বঙ্গীয়

লোক-সঙ্গীত রত্নাকর

বাংলার লোক-সঙ্গীতের কোষগ্রন্থ

(An Encyclopaedia of Bengali Folk-song)

প্রথম খণ্ড

অ—ছ

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এম. এ., পি.-এইচ. ডি.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অধ্যাপক ও আধুনিক ভারতীয় ভাষাসাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক,
নয়াদিল্লী কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমির রত্নসদস্য
কর্তৃক সঙ্কলিত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণের

নিবেদন

বাংলা লোক-সঙ্গীতের কোষগ্রন্থ (encyclopaedia) 'বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহা চারি খণ্ডে প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। চারিখণ্ডের মধ্য দিয়া বাংলার সমগ্র লোক-সঙ্গীতের বর্ণানুক্রমিক পরিচয় এবং সঙ্কলন দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লোক-সঙ্গীতের স্বরলিপিও প্রকাশ করা হইয়াছে।

লোক সঙ্গীতের কোষগ্রন্থ (encyclopaedia) কেবলমাত্র ভারতীয় ভাষাতেই নহে, ভারতের বাহিরেও অন্য কোন ভাষায় আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে কি না, তাহা আমার জানা নাই। সুতরাং এই প্রয়াস যে কত দুঃসাহসিক, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বিগত প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে যে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহাই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া এই কোষগ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে, তবে কোন কোন বিষয়ে ইহাকে সম্পূর্ণতা দিবার জন্য অন্যের প্রকাশিত সংগ্রহের উপরও আমাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে। লোক-সঙ্গীতের কোষগ্রন্থ রচনার প্রয়াস এই প্রথম বলিয়া ইহাতে কোন পূর্ববর্তী আদর্শ অনুসরণ করিতে পারি নাই, ইহার পরিকল্পনা এবং রূপায়ণও আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব ; সেইজন্য ইহা দোষত্রুটি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছে, এমন দাবী আমি করিতে পারি না। প্রথমত দেখা যাইবে, বাংলার কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলের সংগ্রহ ইহাতে অধিক পরিমাণে স্থান পাইয়াছে। ইহার কারণ, এই কয়েকটি অঞ্চল হইতেই আমি উপকরণ সংগ্রহ করিবার সর্বাধিক সুযোগ পাইয়াছিলাম। ক্রমাগত কয়েক বৎসর যাবৎ এই সকল অঞ্চলে সংগ্রহ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সমবেত ভাবে ইহাদের মধ্য হইতে সংগ্রহ কার্য করিয়াছি। অন্যান্য অঞ্চলে এই সুযোগ পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে সংগ্রহ করা হইয়াছে মাত্র; অনেক ক্ষেত্রে অন্যের প্রকাশিত সংগ্রহের উপরও নির্ভর করিতে হইয়াছে। তবে এই কথা সত্য, পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তর বাংলার এমন কোন অঞ্চলের এমন কোন লোক। সঙ্গীত নাই, যাহা আমার জ্ঞাতসারে কোষগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। তথাপি ইহার কোন অসম্পূর্ণতার প্রতি যদি কোন সহৃদয় লোক-সঙ্গীত

রসজ্ঞ পাঠক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তবে তাহা ভবিষ্যতে দূর করিবার প্রয়াস পাইব।

বাংলাদেশকে জানিতে হইলে গানের মধ্য দিয়া ইহাকে জানা যত সহজ, অন্য কোন বিষয়ের মধ্য দিয়াই তাহা তত সহজ নহে। প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম কাল পর্যন্ত বাঙ্গালীর সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদই তাহার সঙ্গীত। বাঙ্গালীর ধ্যান ধারণা, সামাজিক আচার-আচরণ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনের সুখদুঃখের অনুভূতি সবই সঙ্গীতের মধ্য দিয়া সার্থকতম বিকাশ লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালীর সঙ্গীত-সাধনায় যে বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিতে না পারিলে বাঙ্গালীর চরিত্র এবং তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা করা যাইবে না। এই উদ্দেশ্যেই বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি সামগ্রিক পরিচয় প্রকাশ করিবার গুরুত্বপূর্ণ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। ইতিপূর্বে নানাভাবে আমি বাংলার লোক-সঙ্গীত সম্পর্কে অন্যত্রও আলোচনা এবং সংকলন প্রকাশ করিয়াছি। ('বাংলার লোক-সাহিত্য', তৃতীয় খণ্ড, 'বাংলার লোক-সঙ্গীত' ১ম হইতে ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা বেঙ্গল মিউজিক কলেজ হইতে প্রকাশিত ইত্যাদি) কিন্তু তাহাদের কাহারও মধ্যে ইহার সামগ্রিক রূপ প্রকাশ করিবার সুযোগ পাই নাই। বর্তমান গ্রন্থের চারি খণ্ডে সেই অভাব পূর্ণ করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই কোষগ্রন্থ বাংলা ভাষায় কেন, বাংলাদেশের বাহিরেও এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্বে স্বর্গত দুর্গাদাস লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা রঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে 'বাঙ্গালীর গান' (১৩১২) নামক যে একখানি সুবৃহৎ গীতিসঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন হইতে আরম্ভ করিয়া রজনীকান্ত সেন পর্যন্ত বিভিন্ন আধুনিক সঙ্গীত রচয়িতাদিগের গীত সংকলিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতও তাহাতে বিশেষ অংশ অধিকার করিয়াছে। সুতরাং তাহা লিখিত গীতির সংকলন, লোক-সঙ্গীতের সংকলন নহে। তিনি 'নিরক্ষর কবির গান' নামক অধ্যায়ে মাত্র যে পনরটি সঙ্গীত সংকলন করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত লোক-সঙ্গীত। তবে এ'কথা সত্য, ব্যাপকভাবে বাংলার সঙ্গীত-গ্রন্থ সঙ্কলনের প্রয়াস তিনিই প্রথম করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থখানির ভিতর দিয়া অষ্টাদশ *শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাঙ্গালীর নাগরিক*

জীবনের সঙ্গীত-সাধনার ধারার পরিচয় পাওয়া যাইবে, কিন্তু 'বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর' প্রধানত পল্লীবাংলার সঙ্গীত-সাধনার পরিচায়ক।

বর্তমানে পল্লীসঙ্গীত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রধান সমস্যা হইয়াছে, ইহার সুরের সমস্যা। পল্লীর গায়কগণ তাঁহাদের সঙ্গীতে যে সকল আঞ্চলিক সুর ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই সম্পর্কে নাগরিক গায়কদিগের কোন জ্ঞান নাই; এমন কি, তাঁহারা যদিও তাহাতে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজেদের কণ্ঠে তাহা আরোপ করিতে চাহেন, তাহা হইলেও তাঁহারা এই কার্যে সফলকাম হইতে পারেন না। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়কের কণ্ঠে পল্লীর নিতান্ত অনায়াস-লব্ধ সুর কখনও ইহার নিজের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পরিস্ফুট হইতে পারে না। পল্লীসঙ্গীতে কেহ যথার্থ শিক্ষা লাভ করিতে পারে না, ইহা জন্ম সূত্রে পল্লীবাসী লাভ করে। সেইজন্য শহরে প্রতিষ্ঠিত পল্লীসঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর দিয়া আশানুরূপ ফল লাভ করা যায় না।

যদিও এ'কথা সত্য, স্বরলিপির মধ্য দিয়াও গানের প্রকৃত সুর-রূপটি যথাযথ প্রকাশ পাইতে পারে না, তথাপি পল্লীসঙ্গীতের সুর সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান না থাকিবার জন্যই ইহার প্রকৃত স্বরলিপি প্রণয়ন করাও অত্যন্ত দুরূহ কাজ হইয়া উঠিয়াছে। এক অঞ্চলের গায়ক স্বতন্ত্র অঞ্চলের পল্লীসঙ্গীতের সুর আয়ত্ত করিতে পারে না; কারণ, তাহার কণ্ঠ নিজের অঞ্চলের সঙ্গীতের বিশিষ্ট সুরেই মূলত গঠিত হইয়া থাকে। সেইজন্যই দেখা যায়, পূর্ব বাংলার ভাটিয়ালী গায়কের কণ্ঠে পশ্চিম বাংলার ঝুমুর গান কিছুতেই জমিয়া উঠে না। উত্তর বাংলার গম্ভীরা গানের অঞ্চলের একজন গায়কের কণ্ঠে পশ্চিম বাংলার টুসু গানের সুর কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইতে পারে না। সেইভাবেই এক এক অঞ্চলের গায়ক অন্য অঞ্চলের কিংবা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়ক পল্লীসঙ্গীতের স্বরলিপি রচনা করিতে সক্ষম হইতে পারে না। সুতরাং পল্লীসঙ্গীতের যে সহজ সুর আজ ক্রমাগতই শহর হইতে আমদানী করা সিনেমা-রেকর্ডের গানের সুর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া বিকৃত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা রক্ষা করিবার উপায় কি? পশ্চিম বাংলায় শিল্প-জীবনের দ্রুত প্রসার সত্ত্বেও এমন গ্রাম এখনও বহু আছে, যেখানে বাংলার লোক-সঙ্গীতের মৌলিক সুরের সন্ধান পাওয়া যায়। সেখান হইতে এখনও টেপ্-রেকর্ড যন্ত্রের সহায়তায় সঙ্গীতের সুরগুলিকে তুলিয়া আনিলে ইহাদের মৌলিক সুরের পরিচয়

এখনও রক্ষা পাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য দেশেও এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়।

১৯৬৪ সনে যখন আমি সোভিয়েত দেশের লেনিনগ্রাড্ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার লোক-শ্রুতি সম্পর্কে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে যাই, তখন সেখানকার পুস্কিন ইন্‌স্টিটিউট্ অব্ রাশিয়ান লিটারেচার'-এর অন্তর্গত লোক-সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্রটি পরিদর্শন করিবার সুযোগ পাই। তাহাতে উনবিংশ শতাব্দীতে phonogram বা শব্দধারক যন্ত্র যখন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তখন হইতে পল্লী-সঙ্গীতের রেকর্ড করিয়া গবেষণাগারে আনিয়া রাখা হইয়াছে। Phonogram-record হইতে disc-record এবং তাহা হইতে এখন tape-record-এ সেই গানগুলিকে তুলিয়া রাখিয়া ইহাদের স্থায়িত্ব দীর্ঘতর করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পল্লীসঙ্গীতের সুর রক্ষা করিবার জন্য আমাদের দেশেও এই নীতি অনুসরণ করা যাইতে পারে।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিবার কার্যে যাঁহার নিকট হইতে সর্বাধিক সহায়তা এবং উৎসাহ লাভ করিয়াছি, তিনি সঙ্গীত-জগতে সুপরিচিত পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ। তাঁহার আনুকূল্য ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশ কিছুতেই সম্ভব হইত না। দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাদেমি এই গ্রন্থ মুদ্রণের সমগ্র ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সেইজন্যই গ্রন্থের মূল্য এত সুলভ করা সম্ভব হইয়াছে। গ্রন্থের মুদ্রণ কার্যে সহায়তা করিবার জন্য আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র বর্তমানে অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্র এম. এ. এবং অধ্যাপক শ্রীসুধীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী এম. এ. প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানিকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্য ইহাতে অন্য যাঁহাদের প্রকাশিত সংগ্রহ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নহে; তাঁহারা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি
গবেষণা পরিষদ
ঝুলনযাত্রা, ১৩৭১ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

অ

অষ্টক

চৈত্রমাসের সংক্রান্তির সময় নীলের গাজন উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপিয়া যে বিভিন্ন শ্রেণীর গান গাওয়া হয়, তাহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর গান অষ্টক গান বা অষ্ট গান নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদ জিলা ও তাহার সংলগ্ন অঞ্চলেই এই গান প্রচলিত আছে, বাংলার অন্য কোন অঞ্চলে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া যে অষ্টক গান বা অষ্ট গান নূতন একটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা নহে, কারণ, যে অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বেশী হইয়াছে, সেই অঞ্চলে গাজন গানে শিব-প্রসঙ্গ ব্যতীতও রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গও প্রচার লাভ করিয়াছে। অষ্টক গানে একদিকে শিবের প্রসঙ্গ যেমন বর্ণিত হয়, তেমনই রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গও গীত হয়। সেইজন্য কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা, নিমাই সন্ন্যাস বিষয়ও অষ্টক গানে শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি, লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতও অষ্টক গানের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া ইহাতে কিছু মাত্র বিশেষত্ব নাই। তবে সুর, পদবিন্যাস ও গায়কী রীতির মধ্যে ইহার বৈশিষ্ট্য আছে। সেইজন্যই ইহা নীলের গাজনের মধ্যেই বিশেষ একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

অষ্টক শব্দটির তাৎপর্য এখানে বুঝিতে পারা যায় না। কারণ, ইহার গীত-রীতিই হউক কিংবা বিষয়-বস্তুই হউক, ইহাদের কাহারও মধ্যে অষ্ট বা অষ্টক শব্দের অর্থবাচক কোন ভাব প্রকাশ পায় না। যে রচনায় আটটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ আছে, তাহাকে অষ্টক বলা যায়, কিন্তু অষ্টক গান কোন পরিচ্ছেদে বিভক্ত নহে। তবে গাজন গানের রীতি ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছে। সুতরাং ইহার বর্তমান রূপ দেখিয়া ইহার প্রাচীন রূপের কথা কল্পনা করা অনেক সময় কঠিন। হয়ত যখন এই শ্রেণীর গানের উদ্ভব কিংবা ইহা গাজনের সঙ্গে প্রথম যুক্ত হইয়াছিল, তখন আটটি শ্লোকে কিংবা অংশে বিভক্ত হইয়া এই গান রচিত ও গীত হইত। আজ তাহার সেই রূপ আর নাই, অথচ নামটি রহিয়া গিয়াছে। সেইজন্য অষ্টক শব্দটির আজ তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যেমন এক যাত্রাভিনয়ের মধ্যে দেশের যাবতীয় নাগরিক গীত-রীতি আসিয়া একদিন আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, তেমনই বাংলার গাজনোৎসবের মধ্যেও দেশের যাবতীয় লৌকিক গীত-রীতি আসিয়া একদিন একত্র মিলিত হইয়াছিল। সেইজন্য গাজনের মধ্যে বিচিত্র প্রকৃতির গীত-রীতির সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। অষ্টক গান তাহাদেরই একটি রূপ মাত্র।

শাস্ত্রীয় কিংবা লৌকিক কোন গানের রাগ-রাগিণী অর্থে অষ্টক শব্দটি পাওয়া না গেলেও দেখা যায়, ঋগ্বেদের একটি সূক্তের নামক অষ্টক। সূক্তগুলি বিশেষ বিশেষ সুরে গাওয়া হইত, সেই সূত্রেই অধুনা বিলুপ্ত কোন গানের সুরের নামও অষ্টক গান বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

১

ওরে, ঘোর কলিকাল হরি বল।
পাপের হল অধিকার।
দিগ্‌বিদিক পারে হোল সবই হল একাকার॥
ঘরে সাপ গাছের মাপ গেল,
বেম্মার কচা দর হোইল।
ওরে বউ হইয়াছে রাজরাণী
মা হইয়াছে তার চাকরাণী॥
বধূর কথা মধু লাগে
জয় করে সেই সুন্দরী॥ —মুর্শিদাবাদ

২

শিব বলে, সুন্দরী,
তুইতো বড় রূপসী।
আমি একটু হইছি বুড়া
তাতে তোর ক্ষতি কি?
আমি দিব সোনার মুকুট তোর মাথায়;
সোনার মল গড়ে দিব পায়,
দুই হাতে দুই কঙ্কণ দিব, যাতে তোর শোভা হয়।

চিরুণে চুড়িয়া চুল,
খোঁপায় দিয়া, হা রে, চম্পা ফুল।
ফুলের গন্ধে কেড়ে নেয় প্রাণের যুবতীর কুল॥ —ঐ

৩

ও নারদ কৈলাসে ভবানীকে কয় হেসে,
পাগলা মামা ধুতরো খেয়ে
কোচের বাড়ী যায় ঘুরে।
ও মামা হাসে রসে পান চিবায়,
চিচ ঢালে কোঁচানির গায়।
কেউ বা মামার মাথা খায়, কেউ বা মামার জট ঘুরায়,
ওরে চুপ—গাজন তায় আলোয়ে, নাগর দিল ভুলায়ে। —ঐ

৪

কৃষ্ণ ডুবে আছে কালিয়ায়।
বলাই মনে মনে ভাবিলেন, হৃদয় (মনে)
কৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে, উপনীত হইলেন নন্দালয়ে।
কি শোনালি, ও যাদুমণি!
ও তুই কি শোনালি রে নিঠুর বাণী,
শূন্য করে গেছে আমার সংসার,
তোরা কোথায় লুকায়ে আলি রে, আমার প্রাণের নীলমণি॥
নন্দরাজা কেন্দে বলে, রাণী, কেন্দো না আর,
তোমায় বলি, পুর্ব জন্মে শাপ ছিল,
ও তাই ঘটে গেল, আমার কপালে। —ঐ

৫

শচীরাণী কেন্দে বলে নৈদে বাসী দেখবি আয়,
আমার নিমাই আমায় ছেড়ে যায়।
আর বুঝি মা বলে
নিমাই আমার, ডাকবে না আমায়।

এই নদীয়া আঁধার হলো নিমাই চান্দ ছেড়ে গেল,
আমার ভাগ্যে এই ছিল
বাঁচার চেয়ে, ওরে নিমাই, মরণ আমার ভাল। —ঐ

৬

শিব নারায়ণ, অতিথি বেশে, গেল ধরার বাড়িতে।
বলে 'আছি উপবাসী—
ও চাই পারণ করিতে'।

৭

ও তুই যারে কোকিল, যা রে উইড়ে,
করিস না আর দেরি।
আমার বন্ধু যেথায় গেছে—বলগে গিয়ে বন্ধুর কাছে,
আমি বন্ধু বিনে জীবনেতে মরি। —ঐ

অষ্টমাসী

নায়িকার বারমাসের বিরহ-জীবনের বেদনা যে গানের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হয়, তাহাকে বারমাসী (বারমাসী বা বারমাস্যা দেখ) বলে। কিন্তু বার মাসের পরিবর্তে তাহাতে যদি ছয় মাসের বর্ণনা থাকে, তবে তাহা ছয়মাসী বা ছয় মাস্যা (পরে দ্রষ্টব্য) এবং সেই বর্ণনা যদি আট মাসের হয়, তবে তাহাকে অষ্টমাসী বলে। বারমাস্যা যত ব্যাপক, ছয় মাস্যা এবং অষ্টমাসী তেমন ব্যাপক নহে। এমন কি, ছয় মাস্যাও যত পাওয়া যায়, অষ্টমাসীও তত পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র বেহুলার কাহিনীমূলক গীত গাহিবার প্রসঙ্গে বেহুলার অষ্টমাসী কোন কোন অঞ্চলে শুনিতে পাওয়া যায়। মনসার অষ্টমাসী মনসার আটমাসের বিরহ-বেদনার বর্ণনা নহে, বরং তাহার বিবাহের দিনে তাঁহার স্বামী লখীন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার স্বর্গসভায় আসিয়া উপস্থিত হইবার দিন পর্যন্ত যে আট মাস সময় কাটিয়াছিল, তাহারই বর্ণনা। ইহাও বেদনারই সঙ্গীত এবং গৌণভাবে ইহাতে বিরহের কথাও আছে। কারণ, মৃত স্বামীর অস্থি কয়খানি সম্বল করিয়া সেদিন বেহুলা যে নিদারুণ দুঃখের মধ্য দিয়া তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাও তাহার স্বামীর

বিরহ-জনিতই ছিল। তবে সাধারণত বারমাসীর মধ্যে যে নায়ক-নায়িকার প্রেমানুভূতির অভিব্যক্তি থাকে, ইহাতে তাহা নাই।

বারমাসী, অষ্টমাসী কিংবা ছয়মাসী ইহাদের প্রত্যেকটিই লোক-সঙ্গীতের অন্তর্গত। কিন্তু তথাপি দেখা যায়, মধ্যযুগের মঙ্গলগান ও নানা আখ্যায়িকা গীতিকায় ইহারা স্থান পাইয়াছে। তাহার ফলে ইহাদের লৌকিক রূপ যে কোন দিক দিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা নহে। অনেক ক্ষেত্রে মঙ্গলগান কিংবা অন্যান্য কাহিনীমূলক গীতিকার কবিগণ লোকমুখে যাহা শুনিতেন, তাহাই অবিকল তাঁহাদের রচনার মধ্যে গ্রহণ করিতেন। অবশ্য আবার এ কথাও সত্য যে, অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা ইহার বহিরঙ্গে তাঁহাদের ব্যক্তিগত রস এবং রুচিবোধ অনুযায়ী কিছু কিছু পরিবর্তন সাধনও করিতেন। বেহুলার যে অষ্টমাসীটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল, তাহার লৌকিক রূপ যে কোন দিক দিয়াই ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইবে।

১

শুন গো, মনুসা মাও গো, মহাদেবের ঝি।
হেন লয় মোর মনে শীতল জল পি॥
বৈশাখ মাসেতে, মাও গো, লখাইয়ে বিয়া করে।
কাল রাত্রি খাইল নাগে লোহার বাসরে॥
রামকলা কাটিয়া, দেবী গো, ভেরুয়া সাজাইলু।
ইষ্টমিত্র বাপ ভাই ফিরিয়া না চাইলু॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে, মাও গো, ভাসিলু সাগরে।
দারুণ জ্যৈষ্ঠের খরায় বজ্র ভাঙ্গি পড়ে॥
প্রাণনাথ স্মরি, মাও গো, চক্ষের পড়ে পানী।
শুকুনা কাষ্টেতে যেন জ্বলন্ত আগুনি॥
আষাঢ় মাসেতে, মাও গো, গাঙ্গে নয়া পানী।
প্রভুরে খাইতে আইল অরণ্যের বাঘুনী॥
আত্মমাংস কাটি, দেবি, যুগাইলু আহার।
ছাড়িয়া পলাইল বাঘে বুঝি ব্যবহার॥
শ্রাবণ মাসেতে, দেবী গো, ঝড় বরিষণ।
স্বামী নাহিক যার নিষ্ফল জীবন॥

সাগরে ভাসিয়া আমি বর্তির ঘাটে আইলু।
বর্তির সঙ্গ পাইয়া, মাও, তোমারে পুজিলু॥
ভাদ্র মাসেতে, দেবী গো, বাতুলী কত হইল।
জুক, পোক, মশা, মাছি সমাইয়ে বাস লেল॥
জুক, পোক, মশা, মাছি গো, সমাইয়ে নৈলা ঘর।
মুই অভাগী ভাসিলু, মাও, গণ্ডকী সাগর॥
আশ্বিন মাসেতে, মাও গো, নেতার ঘাটে আইলু।
রজকীর রূপ ধরি কাপড় ধুইলু॥
বড়ের কুমারী হইয়া না বাসিলু ভিন।
নেতার ঘাটেতে ছিলু সমস্ত আশ্বিন॥
কার্তিক মাসেতে, মাগো, ত্রিদশের মেলে আইলু।
নর্তকীর বেশ ধরি দেবতা মানাইলু॥
অগ্রহায়ণ মাসেতে, দেবী গো, মাগিয়া লেলু বর।
জীয়াইয়া দেও, মাও, দুর্লভ লক্ষ্মীধর॥
শ্রীষষ্ঠীবর কবি গো, মনুসা দেবীর বর।
অষ্টমাসী গাইলা কন্যা পদ্মার গোচর॥
কৃপা যদি কর, মাও, জয় বিষহরি।
তবেত জীয়াও লখাই রূপের মুরারি॥
যদি মোর প্রভুরে তুমি না দেও জীয়াইয়া।
দেবের সত্য জিনিলু মুই মনুষ্য জাতি হইয়া॥
এ সব শুনিয়া দেবী না দিল উত্তর।
না জীয়াইমু লক্ষ্মীধর—সুন্দরীর যাউকা ঘর॥
বিপুলায় বলে,—মসি, নেতাই।
মোর কার্য কিছু কও মনুসার ঠাঁই॥
বিপুলার বচনে নেতা করিলা গমন।
প্রণতি করিয়া ধরে পদ্মার চরণ॥
নেতায় বললে, বৈন, জয় বিষহরি।
জীয়াইয়া দেও লখাই, সুন্দরী যাউকা পুরী॥
পদ্মা বলে, মোর বৈরী, তোর বৈরী জন।
বাহুয়ায় পুত্র জন্য বল কি কারণ॥

—শ্রীহট্ট

অহীরা

পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী জিলাগুলিতে কার্তিকী অমাবস্যার সময় গো-জাতির কল্যাণার্থে এক লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে বাধনা পরব বলে। পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জিলার পশ্চিমতম সীমান্ত, বর্ধমান জিলার আসানসোল মহকুমার পশ্চিম অংশ, বিহারের ধানবাদ জিলা, সাঁওতাল পরগণা জিলা এই সকল অঞ্চলের বাঙ্গালী ও বঙ্গভাষাভাষী আদিবাসীদিগের মধ্যে এই উৎসব উপলক্ষে যে গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সাধারণতঃ বাধনা পরবের গান বলিয়া পরিচিত। ইহাকে অহীরা সঙ্গীতও বলে। গো-জাতির পালক সাধারণতঃ গোপ বা আভীর জাতি। আভীর শব্দটিই স্থানীয় উচ্চারণে অহীর শব্দে পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র বিহারী গোয়ালা বা অহীর বা আহীর জাতির মধ্যেই যে এই উৎসব এবং ইহার সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহা নহে, প্রত্যেক গৃহস্থই কৃষি ও অন্যান্য কার্যের জন্য গো-পালন করিয়া থাকে বলিয়া তাহারাও গৃহে গৃহে স্বতন্ত্রভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গোষ্ঠীবদ্ধ-ভাবে এই উৎসব উদ্‌যাপন করিয়া থাকে।

এই উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ; যেমন গরু জাগানো, গরু নাচানো ইত্যাদি ইহাদের উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। এই উৎসবের সঙ্গে একটু ধর্মীয় আচার যুক্ত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় যে, অন্যান্য লোক-সঙ্গীত যেমন ক্রমপরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হয় এবং নূতন নূতন উপকরণ গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করে, ইহার তেমন হয় না। ইহার সঙ্গীত নূতন করিয়া বিশেষ একটা রচিত হইতে দেখা যায় না; প্রচলিত সঙ্গীতগুলিই প্রধানতঃ অবিকৃতভাবে চলিতে থাকে। তবে ভাষার আধুনীকরণ তাহাতে সকল সময় রুদ্ধ হয় না, অপ্রচলিত প্রাদেশিক শব্দ পরিবর্তিত হয়। কিন্তু বিষয়-বস্তুর কোন পরিবর্তন হয় না। প্রতি বৎসর উৎসবের যে অঙ্গ অবলম্বন করিয়া যে গান গীত হয়, তাহা প্রতি বৎসর সেই ভাবেই গীত হয়। সুতরাং ইহাকে আচার-সঙ্গীত (ritual song) বলিয়াও মনে কয়া যায়।

অনেক সময় এই সঙ্গীত কাহিনীমূলক (narrative) হইয়া থাকে, তাহাকে 'কপিলা-মঙ্গল' বলা হয়, কিন্তু পুরাণের কপিলা গাভীর বৃত্তান্তের সঙ্গে যেমন

ইহার কোন যোগ নাই, তেমনই মঙ্গলগানের সাধারণ রীতি অনুযায়ীও তাহা রচিত হয় না।

১

কপিলা গাই চলে গেল শিরি বৃন্দাবন,
ডোহরে ডৌড়িল অষ্টপায়া বাঘা ছেঁকিল আঁওয়াইল।
ছড়বে তো বাঘা রাজাকের পথ ধরে,
নাহি আমি ছাড়িব রাজাকের পথ (সড়ক)।
বার বার বার বৎসর ভুখে আছিরে,
আজি খাব অন্ত্য পুরি (পেট পুরে)
শোনরে শোনরে আমারি বচন, সত্যে বন্দি করি।
গরুর শিংয়ে জল খায়
ধোপার মোট মাথায় বহে
তখন কান্দে কান্দে রাস্তায় ডৌড়িল
যাতে যাতে হামলা আছ সে (হাম্বারব)
খা রে খা রে খা রে বাচ্চা জন্মের মত দুধ
বাঘার সঙ্গে সত্যে বন্দী আছি।
বল না, মাগো, আমি যাবো তোমার আগে আগে
তুমি যাবে পিছনে পিছনে
তখন যে বাঘা বলদা এক করতে দুই জনে আসে—
আজ খাব অন্ত্য পুরি
আয়রে আয়রে, বাঘা, তোর সঙ্গে যুদ্ধ যে লাগে
সাতটি রাত সাতটি দিন রে
ওরে তখন যে মহাদেব ওলা দেখতে পাইল
কিসের ধূলা যে উড়ে, তখন যে মহাদেব ওলা
ছি ছি ছি এখন ও বলদা এখনও
রাখিছ কার কুন্দা করি দেও (কাটা)
জাগ জাগ জাগ ঘর ঘুরিয়ে যাও
আমি নাহি যাব ঘর গো
আমি চলে যাবো শ্রীবৃন্দাবন।

ওরে রে তখন যে বলদা বলা
আমি আড়াই দিনের বাছুর
আমি দেনা শোধ করিতে যাবো
চলে যাবো মহাদেবের ঘরেরে
ওরে, তখন যে কুলি মাতা যে হাম্বারব মারিছে
তখন সব লোক দেখে ঘরে কপাট দিয়েছে
তখন বলে বাইরা বাইরা বাবা আমি
আড়াই দিনের দেনা শেষ করি
তখন মহাদেব বাহির হইয়া
হাল জুড়িল আড়াই বেরা ঘুরাইল ছাড়িয়া দিল।
তখন যে বলদা চলে গেল শিরি বৃন্দাবন ॥

—নিগুরিয়া (মেদিনীপুর)

২

ওইরে কোন খানেরে ওইরা ওলটি পলটিরে
কোনখানে চলে গম্ভীর বনেরে—আরে চলে গম্ভীর বনে।
আহা রে গম্ভীর বনেরে চরি আসে গর সামালি
আহারে আজো যেরে বলদা দেখিব মরদানী।
চারি পায়ে লাথিয়া গরু দুই শিঙ্গে ধুনেরে।
মাতালকে তো দিবে রে উলটায়ে ॥ —ঐ

৩

আরে ঈশ্বরে ছাঁচয়ে ঈশ্বরে ছুলয়ে
মাহাদেবে গাড়ে মাল খামি ;
সেই খামে বাঁধব কোকিলাকা পুতা হো
খেলি খেলি ধূলা উড়ি যায় ॥ —ঐ

৪

প্রশ্ন— ওইরে কতিখনে আইরা চরিবাজি আইলিরে
কতিখনে সিনান করিলি
কতিখনে অইরা ফুল গাঁথলিরে—
কতিখনে খেলিতে বাইরালি রে ॥

উত্তর— কুঁকড়া ডাকেরে অইরা চরিবাজি
আইলারে বাইসাম বেলায় সিনান করিলি রে
দুপহরে ফুল গাঁথলি
বৈকাল বেলায় খেলিতে বাইরালি ॥ —ঐ

৫

ভালা অহিরে
কোনে কা পুতা ভালা শিশু বালক গো,
কোনে কা পুতারে ডামাল।
আর,—কোনে কা পুতা ভালা
অতি বলবান গো
রগড়ি ধরত ধেনু গাইরে।
ভালা অহিরে—
আরে, কপিলাকা পুতা ভালা শিশু বালক গো,
মহিষাকা পুতারে ডামাল।
আর—বাঘেকা পুতা ভালা অতি বলীয়ান গো।
রগড়ি ধরত ধেনু গাইরে। —পুরুলিয়া

৬

কোনে ত চাঁছয়ে কোনে ত ছুলয়ে
কোনে ত গাড়ে মালথায় রে—
আর, কোনে কা পুতা বেঁধে নানা রঙ্গ গো
কোনে ত হল ধূলাময় রে।
ঈশ্বরে চাঁছয়ে মহাদেবে ছুলয়ে
মানবী এ গাড়ে মালথায় রে।
আর কপিলাকা পুতা বেঁধে,
করি নানা রঙ্গ গো।
স্বরগে পাতালে ধূলা উড়ে। —ঐ

৭

ডুংরিকে ধাঁরি ধাঁরি ঝরনাফুল কুটি গেল।
উঠি গেলাই তিতা পুঁটি মাছ।

সেহ তিতা পুঁটি মাছ ভউজী খাওলে গে।
দেওরে তো খালেক দুধ ভাত। —ঐ

৮

চোদ্দ সালের আকালে লোক চলে সকালে
নাই যাব ধনিয়া বেপারে।
ধনিয়ার বাসে নিন্দ নাহি আসে
পান বিড়ি রহিল পকেটে। —ঐ

৯

আরে অহিরে[১]—
আরে কেউ ত কাঁদে বালা জনমে জনমে গো,
কেউ ত কাঁদে জয় মাসরে।
মায়ে ত কাঁদে বালা জনমে জনমে গো
বহিনী ত ছয় মাসরে।
বহুজিনী[২] কাঁদয়ে নিশাভোর রাতি হো,
আরে ছিও রে—
খুঁজে দুসরা দুখারী রে। —ঐ

১০

কাহার ঘর ভালা উঁচা উঁচা পিঁড়া যে
কাহার ঘররে গভীর।
কাহার ঘর ভালা অতি চমৎকার যে
সারারাতি জ্বলে মোমের বাতি।
অহিরে—
গাইকা ঘর ভালা উঁচা উঁচা পিড়া যে
মহিষাকা ঘর রে গভীর—
শিরধনী[৩] কা ঘর ভালা অতি চমৎকার,
বাবু হো—
সারা রাতি জ্বলে মোমের বাতি। —ঐ

১। ঐ বে, ২। বধু, ৩। সুরধনী গাভী।

১১

অরুণ বনে কেরি তরুণ লতা হো
লগনে ভাঁগব জোতি[১]।
সেও জোতে বাঁধব কপিলাকা পুতা হো
হলিডলি[২] আওত[৩] মাতুয়াল[৪]। —ঐ

১২

কাকর[৫] বরদা[৬] ভালা গুড়া ক্ষেতে ঘুরই
কাকর বরদা ঘানি ঘুরে
কাকর বরদা ভালা সহরময় ছুটয়ে
স্বরগে পাতালে ধূলি উড়ে।
চাষীকা বরদা ভালা গুড়া ক্ষেতে ঘুরয়ে
তেলিকা বরদা ভালা সহরময় ছুটয়ে
স্বরগে পাতালে ধূলি উড়ে। —ঐ

১৩

কাকে ত সাজে ভালা হাতী বল ঘোড়া হো,
কাকে ত সাজে পাকা পিঁড়া।
কাকে ত সাজে ভালা উঁচা উঁচা পিঁড়া হে,
কাকে ত সাজে পাঁজি পুঁথি।
রাজাকে সাজে ভালা হাতী বল ঘোড়া হে,
জমিদারকে সাজে পাকা পিঁড়া।
মণ্ডলকে সাজে ভালা উঁচা উঁচা পিঁড়া হে,
বাম্হনকে সাজে পাঁজি পুঁথি। —ঐ

১৪

কোন ফুলেরে অহীরা[৭] উড়ন পিঁধন হো
কো ফুলে ঘষণ মাজন
কোন্ ফুলে রে ঐরা খোঁপারাই চিকন হো
কোন্ ফুলে রাখিল সংসার।

১। দড়ি, ২। হেলে দুলে, ৩। আসছে, ৪। মাতাল, ৫। কার, ৬। বলদ। ৭। আহীর,

কাপা[১] ফুলেরে অহীরা উড়ন পিঁধন হো
সর্ষা ফুলে ঘষণ মাজন।
কিয়া ফুলে রে ঐ রা খোঁপারী চিকন হো
ধান ফুলে রাখিল সংসার। —ঐ

১৫

অহি রে—
কুলি কুলি যাত্তে ছিলি নাচিয়ে খেলিয়ে
তোরি গিরি হায় ডাকিয়া ঘুরাল।
তোরি সে ঘরে আছে পাঁচ মুড়[২] লছুমন[৩]
তাহাকে জাগাই মোরা যাব। —ঐ

১৬

অতদিনে যে চরালি বরদা কচায় বন খুদিয়ে[৪]
রাঢ়ে চুয়াড়ে দেত গালি।
চারি পায়ে জঁাকবে[৫] জড়া[৬] শিং এ মারবে
রাখি দিও বাগালেরি নাম। —পুরুলিয়া

১৭

জাগো, মা লছুমণি, জাগো মা ভগবতী
আজি ত অমাবস্যা রাতি
জাগে কা প্রতি ফল দিব গো মহাদেবে
পাঁচ পুতায় দশ ধেনু গাইরে। —ঐ

১৮

চাঁদমা উঠি গেল কুকুড়ামা ডাকি গেল।
ধনি পুত্র তোহারিকা নিন্দ।
গঙ্গা গোহালে ভালা গায়া মোর কান্দয়ে
উঠ পুত্র খুলত ময়দান। —ঐ

১। কার্পাস। ২। পাঁচ মাথা অর্থাৎ পাঁচটি, ৩। লক্ষ্মী, ৪। মাঠে বনে গুহায়, ৫। চেপে ধরবে ৬। জোড়া।

১৯

জাড়ে শিশিরে ভালা অঙ্গ মোর ভিজয়ে
হামে নাহি খুলম আধারাতি। —ঐ

২০

ভালায় অহীরে জাগে মা লক্ষ্মীণী
জাগে মা ভগবতী জাগে অমাবস্যা রাত্রি
আর জাগে পতিপদ দেবী গো মাইলা
পাঁচ পুত্র দশ ধেনু গায় রে। —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২১

ভালায় অহীরে, পচাপানী কুলিরে,
ছোট মোট কুলিরে তিল সরিষার বড় চাষ রে।
আর তরী যে গোলাগলিরে, এতই না কিরপণ
কভু নাই তো শিঙে ভরি তেল। —ঐ

২২

অহীরে, এখনে ত নে ত ভালা সের ভরি ধান।
চলি যাব দুসর দুয়ার।
ধান ত দেলে ভালা স্থপ ভরি ভরি!
তেল বিনা মন নাহি পায়।
অহীরে, এখনে ত নে ত ভালা সের ভরি ধান। —ঐ

এখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুর জিলার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত বা ঝাড়গ্রাম মহকুমা হইতে যে সকল গান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের ভাষা আঞ্চলিক প্রাদেশিক ভাষা বা কুর্মালি ভাষা নহে, বরং খোট্টাই বাংলা। কারণ, বিহারী আহীর জাতির মধ্য হইতেই এই গানের প্রচার হইয়াছে। তাহার প্রভাব ইহাদের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, ইহারা আচার সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অপরিবর্তনীয়।

আ

আখ্যান-গীতি

যে সকল গানের মধ্যে আখ্যান, আখ্যায়িকা বা কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই সাধারণভাবে আখ্যান-গীতি (narrative song) বলা হয়। ইহা বিষয় অনুযায়ী বিভিন্ন হইতে পারে, যেমন, পৌরাণিক আখ্যান-গীত, লৌকিক আখ্যান-গীতি ইত্যাদি। রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ, ইত্যাদির আখ্যান অবলম্বন করিয়া যে গীতি রচিত হয়, তাহাকে পৌরাণিক আখ্যান-গীতি বলা যায়, তাহা পুরাণের ধারা অনুসরণ করে না বলিয়া লোক-সঙ্গীতের মধ্যে সকল সময়ই স্থান লাভ করিতে পারে। ইহাতে পৌরণিক চরিত্রগুলি লৌকিক রূপ লাভ করে। এখানে আখ্যান-গীতি বলিতে সাধারণতঃ লৌকিক এবং পৌরাণিক আখ্যান-মূলক গীতি উভয়ই মনে করা হইয়াছে।

লৌকিক আখ্যানও নানা বিষয় সম্পর্কে হইতে পারে। কিন্তু লৌকিক প্রণয়-কাহিনী অনেক সময় গীতি (song)-র সীমা অতিক্রম করিয়া গীতিকা (ballad)-এর সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। যেমন 'গোপীচন্দ্রের গান'কে আখ্যান-গীতি না বলিয়া গীতিকা (balled)-ই বলা হইয়া থাকে। যে সকল আখ্যায়িকা-গীতির রচনা গীতিকার মত দৃঢ় সংবদ্ধ নহে, কিংবা কাহিনীর নাটকীয় গুণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিকাশ লাভ করে না, বরং তাহাদের পরিবর্তে নিতান্ত শিথিলবদ্ধ রচনায় গীতিসুর (lyric quality) দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া শিথিলভাবে অগ্রসর হয়, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাহাকে loose narrative বলা যায়; তাহাকেই আখ্যান-গীতি বলা যায়। প্রেমের বিষয়ও যদি গীতিকার মত বাস্তবধর্মী না হইয়া একান্ত কল্পনানির্ভর ও ভাবমুখীন হয়, তাহাও আখ্যান-গীতির পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। রোমান্টিক প্রণয়-বৃত্তান্ত, ধর্ম সাধকের অলৌকিক জীবনাচরণ আখ্যান-গীতির বিষয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই ইহাদের রচনা শিথিলবদ্ধ এবং বৈচিত্র্যহীন ; কাহিনীও কেবলমাত্র গতানুগতিকতার অনুসারী।

পৌরাণিক আখ্যান-গীতিই মঙ্গলকাব্যের পূর্ব রূপ; রচনার দিক দিয়া দৃঢ় সংবদ্ধ এবং ভাবের দিক দিয়া নিবিড়তা লাভ করিয়া ইহারাই ক্রমে লিখিত

সাহিত্যের মধ্য দিয়া মঙ্গলকাব্যের রূপে উত্তীর্ণ হইয়াছে। মনসার গান, চণ্ডীর গান, ধর্মঠাকুরের গান পূর্বে ইহাঁরা লৌকিক আখ্যান-গীতি মাত্রই ছিল; খৃষ্টীয় চতুর্দশ পঞ্চাদশ শতাব্দীতে ইহারাই ক্রমে সাহিত্যের লিখিত ধারার অন্তর্ভুক্ত হইয়া মঙ্গলকাব্যের রূপ লাভ করিয়াছে।

লৌকিক

১

ফুলবানু

আরে এ আহায় এ—
মোল্লা মুন্সী, বাদশা কাজী শোনেন দিয়া মোন,
সোনারপুরের বার্তা কিছু করি নিবেদন।
এই না ত্মাশে ছিল মর্দ গিয়াসুদ্দিন নাম,
ত্মাশে ধইন্য বিত্মাশ মাইন্য চৌদীঘালে[১] নাম।
ঝাউ বিরিক্ষের[২] মতন মাথা খাড়া[৩] আস্‌মান,[৪]
হস্তপদ য্যামুন ত্যামুন বক্ষডা পাষাণ।
(হারে) হেই না গিয়াসুদ্দিনের বিবি পরীবানু যার নাম;
রূপের কথা কতবা কমু অঙ্গডা সুঠাম।
সোনার বণ্ পরীবানুর নায়েগুণে ধইন্যা,
চাদের মতন বদন তার ওষ্ঠ তেলা কুইচ্যা।
হস্তের আঙ্গুল দীঘাল[৫] দীঘাল ব্যালন বাইগণের[৬] মত,
বক্ষের উপার পদ্ম দুইডা বিল্বিফলের মত।
গলাতে হাঁসুলী তার নাহে নাক ঠাশা,
হাতের বাজু য্যামুন ত্যামুন কোমরে গোট ছড়া।
পন্থ দিয়া হাটে যহন মল খাড়ু পায় দিয়া,
বিষম খায় গাবুর[৭] মুনিষ্যে ত্মাহে চাইয়্যা চাইয়্যা।

১ চতুর্দিকে। ২ গাছ। ৩ সোজা। ৪ আকাশ। ৫ দীর্ঘ—বড়—লম্বা লম্বা। ৬ বেগুন। ৭ যুবাপুরুষ।

(হারে) একদিনেতে ব্যালা শ্যাষে পরীবানু চলে জলের ঘাটে;
সেই না কালে পন্থ দিয়া বাদসা চলে অশ্ব পৃষ্ঠে।
অশ্বেতে রইয়্যা বাদ্‌সা ছ্যাহে জলের ঘাটে,
আহাশেরই[১] চন্দর[২] বুঝি নাইম্যাছে পাতোলে।
কী দেখিল, কী শুনিল বাদ্‌সা কিছুই নাই কয়,
নিশি শ্যাষে রাজসভাতে জহিরেরে বোলায়।
রাজ-সোমাচার[৩] পাইয়্যা জহির মোনে মোনে গোণে,
এতদিনে বুঝি বাদ্‌সার নেকনজরে পড়ে।
গদগদভাবে জহির দরবারেতে যায়,
বাদ্‌সা দেইখ্যা তারে বড় আসন দ্যায়।
বাদ্‌সা কয়, জহির মেঞা তুমি আমি দোস্ত অনেক দিনেকার,
একখান কর্ম করন লাগে, (হেইলে) সুখে থাকবা জীবনভর।
হাইস্যা কয় জহির মেঞা, কী কাম[৪] বা করমু,
তুমি মোরগো দ্যাশের মাথা যা কবা তা হুন্‌মু[৫]।
বাদ্‌সা কয়, শোন দোস্ত, কম কঠিন কিছুই না কমু,
এই দণ্ডেই তালাক্ দ্যাও তোমার বিবি পরীবানু।
ভাইব্যা দেইখ্যো দোস্ত এই কইলাম সার;
যে-কোন দৌলাত[৬] দিমু রত্তন বহু তার।
শুইন্যা বাদ্‌সার কথা জহির মেঞা ওঠে তেইজ্যা,
থুক্ কইর‍্যা ফ্যালায় ছ্যাপে[৭] দরবার মইধ্যেখানে।
জহির কয়, দুষ্টমতি, অনাচারী তুমিই দ্যাশের পতি,
পরের ইস্তিরী[৮] পাবার আশা কইরো না সম্প্রতি।
বাদ্‌সা কয়, হাচা কথা কইলাম মুই সার,
আমার থাবার থিকা তোর নিস্তার নাই আর।
জহির কয়, সেলাম অগো, সেলাম তোমার পায়,
ধড়ে মুণ্ডু থাকা তক্[৯] জহির না ডরায় বাদসায়।

---

১ আকাশ। ২ চাঁদ। ৩ বার্তা-ডাক ৪ কাজ। ৫ শুনিব। ৬ টাকাকড়ি। ৭ থুতু। ৮ স্ত্রী—পরিবার। ৯ পর্যন্ত।

হারে, এই কথা না কইয়্যারে জহির ঘরে ফির‍্যা যায়,
ঘরে ফির‍্যা জহিরুদ্দিন পত্নীরে বোলায়।
জহির কয়, শোন, কন্যা, কহিগো তোমায়,
আইজ নিশি পোহাইলে আর ত' ছাখা পাবা না আমায়।
দুশ্‌মন রাজার রাজ্যে বাঁচন বিষম দায়,
রক্ষকই ভক্ষক হইয়্যা গিল্যা খাবার চায়।
তোমার রূপের সৌরভ পাইয়্যাছে বাদসায়,
বান্দীর বাচ্ছায় তোমারে নিহা করবার চায়।
পরীবানু কাইন্দা কয়; এ-কথা শোনলে গোনা হয়,
বরাতে আছে যা' তা' খণ্ডান না যায়।
এই কথা না বইল্যা দুই জন বৈষম[1] নিদ্রা যায়,
ছয় মাসের শিশু আত্তাপ মইধ্যেতে ঘুমায়।
হায় হায়রে হায়, আমি কি কইমু নতুন কথা কওনও না যায়,
জহির মেঞার কথা শোনলে পাষাণ ফাইট্যা যায়।
সেই নিশাতে শ্যাষ পহরে ম্যাঘে আন্ধার করে তামাম দুনিয়া,
দুশমন বাদসার দাগাবাজীতে মরল গিয়া জহিরুদ্দিন মেঞা।
সুখে নিদ্রা যায় বুঝি জহিরুদ্দিন মেঞা,
চুলে ধইর‍্যা উঠায় তারে কঁ্যাথার উপর থিকা।
হারে, শোর[2] করনের আগেই তারা জহিরেরে কোপায়,
আষ্টজন মুনিষ্যে তহন পরীবানুরে পাল্কীতে ওঠায়।
পাল্কীতে উঠাইয়্যা কইন্যায় তারা ঘরে আগুন ছায়,
আন্ধারে কোলের পোলা ছাইঞ্চাতে[3] গড়ায়।
হারে, আসমান[4] হইতে মা ফাতিমা দোয়া যে করিল[5],
হেই[6] না দোয়াতে এক অঘটন ঘটিল।
ঘরে আগুন দিয়া না দুশমন দৌড়াইয়্যা পালায়,
আগুনের তরাশে[7] ঘর পুইড্যা সাড়া অয়।

---

১ বিষম—এস্থলে গভীর ঘুমে অচেতন। ২ চেঁচানো। ৩ ঘরের বাইরে ভূমি সংলগ্ন অংশ। ৪ আকাশ। ৫ পাঠ ভেদে-করিল। ৬ সেই। ৭ তেজে।

আধা পোড়া না অইতে অইতে দেয়ার[১] পানীর জোরে,
আগুন বুঝি নিভ্যা গ্যাল জহির মেঞার ঘরে।
বাতাসী বিবি ছিল পরীবানুর এক বুইন,
দৌড়[২] পাইড়্যা আইল হেথায় না করিয়া গৈণ।
ঘরের কাছে ছাঞ্চিতলায় পোলার[৩] কান্দন শোনে,
এদিক ওদিক দেইখ্যা বাতাসী পোলা বুকে টানে।
পোলা কোলে তুইল্যা লিয়া বাতাসী বস্তর[৪] দিয়া ঢাকে,
এক দৌড়ে গ্যাল গিয়া আপনারি থামারে[৫]।
দুশমনের ভয় ভাইব্যা বাতাসী তহন ছ্যাশ ছাড়ে রাইত পোয়াবার আগে,
গেরাম ছাড়া অইলে পরে কাক ককিলায় সোরে[৬]।
রাইত পোয়াইল ফর্শা অইল লাগল সোর গোল,
জহির মেঞার ছ্যাহডা ফুইল্যা অইল ঢোল।
ছ্যাশের মুনিষ্যে চাইয়্যা ছ্যাহে[৭] জহিরের অবস্থা,
বাদসার কাণ্ড দেইখ্যা কেউবা কয় ফিশফিশানি কথা।
জহির মেঞা চইল্যা গ্যাল মুইছ্যা গ্যাল নিশ্চিন্ন অইয়্যা,
ছ্যাশের মুনিষ্যে বচ্ছর পরে তারে গ্যাল বেস্মরণ[৮] অইয়্যা।
এই প্রেস্তাবনা সাঙ্গ অইল জহির মেঞার কথা,
একমনে শোনেন বইয়্যা নতুন প্রেস্তাবনা[৯]।

হায় হায়রে—এ আহায়—এ
স্বরূপনগরের কথা কিছু করি নিবেদন,
এমন আজগুবি সোমাচার কেউ শোনেনি কখন।
সোনার পুরের পাশাইল্যা[১০] গেরাম স্বরূপনগর নাম,
হেইনা ছ্যাশে আত্তাপউদ্দিনের বড়ই ডাক নাম।
ডাঙ্গর পোলা আত্তাপউদ্দিন রূপে গুণে ধইন্য,
ছ্যাশের মইধ্যে সেরা মুনিষ্যি বেহেস্তেরও[১১] মাইন্য।

---

১ বৃষ্টি। ২ দৌড়াইয়া। ৩ বাচ্চা-ছেলে। ৪ কাপড়। ৫ বাড়িতে। ৬ ডাকে। ৭ দেখে। ৮ ভুলে যাওয়া—বিস্মৃত হওয়া। ৯ কাহিনী। ১০ পাশাপাশি। ১১ স্বর্গ,

হেইনা ডাঙ্গর পোলা গরু চরাইবার যায়,
হিজল বিরিক্ষের ছায়ায় বইয়্যা আড় বাঁশী বাজায়।
আড় বাঁশী বাজাইয়্যা আত্তাপ জলের ঘাটে থ্যাহে,
হেই না ঘাটে কলসী কাঁখে ফুলবানুও আইসে।
ফুলবানু ফুলের কইন্যা পুষ্পেরই সোমান,
পিরথিম[১] ছাড়িয়া তার বেহেস্তে পরমান।
বাপ ও মায়ের একই কইন্যা রূপেতে মাধুরী,
ভরা গাঙ্গের মত যৈবন কন্যা বিদ্যাধরী।
হেইনা কইন্যার নজর পইল আত্তাপেরি পর,
থির হইয়্যা চায়্যা রইল ফুলবানু সুন্দার।
চৌক্ষে[২] চৌক্ষে কিবা কথা দুইও জনায় কয়,
ফুলবানুরে না দেখিলে আত্তাপের পরাণ রাখা দায়।
দিনে দিনে আইসে যায় চৌক্ষে চৌক্ষে কথা,
একই দিনের হলকেতে[৩] আত্তাপ কয় মোনের কথা (ব্যথা)।
পানী ভর সুন্দরী কইন্যা পানীতে লাগাইছ মোন,
কাইল যা কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ।
এই কথা না শুন্যারে ফুলবানু মুখে না কইয়্যা কথা,
ইসারাতে সমঝাইয়্যা থ্যায় মনেরি বারতা।
বাঁশের বাঁশী হইতাম, দূতী লো, পাইতাম মনে সুখ,
বাজনেরি ছলে দিতাম, বন্ধু, তোমার মুখে মুখ।
(রে বন্ধু, তোমার মুখে মুখ)॥
আহার নিদ্রা ছাইড়্যা আত্তাপ ফেরে বনে বনে,
ফুলবানুর বদনখানি মোনে মোনে গোণে।
ঘাটেতে আইস্যা ফুলবানু এদিক ওদিক চায়,
বন্ধুরে না দেইখ্যা আইজ কান্দন জুড়্যা থ্যায়।
আমার উদ্দেশ্যে, বন্ধুরে, আরে দুঃখ্যু, বাজাও মোহনবাঁশী,
আমার আসার আশেরে, আরে দুঃখ্যু, থাকে জলের ঘাটে বসি।

---

১ পৃথিবী। ২ চোখ। ৩ সুবিধা বা সুযোগ।

কান্দিয়া বাঁশীর সুরেরে, হায়রে বন্ধু, কও যে মোনের কথা,
তোমার কান্দন শুন্যারে, আরে দুঃখ্যু, আমার চিত্তে হইল ব্যথা ॥
হারে, এই না কথা কইয়্যারে কইন্যা কলসী নিল কাঁখে,
বিন্যাগাছের ঝোপের থিকা সুজন বন্ধু ছ্যাখে।
আউগাইয়্যা সোনার বন্ধু হস্ত ধরে তার,
কলসী নামাইয়া কইন্যা কহে সমাচার।
আউলাইয়্যা মাথার বেণী লোটাইয়্যা ভূঁইয়ার তলে,
সুন্দরী কইন্যারে তুল্যা নিল আত্তাপ নিজের বক্ষের পরে।
কয়মাস অইল গত কিছুই নাই গণি,
জলের ঘাটে চলে সুন্দরী কক্ষেতে গাগরী,
রাজার বেটা সত্তাপউদ্দিনের নজরে পইল ফুলবানু সুন্দরী।
সত্তাপউদ্দিন নাম তার রাজার কুমার,
ঘোড়ায় চড়িয়া ফেরে দেশ দেশান্তর।
সেই বা কালে সত্তাপউদ্দিন একদৃষ্টে ছ্যাখে চাইয়্যা চাইয়া,
আসমানেরই হুরী য্যামুন আইস্যাছে লামিয়া।
সেইওনা কইন্যার রূপ দেইখ্যা সত্তাপ তার বাজানরে কয় বিনয় হইয়্যা,
তোমার মাইয়্যার বিয়া দিলে রাণী করমু আমি রাজা হইয়্যা।
কফিলদ্দি যুয়ান মর্দ[১] ছ্যাশ বিছ্যাশে নাম,
সত্তাপের কথায় মেঞা অইল খান্ খান্।
কফিলদ্দি কয়, মেঞা, তোমারে সেলাম মাইন্য করি,
আমার মাইয়্যার আশ ছাড় এই আর্জি করি।
তোমার বাজান[২] রাজা ছ্যাশের সগল মুনিষ্যেই জানে,
খাজনা বাকী পড়লে পেরজার তহনই তারে বান্ধে।
হেই না ঘরে, শোন বাপু, মাইয়্যা দিমু না,
ঘরের ছাওয়াল[৩] ঘরে যাও গৈণ[৪] কইরো না।
আইচ্ছা, মেঞা, সাবাস, ভাই, সজ্জুত[৫] হইয়া রইও,
কাইল নিশিতে লইয়্যা যাইমু তোমার মাইয়্যা সামাল দিও।

---

১ পালোয়ান। ২ বাপজান—পিতা। ৩ ছেলে। ৪ দেরী। ৫ সাবধান।

হায় হায়রে, এই না কথা কইয়্যা সত্তাপ বাজানের ঠেকায়,
বাজানের ক্ষেমতার চোটে ফুলবানুরে আনায়।
ফুলবানুরে আনাইতে সত্তাপ ষোল বেহারা জোড়ে,
পাল্কীতে না উইঠ্যা কইন্যা হাপুস্ হুপুস্ কান্দে।
হারে, ছাইড়্যা যায় চেনা ঘাট দীঘি ঘর দুয়ার,
দ্যাশের চৌহদ্দি[১] ছাড়াইয়্যা কান্দে ফুলবানু সুন্দার।
বন্ধুরে, আমি চল্‌লাম বিদ্যাশেতে তুমি থাইকো সুখবাসে,
দিনান্তেতে আমারি নাম লইও।
ও বন্ধু, পাখী হইয়্যা যাইতাম উড়িয়া মুই কুলের কুলবালা,
কইতাম আমার মোনের দুঃখ্যু কান্দিয়া কান্দিয়া।
(রে বন্ধু, কান্দিয়া কান্দিয়া)॥
সোনা নয় রূপাও নয় যে আঞ্চলে রাখিব,
বসিয়া বিরলে বন্ধু চান মুখ দেখিব।
(রে বন্ধু, চাঁদ মুখ দেখিব)॥
আস্‌মানে চাহিয়ারে, বন্ধু, রাখিও স্মরণে,
তোমারে না পাইয়্যা মুই না বাঁচি পরাণে।
তুমি হইও হিজল গাছ, বন্ধু, আমি গুলঞ্চলতা,
তোমারে জড়াইয়্যা রইমু আমার বাহু দিয়া।
(রে বন্ধু, আমার বাহু দিয়া)॥
দুশ্‌মন রাজার লোক নিদয়া পাষাণী,
তোমারে না পাইয়্যা মুই পাইলাম পরসানি[২]
(রে বন্ধু, পাইলাম পরসাণী)॥
(হারে) ফুলবানুরে আনাইয়্যা সত্তাপ সাদী যে করিল,
রাজপুরীতে বাইদ্য ভাণ্ড বাজিতে লাগিল।
পাশা খেলা, সিন্দুর খেলা শরবৎ খাওয়া খাউই,
সগল কার্য সমাধা কইর‍্যা সত্তাপ মোছে কপালের পানি।

---

১ সীমানা। ২ কষ্ট।

হায় হায়রে, এ আহায় এ—
ম্যাঘের শ্যাষে চান্দের উদয় যেমুন খরার শ্যাষে বাইন্সা,
রাজপুরীতে আইয়্যা কইন্যা কান্দে রইয়্যা রইয়্যা।
খায় দায় সুখে আছে চৌদিকে দাস দাসী,
ফুলের নাগান[১] বিবি পাইয়্যা সত্তাপও অয় খুশী।
চাষার মাইয়্যা ফুলবানু যেমুন বনের পঙ্খীছানা,
বাঁশের খেঁচায় বন্দী হইয়্যা গুটাইয়্যা থুইছে ডানা।
যে দিগেতে দ্যাখে চাইয়্যা নয়া ধন দৌলাত,
দেইখ্যা দেইখ্যা আলগোছে কইন্যা করে ফাৎ ফাৎ।
হারে, এক মাস, দুই মাস, তিন মাস যায়,
সুন্দরী কইন্যার রূপ বাতাসে মিশায়।
সোনার বন্ন অইলরে কালা শুখাইয়্যা[২] শুখাইয়্যা,
আবডালে[৩] খাড়াইয়্যা সত্তাপ দ্যাখে চাইয়্যা চাইয়্যা।
হারে, কত না দিন হইল গত কিছুই নাই গণি,
এক রাইতে জাইগ্যা কইন্যা শোনে বংশীধ্বনি।
না লইও না লইও, সখি, আত্তাপেরি নাম,
তোমার চরণে মোর শতেক সেলাম।
এই না বাঁশী শুইন্যারে কইন্যার চৌক্ষে আসে পানি,
নিচ্চুপেতে[৪] আইসে ছাতে পায়ে না বাজে মল।
চাইয়্যা দ্যাখে বিরিক্ষের তলে সুজন বন্ধু রইয়্যাছে খাড়াইয়্যা,
দেইখ্যা তারে কয় কথা কান্দিয়া কান্দিয়া।
সুখেরে কইর‍্যাছি বৈরীরে, বন্ধু, দুঃখেরে দোসর,
তুই বন্ধুর পিরীতে মজ্যা আপন হইলাম পর।
কুলেরে করিলাম বৈরীরে আমি অবলা রমণী,
তোর না পিরীতে ডাক্যা কলঙ্কেরে আনি।
ঘরেতে লাগিল, রে বন্ধু, দোয়ারেতে কাঁটা,
সাধ কইর‍্যা খাই, বন্ধু, পিরীত গাছের গোটা।

---

১ মতি। ২ শুকনো। ৩ আড়াল থেকে। ৪ চুপি চুপি।

যে জন খাইয়্যাছে বন্ধু পিরীত গাছের ফল,
কলঙ্ক মরণ বন্ধু জীবন সফল।
হায় হায়রে, কপালেতে দুক্ষু থাকলে খণ্ডান না যায়,
ভালকথা শোনালে পরে মোন্দ মনে লয়।
দুঃখের কথা শুন্যা কইন্যার আত্তাপ উল্টা বুঝ বোঝে,
বাঁশী বাজান ক্ষ্যাস্ত দেয় রাত্রি নিশাকালে।
সেই না রাইত অইতে কইন্যা পঙ্খীর মতন শুকায়,
হস্তে ধইর‍্যা সত্তাপ মেঞা কত কথা কয়।
চম্পা বন্ন অইলরে আঙ্গার[১] যেমুন শুখ্না গাছের পাতা,
ম্যাঘের মতন কালা ক্যাশে বান্ধাইল জটা।
শয়ন নাই, ভোজন নাই থাকে চাইয়্যা চাইয়্যা,
ঠাডা[২] পড়া মাইনষের নাগান[৩] জীয়স্তেতে মড়া।
শয়ন মুন্দিরে সত্তাপ সুখে নিদ্রা যায়,
ফোঁপানীর[৪] শব্দে তার ঘুমও ভাইঙ্গা যায়।
জাইগ্যা ছ্যাখে রাজার পুত্র ফুলবানু নাই ঘরে,
আলগোছে আইসা খাড়ায় ছাতের আইলসার ধারে।
ধমকে ধমকে কইন্যা কান্দে দূর পানেতে চাইয়্যা,
চৌক্ষু ফাইট্যা আসে পাণী সত্তাপ শোনে খাড়াইয়্যা।
মুই ত অবলা নারী, বন্ধু, হইলাম অন্তর পুড়া,
কুল ভাঙ্গিলে নদীর জল মধ্যে পড়ে চড়া।
বইস্যা কান্দে ফুলের ভ্রমর উইড়্যা কান্দে কাগা,
শিশুকালে করলাম পিরীত যৈবন কালে দাগা।
(রে বন্ধু, যৈবন কালে দাগা)॥
সুজন চিন্যা পিরীত করা বড় বিষম লেঠা,
ভাল ফুল তুলিতে গেলে অঙ্গে লাগে কাঁটা।
লাজ বাসি মনের কথা কইতে না সে পারি,
বুকেতে লাইগ্যাছে আগুন, বন্ধু, ছ্যাখাই কারে চিরি।

---

১ কয়লা—এখানে কালো রং। ২ বাজ। ৩ মত। ৪ হেঁচকি সহকারে রুদ্ধ-শব্দে কান্না।

কইতে নারি মোনের কথা ঘরের লোকের কাছে,
তোমারই লাগ্যা আমার অন্তর পুইড়্যা গ্যাছে।
নদীর ঘাটে অইত ছাখা কাঙ্খেতে কলসী,
ঐছন করিয়া গ্যাল তোমার মোহন বাঁশী।
ঘরের বাইর হইতে নারি কুল মানের ভয়,
পিঞ্জরা ছাড়িয়া মোন বাতাসে উড়ায়।
কত কইর‍্যা বুঝাই পাখী নাই সে মানে মানা,
ভরা কলসী অইলরে, বন্ধু. দিনে দিনে উনা।
কান্দিয়া মোনের কথা ফুলবানু পিছন দিকে চায়,
লাজেতে মরিয়া গিয়া সোয়ামীরে ছাখতে পায়।
হস্তে ধরি ফুলবানুরে সন্তাপ বুঝায় কত কথা,
এমন কইর‍্যা ক্ষয় হইও না, খাও আমার মাথা।
আমার বাজনা বাদশা ছাশের সগ গললোকের মাথা,
তোমার লাইগ্যা কিনা করমু, শোন আমার কথা।
ভুইল্যা যাও আগের কথা হাইস্যা কথা কও,
অধরে অধর থুইয়্যা মধুর কথা কও।
পিছের কথা পিছে থাকুক দুক্ষু পাবা মোনে,
তোমার দুক্ষু দূর করমু যা থাকে নসিবে[১]।
এই পর্যন্ত বাক্য সন্তাপ কইবারে যেই পারে,
ডুন্ ডুমা ডুম্ ঢুঢুম্ ঢুম্ বাইগু কানে আসে।
চাইয়্যা ছাখে সন্তাপউদ্দিন রাজার বেটা বটে,
বাড়িতে পইড়্যাছে ডাকু সজাগ হইয়্যা ওঠে।
দড়ির চঙ্গ[২] বাইয়্যা ডাকু ছাতে আসে চইল্যা,
তরুয়াল হাতে লম্ফ দিয়া সামনে আসে খাড়াইয়া।
সর্দার ডাকুয়া কয়, শোন, আমি আত্তাপউদ্দিন,
এই দুনিয়ায় ফুলবানুর একই প্রেমিক থাকবে চিরদিন।
মুখের ঢাকনা খুইল্যা আত্তাপ, যহন চাইয়্যা ছাখে,
খুশীতে ডম্মগ্ হইয়্যা ফুলবানুতে হাসে।

---

১ অদৃষ্ট। ২ মই।

আত্তাপের বাক্যে সত্তাপ ওঠে গর্জন কইর‍্যা,
ব্যালা শ্যাষে ম্যাঘের ডাকে যেমন আসমান কাঁপে থর থরাইয়্যা।
দুশমন ডাকুয়া তুইরে, বুঝিলাম সার,
এই জন্মের তলুয়ার খেলা তোর খেলাইব আইজ।
এই না কথা কইয়্যারে সত্তাপ নিজের অস্ত্র ধরে,
আত্তাপউদ্দিন রাইগ্যা গিয়া পাল্টা বাড়ি মারে।
ঝনর ঝন্ ঝনর ঝন্ বাজে তলুয়ার,
বাঘে মৈষে লাইগ্যাছে লড়াই দ্যাখতে চমৎকার।
কতক্ষণ অইল গত কিছুই নাই গণি,
খানিক পরে সত্তাপ মেঞা ফ্যালাইয়্যা দেয় নিজের তরবারি।
সত্তাপউদ্দিন ডাইক্যা কয়, শোনো মেঞাবাই,
তোমার লগে কাজিয়া[১] নাই আপোষ আমি চাই।
ফুলবানু খাড়াইয়্যা রইছে আমাগোর সামনে,
কার লগে যাইবে কইন্যা বোলাও না[২] তানারে।
একই আহাশে দুইও সূর্য যেমুন অসম্ভব পেরস্তাব,
পরের ধনে পোদ্দারীতে তেমুন ঘোনাবে[৩] মনস্তাপ[৪]।
সত্তাপের বাক্যে আত্তাপ তলুয়ার ধরে কইস্যা,
গাজী গাজী কইর‍্যা সত্তাপ খাড়ায় লম্ফ দিয়া।
ঝনার ঝন্ ঝনার ঝন্ তরুয়ালে তরুয়ালে লাগল ঠোনাঠুনি,
দুই মর্দের[৫] কেরেজ[৬] দেইখ্যা ভাবে ফুলবানু সুন্দরী।
হাই হাই কইর‍্যা আত্তাপ তরুয়াল উচাইল,
এক কোপে এই দণ্ডেই সত্তাপের মস্তক বুঝি দো-খণ্ড করিল।
না না পারল না আত্তাপ সত্তাপ হুশিয়ার আছিল,
পাশ কাডালে[৭] সইর‍্যা গিয়া আত্তাপের তরুয়াল মারিল।
হায় হায়রে, একই কোপে দু-খণ্ড অইল আত্তাপেরি মাথা,
লামার[৮] থিকা খবর পাইয়্যা তার মায়ে আইল ধাইয়্যা।

---

১ ঝগড়া। ২ জিজ্ঞাসা করিল। ৩ এগিয়ে আসবে। ৪ মনঃকষ্ট। ৫ পালোয়ান।
৬ বিক্রম। ৭ একপাশে। ৮ নিচতলা থেকে।

সত্তাপের মায় পরীবানু কান্দিতে লাগিল,
কান্দিয়া কান্দিয়া খেদে তারে কইতে লাগিল।
পরথম যৈবনের নিধি আত্তাপ যে আমার,
তোর না বাপের দুশমনিতে ছাড়াইছিলাম তায়।
শিশুকালে হাজী ছাইব অর হস্তে নাম কুন্দাইছিল[1],
এই না কইয়্যা হস্তে ধইর‍্যা আত্তাপের ড্যানা[2] দেখাইল।
হস্তের উপর লেখা আত্তাপেরই নাম দেইখ্যা সত্তাপ চমকিত হইল,
(ভাবে) বিধি আইজ কী খেলা না দেখাইল।
পিছন ফির‍্যা চাইয়্যা ছ্যাখে ফুলবানু ঢইল্যা পড়ছে আত্তাপেরি বুকে,
কেউ জানে না কখন যে মারছে ছুরি
নিজেরই কলিজার[3] উপরে।
আহারে, কি দারুণ কথা কওনও না যায়,
চতুরদিগে ওঠে কান্দন থামান অইল দায়।
শোর গোল কইর‍্যা কান্দে সত্তাপেরি মায়,
কইয়্যা দেয় পুর্বকথা প্রত্যয় না হয়।
পরীবানু কয়, শোন্, তুই যে রাজার বেটা,
এট্টুর লইগ্যা আইজ তুই বাঁধাইলি এ-কোন্ ল্যাঠা।
এই না কইয়্যা পরীবানু তহন আত্তাপের ছ্যাহ কোলেতে তুলিল,
কোলো লইয়্যা মরা পোলা কান্দিতে লাগিল।
(হারে) আত্তাপেরি ছাইড়্যা আমি দেখি যে আন্ধারা,
যৈবনকালে হারাইলাম তোরে দুশমনেরি আগে।
(হারে) আমারও দুঃখুতে ঝরে বিরিক্ষের পাতা,
তোমরা সবাই সাক্ষী রইয়্যা শুনিও সে বারত্তা।
কি করলি, কি করলি, সত্তাপ, গায়ে দিলি হাত,
না জানি না শুনিয়া ভাইয়ের লগে করলি রে বিবাদ।
কইয়্যা দেরে তোরা মোরে দেরে দেখাইয়্যা,
অভাগী হারাইলাম আঁখি কান্দিয়া কান্দিয়া।

১ নাম লিখে দিয়েছিল। ২ হাত। ৩ বুক—হৃদয়।

(হারে) কান্দিতে কান্দিতে রাইত অইল পরভাত,
কাক কুকিলায় করে সোর সন্তাপ করে ফাৎ ফাৎ।
আন্তাপেরে লইয়্যা গ্যাল আসমানেরি হুরী[১],
বিপদকালে জাইনো বন্ধু তানারেই কাণ্ডারী।

—টাঙ্গাইল (মৈমনসিংহ)

২

সোনারায়

কন্যা, ছান করে হে, নদীর গণে ঢেউ।
এত বেলা ছান করে কোন গৃহস্থের বউ ॥
চন্দন পিষিয়া কন্যা ভড়াইল কুরি।
ছিন্নান করিতে যায় সরোবর দীঘি ॥
ধবল অংশ পাটা কইতর নিল সঙ্গেতে করিয়া।
সোভরণের কাটারী নিল হস্তেতে করিয়া ॥
খইলা ক্ষার নিল কন্যা অঞ্চলে বান্ধিয়া।
কক্ষে নিল কুম কলসী হস্তে নিল ঝারি ॥
ছিন্নান করিতে গেল সরোবর দীঘি।
সরোবর দীঘিরে তার মাণিক চারি ঘাট ॥
ধীরে ধীরে গোয়ালের নারী নামিল তাহাত।
এক অর্ধ মাথার কেশ দুই অর্ধ করিয়া ॥
খইল ক্ষার দিল কন্যা মস্তকে ঢালিয়া।
হাটু পানীত নামিয়া কন্যা হাটু করিলেক সু ॥
হিয়া পানীত নামিয়া কন্যা দিলেক পঞ্চ ডুব।
কুঘাটে নামিয়া কন্যা সুঘাটে উঠিল ॥
ভিজা বস্ত্র ফেলেয়া কন্যা শুকল পরিল।
শুকল পরিয়া কন্যা চলিয়া যেইল ঘরে ॥
আলো আতপ কাঞ্চা কলা নিল থরে থরে।
আলো আতপ কাঞ্চা কলা কদমের ফুল ॥

---

১ পরী।

শত শত নিল ফুল শোলার ভূপল।
শোলার ভূপল ফুল মালী যাকো কাটে॥
তিল তুলসী ফুল আরো নিল জাতে জাতে।
তিল তুলসী ফুল আরোও বেল পাত॥
ধূপ চিনি গুড় কলা নৈবিদ্যের ঠাট।
তখন এক সুন্দর হাড়ীর ছাইলা আনে ডাক দিয়া।
পূর্ব মুখে নিল কন্যা এ চাতাল চেঁচিয়া॥
পূর্ব মুখে রহিল কন্যা ধরম চিন্তিয়া।
ধবল অংশ পাঠা কইতর দিলেন ছাড়িয়া॥
যদি, হে ধর্ম ঠাকুর, না দিস্ পুত্র বর।
স্ত্রী বধ্য হইম মুই কাটারিক্ করিম ভর॥
স্ত্রী বধ্য কথা শুনিয়া ধর্ম কাঁপে থর থর।
সাক্ষাতে আসিল ধর্ম নারীর গোচর॥
নারীর নিকটে ধর্ম কহে মৃদুভাষে।
না করিহ আত্মহত্যা তোকে দিমু বর।
বর পায়া গোয়ালের নারী বাসরে চলিল।
অমৃত কদম্ব ফল ভক্ষণ করিল॥
উঞ্চা গাছে থাকি ঠাকুর ছাড়িল নিঃশ্বাস।
শ্বেত মাছি হয়া ঠাকুর গর্ভে নিল বাস॥
এক মাস হইল ঠাকুর গর্ভে নিল বাস।
প্রতিপদ বলিয়া ঠাকুর পালে উপবাস॥
দুই মাস হইল ঠাকুর গর্ভে নিল বাস।
দ্বিতীয়া বলিয়া ব্রত পালে উপবাস
তিন মাস হইল ঠাকুর গর্ভে নিল বাস।
তৃতীয়া বলিয়া ব্রত পালে উপবাস॥
চারি মাস হইল ঠাকুর গর্ভে নিল বাস।
চতুর্থী বলিয়া ব্রত পালে উপবাস॥
পঞ্চ মাস হইল ঠাকুর গর্ভে নিল বাস।
পঞ্চমী বলিয়া ব্রত পালে উপবাস॥

ষষ্ঠ মাস হইল ঠাকুর গর্ভে নিল বাস।
ষষ্ঠী বলিয়া ব্রত পালে উপবাস॥
সপ্ত মাস হইল ঠাকুর গর্ভে নিল বাস।
সপ্তমী বলিয়া ব্রত পালে উপবাস॥
অষ্ট মাস হইল ঠাকুর গর্ভে নিল বাস।
অষ্টমী বলিয়া ব্রত পালে উপবাস॥
নবম মাস হইল ঠাকুর গর্ভে নিল বাস।
নবমী বলিয়া ব্রত পালে উপবাস॥
দশম মাস হইল ঠাকুর গর্ভে নিল বাস।
দশমী বলিয়া ব্রত পালে উপবাস॥
এইরূপে দশমাস দশদিন পুর্ণিত হইল।
মায়ের কুপী হইতে ঠাকুর ভূমিতে পড়িল॥
ভূমিতে পড়িয়া ঠাকুর পঞ্চ রাও করিল।
উত্তম গঙ্গার জলে ছিন্নান করাইল॥
অনেক ধাই আস্‌ছে তারে নাই কারও ভেদ।
সোভারণের চেইচ্‌কা দিয়া নাড়ি করিল চ্ছেদ্‌।
প্রথমতে প্রণাম করং ধাই মেনে মাও।
মায়া দয়া ছুট করিছে দেখিয়া পুতের গাও॥
তারপরে প্রণাম করং গাভী মেনে মাও।
মায়ের দুগ্ধ নাই খাইতে তার সে দুগ্ধ খাওং॥
তারপরে প্রণাম করং মাও মেনে আই।
দশমাস দশদিন গর্ভে দিছেন ঠাঁই॥
তারপরে প্রণাম করং পিতা সেনে বাপ।
তার জন্যে দেখি আছং এভব সংসার॥
এক মাসে ঠাকুরের এক পাষ্টি কামাইল।
দুই মাসে ঠাকুরের দো পাষ্টি কামাইল॥
সাত মাসে ঠাকুরের সাধনা কোবাইল।
চুড়াকরণ করাইতে নাপিত বামন যায়।
গোয়ালের ঘরে জন্ম হইল ঠাকুর সোনারায়॥

ধন্য ঠাকুর সোনারায় গৃহস্থক দে তুই বর।
ধনে পুত্রে বাড়ুক গিরি চন্দ্র দিবাকর॥

বিহানে বিরাইল পাল বেলি হইল তুপুর।
খেদেয়া তুলিল পাল বাতানের উপর॥
বাতানেতে রান্ধে বাড়ে বাতানেতে খায়।
মহিষের পৃষ্ঠে চড়িয়া যাতু শিঙ্গা বেণু বাজায়॥
কেহ বান্ধে কেহ ছান্দে কেহ দোয়ায় তুধ।
তুধ ছেকিয়া ভাণ্ড ভরায় উমুরা তুই বাপ পুত॥
এলুয়া উফুড়িয়া নন্দ পাকাইল বেড়ুয়া।
একে একে সাজায় ভাঁড় পঞ্চাশ চড়ুয়া॥
তুমি থাক বাতানে, পিতা, আমি গৃহে যাই।
নষ্ট হইল কাচা ননী যায়া বলো খাই॥

যাতুয়ার মায়ে ডাকেরে, জননী ডাকেরে।
আইজ নিশি পোহাইল কার বাসরে॥
শিকিয়াতে থুইছে ভাণ্ড লাগ্য নাহি পায়!
পিড়ার উপর পিড়া থুইয়া উর্ধ্ব মুখে চায়॥
তলেতে ছেদিয়া ভাণ্ড হেটে দিল মুখ।
হেন কালে দেখা হইল যশোদা মায়ের মুখ॥
ননী খাইল, কেরে বাছা, ননী খাইল আর।
তুই আঙ্গুলের মুখেতে মিলাইয়া সংসার॥
হাতে নড়ি দিয়া যশোদা মারিবার যায়।
ননী খাওয়া ছাড়ি যাতুয়া উঠিয়া পালায়॥
যাতু যায় তার আগে আগে যশোদা যায় তার পিছে।
লাফ দিয়া চড়িল যাতু খেইল কদমের গাছে।
চড়িলু কদমের গাছে ভাল হইল তোরে।
মড়কা কদমের ডাল যদি ভাইঙ্গা পড়ে?

ভাঙ্গিবে কদমের ডাল মরিব আমরা।
সহিতে না পারি আমি বন্ধনের জ্বালা॥
নাম ত যাদুয়া, বাছা, নাম ত শিগিরে।
এই ননী ধরিয়া যা তুই মথুরা নগরে॥
মায়ের বচনে যাদু নামিতে লাগিল।
লাফ দিয়া যশোদা তখন বাম হস্তে ধরিল॥
চাইর আঙ্গুলী বাটি দিয়া ভিড়িয়া বান্ধিল॥
যাদুর বান্ধন দেখি কান্দে রাখালগণ।
কা'কে নিয়া খেলিব খেলা যাদুয়া হইছে বন্ধন॥
এমন যাদুয়ার মাও গর্ভে দিছে ঠাই।
রৌদ্রেতে বান্ধিয়া থুইছে এ সুন্দর কানাই॥
যাদুয়ার বন্ধন দেখি যশোদার হইল দেয়া।
যাদুর বন্ধন খুলি দিল চান্দ্ মুখ চায়া॥

যাদু বনে যায়রে, যাদুয়া বনে যায়।
বনের সাজন তখন সাজেয়া দিল মায়ে॥
বিয়ানে বিরাইল বাছা শুধু ননী খায়া।
বেলি হইল দুপর যাদু না আইল কিসের লাগিয়া॥
ভাত হইল খর খর ব্যঞ্জন হইল বাসি।
ঘন আওটা দুধের মধ্যে পড়িয়া গেল মাছি॥
নাই মারং নাই ধরং নাই বলং দূর।
এক বোল বুলিছং যাদুক বান্ধেক্ বাছুর॥
তখনে না কইছং নন্দ বেছেয়া ফেলাও ধেনু।
সহরে মাগিয়া খাবো কোলে নিয়া কানু॥
সাত পাঁচ পুত্র যার আনন্দে গোঁসাই।
আমার ঘরে দিছে ঠাকুর একেলা কানাই॥
কানাই দোসরের ধন নাই দেয় গোঁসাই।
যেই ছাওয়ালে খেলা খেলাইছে সেই ছাওয়ালে কয়
তোমার যাদুক দেখ্ছি আমরা সেই কালীদয়॥

হাতে আছে মোহন বাঁশী মাথায় মটুক চুল।
নাচিতে নাচিতে গেইছে সেই কালীদহএর কুল ॥
কালীদহের কুলে যায়া পাতিয়াছে খেলা।
সেই খেলাইতে যাদুর হইছে দুপর বেলা ॥
আমলী ধামালী আর আছে সব গাই।
অচম্ভুতা ধামালীটা কেবল পালের মধ্যে নাই ॥
উঞ্চা গাছে চড়িয়ে মুই চানু চতুর্দিক।
তবুত ধামালীর মুই না পানু উদ্দিশ ॥
উড়িয়া যায় রে রাজহংস রয়া পুছে কানু।
এদিকে কি ও দেখিছো, বাপু, বাছুর সুদে ধেনু ॥
নাই দেখি নাই, বাপু, বাছুর সুদে ধেনু।
ওনা নদী দিয়া বিরাইছে পর্বতের ঝোড়া।
নিশ্চয় করি জানেন তোমার গাভী গেইছে চোরা ॥
ধ্যায়ানে কানাই বলাই তখন ধ্যায়ানে বসিল।
বাছুর সুদে গাভী তখন আপনে আসিল ॥

ঠাকুর সোনারায় রে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী।
মানষি চাউটালী মারে গান করিবার না পারি ॥
ধন্য ঠাকুর, সোনারায়, তুই গৃহস্থক্ দে বর।
ধনে পুত্রে বর গিরি চন্দ্র দিবাঙ্কর ॥
বৈকুণ্ঠের ঠাকুর নামিল ঘোড়াঘাট।
ঠাকুরের সঙ্গে এক নামিল দুসাশয় বাঘ ॥
দুসাশয় বাঘ ঠাকুর অরণ্যেতে থুইয়া।
ঘরে ঘরে বেড়ায় ঠাকুর হরিনাম দিয়া ॥
হরিনাম দিয়া ঠাকুর চলিয়া যায় ঘরে।
পন্থের মধ্যে নাগাল পাইল এক দুর্জয় মোগলে,
মোগলে পোছে কথা সন্ন্যাসীর না আইসে রাও
কোথা হইতে সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথা চলি যাও।

রাও বাও নাই সন্ন্যাসীর দোক্‌দোকাইলে মাথা
মোগলে কাড়িয়া লইলেক সন্ন্যাসীর ঝুলি কাঁথা ॥
কেহ নিলেক ঝুলি কেহ নিলেক ডাং।
কোমরের পাটান খুলি চড়াইল বন্ধন ॥
ধাকাইতে ধাকাইতে নিলেক আগত করিয়া।
পাইকক্ করিলেক্ হাওয়ালী সর্দারক করিল ওল।
জোড় ডেরুটাক তুলিয়া দিলেক গলায় নিগড় ॥
জাগ জাগ পাইক সব হইয়া সাবধান।
এই বন্ধনী পালাইলে কাটিব নাক কান ॥
কতেক রাইত হইতে ঠাকুরের কতেক রাইত যায়।
কতেক রাইত যাইতে ঠাকুর ভাঙ্গ ধুতুরা খায়।
ভাঙ্গ ধুতুরা খায়া ঠাকুর গায়ে করিলেক বল।
জোড়ডেরুটাক ভাঙ্গিয়া ভূমির করিলেক তল ॥
কতেক রাইত হইতে ঠাকুরের কতেক রাইত গেল।
কতেক রাইত যায়া ঠাকুর মোগলক স্বাপন দেখাইল,
যদিরে মোগলের ছাইলা না দিবু ছাড়িয়া।
জন বাচ্ছা মারিম তোর গণিয়া গণিয়া ॥
হাতীশালের হাতী মারিম ঘোড়াশালের ঘোড়া।
এচিয়া বেচিয়া মারিম ভাল ভাল প্রহরা ॥
ঘোড়াশালের ঘোড়া মারিম এ ঠাট পাঠত।
তোক্ মোগলক্ তুলিয়া মারিম আলোগ রথত ॥
স্বপন পায়া মোগলের বড় হইল ভয়।
এহি ত মানুষ নয় ঠাকুর সোনারায় ॥
রজনী প্রভাত হইলা কোকিলা করে রাও।
শয্যা হইতে মোগলের ছাইলা গড়েয়া দিলেক গাও ॥
ছোট মোগল উঠিয়া বলে বড় মোগল মোর ভাই।
কালিকার বন্ধনীক একবার চল দেখিবার যাই ॥
এক পায়ে দুই পায়ে বন্ধনীক দেখিবার যায়।
জোড় ডেরুটা পড়ি আছে নাই সোনারায় ॥

ধন্ম ঠাকুর, সোনারায়, তুই গৃহস্থক দে বর।
ধনে পুত্রে বর গিরি চন্দ্র দিবাকর।

উঠরে, যাদুয়া বাছা, উঠরে গোবিন।
কুসুমের পালঙ্ক পায়া কতই পার নিন্॥
মায়ের বচনে যাদু উঠিয়া বসিল।
মেলিতে না পারি আঙ্খি ঘষিতে লাগিল॥
বাম হাতে ভিঙ্গা নিয়া চক্ষে দিল জল॥
মধুরে মধুরে বাক্য বলে যাদুধন।
রামতেল বিষ্ণুতেল যাদুয়ার গায়ে দিয়া।
যাদুয়া গেলেন ছান করিতে কালীদহের কুড়া॥
যাদু গেল ছান করিতে যশোদা রহিল ঘরে।
এ ক্ষীর থাল অন্ন মা বাড়েন থরে থরে॥
থালিতে বাড়েন অন্ন মা পঞ্চ বাটীতে ব্যঞ্জন।
চকি পীড়া আনি দেন বসিতে আসন॥
আইস্ আইস্, যাদুয়া, বাছা করহ ভক্ষণ॥
চৌকি পীড়া ভিড়িয়া বসিল ঠাকুর নারায়ণ॥
খায়া দায়া ছাওয়াল কানাইর রঙ্গ হইল মন।
সোভারণের খাইড়্কা দিয়া করিল দন্তের মাঞ্জন।
পান খাইতে দিলেক যাদুক মোহর বাটা পান।
পান খাইয়া খাইলেক যাদু দন্তের মইলাম॥
খায়া দায়া ছাওয়াল কানাইর রঙ্গ হইল মন।
কুত্তি গেলু যশোদা মা সাংরন দড়ি আন॥
হাতে বাঁশী লইয়া রাম মইষক খেদাইতে যায়।
দুই মইযে চারি শিঙ্গে এ যুদ্ধ ভেষায়॥
শিঙ্গেতে তুলিয়া রামক ঘুরায় চতুর্পাক।
শিঙ্গেতে ঘোরে রাম যেন কুমারের চাক॥
শিঙ্গ হইতে তুলিয়া রামক ফেলে তারে দিল।
উত্তর শিয়রে রাম পড়িয়া রহিল॥

দৌড় পারে যশোদা না বান্ধে মাথার কেশ।
পুবের জঙ্গল খানে রহিল পরবাস ॥
পুবের জঙ্গল খানে দেখে নিরখিয়া।
পুবের জঙ্গল খানে না পাইল খুঁজিয়া ॥
দৌড় পারে যশোদা না বান্ধে মাথার কেশ।
দক্ষিণ জঙ্গল খানত রহিল পরবাস ॥
দক্ষিণ জঙ্গল খানত দেখে নিরক্ষিয়া।
সে জঙ্গলেও তাঁক না পাইল খুজিয়া ॥
দৌড় পারে যশোদা না বান্ধে মাথার কেশ।
পশ্চিমের জঙ্গল খানত রহিল পরবাস ॥
পশ্চিমের জঙ্গল খানে দেখে নিরক্ষিয়া।
ও জঙ্গলেও তাক না পাইল খুঁজিয়া ॥
দৌড় পারে যশোদা না বান্ধে মাথার কেশ।
উত্তর জঙ্গল খানত রসিল পরবাস ॥
উত্তর জঙ্গল খানত দেখে নিরক্ষিয়া।
উত্তর শিয়রে আছেন পড়িয়া ॥
পুত পুত বলিয়া রামক তুলিয়া নিল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল মড়া পুত্রের গালে ॥
আম আন ধাম আন আন ধামাগড়ি।
রামক পুড়িতে আন, আন চন্দন খড়ি ॥
হরি হরি বলিয়া রামক অগ্নি ভেজাইল।
পোড়া ত না যায় রাম মুখে গায় গীত।
বাঘের পিঠে চড়িয়া রাম মইষের খায় দুধ।

—ধুবড়ী (গোয়ালপাড়া)

পৌরাণিক

শিবদুর্গা

১

শিব জপরে মন, হেলিবে শমন।
বদন ভরিয়ে মুখে বল বম্ বম্॥ ধ্রু॥
ব্যাঘ্র ছাল বিছায়ে বসেন যোগপতি।
হরের বামে চণ্ডিকা বসেন পার্বতী॥
বাম কড়ে[১] থাকে গৌরী বলেন বচন।
এক বাক্য বলি, শুন, ঠাকুর ত্রিলোচন॥
দুর্গা বলে, 'আমার বাইয়ে[২] শঙ্খ নাই, তোমার নাই লাজ।
ঠাকুর, দু'টিবাই শঙ্খ দাওহে স্বামী দেবরাজ॥
কোথা না[৩] দেখিলি শঙ্খ, কোথা খুঁজে এলি।
কি বুঝিয়ে শঙ্খদাম আমারে মাগিলি[৪]॥
রূপা, সোনা পর, যে অকালে বেচি খাবি।
রাঙা রুলি শঙ্খ পরি কোন্ স্বর্গে যাবি॥
রূপা সোনা পরে আমার অঙ্গ ব্যথা করে।
দুটি বাই শঙ্খ পরতে বড় সাধ করে॥
কড়ার ভিখারী, দুর্গা, কড়ার লেগে মরি।
কোঁথা গেলে পাবলো দু'বাই শঙ্খের কড়ি॥
তোমার পিতা দক্ষরাজা ধনের ঈশ্বর।
শঙ্খ পরতে সাধ থাকে ত যাও বাপের ঘর॥
শুনিলে শুনিলে, পদ্মা, বুড়া ভাঙ্গড়ের বচন।
সিকে দশকের শঙ্খ দিতে উড়ে যাবে ধম॥
নিতুই কি মা বাপের ঘরে পরে আভরণ।'
'তোমার পিতা দক্ষরাজা বল্‌গা গিয়ে তারে।
স্বতন্তরা হ'য়ে শঙ্খ কিনে দিতে পারে॥'

---

১ নিকটে বা পার্শ্বে। ২ বাহু বা মণিবন্ধে। ৩ কোথায়। ৪ চাহিলি।

'চোখ খাক মোর মা বাবা, চোক খাক মোর পরে।
জেনে শুনে বিয়ে দিলে ভিখারীর ঘরে ॥
চোখ খাক মোর মা বাপ চোখ খাক মোর খুড়ো।
জেনে শুনে বিয়ে দিলে ঠেঙ্গা-ধরা বুড়ো ॥'
ঠাকুর বলে, 'ডাঙ্গর ডাঙ্গর বলে, দুর্গা, নাহি দিও গাল।
দুটি হাতে ধ'রে বল্‌ছি, দুর্গা, শঙ্খ দিব কাল ॥'
এই ঠিঞে থাক, বুড়ো, কুচ্‌নির মাথা খেয়ে।
আমি যাছি বাপের ঘর কার্তিক গণেশ নিয়ে ॥
কোলে নিল কার্তিক হাঁটিয়ে লম্বোদর।
ক্রোধ ক'রে যাত্রা করে মাতাপিতার ঘর ॥
ঘরে হ'তে বেরিয়ে মস্তকে ঠেকে চাল।
ডাইনে শৃগাল যায় বামে যায় কাল ॥
দুর্গাবলে—'আজকে যাবার যাত্রা লক্ষণ ত নাই।
কেনে ঘরের বার করলাম কার্তিক গণাই ॥
এমন লোক কে আছে, এগিয়ে এসে নিতে।
যাব না যাব না বলে যাব তার সাথে ॥'
ঢেঁকী বাহনে নারদ গেছে ব্রহ্মার ভবন।
আসিতে মামীর সাথে পথে দরশন ॥
আজ কেনে দেখি মামীর বিরস বদন।
মামাতে মামীতে কোন্দল কিসের কারণ ॥ -
দুর্গা বলে, 'তোর মামাকে চাইলাম দু'বাই শঙ্খের কড়ি।
দিলে না সেই কারণে যাচ্ছি আমি মাতাপিতার বাড়ী' ॥
এইখানে থাক, মামী, তিলেক বসিয়ে।
মামাকে জিজ্ঞাসা ক'রে তোমাকে নিবসিঞে ॥
ব্রহ্ম ডাঙ্গালে রইলাম, নারদ, তোর বিলম্ব চেয়ে।
তোর মামাকে জিজ্ঞাসা ক'রে শীঘ্র নিবেসিঞে ॥
দৌড়াদৌড়ি করে হল নারদের গমন।
মামার সাক্ষাতে নারদ দিল দরশন ॥

মামাগো, তুমি ত ব'সে আছ রতন সিংহাসনে।
কার্তিক গণেশ ভাই দেখতে পাই না, মামা, কৈলাস ভুবনে॥
কত দূর গেল তোমার মামী নারদ আন গা ফিরিয়া।
কাল দু'বাই শঙ্খ দিব নগরে কিনিয়া॥
ভাল হলো, মামাগো, মামী বাপের ঘর গেল।
আজ হৈতে কৈলাসে কোন্দল ঘুচিল॥
তখনই বলিলাম, মামা, বিয়ে নাহি কর।
সহুরে নগুরে মামী আন বড় নাবর।
কোন্দলের ঝী বটে, কোন্দল কেবা পারে।
দেবতার বৌ জলকে যায় না, তার কোন্দলের ডরে॥
কোন্দলের ঝী যে দিন কোন্দল নাহি পায়।
বেল গাছে চুল জড়িয়ে গডাগড়ি যায়॥
শীঘ্র করি যারে, নারদ, আনগা ফিরিয়া।
কাল দু' বাই শঙ্খ দিব নগরে কিনিয়া॥
কোন্দলের পড়ো নারদ বগল দাবিল।
দু'কাঠি বাজায়ে নারদ যাত্রা করিল॥
দৌড়াদৌড়ি ক'রে হলো নারদের গমন।
মামীর সাক্ষাতে নারদ দিল দরশন॥
পালাচ্ছিস ত পালা, মামী, কার্তিক গণেশ লয়ে।
দুয়ারে ব'সেছে মামা ত্রিশূল হাতে লয়ে॥
তোমার নাগাল ধরতে পেলে বধিবে পরাণে।
নারদের কথা কিছু মনেতে লাগিল।
কার্তিক গণেশ লয়ে দুর্গা বাপের ঘর গেল॥
দৌড়াদৌড়ি ক'রে হচ্ছে.নারদের গমন।
মামার সাক্ষাতে নারদ দিল দরশন॥
মাথার কিরে দিলাম, মামা, বারে বারে।
তবু ত আমার মামী নাহি এলো ঘরে॥
বুদ্ধি বল, নারদ, উপায় বল মোরে।
তোমার মামী ঘরকে এসে কেমন প্রকারে॥

মামা, মামী হ'য়েছে বাগ্দিনী তুমি হও না বাগা।
বড় বনের বাঘা হ'য়ে. তুমি পথে দাওগা দাগা॥
নারদের কথা কিছু মনেতে লাগিল।
বাঘের মূর্তি মহাদেব সাজিতে লাগিল॥
হোল্‌না পারা মাথা বাঘের তারা পারা আঁখি।
এমন চূড়ান্ত বাঘ কভু নাহি দেখি॥
বাঘ মূর্তি হ'য়ে ঠাকুর আগুলিল পথে,
ভাল হলো গণেশের মা বাহন পেল পথে॥
লম্ফ দিয়ে চাপতে গেল বাঘের উপর।
লজ্জাতে ব্যাকুল হয় ঠাকুর দাঁড়াইল দূরে॥
জয় রাম শ্রীরাম বলে ঠাকুর কৈলাসকে যায়।
নারদ বলে, মামাগো, ভেয়ে ভেয়ে সা'ধ তোমাদের কান্দে করা আছে।
রাসলীলা করেছিলা শ্রীবৃন্দাবনে॥
রাধারাণী বলে, ও তারা হেটে যেতে নারি।
এসহে দয়াল ঠাকুর তোমার কান্দে করি॥
মামাগো. বাঘ যে দুর্গার বাহন তাও আমি জানি।
না পালালে তোমার কান্ধে চাপতো আমার মামী॥
বুদ্ধি বল, নারদ, উপায় বল মোরে।
তোমার মামী ঘরকে এসে কেমন প্রকারে॥
মামাগো, এই বেলাতে সাজতে পার শাঁখারী বরণ।
রূপে গুণে মামীর সাথে হ'বে দরশন॥
কতকগুলি ধন নিল, গায়ে নিল শঙ্খের গুঁড়ি।
অধিক ক'রে নিলেন ঠাকুর গাঁজার ধুকুড়ি॥
'শঙ্খ নিবে' 'শঙ্খ নিবে' ব'লে গো শাঁখারী চলে যায়।
রাজকুলি বেয়ে গো শাঁখারী চলে যায়।
বাড়ীর ভিতর ছিল পদ্মা শুনিবারে পায়॥
বাড়ীর বাহির হ'লে পদ্মা ডাকিতে লাগিল।
চল চল, শাঁখারী, আমাদের ঘর চল।
তোমার শঙ্খ পরিবে দুর্গা অভয়া মঙ্গল॥

ভদ্রলোকের বাড়ী যেতে প্রাণে লাগে ডর।
না জানি কে ব'সে আছে ভোলা মহেশ্বর ॥
কার্তিক গণেশ দুটি ভাই খেলিবারে যায়।
সুবর্ণের পাটি শাঁখারীরে ফেলে দেয় ॥
মোচে পাক দিয়া বুড়াটি চাপিয়ে বসিল।
শিব হলো শাঁখারী যার পবন গুজারি।
শঙ্খ দেখতে এলো শিবের খুড়শেশ শাশুড়ী ॥
গায়ে বস্ত্র নেয় না তারা করে হুড়াহুড়ি ॥
কোন নগরে থাক, ঠাকুর, কোন নগরে ঘর।
শঙ্খ বেচতে এলে, ঠাকুর, আমারই নগর ॥
পুর্ব দেশে থাকি আমার উজানিতে ঘর।
শঙ্খ বেচতে এলাম, পদ্মা, তোমার নগর ॥
শঙ্খেরই মূল্য শুনি, ওহে, আগে থেকে বল।
তোমার শঙ্খ পরিবে দুর্গা অভয় মঙ্গল ॥
কে কে পরিবে শঙ্খ কিনে কিনে পর।
এক বারে কড়ি দিতে না পার যতেক দিনে পার ॥
এক জোড় দুই জোড় শঙ্খ তিন জোড় দেখিল।
দু'টি বাই শঙ্খ পদ্মার মনেতে লাগিল ॥
তেল জল লয়ে গো শাঁখারীর আগে দিল।
নরম বাই পেয়ে বুড়াটি টিপিয়ে ধরিল ॥
একগাছি শঙ্খ পরায় মন্ত্র ক'রে সার।
দুর্গার বাইকে শঙ্খ গিয়ে না বেরিও আর ॥
করাতে কাটিলে শঙ্খ কাটা নাহি যেও।
সদাশিবের দাপে শঙ্খ অমর বর হৈও ॥
শঙ্খগুলি পরাবে ঠাকুর বসে বাম পাশে।
উঠে মুঠে বলে শাঁখারী আমারে কেমন সাজে ॥
কতকগুলি ধান এনে শাঁখারীর আগে দিল।
ঠাকুর বলে, ধানের মরা নই ঝাড়গণ্ডের ঘর ॥
আমার ঘরে আছে কত পরশ পাথর ॥

সোনার কুমড়ো কত মেঝেয় গড়াগড়ি যায়।
সে ধন বেঁচিতে দাসীর গতর দুখায়॥
এত ধন আছে, ঠাকুর, তোমারি সে ঘরে।
দারুণ শাঁখার বোঝা দেখি তোমার মাথার উপরে॥
জাতিহীন নই, পদ্মা, বৃত্তিহীন নই।
এ কারণে শাঁখার বোঝা মাথায় ক'রে বই॥
শাঁখারী মুনসে দরজী মুনসে এক নগরে রয়।
শাঁখারী মুনসের কথা কিছু দরজী মুনসে কয়॥
উম্মাতে হালিছে গা দুর্গার কি করতে পারে।
দুর্গা শঙ্খ ভাঙ্গিতে গেলেন হেঁসেল ঘরের কোণে॥
হেঁটে শিল উপরে নোড়া মধ্যে দেবী শাঁখা।
শিল শূন্য হলো শাঁখার গায়ে নাহি লাগে ঘা॥
সদাশিবের বরে শঙ্খ অমর বর হয়॥
ব্যাঘ্র ছাল বিছায়ে বসনে যোগপতি।
হরের বামে চণ্ডিকা বসেন পার্ব্বতী॥
বাম কড়ে থেকে গৌরী বলেন বচন।
একবাক্য বলি, শুন, ঠাকুর, দেব ত্রিলোচন॥
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে গো, চরণে রাখ মতি।
ইহা শুনিলে মঙ্গল হয় গোয়ালে ভগবতী॥
তুমি চিন সবারে, তোমারে চিনে কে।
ডাকিয়ে চিন্তিয়ে নাম জপ মনে মনে॥
শিব বিনে কেউ দয়াল নাই এ তিন ভুবনে॥ ধ্রু। —বীরভূম

২

শিবের ঘরে অন্ন নাই বাতাসে নড়ে হাঁড়ী
সকলে যে ধন দিয়ে আপনি ভিখারী॥
কাল ভিক্ষা ক'রে এলাম কুজানি নগরে।
উঠে মুঠে বল্‌ছে দুর্গা, অন্ন নাহিক ঘরে॥

তিনদিনকার ভাত, গৌরি, খেলে একদিনে।
এ ঘরকন্নাতে বুড়া বাঁচিবে কেমনে॥
কতগুলি ঘরের ব্যয় না জান বুড়াটি।
তোমার একলা ভীমকে চায় বাহান্ন পৌটি॥
হাতে খড়ি করি, গোসাঞী, নাও কেন্নে লেখা।
উচিত কথা বল্‌তে হলেই মুখ কর্ছো বাঁকা॥
ভিক্ষার অন্নে কুলায় না, হে ঠাকুর, চাষে দাও মন।
ফুল তুলসী পাবে সকল দেবতাগণ॥
অন্য লোকের বালকগুলি দুধে ভাতে খায়।
সোনার চাঁদ গণপতি অন্নকে লালায়॥
চাষ কর্ম কর, ঠাকুর, সুখে অন্ন খাব।
বড় বড় মুনির নাগাল দুয়ারে বসে পাব॥
চাষ কর্ম করে, দুর্গা, না করি জঞ্জাল।
নগর ভিক্ষা মেগে খাচ্ছি, সুখে আছি ভাল॥
চাষের পরম লক্ষ্মী, শুন কৃত্তিবাস।
ক্ষেতে হবে মুগ মসুরী সরিষা কাপাস॥
রাম রম্ভা, গণেশ রোপিবে থরে থরে।
শাঁকআলু কচু দিবে বাড়ীর ভিতরে॥
নটে পটে সাম্‌নে, ঠাকুর, দেখছি বার মাস।
চাষের পরম লক্ষ্মী, শুন কৃত্তিবাস॥
'কোথা পাব লাঙ্গাল জোঙাল, কোথা পাব বীজের ধান।
কোথা গেলে পাব, দুর্গা, ক্ষেতের কৃষাণ॥'
হাতের ত্রিশূল ভেঙ্গে গড়, কোদাল আর ফাল।
রাখাল কৃষি করবে ঘরে নন্দী মহাকাল।
আমার বাঘে তোমার বৃষে মর্ত্তে জোড় হাল॥
ঠাকুর বলে—বাঘে বলদে হাল নাহিক শুনি।
লাঙল জোয়াল নিয়ে মাঠে করবে টানাটানি॥
অতিবাদ ক্ষুধা লাগলে বাঘা ধ'রে খায় আপনি।
তখন ফুরাবে, দুর্গা, ঘরের জঞ্জাল।

কাপাস চাষ কর, ঠাকুর, বস্ত্র পরিব।
দেবতার বৌ হ'য়ে কত বাঘছাল পরিব ॥
আখ চাষ কর, ঠাকুর, অমৃত ফলিবে।
চিনি শর্করা ল'য়ে ধর্ম সেবায় লাগিবে।

শিব জপরে মন, হেলিবে শমন,
বদন ভরিয়ে মুখে বল বম বম্ ॥ ধ্রু ॥

বীচনের কারণে ভীম কৃষাণ পাঠিয়ে দিছি।
এস এস, ভীমরে, বাটার তাম্বূল খাবে।
শীঘ্র করে লক্ষ্মীর ঘরে সংবাদ আনিবে ॥
একে তেজিরে ভীম যেই আজ্ঞা পেল।
নেতের ক্ষেতে সেতের ধড়া ভীম তিন বেড়ে বান্ধিল ॥
আশী মন লোহার গদা বাম কাঁধে ফেলিল।
চৌদ্দ মন সোনার নূপুর পায়ে তুলে নিল ॥
যাবেরে শিবের ভীম যাবে অনেক দূরে।
দুই পায়ে তুলে নিল বাজন্ত নূপুর ॥
সাজন কোজন করে ভীম চায় রোষে রোষে।
ভীম খট্ খট্ পা ফেলে বার বার ক্রোশে ॥
উত্তরিল যেয়ে ভীম লক্ষ্মীর বাড়ীতে।
লক্ষ্মী বলে আজ, ভীম, দেখি কেনে বিরস বদন।
মা মোরে পাঠালে কিঞ্চিৎ বীচনের কারণ ॥
আজ, ভীম, কর কিছু রন্ধন ভোজন।
রন্ধন ভোজন করিলে সামগ্রী দিবে কি ?
বাহান্ন মন চাল লাগে, তের পৌটি ডাল।
সাত কলসী ঘৃত চাই লবণ মন চার ॥
চাল ডাল লয়ে ভীম সমুদ্র ধারকে যায়।
ভীমকে দেখিয়ে তখন সমুদ্র পালায় ॥

পালাও না পালাও না, সমুদ্র, মেরা ভাই।
একফুট[১] জল দাও রসুই করে খাই ॥
পাড়াতে গুড়ুলে[২] ভীম তেউড়ি[৩] খিচিল[৪]।
আড়াই মুড়ো জ্বালে ভীমের অন্ন তৈয়ার হল ॥
হাঁড়ীর কানা[৫] ধ'রে ভীম মাড়[৬] গড়াইল।
মাড়জোল নদী[৭] বলে তাই জন্ম হলো ॥
গামছা বিছায়ে ভীম অন্ন ঢেলে দিল।
কুলকুচি করিয়ে ভীম অন্নেতে বসিল ॥
লক্ষ্মী বলে—
কও দেখিরে ওরে ভীম, তোমার অন্নে কুলাইল।
ভীম বলে, জলে থলে ওগো, মা, পৌণে-পেঠা হলো ॥
নিতুই অন্ন দিয়ে মামা পারে গো পুষিতে।
এক দিন অন্ন দিতে তুমি অনাথ হয়ে গেলে ॥
গঙ্গাজলি ধান লক্ষ্মী বাহির করে দিলে।
বাঁকের ডগায় বেন্ধে ভীম বন্দনা করিল ॥
সাজন কোজন ক'রে ভীম যায় রোষে রোষে।
ঠাকুর বলে—
আজ কেনে দেখি, ভীম, তোমার বিরস বদন।
আজ কিছু করেছিলাম রন্ধন ভোজন ॥
রন্ধন ভোজন করলে সামগ্রী দিলে কি ?
সলিয়া কলাই সলিয়া বেগুণ ঝম্ফ কুড়ি কুড়ি ॥
মন পঁচিশেক দিয়াছেন ঝাল মরিচের গুঁড়ি।
বাহান্ন মন চাল দেয়, তের পৌটি ডাল।
সাত কলসী ঘৃত দেয় লবণ মন চার।
শিব নিন্দা করো না, শিবের কর সেবা।
শিব দিতে পারে বর ধনে করে রাজা ॥

১। একবার ভাত ফুটিবার পরিমাণ জল ২। গোড়ালির দ্বারা আঘাত করিয়া ৩। আখা. ৪। প্রস্তুত করিল, ৫। কিনারা, ৬। ফেন ব মণ্ড, ৭। বাতিকার সন্নিকটে সিজাকড্ডাং গ্রামের অদূরস্থিত নদী।

শিবের নিন্দা ক'রে দক্ষ অজা মুখো হ'লো।
রামের মা'রে রাবণ রাজা নির্বংশ হ'লো॥ —বীরভূম

রাধাকৃষ্ণ

১

অবধান কর কিছু নিবেদন করি।
গোকুলে আনিল ফল এক মাগী বুড়ী॥
একটা ঝুড়ি মাথে,
একটা ঝুড়ি মাথে, বসলো পথে, লঞা একটা ঢেলে[১]।
ডেকে বলে, ফল নাওসে, যত গোপের ছেলে॥
বাপু, সব দৌড়ে আয়,
বাপু, সব দৌড়ে আয়, ডাক্‌ছে তায়, ডাকছে ঘনে ঘনে।
শ্রীদাম বলে, ও ভাই কানাই, বুড়ী ডাক্‌ছে কেনে॥
ইহার সব বৃত্তান্ত,
ইহার সব বৃত্তান্ত, কিছু অন্ত, জান তো, গুণের ভাই।
ডাক্‌ছে বুড়ী, ধীরি ধীরি, চল কেন্নে যাই॥
আবার সব আসবো ফিরে,
আবার সব আসবো ফিরে, ধীরে ধীরে, খেলা করবো হেথা।
চল যাই গুণের ভাই, শুনি গা বুড়ীর কথা॥
চলিল সভে মিলে,
চলিল সভে মিলে, গোপের ছেলে, মন্দ মন্দ হাসি।
সেই ঠাঁইকে[২] গেলেন বুড়ী যেথায় আছে বসি॥
বুড়ী তুমি ডাকছো কেনে,
বুড়ী তুমি ডাকছো কেনে, ঘন ঘন, করছ কলরব।
তোমার বাণী শুনে আমরা ধেঞা এলাম সব॥
তখন ডোমনী বলে,
তখন ডোমনী বলে, ডাকৃছি আমি, শুনরে গোপের বেটা।
আম্র কাঁঠাল, পিয়াল, জাম, ফল এনেছি গোটা॥

১। ঝুড়ি. ২। স্থান।

ধর, নাও কিছু কিছু,
ধর, নাও কিছু কিছু, যত শিশু ফল এনেছি পাড়ি।
ধর, হাতে কর বেতে[১] খাওগা টোকার মারি[২] ॥
খেলে বড় সদ[৩] পাবে,
খেলে বড় সদ পাবে, ব'সে খাবে, মুখের হবে তার[৪]।
ঘরকে গেঞা, মায়ের ঠেঞা, বুঝে আনগা ধার[৫] ॥
যাও যাও, বলে বুড়ী,
যাও যাও, বোলে বুড়ী, চললেন হরি, গেলেন গোকুলপতি।
ডেকে বলে ফল দাওসে, মাগো যশোমতি ॥
চল, মা, রাজার পথে,
চল, মা, রাজার পথে, আমার সাথে, কিনে দাওগা ফল।
দিবি কিনা দিবি, মা, সত্য ক'রে বল ॥
নয় ত উপায় করি,
নয়ত উপায় করি, ভাঙ্গবো হাঁড়ি, দধি দুগ্ধ ছানা।
ঘর সইতে[৬] দিব ঠেলে যত হাঁড়ির কানা ॥
দিব ঠেলে ফেলে,
দিব ঠেলে ফেলে, যাবে পড়ে, তখনি পাবি জ্বালা।
নইলে কড়ি দিয়ে মোরে তুমি কিনে দাও সে কলা ॥
ব'লে কান্দেন হরি,
ব'লে কান্দেন হরি, দে মা কড়ি, বলেন যাদব রায়।
লোকের ছেলে, মাকে বলে. কত কিনে খায় ॥
শুনে হাসে রাণী,
শুনে হাসে রাণী, কথা শুনি, বলে গোপের ঝি।
হারে, লোকের ছেলে কি বা খায় তুই খাস্ না কি ॥
বাপ, তোর কেমন কথা,
বাপ, তোর কেমন কথা, কইলি হেথা, আমায় দিলি দোষ।
পাকা পাকা ফল আনব আসুক নন্দ ঘোষ।

১। মুখ গহ্বর, ২। অম্লরসের দ্রব্য আস্বাদনকালে তালু সংযোগে জিহ্বার দ্বারা শব্দ বিশেষ, ৩। স্বাদ, রুচির আস্বাদ, ৪। মুখের জড়তা দূর হইয়া সরস হওয়া, ৫। মূল্য বা পারিশ্রমিক, ৬। সমেত, সমগ্র গৃহের।

ঘরে আসুন নন্দ,
ঘরে আসুন নন্দ, কৃষ্ণচন্দ্র, ফল আনাব পাড়ি।
কিসের লেগে নীচের ঘরে মজাইবে কড়ি॥
ব'সে খাও ক্ষীর নবনী,
ব'সে খাও ক্ষীর নবনী, যাদুমণি, ও মোর চাঁদের কণা।
কুম্ভ কাঁখে জল আনিগা ঘরে থাক, সোনা॥
ঘরে মোর বসি থাক,
ঘরে মোর বসি থাক, শিশু ডাক, সবে কর খেলা।
ঘরকন্না সব রৈল ধান্য রৈল মেলা॥
আমি যাব জলে,
আমি যাব জলে, রাণী বলে, নিয়ে আসি জল।
দ্বিজ বলরামে বলে আমার ঠাকুর খাবেন কলা॥
নিল ধান্য কড়ি,
নিলা ধান্য কড়ি, নিলা হরি, হাতে করি ধান।
তুষ্ট হইল ডুম্নী বুড়ী দেখি ভগবান॥
তুমি কাদের ছেলে,
তুমি কাদের ছেলে, কাছকে এলে, ও মোর চাঁদের কণা।
মোরে যত ধান্য দিলে সব হৈল সোনা॥
তুমিত মানব নও,
তুমিত মানব নও, দেবতা হও, সকল দেবের সার।
পুর্ণ ব্রহ্ম গোপের ঘরে হঞাছ অবতার॥
পুণ্য যশোমতী,
পুণ্য যশোমতী, ভাগ্যবতী, জবা দিয়েছে গোটা।
বহু জন্ম কৈল পুণ্য ভক্তি বটে আঁটা॥
একবার বল মাতা,
একবার বল মাতা, শুনি কথা, এসো নীচের কোলে।
নিকটে পেঞাছি বাছা পুর্ব জন্ম ফলে॥

একবার বল, মাতা,
একবার বল, মাতা, শুনি কথা জুড়াক মোর গা।
ও চাঁদ-বদনে একবার বল দেখি, মা ॥
নীচের ভক্তি দেখে,
নীচের ভক্তি দেখে কোলে চেপে মা বলিলা শ্যাম।
ফল খেঞে ঘরে চলে নাচে বলরাম ॥
এলেন যশোমতী,
এলেন যশোমতী ভাগ্যবতী শ্রীদাম সুবল ডাকে।
ধান্য ছিল কেবা নিল আমি শুধাই তোকে ॥
বাপ রে, বল মোরে—
বাপ রে, বল মোরে ছিলে ঘরে সত্য করে বল।
শ্রীদাম বলে শুন, মাতা, চড়ুই নেমেছিল ॥
আমরা জানিনা গো, শুন, ও মা, কখন গেছে উড়ে।
তোমার কথা সত্য বটে ধান রয়েছে প'ড়ে ॥
ছড়া ত উঠানময় প'ড়ে রয় ছড়া গিয়েছে ধান।
রাণী বলে, আজকে সবার করবো অপমান ॥

যত মোর মনে আছে,
যত মোর মনে আছে বান্ধবো গাছে যত গোপের ছেলে।
সবাই মিলে যুক্তি করে ঘর নষ্ট ক'লে ॥
নিত্যি ছড়া ফেলা, ওগো ওমা, কোন যে জ্বালা হলো।
ঘর ছাড়ি জল আনায় প্রমাদ ঘটিল ॥
তখন মায়ের চোখে,
তখন মায়ের চোখে, শ্রীদাম সুবল সকল কথা বলে।
মাকে বলছে—শ্যাম চেপেছে নীচের কোলে ॥
দিল অগ্নি গায়,
দিল অগ্নি গায় ক্রোধে তায় মন হৈল ভারী।
যষ্টি হাতে নিলা রাণী এলায়ন কবরী ॥

ধরি যাদুর হাতে,
ধরি যাদুর হাতে, অখিল নাথের পৃষ্ঠে পড়িল বাড়ি।
ঘরে হৈতে হৈল যেতে, শুন গোপের রাণী ॥
আমার ভেঙ্গে খেলেক,
আমার ভেঙ্গে খেলেক, প্রাণে মেলেক, শুন গোপের বালা।
নন্দ ঘোষে বলবো আমি কত সইবো জ্বালা ॥
কাতর হৈয়ে তবে,
কাতর হৈয়ে তবে, কান্দে নন্দ-রাণী।
ঘর দ্বার সব নষ্ট কৈল যাদুমণি ॥
শ্রীদাম, কর অবধান,
শ্রীদাম, কর অবধান ডেকে আন বাছা যাদব রায়।
দণ্ড চার বেলা হৈলে কতবার খায় ॥
পাছে বা পিত্তি পড়ে,
পাছে বা পিত্তি পড়ে, কার ঘরে বসে আছে একা।
প্রাণ রক্ষা কর, শ্রীদাম, ডেকে আন্ তোর সখা ॥
শ্রীদাম বলে মর্ম্ম,
শ্রীদাম বলে মর্ম্ম, জান না কর্ম্ম, কিছু নাহিক জ্ঞান।
রাণী বলে ঘাটি কর্ম্ম হ'য়েছে শ্রীদাম।
শ্রীদাম গেলেন ধেঞা,
শ্রীদাম গেলেন ধেঞা, নাগালি পেঞা সঙ্গে আনলেন হরি।
দ্বিজ বলরামে কয় মনে ভাবি গোবিন্দপুরে বাড়ী ॥ —বীরভূম

২

শুন ভাই সভাজন করি নিবেদন।
শুনিলে প্রবল সুখ পাপ-বিমোচন ॥
একদিন শিশু সঙ্গে শ্রীনন্দ-নন্দন।
খেলাবশে কৈল প্রভু মৃত্তিকাভক্ষণ ॥
একজন শিশু যশোদারে কৈল নিবেদন।
তোমার কাহ্নাইয়া করে মৃত্তিকা ভোজন ॥

শুনিয়া যশোদা দেবী ধাইল সত্বরে।
উপনীতা হইলা আসি যথা গদাধরে॥
হারে, হারে, বলিঞা যশোদা ধৈল হাতে।
মৃত্তিকা ভক্ষণ কর কেনে, কিছু পাওনা খেতে॥
দধি দুগ্ধ ননী-ছানা আছে ভাণ্ড ভরা।
লোকে শুনে কি বলিবে শুন্‌রে পাগলা॥
নানা মতে ভৎর্সনা ভৎর্সিলা নন্দরাণী।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু বলে যাদুমণি॥
মিছা-মিছি করিঞা বলঞ শিশুগণ।
মৃত্তিকা নাহি খাই গালি দেহ অকারণ॥
শুন গো, মা যশোমতী, করি নিবেদন।
তোমার সাক্ষাতে দেখ মেলিব বদন॥
মায়া করি মুখ যে মেলিএ চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ বদনে দেখিলা নন্দরাণী॥

নন্দ-উপানন্দ দেখে গোপ-গোপীগণ।
ধেনু আদি বৎস দেখে গিরিগোবর্ধন॥
যমুনা পুলিন দেখে শ্রীবৃন্দাবন।
তাহার নিকটে দেখে ভাণ্ডীর গহন॥
শাল পিয়াল তাল হিন্তাল গুবাক।
অশোক কিংশুক দেখে কদম্ব চম্পক॥
মল্লিকা মালতী যুথি বেড়িয়াছে সব।
নানাফুলে তরুগণ হঞাছে উৎসব॥
অলিগণ গান করে পিএ মধুকর।
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ দেখএ দিবাকর॥
পার্বতী সহিত শিব দেখে বৃষের উপর।
রক্ত বর্ণ মহাতেজ আদিত্য স্বরূপ॥
হংস বাহনে ব্রহ্মা দেখে চতুর্মুখ।
মহিষের পৃষ্ঠে দেখে উন চতুর্দশ যম॥

মৃগ পৃষ্ঠে দেখে উন পঞ্চাশ পবন।
সনৎকুমার আর সনক সনাতন॥
গোবিন্দের মুখে রাণী দেখে পঙ্কজন।
তাহার উপরে ধ্বজ চার মনোহর॥
সুভদ্রা বলাই আর কমলা দেবী সাথ।
দেউল ভিতরে রাণী দেখে জগন্নাথ॥
রক্ত পদ্ম যিনি দেখে চরণের তল।
রতন নূপুরে তাথে অতি মনোহর॥
কটিতটে কিঙ্কিনী গাথা দেখি সারি সারি।
নীল মেঘেতে যেন পড়িছে বিজুরী॥
অঙ্গদ বলয়া করে দেখে সুশোভন।
বনমালা দোলে প্রভুর ভুবন মোহন॥
মাণিকে মণ্ডিত চিত্র বিচিত্র মনোহর।
কণ্ঠ মালা দোলে প্রভুর হৃদয় উপর॥
শ্রীমুখ পদ্ম জিনি দেখে পূর্ণ সরোবর।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে করে ঝলমল॥
মুকুট কুণ্ডল দেখে মস্তক উপরে।
মণিমুক্তা প্রবাল মণি ঝলমল করে॥
কত স্থানে কত শত আসে সাধুজন।
সাষ্টাঙ্গ প্রণতি দিয়া বন্দএ চরণ॥
ষোড়শ রোহিণী কুণ্ডে কেহ করে স্নান।
বটবৃক্ষ দেখি কেহ করে আলিঙ্গন॥
বালুকা উপরে কেহ করএ মন্ত্রস্নান।
সিন্ধু গর্ভ দেখি কেহ করে পিণ্ড দান॥
আর এক নন্দ রাণী দেখে অপরূপ।
অন্ন ব্যঞ্জন পিঠা বাজারে বিকায় মুল॥ —বীরভুম

রামসীতা

১

অজ রাজার পুত্র রাজা নামে দশরথ।
শোভা ক'রে বসলেন রাজা লয়ে প্রজাগণ॥
রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজায় কষ্ট পায়।
গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট ঘরের লক্ষ্মী উড়ে যায়॥
·········মহারাজা রথ সজ্জা কৈল।
শনির নিঃশ্বাসে রথ উড়িতে লাগিল॥
কোথায় ছিল জটায়ু পক্ষী সে রথ ধরে নামাইল।
নিজের গলার ফুল মালা জটার গলে দিল॥
জনমের মত জটার সঙ্গে রাজা মৈত্রতা পাতাইল।
বনে থাকি বনের পশু মৈত্রের কিবা জানি।
আমার সঙ্গে মৈত্রতা পাতালে, রাজা, তুমি॥
এইখানে থাক, মিত্র, আমার রথ আগুলিয়া।
আমি আসি বনে থেকে মৃগ শিকার করিয়া॥

বনের মাঝে বনে আছে অন্ধক ব্রাহ্মণী।
পারণের জল আনতে গেছে গুণের সিন্ধুক মুনি॥
নিতি যাই নিত্যি আসি পিতা, সরোবরের ঘাটে।
আজ ত যাবনা কেন প্রাণ কেন্দে কেন্দে উঠে॥
কাল গেছে একাদশী, রে বাপ, আজ ব্রাহ্মণের ভোজন
শীঘ্র করে আন জল করিব পারণ॥
কান্দিতে কান্দিতে সিন্ধুক যায় সরোবরের ঘাট।
সরোবরের ঘাটে সিন্ধুক জল পুরিতে লাগিল॥
বনের হরিণ মনে রাজা সিন্ধুককে মারিল॥
কে মেলি রে মৃত্যুবাণ অঙ্গ গেছে জ্বলে।
আছিড়ে পড়িল সিন্ধুক সরোবরের জলে॥
ঘোড়া হৈতে নেমে রাজা সিন্ধুক নিল কোলে।

গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যা মুখে সুরাপান।
চার পাপে পাপী হয় ভজে শ্রীরাম নাম॥
মরা সিন্ধুক কোলে লয়ে মুনির দ্বারে এল।
পাতার মচমচি কর্ণেতে শুনিল॥
কে এলি, বাপ, সিন্ধু, রে এলি মা ব'লে ডাক জুড়াক রে জীবন।
না জানাতে বধ ক'রেছি, মা, তোমারি নন্দন॥
সাত নয় পাঁচ নয়, রাজা, একা সিন্ধুক মুনি।
কি অপরাধ করেছিল বলিস নাই মার দণ্ড দিতাম আমি॥
পুত্র যদি আছে, রাজা, নি-পুত্রিয়া হবি।
পুত্র যদি নাই তোর চার পুত্র পাবি॥
এই কথা শুনে রাজা আনন্দিত হলো।
মরা সিন্ধুক কোলে লয়ে নাচিতে লাগিল॥
একা সিন্ধুক মারিস নাই, রাজা, মেলি তিন জন।
এমন কান্দন কান্দবি যে দিন রাম-লক্ষ্মণকে দিবি বন॥
তিন জনার সৎকার্য একই চিতার কৈল।
কলসী কলসী ঘৃত ঢালিতে লাগিল॥
বিশ্বামিত্র মুনির কাছে চরু মেগে নল।
সেই চরু নিয়ে রাজা রাণীদিগে দিল॥
সেই চরু ভক্ষণ করে রাণীর রাম জন্ম হলো।
এক মুনির মনের কথা আর এক মুনি কয়॥
রামকে আনতে পারলে যজ্ঞ রক্ষা হয়॥
মুনিরা সব প্রাণের ভয়ে যায় দেশ দেশান্তরে।
দশ মাস দশ দিন পরিপূর্ণ হলো।
ফলে ফুলে গুণের রাম ভূমিষ্ঠ হইল॥
শঙ্খের ধ্বনি দিয়ে মুনি রাজার দ্বারে গেল।
গলায় বস্ত্র দিয়ে রাজা মিনতি করিতে লাগিল॥
ঘন ঘন ঘণ্টা নড়ে শিঙায় দেয় সান।
রাম-লক্ষ্মণ লয়ে যাব করিব যজ্ঞস্থল॥

রাম আমার যেমন তেমন লক্ষ্মণ নয়ন তারা।
খাণিক ক্ষণ না দেখতে পেলে হই গো দিশে হারা॥
ধান দূর্বা দিয়ে রামকে বাড়ীর ধারে দিল।
অর্ধেক দূরে গিয়ে মুনি জিজ্ঞাসা করিল॥
ছয় মাসের পথে যাবে কিনা ছয় দিনের পথে যাবে।
ছয় মাসের পথে গেলে যজ্ঞ দরশন।
ছ'দিনের পথে গেলে তাড়কা নিধন॥
ছ'মাসের পথে যাব না, মুনি, যাব ছ'দিনের পথে।
তাড়কা যে কেমন বীর দেখ্‌ব দু'জনাতে॥
দুষ্ট তাড়কা রাক্ষসী প'ড়ে আছে পর্বত সমান।
তাই দেখে রঘুনাথ ধনুকে জুড়্‌লো বাণ॥
লক্ষ্মণ যত বাণ মারে ধ'রে ধ'রে খায়।
শ্রীরাম দণ্ডিকা বাণে তাড়কা বধয়॥
গৌতম মুনির শাপে অহোল্যা পাষাণ হ'য়েছিল।
রামের পদ-ধূলি পেয়ে মানব হইল॥
যজ্ঞস্থলে গিয়ে নাম-সংকীর্তন আরম্ভ করিল।
ঐ থেকে রাম করিল গমন।
নৌকার ঘাটে গিয়ে দিল দরশন॥
পার কর রে, ধীবর মাঝি, পার কর রে মোরে।
জনক রাজার বাড়ী যাব তোরই কৃপাবলে।
কাঠের তরী ছিল ধীবরের সোনা হ'য়ে গেল।
ঐখান থেকে রাম করিলেন গমন।
জনক রাজার ঘরে গিয়ে দিল দরশন॥
হরের ধেণুকে দিল টান।
হরের ধেনুক ভেঙ্গে গো হলো তিন খান॥
ঐখানে জনক রাজা সীতালক্ষ্মী দান কৈল।
গলায় বস্ত্র দিয়ে মুনির চরণে ধরিল॥
মাঝ পথে আসি হলো পরশুরামের সঙ্গে দেখা।
সাত দিন সাত রাত যুদ্ধ যে করিল॥

হাতে হাত দিয়ে পরশুরামের বল হ'রে নিল।
ঢোল বাজে খোল বাজে আর বাজে কাঁসী।
রামচন্দ্রের বিয়ে হল তোলপাড় ক'রে মিথিলার মাটী॥
জল ছড় দিয়ে রামে বাসরে ল'য়ে যায়।
আপনার কপালের লেখন তুয়ায়ে দেখতে পায়॥
রাজা হব রাজ্য লব মনের উল্লাসে।
সকাল বেলায় কৈকেয় রাণী রামকে দিছ বনবাসে॥
চৈত বৈশাখ মাসে রাম হলেন বনচারী।
একেত রোদের তাপে, নীচে খর বালি॥
ভাঙ্গ, লক্ষ্মণ, তরু ডাল ধর সীতার শিরে।
তারই ছায়ায় সীতা লক্ষ্মী যায় ধীরে ধীরে॥
মাঝ পথে গিয়ে হলো ভরতের সঙ্গে দেখা।
প্রাণের দাদা ছাড়ি আজ চ'লে যাবে কোথা॥
সুখে রাজত্ব কর, ভাই. ভরত শত্রুঘণ।
পিতার সত্য পালিবারে যাচ্ছি পঞ্চবটী বন॥
ঐখান থেকে রাম করিলেন গমন।
চণ্ডালের গৃহে গিয়ে রাম দিল দরশন॥
মদ খায় মাংস খায় চণ্ডালের নাকে মদ গলে।
ঘৃণা নাহি করে রাম চণ্ডালকে লয় কোলে॥
চণ্ডাল বংশ উদ্ধার ক'রে করিলেন গমন।
পঞ্চবটীর বনে আসি দিল দরশন॥
তাল পাতে কুঁড়াখানি খড়িকার টিপুনী।
পথে ব'সে পাশাখেলে জনক-নন্দিনী॥
খেলিতে খেলিতে পাশা পড়ে ভূমি তলে।
রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা পুষ্পর অন্বেষণে॥
বিয়া কর বিয়া কর, ঠাকুর রঘুনাথ।
আমার বিয়া হ'য়েছে লক্ষ্মণের বিয়া নাই।

এই কথা বলে গেল লক্ষ্মণের কাছে।
ধেনুকের হুলে ধ'রে সুর্পণখার নাকটি নিলে কেটে।
বনের মায়ামৃগ হ'য়ে মারীচ নাচিতে লাগিল।
আন রে, দেওর লক্ষ্মণ, মৃগটা ধরিয়ে পালিব পুষিব।
চৌদ্দ বৎসর হলে মৃগ দেশে লয়ে যাব॥
লহ লহ জিহ্বা করে মুখে হুঙ্কার ছাড়ে।
স্ত্রীলোকের কথা রাম কর্ণেতে না শুনে।
ধেনুক বাণ ল'য়ে সবে মৃগের পেছা দৌড়ে।
মার মার ধর ধর বলে খেদাড়িয়ে যায়।
আদিপুরের বাণের স্রোতে মায়ামৃগ দু'খান হয়ে যায়॥
যোগীর বেশে রাবণ রাজা ভিক্ষার ছলে যায়।
ঘন ঘন ঘণ্টা নাড়ে শিঙায় দিচ্ছে সান।
কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিবে, লক্ষ্মী, রক্ষা করি প্রাণ॥
বাটায় ক'রে ফল মূল সাজায়ে সীতা ভিক্ষা লয়ে এলো।
কাছে ছিল পুষ্পক রথ সীতা হরে নিল॥
এ'বন ও'বন খুঁজে দেখে মৃগ নাহি পেলো।
শূন্য কুটীর দেখে রাম অচৈতন্য হলো॥
রাম না কান্দে থির না মানে পড়ি ভূমিতলে।
রামের জটা বাকল ভিজে যায় নয়নেরই জলে॥
সীতা মলে সীতা পাব কুলের কামিনী।
দাদা মলে অনাথ হব কোথায় পাব আমি॥
আন্‌রে ভাই জল থল বাঁচাওরে জীবন।
তোমা হত্যা হবে রে ভাই দুঃখ নিবারণ॥
জলথল লয়ে আনি দাদার কাছে দিল।
জলথল খেয়ে দাদা উঠিয়ে বসিল॥
কিষ্কিন্ধ্যার বনে দেখে বালি আর সুগ্রীব।
কিষ্কিন্ধ্যার বনে আসি দরশন দিল॥
কে বালী কে সুগ্রীব বল্‌তে না পারে।
'দু'টি ভেয়ে যুদ্ধ করে ঘোর অন্ধকারে॥

—বীরভূম

আখড়াই

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর এবং কলিকাতায় নূতন এক শ্রেণীর গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল, তাহা আখড়াই গান নামে পরিচিত। এই বিষয়ে আখড়াই গানের প্রাচীনতম সংগ্রাহক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য।

'সর্বাগ্রে শান্তিপুরস্থ ভদ্র-সন্তানেরা আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন, ইহা প্রায় ১৫০ দেড়শত বৎসরের ন্যূন নহে, কিন্তু তাঁহারা "ভবানী বিষয়" গাহিতেন না, কেবল "খেউড় ও প্রভাতী" গাহিতেন, সেই সকল গীতে "ননদী, এবং দেওরা" এই শব্দ উল্লেখ থাকিত, এবং রচকেরা অতিশয় অশ্রাব্য কদর্য বাক্যে গীত সমুদয় রচনা করিতেন, তৎকালে তাহাতেই অত্যন্ত আমোদ হইত। তচ্ছ্রবনে শান্তিপুরের স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই অশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন, এই মহাশয়দের সময়ে যন্ত্রের বিশেষ বাহুল্য এবং সুরের তাদৃশ পরিপাট্য ও আধিক্য ছিল না, সামান্য টপ্পার ন্যায় সুরে গান করিয়া তাহাকেই "আখড়াই" নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।

শান্তিপুরের আখড়াই গাহনার দৃষ্টান্ত ক্রমে চুঁচুড়া ও কলিকাতাস্থ সংগীত বিদ্যোৎসাহিজনেরা সুর ও বাদ্যের বিশেষ সুশৃঙ্খলা করত অনেকাংশ পরিবর্তন করিয়া আখড়ায়ের আমোদে আমোদি হইলেন। ইঁহারা প্রথমে "ভবানী বিষয়" পরে "খেউড়" তৎপরে "প্রভাতী" এই তিন সংগীতের সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ইতর শব্দ পরিহার পূর্বক অতি সরল সাধু ভাষায় গান সকল রচনা করিতে লাগিলেন। এই সমুদয় গীত ও সুর এবং বাদ্য শুনিয়া বিশিষ্ট লোকমাত্রেই সন্তুষ্ট ও সুখী হইতেন।

চুঁচুড়া দলেরা বৎসরে দুই একবার কলিকাতায় আসিয়া যুদ্ধ করিতেন, ইঁহারা হাঁড়ী কলসী প্রভৃতি ২২ খানা যন্ত্র বাজাইতেন, ইহাতে তাবতেই চুঁচুড়ার দলকে "বাইসেরা" বলিতেন। ঐ সময়ে সখের আখ্ড়াই লড়াই কলিকাতাস্থ বড় বাজার নিবাসী কাশীনাথ বাবুর ফুল-বাগানেই হইত; অন্যত্র হইত না। তৎকালে কেবল আড়া তালে বাদ্য হইত, অপর তাল ব্যবহৃত ছিল না।

ঐ সময়ের কিছু পরে পেসাদারদিগের কয়েকটা দল স্থাপিত হয়, তাহারা দিগের সেই সকল দলের গীতযুদ্ধ এতন্নগরস্থ হালসীর বাগানে নিয়মিতরূপে সর্বদাই হইত। ধনি ও সৌখিন বাবুলোকেরা ইহাদিগের এক এক পক্ষের পক্ষ হইয়া অর্থদান প্রভৃতি নানা প্রকারেই সাহায্য করিতেন। উক্ত মহাশয়গণের মধ্যে গোঁড়ামি সূত্রে পক্ষ প্রতিপক্ষে নিয়ত কথায় কথায় কত রূপ বিবাদ কলহ হইত।

পেসাদার দলের মধ্যে "বৈষ্ণবদাস" নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত গুণী ছিলেন, তিনি আড়া তাল হইতে এক অত্যাশ্চর্য নূতন রূপ করত দৌড়, সবদৌড়, দোলন, পিড়েবন্দি ও মোড় প্রভৃতি অতি সুশ্রাব্য মনোহর মধুর বাদ্য সকল প্রস্তুত করিয়া সকলকেই মোহিত করিলেন। সেই বাদ্য যিনি শ্রবণ করিলেন, তাঁহারি শ্রুতিপথে সুধাবৃষ্টি হইতে লাগিল। এ বিষয়ে বৈষ্ণব দাসকে কত প্রশংসা করিতে হয়, তাহা বাক্য দ্বারা বিস্তারিত রূপ ব্যক্ত করণে অক্ষম হইলাম।

অনন্তর "রামজয় সেন" নামক একজন বৈদ্য বৈষ্ণবদাসের সৃজিত সেই সমস্ত বাদ্য এবং তালকে সংশোধন পুর্বক আরো অধিক উত্তম করিয়া লইলেন। ইঁহারি নিকট ৺রসিকচাঁদ গোস্বামী মহাশয় বাদ্য শিক্ষা করত অত্যন্ত বিখ্যাত এবং যশস্বী হইয়াছিলেন।

এই সময়ে যোড়াসাঁকোস্থ "ন্যাটা বলাই" নামক একজন সুবর্ণ বণিক আখ্‌ড়াই বাদ্যে অত্যন্ত নিপুণ হইয়াছিলেন, "নবু আঢ্য, রাজু আঢ্য এবং রূপচাঁদ" এই তিনজন সুবর্ণ বণিক ইঁহার নিকট বাদ্য শিক্ষা করিয়া বিশেষ পারদর্শী হইলেন।

যোড়াসাঁকোতে যে আখড়াই দল হয়, ৺দুর্গাপ্রসাদ বসু মহাশয় তাহার সুর ও গীত রচনা করিতেন, ইনি এ বিষয়ে অত্যন্ত যোগ্য ছিলেন। এই দলে ন্যাটা বলাই ঢোল এবং হোগলকুঁড়ে নিবাসী ৺পার্বতীচরণ বসু মহাশয় বেহালা বাজাইতেন। পার্বতীবাবুর বেহালা শুনিয়া তাবতেই মুগ্ধ হইয়াছেন, ইনি বাগবাজারস্থ ৺রাধানাথ সরকারের তুল্য প্রতিযোগী ছিলেন।

এই সময়ের পুর্বে নিমতলার দত্তবাবু এবং রামবাগানের দত্তবাবুদিগের আখ্‌ড়ায়ের দুই দল ছিল ও আর আর অনেক মহাশয়েরা দল করিয়া সর্বদাই আমোদ করিতেন। বৈদ্যকুলোদ্ভব ৺কুলুইচন্দ্র সেন সুরের যে নূতন প্রণালী বদ্ধ

করিয়াছিলেন, ৺নিধুবাবু তাহা হইতে বিস্তর বাহুল্য করেন, এবং তাহা উৎকৃষ্ট ও সুমিষ্ট হয়। সেই প্রণালীই অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে।

মৃত গোলাম আব্বস, যিনি অদ্বিতীয় বাদ্যকর ছিলেন, তিনি আখ্ড়াই বাদ্য শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইতেন, এবং কহিতেন "এ, কি আশ্চর্য ব্যাপার। আমি কিছুই বুঝিতে ও শিখিতে পারি না।"

কালক্রমে আখ্ড়াই গান দুঃসাধ্য অনুশীলনের বস্তু হইয়া লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত হইল। এই পথেই ইহা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়। নাগরিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ইহা রাগ-সঙ্গীত দ্বারা প্রভাবিত হইবার ফলে টপ্পা, বেহাগ, ললিত ইত্যাদি সুরে এককালে গীত হইত। সঙ্গীতগুলির রচনার মধ্যেও নাগরিকতার স্পর্শ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

১

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরি, সদাশিবে শুভকরি
নিরানন্দে আনন্দদায়িনী।
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা, অজ্ঞানবোধে সাকারা
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্যরূপিণী।
প্রণতে প্রসন্নাভাব, ভীমতর ভবার্ণব
ভয়ে ভীত ভবানি ভবামি।
কৃপাবলোকন করি, তরিবারে ভব-বারি
পদতরি দেহ গো তারিণী॥

২

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল!
তোমার সাধনা করি সাধ না পুরিল॥
সাধিয়ে আপন কাজ, এখন বাড়িল লাজ,
আমার গেল সে লাজ, বিষাদ হইল॥

৩

যামিনী কামিনীবশ হয় কি কখন।
হলে কিও, বিধুমুখ, হেরি হে মলিন॥
নলিনী হাসিবে কেন, কুমুদী বিরসানন,
এ সুখে অসুখ তবে করে কি অরুণ॥

আগমনী

শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রারম্ভে একদিন বাংলার ভিখারী বৈষ্ণবের কণ্ঠে বাঙ্গালার পল্লীতে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে যে সঙ্গীত শুনা যাইত এবং কালক্রমে যাহা ব্যবসায়ী কবিওয়ালাদিগের ব্যাপক অনুশীলনের ফলে নাগরিক জীবনের সঙ্গীত-চর্চার মধ্যেও একদিন স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা সাধারণভাবে আগমনী গান নামে পরিচিত। আগমনী গান বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে, ইহা কেবলমাত্র স্বাধীন কোন গীতরূপ নহে; কারণ, দুর্গোৎসবকে উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালীর প্রতি গৃহে গৃহে যে কন্যা-উপাসনার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, আগমনী গানে তাহারই ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। প্রতি বৎসর বর্ষার শেষে শারদ প্রকৃতির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতি বঙ্গগৃহে পতিগৃহ হইতে কন্যাসন্তান যে পিতৃগৃহে আগমন করিত, তাহার সুগভীর অনুভূতির স্পর্শে আগমনী গান রূপ লাভ করিয়াছিল। ক্রমে দুর্গা সেই কন্যা সন্তানের রূপক হিসাবেই গৃহীত হইলেন; সেইজন্য বাঙ্গালী জনক-জননীর এই অনুভূতি দুর্গাদেবীর কৈলাস হইতে মর্ত্যলোকে আগমন বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল।

কবিওয়ালাগণ এই গান যখন রচনা করিয়া গাহিতে লাগিল, তখন ইহাদের মধ্য হইতে গ্রাম্য সরলতা ও আন্তরিকতার ভাব লুপ্ত হইয়া গিয়া রচনার দিক দিয়া কৃত্রিম হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু গ্রাম্য জীবনে ইহার মূল লৌকিক ধারাটি এখনও লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে নাই।

১

রাণী, দেওগো জয়ধ্বনি,
তোমার উমা লইয়া আসিল নন্দিনী।
একে শুক্র উদয় শরৎ সময়,
ভাগ্যে বুঝি ব্রহ্মময়ী আসল হিমালয়॥
উমা কোলেতে আনি বসাইলেন রানী,
আস আমার, চাঁদবদনী, জুড়াতে গো প্রাণী॥

আমি জিজ্ঞাসা করি, হে গো তারিণী।
কেমন কইরা হরের ঘরে আছিলা তুমি ॥
না কহে বাণী, শুন, জননী।
না দেয় ব'লে হরনাথে উড়েছিল প্রাণী ॥
জামাই কি আপন নিশির স্বপন,
উমাধনকে না দেখিলে ত্যজিবে জীবন।
এক পাগলের পুর শুনিতে অদ্ভুত,
শ্মশানে মশানে ফিরে খায় ভাঙের গুড়া ॥ —ত্রিপুরা

২

পুণ্যধাম বাপের বাড়ী, যাইতে চাহে সকল নারী,
ঐ দেখ না দুর্গাদেবী সিংহবাহিনী।
গণেশেরে কোলত করি আইসেন জননী ॥
সম্মুখেতে নন্দী আইয়ের আশা ছোটা ধরি।
ভিঙ্গ চলে পাছে পাছে ধুতুম তুতুম করি ॥
মেনা আইলো বারাই নিতে আদরের ঝি।
ঝি নাতি দেখি মেনা হাসে ভাসে সুখে।
বাটা ভরি আনে পান দিতে ঝিয়ের মুখে ॥
আগ বাড়াইয়া নিল মায়ে বাড়ীর ভিতর।
পূজা দিল বলি দিল খাওয়াইল বিস্তর ॥
তিন দিন রাখিল মায়ে বড় যতন করি।
চারি দিনের দিন বিদায় দিল যাইত নিজের বাড়ী ॥
শিবে বোলে কি আনিলা আমার কারণ।
আলুনি কচুশাক টুনি পোড়া পানি ভাত।
গরীব বাপের বাড়ী আমার ভোজন ॥ —ঢাকা

৩

গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
নিলে তার নাম, পূর্ণ মনস্কাম,
সে আইলে—গৃহে আসেন শঙ্করী।

বিল্ববৃক্ষ-মূলে করিব বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন ;
ঘরে এলে চণ্ডী, শুন্‌বো আমরা চণ্ডী,
আস্‌বে কত দণ্ডী, যোগী, জটাধারী ॥ —২৪ পরগণা

৪

আমার মনে আছে এই বাসনা—
জামাতা সহিতে আনিবে দুহিতে,
গিরিপুরে করবো শিব স্থাপনা।
ঘর-জামাতা করে রাখবো কৃত্তিবাস,
গিরিপুরে কর্‌বো দ্বিতীয় কৈলাস।
হর-গৌরী চক্ষে হের্‌বো বারমাস,
বৎসরান্তে আন্‌তে যেতে হবে না।
সপ্তমী, অষ্টমী, পরে নবমীতে মা যদি আসে,
হর আসবে দশমীতে।
বিল্বপত্র দিয়ে পূজ্‌বো ভোলানাথে,
ভুলে রবে ভোলা, যেতে চাইবে না ॥ —ঐ

৫

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌বো না ॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া, জামাই বলে মান্‌ব না ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥

—দ্বিজ রামপ্রসাদ (ঢাকা)

৬

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্ত করিয়ে,
চৈতন্তরূপিণী কোথা লুকালো ॥

কহিছে শিখরী, কি করি অচল,
নাহি চলাচল, হলাম যে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো ॥
দেখা দিয়ে কেন মায়া তার।
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার।
আবার ভাবি গিরি, কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো ।। —দাশরথি রায় (বর্ধমান)

৭

গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী,
যাও হে একবার কৈলাসপুরে।
শিবকে পুজবে বিল্বদলে, সচন্দন আর গঙ্গাজলে,
ভুলবে ভোলার মন।
অমনি সদয় হবেন সদানন্দ, আসতে দিবেন
হারা তারাধন।
এনো কার্তিক গণপতি, লক্ষ্মী সরস্বতী, ভগবতী
এনো মস্তকে কোরে ॥
জামাই যদি আসেন, এনো সমাদর কোরে।
শুনি পুরাণ চণ্ডীতে, পুর্ব জন্মেতে উমা ছিল
দক্ষের মেয়ে ,প্রসূতির মেয়ে,
শিব-নিন্দা শুনে, সেই অভিমানে,
প্রাণ ত্যজিলেন দক্ষালয়ে।
আমি সেইটে করি ভয়, ঝি-জামাই আনতে হয়,
এসো কৈলাসবাসীদের সব নিমন্ত্রণ কোরে। —২৪ পরগণা

৮

নিশি সুপ্রভাতে, শুভ ষষ্ঠীতে শুভক্ষণ সময়—
কোরে সঙ্কল্প, ষষ্ঠীর কল্পনা, কোল্লেন হিমালয় ॥
বলে পাষাণকে রাণী, সবিনয় বাণী,
আনতে যাও ঈশানী, মেয়ে দুঃখিনীর মেয়ে।

আমি দেখেছি স্বপন, যেন উমাধন
আশাপথ রয়েছেন চেয়ে ॥
আছে কন্যা সন্তান যার, দেখতে হয়, আনতে হয়,
সদাই দয়ামায়া ভাবতে হয় হে অন্তরে।
কোরবো চণ্ডীর বোধন বিল্বমূলে।
দণ্ডিগণ পড়বে চণ্ডী, পাব চণ্ডী চণ্ডীর ফলে।
ঘটে চণ্ডী, পটে চণ্ডী, স্থানে স্থানে মঙ্গল চণ্ডী,
চণ্ডীর কল্যাণে।
পাব চণ্ডীর ফলাফল, হবে না বিফল,
আসবেন মঙ্গল চণ্ডী সুমঙ্গলে ॥
কন্যার মায়াছলে, ত্রিজগৎ ভোলে,
দেখলে আনন্দ হয়, নিরানন্দ যায়
সদানন্দের মন ভুলালে ॥
শিবের নয়নের তারা ত্রৈলোক্যতারা।
দুঃখ পাসরা ত্রিনয়নী শিব-মোহিনী,
গৌরীর আজ্ঞাকারী শিব,
নামে তরে জীব, ভবতারিণী ভবানী ॥
আমার এমন ঝি-জামাই, জন্মে জন্মে যেন পাই,
সদাই পুজা করি, আমার মানস অন্তরে ॥

—রাম বসু (২৪ পরগণা)

৯

গিরি, কি অচল হলে আনিতে উমারে,
না হেরি তনয়া-মুখ হৃদয় বিদরে।
ত্বরান্বিত হও, তোমার করেতে ধরি,
উমা 'ওমা' বলে দেখ ডাকিছে আমারে ॥

—রামনিধি গুপ্ত (২৪ পরগণা)

১০

আর কেন কাঁদ, রানি, উমারে আনিতে যাই,
গেলে যদি কৃত্তিবাস না পাঠান, ভাবি তাই।

উমার আমার অঙ্গ-ছায়া করে শীতল হরের কায়া,
পাঠায়ে কি ভব-জায়া পাগল হবেন, ভাবি তাই ॥ —২৪ পরগণা

১১

কি শুনালে, গিরিবর, উমা কি ভবনে এলো ?
ভবেরি ভবানী আমার ভবন করিল আলো।
উমা শশী না হেরিয়ে ছিল নয়ন অন্ধ হোয়ে,
এবে নয়ন-তারা নিরখিয়ে আঁখি মম জুড়াইল ॥ —ঐ

১২

কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী।
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী ?
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী ;
কক্ষে ল'য়ে গজানন, গমন গজগামিনী,—
মা ব'লে মা ডাকে মুখে আধ আধ বাণী।
এ যে করি-অরিতে করি ভর, করে করিছে রিপুসংহার,
পদ-ভরে টলে মহী মহিষ-নাশিনী।
প্রবলা প্রখরা মেয়ে, তনু কাঁপে দরশনে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোকধন্যা ত্রিলোক-জননী ॥
—দাশরথি রায় (বর্ধমান)

১৩

গা তোল, গা তোল, বাঁধ, মা, কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণী, তোর ঈশানী।
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে, 'মা কৈ' 'মা কৈ ব'লে',
ডাকৃছে, মা, তোরে শশধর-বদনী।
মা গো, ত্রিভুবনে মান্যে, ত্রিভুবনে ধন্যে,
তোর মেয়ে সামান্যে নয়, গো রাণি।
আমরা ভাব্তেম ভবের প্রিয়ে,
মা নাকি তোর মেয়ে,
তিনি নাকি ভবের ভয়-হারিণী ॥

ধর্‌লি যে রত্ন উদরে, তোর মত সংসারে,
রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী।
মা তোর ঐ তারা, চন্দ্রচূড়দারা,
চন্দ্রদর্পহরা চন্দ্রাননী,
এমন রূপ দেখি নাই কারো, মনের অন্ধকার
হরে মা, তোর হর-মনোমোহিনী ॥ —ঐ

১৪

শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে উমা এলেন হিমালয়।
কোরে নিরীক্ষণ, চক্ষে হেরে চাঁদ বদন,
অভয়ার গিরিরাণী কয়—
আয়, মা, পূর্ণ শশী, স্বর্ণশশী বিধি আমায় দিয়েছে,
একবার আয় গো, মা, কোলে, ডাকো 'মা' বোলে,
পাষাণেতে পদ্ম ফুটেছে।
গেলো মনোদুঃখ দূরে, তোমার বিধুমুখ হেরে;
এলে, করুণাময়ী মা, করুণা কোরে ॥
বল, মা, আমার কাছে,
জামাই শিব এখন কেমন আছে?
শিবের সুমঙ্গল শুনিলে সকল,
শুন্‌লে পরে আমার প্রাণ বাঁচে।
মনে করতেম আমি সদাই বাসনা,
উমাধনে আনতে যাই।
ভাবতেম মনেতে, কাঁদতেম নিশিদিনেতে,
চলিবার কিছু শক্তি নাই।
গিরি প্রাণ বাঁচালে তোমায় এনে,
পূর্ণ হলো বাসনা, ঘুচ্‌লো বেদনা সকল যন্ত্রণা।
তুমি না এলে এখন, যেতো মা জীবন,
মায়ে ঝিয়ে দেখা হোতো না।
এখন জুড়ালো হৃদয়, দুঃখ গেলো সমুদয়,
হোলো কোটি চন্দ্র উদয় এ গিরিপুরে ॥—হরু ঠাকুর (২৪ পরগণা)

১৫

গৌরী কোলে ক'রে নগেন্দ্র-রাণী করুণ বচনে কয়,—
উমা মা আমার স্বর্ণলতা, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
মরি জামাতার খেদে, তোমার বিচ্ছেদে, প্রাণ কাঁদে দিবানিশি।
আমি অচল নারী, চলিতে না পারি, পারি না যে দেখে আসি।
আছি জীবন্মৃতা হ'য়ে, আশাপথ চেয়ে তোমায় না হেরিয়ে নয়ন ঝরে।
কও দেখি উমা, কেমন ছিলে, মা, ভিখারী হরের ঘরে ?
জানি নিজে সে পাগল, কিছু নাই সম্বল, ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা করে।
শুনে জামাতার দুখ্ খেদে বুক বিদরে।
তুমি ইন্দুবদনী, কুরঙ্গ-নয়নী, কনকবরণী তারা।
জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন, শিরে জটা বাকল পরা।
আমি লোক-মুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি, ফণী ধরে অঙ্গে ভূষণ ক'রে।
মরি, ছি ! ছি ! ছি ! একি কবার কথা, শুনে লাজে মরে যাই ;
তোমা হেন গৌরী, দিয়েছেন গিরি, ভুজঙ্গেতে যার ভয় নাই ;
মাখে অঙ্গেতে ছাই।
তুমি সর্বমঙ্গলা, অকুলের ভেলা, কুলে এনে দিতে পার।
দেখে খেদে ফাটে বুক, তোমার এত দুখ্, সে দুখ ঘুচাতে নারি।
তুমি রাজার বালিকা, মায়ের প্রাণাধিকা, ভাগ্যেতে, মা, হলি শিবদারা।
মরি দুঃখেতে শঙ্করী, শঙ্কর ভিখারী, উপজীব্য ভিক্ষা করা।
সদা বলি, মা, গিরিকে, আনগে গৌরীকে, কত কষ্ট উমার কৈলাসপুরে।
—রাম বসু (ঐ)

১৬

বসিলেন মা হেমবরণী, হেরম্বে ল'য়ে কোলে।
হেরি গণেশ-জননী রূপ, রাণী ভাসেন নয়ন-জলে।
ব্রহ্মাদি বালক যার, গিরি-বালিকা সেই তারা।
পদতলে বালক ভানু, বালক চন্দ্রধরা,
বালক ভানু জিনি তনু, বালক কোলে দোলে॥

রানী মনে ভাবেন—উমারে দেখি, কি উমার কুমারে দেখি ;
কোন্ রূপে সঁপিয়ে রাখি নয়ন যুগলে !
দাশরথি কহিছে, রাণি, দুই তুল্য দরশন
হের, ব্রহ্মময়ী আর ঐ ব্রহ্ম-রূপ গজানন,
ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে বসেছে মা ব'লে ॥ —দাশরথি রায় (ঐ)

১৭

গত নিশিযোগে আমি হে দেখেছি যে সুস্বপন—
এল হে সেই আমার তারাধন।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে বলে—'মা কৈ, মা কৈ, মা কৈ আমার,
দেও দেখা দুখিনীরে।'
অমনি দু বাহু পসারি, উমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি. আমি নই।
ওহে গিরি, গা তোল হে, উমা এলেন হিমালয়।
উঠ, 'দুর্গা' 'দুর্গা' ব'লে, দুর্গা কর কোলে,
মুখে বল, 'জয় জয় দুর্গা জয়'।
কন্যা-পুত্র-প্রতি বাৎসল্য, তায় তাচ্ছিল্য করা নয়।
আঁচল ধরে তারা বলে—'ছি মা, কি মা, মাগো, ও মা,
মা-বাপের কি এমনি ধারা' ?
গিরি তুমি যে অগতি, বুঝে না পার্বতী,
প্রসূতির অখ্যাতি জগন্ময়।
মা হওয়া যত জ্বালা, যাদের মা বলবার আছে,
তারাই জানে ;
তিলেক না হেরিয়ে জন্মব্যথা পাই,
কর্মসূত্রে সদা স্নেহে টানে।
তোমারে কেউ কিছু বলবে না—
দেখে দারুণ পাষাণ ;
আমার লোক-গঞ্জনায় যায় প্রাণ।
তোমার তো নাই স্নেহ, একবার ধর ধর, কোলে কর,
পবিত্র হোক পাষাণ-দেহ।

আহা, এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে,
তিন দিন বৈ রাখে না মৃত্যুঞ্জয়। —রামবসু (ঐ)

১৮

গা তোল, গা তোল, গিরি, কোলে লও হে তনয়ারে।
চণ্ডী দেখে পড়াও চণ্ডী, চণ্ডী তোমার এলো ঘরে ॥
মঙ্গল আরতি ক'রে গৃহে তোল মঙ্গলবারে।
অমঙ্গল যত যাবে দূরে, বোধনে সম্বোধন ক'রে ॥
তারা পুজে পেলেন তারা, ত্রিপুরাসুন্দরী তারা ;
আঁখি-তারা, দুঃখহরা, নয়ন জুড়াল রে ॥ —২৪ পরগণা

১৯

ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে,
তত্ত্ব না পাইয়ে যার।
তোমার সেই উমা, এই এলো, সঙ্গে শিব-পরিবার।
এখন যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ, গঞ্জনা দূরে গেল।
'আমার মা কৈ, মা কৈ', ব'লে উমা ঐ, ব্যগ্রা হ'য়ে দাঁড়াল।
বলে—'তোমার আশীর্বাদে, আছি মা ভাল,
দুখিনীর দুখ্ ভাবতে হবে নাই।'
মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই।
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে,
রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই।
শিবে এসে বলে 'মা, শিবের সেদিন আর এখন নাই।
যারে পাগল পাগল বোলে, বিবাহের কালে,
সকলে দিলে ধিক্কার ;
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বৈভব,
কুবের ভাণ্ডারী তার।
এখন শ্মশানে মশানে, বেড়ায় না মেনে,
আনন্দ কাননে জুড়াবার ঠাঁই।'
হোক্, হোক্, হোক্, উমা সুখে রোক্, সদাই হোত মনে।

ভিখারীর ভাগ্যে পড়েছেন দুর্গে,
তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে।
দুহিতার সুখ শুনিলে, গিরি,
যে সুখ হয় গো আমার ;
আছে যার কন্যে, সেই জানে,
অন্যে কি জানিবে আর।
যদি পথিকে কেউ বলে, 'ওগো, উমার মা,
উমা ভাল আছে তোর' ;
যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধেয়ে যাই ;
আনন্দে হ'য়ে বিভোর।
শুনে আনন্দময়ীর আনন্দ সংবাদ,
আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই। —রাম বসু (ঐ)

২০

পুরবাসী বলে, উমার মা, তোর হারা তারা এল ঐ।
শুনে পাগলিনীর প্রায় অমনি রাণী ধায়,
বলে—'কৈ মা উমা কৈ ?'
কেঁদে রাণী বলে আমার উমা এলে !
একবার আয় মা, একবার আয় মা, করি কোলে।
অমনি দু'বাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কেঁদে রাণীরে বলে।
কৈ মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে।
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ ;
জেনে এলাম আপনা হ'তে,
গেলে নাকো নিতে রব নাগো, যাব দু'দিন গেলে ॥
পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে, মা, মায়া কি পাসরি।
কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই,
'তোর কি মা নাই ? তোর কি মা নাই ?'
অমনি মরমে মরে যাই ॥

তাদের বলি, আমার পিতে এসেছিলেন নিতে,
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে ॥
আমার মনের ব্যথা, আছে মনে গাঁথা,
মা, কি বলিবে অন্যে, পিতৃদত্তা কন্যে,
চক্ষে দেখে দিলে পাগল স্বামী সকলি জান তুমি।
এ কি কবার কথা!
ঘরেতে সতীনের জ্বালা গো তাও তো শুনেছ সব,
শিব-সোহাগিনীর প্রায় রেখেছেন মাথায়
সদাই কলকল রব।
তরঙ্গিণীর অভিমানের কথা,
আমার সয় না, আমার সয় না,
আমার হয় না স'হ্যতা।
আমি ভাবি কোথা যাব কোথায় গে জুড়াব,
কাঁদি বসি বিল্ববৃক্ষমূলে, হিমালয় আর কৈলাস শিখর
নহে দূর যাতায়াত—মনে হলে মা। দিনে শতবার
তত্ত্ব নিলে ত পার, মা, নিতে।
বাৎসল্য ভাবেতে তাচ্ছিল্য কি সে শুনি, কহ, মা।
আমি হতাম তোমার মা, জানাইতাম, মা,
মায়ের কত স্নেহ, মা!
তোমার কঠিন হৃদয়, পিতাও নিদয়;
হোক মা, ও হোক মা!
একবার তত্ত্ব ত নিতে হয়!
আমি এ সুখ-শরদে মরি মনের খেদে,
কথায় কথায় কোন্ বা বলে পাঠালে ॥ —২৪ পরগণা

২১

১ চিতান। ভবনে ভবানী, পাইয়া পাষাণী,
পুলকে হয়ে মগনা।
১ পরচিতান। ঈশানী সম্বোধনেতে রাণী কয় ক'রে করুণা।

১ ফুকা। মা, তোমায় নয়ন পথে হারিয়ে, ত্রিনয়না
কেঁদে কেঁদে, তারা, চক্ষের তারা ছিল না,
১ মেলতা। আজি সেদিন ঘুচিল, সুদিন হইল,
এ দিন হবে মনে না জানি।
মহড়া। একবার আয়, মা, করি কোলে দুখপাসরা, নন্দিনী।
চারু, চন্দ্রাস্তে, প্রাণ-উমা, ডাক মা বলে মা
শুনে, মা, জুড়াই তাপিত প্রাণী।
খাদ। শুধাই তাই গো, ঈশানি,
২ ফুকা। যার উমা জগতের মা,
তার কি, মা, এমন হয়;
হাঁগো, প্রাণের তারা, সেও কি উমা-হারা রয়।
২ মেলতা। মা, তোর শ্রীমুখ না হেরে,
যে দুখ অন্তরে
ছিলাম মণিহীন ফণী দিবাযামিনী।
অন্তরা। ভাল, মা গো, মা, তোর যেন পাষাণী তুই ত জগৎজননী
ভাল তা বলে মা একবার মায়ে তোমার
মনে কর কৈগো তারিণী।
২ পরচিতান। কৈলাস-শিখরে, শঙ্করের ঘরে
গিয়ে, মা, ভুলে থাক মায়।
৩ পরচিতান। মা বলে করিস্ না, মা, মনেতে,
এ দুঃখ বলি গো, মা, কায়।
৩ ফুকা। বালিকা কালিকায়, না হেরে, মা, নয়নে,
গেছে অশ্রুজলে দিন, ওমা, হর-অঙ্গনে।
৩ মেলতা। আমি একে অবলা, তাতে গো অচলা
শক্তিহীন শক্তিতত্ত্বে, ঈশানী। —ঐ

২২

১ চিতান। আনন্দে মগনা, শিখরী অঙ্গনা, আনন্দময়ী পাইয়ে।
১ পরচিতান। করুণায় সম্ভাষেণ রাণী, গৌরীর শ্রীমুখ চাহিয়ে।

১ ফুকা। শঙ্করী, শুভঙ্করি, আয় মা কোলে করি আয়,
শ্রীমুখমণ্ডলে, একবার মা বলে,
ডাক্, মা, উমা গো আমায়।

১ মেলতা। তোমা বিহনে, তারিণি, যেন মণিহারা ফণী
হয়েছিলাম মা, মা, মা গো।
সে দুঃখ ঘুচিল আজি হর-অঙ্গনা।

মহড়া। কও মা, কেমন ছিলে শিবালয়ে, শিবানী, ইন্দুবদনা।
শুনি লোক মুখে শিব, বিহীন-বৈভব,
ফণী সব নাকি ভূষণ তার,
ছি-ছি সেই হরের করে, দিয়াছি, মা, তোরে,
কত দুঃখ সহ্য কর, ত্রিনয়না।

খাদ। আমি সহজে অবলা, তায়, মা, অচলা,
তত্ত্ব করিতে পারি না।

২ ফুকা। বলি, মা, গিরিরাজে, দেখে এস গো উমায়;
নারী পেয়ে ছলে, সে আমায় বলে,
দেখে এলাম অন্নদায়।

২ মেলতা। কিন্তু লোকের মুখে শুনি দীন অতি দাক্ষায়ণী, ভবভাবিনী
মা মাগো, এসব দুঃখ, মা, মেয়ের প্রাণে সহে না। —ঐ

২৩

ধন্য ভাগ্যবতী, কাঁদ সতী,
তোমার মত যেন কাঁদে সর্বজনা॥
যোগী ঋষি যতী, কাঁদে দিবারাতি,
তোমার মত বল পেয়েছে ক'জনা॥
অধরা নাম তার, খ্যাত চরাচরে,
যারে ধরা দেয় সেই ধরতে পারে,
পঙ্গু হলেও গিরি লঙ্ঘিবারে পারে,
যারে দয়া করে কি তার ও ভাবনা॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, গেল কতবার,
আমরা রাণী আছি বরাবর,

আসে যায় কুন্তী হয় যুগান্তর,
সকল যুগের কথা আছে মোর জানা।
ভক্তি তোরা গিয়ে মায়াতে থাকিলে,
হাজারো কাঁদিলে দেখা নাহি মিলে,
মূলাধারে মিলে, আছে বট দলে,
দিব্য চক্ষু মিলে দেখনা দেখনা ॥
বুঝালে বুঝনা এ যে বড় দায়,
সময়েতে স্বপ্ন সত্য মিথ্যা হয়,
বল দেখি স্বপ্ন দেখলে কোন সময়ে
সত্য মিথ্যা তোমার সকল যাবে জানা।
পিতা হতে মাতার স্নেহ বেশী হল,
এই কথা রাণী বারে বারে বল,
পুত্রশোকে দশরথ মরেছিল,
মাতা বেঁচেছিল (তার) প্রাণ তো গেল না ॥
কৃষ্ণ পদ-চিহ্ন ধরে ফণিগণ
সেই পুণ্যে শিবের মস্তক ভূষণ,
সর্বত্যাগী শিব, বলদ বাহন নিজে
ত্যাগী না হইলে মাকে তো মিলে না ॥ —মুর্শিদাবাদ

২৪

অরূপ স্বরূপ সতী, ধরে কত মূর্তি
কার শক্তি আছে করিতে বর্ণনা ॥
বিনা ঐশ্বর্যে না পারে ধরিতে,
বাঁধিলে ভক্তিতে পালাতে পারে না ॥
কন্যা রূপে পেয়ে আনন্দে উতলা,
দান করে দিলে নিয়ে গেল ভোলা,
কে বুঝিতে পারে লীলাময়ীর লীলা
কত রূপে মাতা করে গো ছলনা ॥

সব কথা থাক, শুন এক মনে,
চণ্ডী পাঠ করাও এনে ভট্টগণে,
বেদ পাঠ করুক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে,
আসিবে আপনি আনিতে হবে না ॥
কভু মিলে কভু নাহি মিলে ধ্যানে,
অধরা নাম তার দিল ভক্তগণে,
অনন্ত নাম তার, কেবা অন্ত জানে
যা কিছু বলিলাম আছে হে জানা ॥
এক বার গেলে বৃদ্ধ বাতুল বলে,
এখন দেখছি তুমি ছুকরি সেজে এলে,
এ সব ভাষা তুমি কোথা বা শিখিলে
উত্তম অধম তোমার যাচ্ছে নাহি জানা ॥
পতি ভক্তি যার নাহি হে অন্তরে
তার স্বপ্ন মিথ্যা শাস্ত্র অনুসারে,
যাই নাহি রাণী অদিতির দোরে,
অস্বতির মধ্যে তাহারও গণনা ॥
দাস্য ভ্রমর-ভক্ত মায়ের মত আছে
পাদ-পদ্ম ফুল অন্বেষণ করিছে,
সুধা নিঃসরিছে পান করিতেছে,
বাৎসল্যেতে রাণী অনেক যাতনা ॥ —ঐ

২৫

তব দুঃখে দুঃখী, সুখে হই সুখী, পুরুষেতে কি আর
জানহে ছলনা ॥
তুমি আর আমি মরমের মরমী—
মরমেতে আছে মরম বেদনা ॥
পুরুষ হতে নারীর মায়া বেশী হলো,
কুন্তী দেবী তবে কি কর্ম করিল ;

সূর্যপুত্র কর্ণে গর্ভে ধরেছিল,
প্রসবেতে তারে জলে ফেলে দিলো
মায়া তো তার হলো না হলো না ॥
মহামায়ার মায়া কে বুঝিতে পারে
মনে কর আসি ধরেছি উদরে,
উমাই তো তোমায় আছে, রাণী, ধরে ;
উমা সরে গেলে কেউতো ছোবে না ॥
স্বপ্ন দেখে লোক বায়ুর কারণে,
সে সব বিষয় চিন্তা করে মনে মনে,
গৃহদাহ কোথাও হতেছে আগুনে,
বিনা মেঘে কোথাও পড়িছে ঝঞ্ঝনা ॥
অকুশল চিন্তা কর তুমি মিছে,
হৃদয়-চন্দ্রিমা কুশলেতে আছে,
আসিবে আসিবে হৃদয়েতে আছে,
মোদের প্রতি উমার অসীম করুণা ॥

—ঐ

২৬

কল্পতরু উমা, হৃদয়-চন্দিমা, এসে বলবে মা
বাৎসল্য-রূপিণী ॥
আগামী মাসেতে, সপ্তমী তিথিতে,
পাইবে দেখিতে হৃদয়-চিন্তামণি ॥
গিরিবাসী যত শুন সর্বজন।
সকলেতে কর মঙ্গল কামনা ;
বাদ্য করে বাজাও বিবিধ বাজনা ;
শঙ্খ ঘণ্টা আর ঢাক ঢোল সানি ;
কদলির বৃক্ষ রোপ সারি সারি,
পুর্ণ কুম্ভ আর শাখা তদুপরি
আনিবারে যেন, যেও অগ্রসরি
মায়ের সঙ্গে কত আসিবে জননী ॥

এহেন ভাব যার আছে হে অন্তরে
সেই জনা উমা ধরিবারে পারে,
নইলে কি উমা আসে তার উদরে ;
ধন্য ধরাধামে তুমি তার জননী ॥
তোমার যেমন, আমার তেমন
হৃদয়তে জাগে দিবস রজনী,
যাই কৈলাস পুরে আনিব শিবানী
সব জালা যাবে দেখে বদনখানি ॥
রাজা রাণী মোদের দ্বন্দ্ব মিটে গেছে,
আসিয়াছে উমা, মা বলে ডাকিছে ॥
মৃদু হাসি ওষ্ঠে অমিয় ঝরিছে
পান করি মোরা এস হে রাণী ॥ —ঐ

২৭

রাণীর উক্তি

তিথি অনুসারে বারি পূর্ণ করে
বাহ্য ব্যবহারে, মঙ্গল আচরি ॥
শুভাশুভের ভার সকলই হে তার—
আমরা কিহে তার, শুভ করতে পারি ॥
ভাগ্যবান রাজা, সর্বগুণে গুণি
তব ভাগ্যে আমি, উমার জননী,
আসছে উমা কথা তব মুখে শুনি,
আনন্দে বিভোর আপনা পাসরি ॥
কদলির বৃক্ষ, রোপ সারি সারি
প্রতি ঘরে কুম্ভে পূর্ণ করো বারি,
চন্দনের ছড়া দেহ ত্বরা করি ॥
কর চণ্ডী পাঠ, ব্রাহ্মণগণে আনি
শুদ্ধ চিত্তে রাজা, কর বেদধ্বনি ।
চণ্ডী শুনে চণ্ডী আসিবে আপনি
বসে আছি আমি হয়ে ব্রতচারী ॥

বাজাও বাজনা নাচুক অপ্‌সরী
সর্বানন্দে নন্দ হউক গিরি পুরী
জন্মে জন্মে আমি এই আশা করি
কৃপা দৃষ্টি যেন করিস, মা শঙ্করী ॥ —ঐ

২৮

রাণীর উক্তি আনিব আসিবে, এনে দেখাইবে এইভাবে রাজন—
বহুদিন গেল।
ষষ্ঠী আর সপ্তমী ছাড়িলে না তুমি,
নিঠুর তোমার মত না দেখি না হলো ॥
দুকুল পাথার, এ'ভব নদীতে
বাৎসল্যের নৌকায়, হবে পারে যেতে,
ডুবায়ে দিতেছ ঐশ্বর্য খোঁচাতে
হাবু ডুবু কেন খাবে না হে বলো ॥
আহারেতে রস, রস হতে রক্ত
রক্ত ত্রিভাগ হয়ে তৈল, পিত্ত, ঘৃত,
উপরের তৈল সতই কর ধৌত
ভিতরের তৈল ভিতরেই থাকিলো ॥
রাজশ্বরী নাম, আগে থেকে ধরে
দশ মহাবিদ্যা হলো তার পরে
কে দিয়েছে নাম পেলে কেমন করে
ভাল করে রাজন্ বুঝাইয়া বলো ॥
আঠারো ভুজা মাতা, হইল কোনখানে
সে সব কথা কেন রাখিলে গোপনে,
বুঝাইয়া বলো ছেড়ে দিচ্ছ কেনে
তোমার আননে শুন্‌তে ইচ্ছা হলো ॥
রাজ বুদ্ধি তোমার এবার গেল জানা
সময় বুঝে কথা বলিতে জান না,
এনে দিবে সাড়ী, চিরুণী আর আয়না
কোন সময় কোন কথা লাগে ভালো ॥ —ঐ

২৯

ভাল মুখের ভাল কথা শুনতে ভাল,
আমার ভাল কই হলো না হলো না ॥
ভালবাসি যারে এনে দেখাও তারে,
স্বরূপ দেখাও মোরে পুরাও বাসনা ॥
পরক্ষেত্র হয়, থাকে শ্বশুর ঘরে
আপনি আসিবে চিন্তা করলে পরে,
সেইভাব ধরে এসেছি এ'পারে
সেভাব অন্তরে ভাবিতে হবে না ॥
বাহ্য ব্যবহারে বাৎসল্যের ভাবে
শিবে বুঝাইয়ে উমারে আনিবে,
পেয়েছ যে ভাবে, থাক সেইভাবে
অন্যভাবে আর যেওনা যেওনা ॥
অসুরের ভাব তুমি কি জান না,
আসা যাওয়া আর কতই যাতনা।
তার সাক্ষী দেখ যশোদা, পুতনা
কাঁচে আর কাঞ্চনে বাটা হয় কিনা ॥
তৈল বিনে মায়ের শিরে জটাধারী
অস্ত্র অভাবে, হন বাঘাম্বরী
অন্ন বিনে উমা ফল মুলাহারী
প্রতিগ্রহহারী হরের অঙ্গনা।
গৃহাভাবে মায়ের পর্বতে বসতি
রাজকন্যা হয়ে এতেক দুর্গতি,
ভাণ্ডর তোমার জামাই শ্মশানে বসতি,
ভূত প্রেতের খেলা ডম্বরু-বাজনা ॥ —ঐ

৩০

কারে বলি কথা, কে শুনিবে কথা
অযথা কেবল মরিহে ফুকুরে ॥

মরমের মরমী না হইলে স্বামী
মরম বেদনা জানিবে কি করে ॥
মাথা যদি কেউ ঠুকে হে পাষাণে,
ব্যথা হয় কোথায়, মাথায় না পাষাণে ?
যখন যেখানে যা আসিছে মনে
আসল কথা কেনে দিচ্ছ তুমি ছেড়ে ॥
যে ভাবের ভক্ত, পাবে সেই ভাবে—
এসব কথা বলা হয়ে গেল পূর্বে,
পার হয়ে পার, হতে কেন হবে
বলা কথা কেন, বল বারে বারে ॥
রাজা হলে রাণী হয় রাজেশ্বরী—
ভিক্ষা করে শিব উমাও ভিখারী
গিরিরাজ হল হিমালয় গিরি
রাজেশ্বরী উমা হল কেমন করে ॥
তৈল যদি তোমার তুচ্ছ জিনিষ হয়
ঘটে-পটে কেন সর্বাগ্রেতে দেয়—,
অভাবেতে তারা মাখে না হে গায়
ঢাকিলে ঢাকা যাবে কেমন করে ॥

—ঐ

৩১

তিথি অনুসারে ভাবিয়ে অন্তরে
হৃদয় চন্দ্রিমারে এনে দেখাইবে ॥
প্রাণ-পাখী উড়ে যাচ্ছে পিঞ্জর ছেড়ে
আনিয়ে উমারে কারে দেখাইবে
মূল রাস্তা ছেড়ে, অন্য রাস্তা ধরে,
পড়ে গেছ এখন বহু রাস্তার মোড়ে,
পাবে না হাতুড়ে বেড়াও ঘুরে ঘুরে
অকুল পাথারে হাবু ডুবু খাবে ॥

সুবাসিত তৈল, আমলা, হরিদ্রা
স্নান হয় না মায়ের এসব দ্রব্য ছাড়া,
সর্বৌষধি গুলে ভৃঙ্গারের ধারা
মন্ত্র বলে স্নান করাই তারে ॥
রাজেশ্বরী উমা সকলেতে জানে
কে দিয়েছে নাম পেয়েছে কোনখানে,
আঠারো ভূমা মাতা হইল কোন খানে
ছিন্নমস্তা নাম হইল কি ভাবে,
তুমিতো পাষাণ, আমি তো পাষাণী
ভাবের অভাব মোদের হবে না হে কেনি,
দশরথ রাজা জ্ঞানে মহাজ্ঞানী
পেয়েছিল তবু ছিল একভাবে ॥
অভয়া নাম বটে চরাচরে
অভয় দিয়েছিল রাবণ রাজারে,
অসময়ে মাতা তারে দিল ছেড়ে,
সেই ধারা রাজন—ধরেছো সেইভাবে ॥ —ঐ

৩৩

মেনকার প্রাণ ধন গিরিরাজ-নন্দিনী,
আদ্যাশক্তি ভগবতী, জগৎ-প্রসবিনী।
কৈলাস ছাড়িয়া মাতার মর্ত্যে আগমন।
মর্ত্যবাসী জীবগণের কল্যাণ কারণ।
এস মা এস মা দুর্গে, মঙ্গলদায়িনী
সন্তানের ত্রাণকর্তা জগৎ জননী ॥
বৎসরেক পরে যার শুভ আগমন
বিশ্ববাসী নরগণের আনন্দিত মন ॥
মর্ত্যবাসী নরগণ আছে সর্বক্ষণ।
আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে মগন ॥
জগৎ আনন্দময় সহাস প্রকৃতি,
বিশ্বমাঝে বিশ্ববাসীর বাড়ে হর্ষ অতি ॥

আনন্দ বাঁশীর স্বর—বাজে ঢাক ঢোল,
তালেতালে নৃত্য করে বালকের দল
বালবৃদ্ধ নরনারী সাজি নব সাজে।
আনন্দের ফোয়ারা সম সকলে বিরাজে,
বৈদিক মন্ত্রে স্তব-স্তুতি করি উচ্চারণ,
পুজক ঠাকুর করেন দেবীর পূজন ॥
পুজা অন্তে চণ্ডী পাঠ, চণ্ডীগুণ কীর্তন
শুনিলে শ্রোতার পাপ হইবে মোচন ॥ —ঐ

বাঁকুড়া জিলায় ভাদ্রমাসে ভাদু পুজা নামে যে লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেই উপলক্ষে ভাদু দেবীরও আগমনী গান শুনিতে পাওয়া যায়। উমা গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা, ভাদু কাশীপুর রাজের কন্যা বলিয়া কল্পনা করা হয়। উমা স্বামি-পুত্রবতী ও বিবাহান্তে পতিগৃহবাসিনী, কিন্তু ভাদু কুমারী-বয়সেই পিতৃগৃহে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাই ভাদু পুজা ভাদুর বাৎসরিক স্মৃতিপুজা; তথাপি অনেক ক্ষেত্রে পল্লীবাসীর পতিগৃহাগত কন্যা সন্তানের রূপও লাভ করিয়া থাকে।

৩৩

ভাদুর আগমনে।
কি আনন্দ হয় গো মোদের প্রাণে ॥
মোরা সাজি ভর্তি ফুল তুলেছি গো, যত সব সঙ্গিগণে ৷৷
মোরা সারা রাত কর্‌ব পূজা গো, ফুল দিব গো চরণে।
আন্‌ব সন্দেশ থালা থালা খাওয়াব ভাদুধনে ॥
ভাদুপুজা নাই যেথায় যে গো, কি কাজ তাদের জীবনে।
কাশীপুরের রাজার পূজা গো, সে পুজা করে প্রথমে ৷৷
সে মনের মত বর পেয়েছে যা ছিল তার মনে।
ভাদু, বলি তোমায়, চরণ তোমার দিবে আমার মরণে ৷৷

—বাঁকুড়া

আচার সঙ্গীত

যে সকল সঙ্গীত ধর্মীয় কোন আচারানুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বরূপ—তাহা ব্যতীত ইহার কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, তাহাই আচার (ritual) সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখিত হয়। কোন ঐন্দ্রজালিক (magic) ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া মন্ত্র বা incantation-এর আকারে ইহাদের উদ্ভব হয়, পরে ক্রমে তাহা সঙ্গীতের রূপ লাভ করে ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও লোক-সঙ্গীত যেমন ক্রম বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিয়া বিকাশ লাভ করে, ইহার পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। কারণ, ইহার একটি ধর্মীয় উদ্দেশ্য এবং সেই সূত্রেই অলৌকিকতার প্রতি লক্ষ্য থাকে বলিয়া ইহা ক্রম পরিবর্তনের ধারা স্বীকার করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ একটি অনমনীয় বা অপরিবর্তনীয় (rigid) রূপ লাভ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং ইহা সঙ্গীত নহে, ধর্মীয় মন্ত্র মাত্র, যথার্থ লোক-সঙ্গীত নহে। তবে লোক-সঙ্গীতের কোন কোন গুণ ইহার মধ্যে অনেক সময় প্রকাশ পায়। তথাপি এ কথা সাধারণভাবে স্বীকার করিতে হয় যে, আচার সঙ্গীতে সঙ্গীতের গুণই হোক কিংবা কাব্যের গুণই হোক, তাহা প্রায় কিছুই থাকে না।

প্রত্যেক আচার সঙ্গীতই এক একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত। সেইজন্য এখানে কোন্ সঙ্গীত কোন্ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত, তাহা উল্লেখ করা হইল।

ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে যে পূজা-মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করা হয়, সেই উপলক্ষে গীত একটি প্রাচীন সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাতে দেখা যাইবে যে, লোক-সঙ্গীতের ভাষা যেমন প্রাচীন যুগ হইতে নূতন যুগে উত্তীর্ণ হইয়া আধুনিকতায় পরিবর্তিত হইতে হইতে অগ্রসর হয়, আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত ইহার ভাষায় তেমন কোনই পরিবর্তন হয় নাই। মন্ত্রের ভাষা যেমন মন্ত্রের ঐন্দ্রজালিক শক্তি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অপরিবর্তিত রাখা হয়, তেমনই আচার সঙ্গীতের ভাষাও অপরিবর্তিত থাকে। তবে কোন কোন আচার সঙ্গীত যখন আচারের সম্পর্ক মুক্ত হইয়া যায়, তখনই কেবল ইহার মধ্যে ক্রম পরিবর্তনের ধারা প্রকাশ পায়।

১

দুয়ারী ছাড় দুয়ার সহিতে কোটাল।
তুহ্মা সব সঙ্গে দেখা শ্রীধর্মর দুয়ার ॥
সুনার পাটেতে বেসাতির বৈসএ হাট।
ভেটিব তো স্বরূপনারাণ ঘুচাহ কপাট।
সুনার কড়ি দিল দুয়ারির হাতে।
কপাট ঘুচাএ দিল চন্দ্র মহাশএ।
আনন্দে ভেটহ গিয়া পরভু নিরঞ্জনে।
সেই ত দুয়ারে বরত ঝি ফুলজল দিএ ॥
চন্দ্র কত কৈল পচ্ছিম দুয়ার।
দুয়ার ছাড় দুয়ারি সহিত কোটাল।
তুহ্মা পরশনে দেখিএ শ্রীধর্মের দুয়ার ॥
রূপাকর পাটএ বেসাতির বৈসএ হাট।
ভেটিব তো স্বরূপনারাণ ঘুচাহ কপাট।
রজতর কড়ি দিল দুয়ারির হাথে।
কপাট ঘুচাএ দিল হনুমন্ত মহাশএ ॥
সেই ত দুয়ারে বইসে ফুলজল দিএ।
হনুমান মুক্ত কইল লঙ্কার দুয়ারে ॥
দুয়ার ছাড় দুয়ারি সহিত কোটাল।
তুহ্মা দরশনে দেখা শ্রীধর্মর দুয়ার ॥
তামাকর পাটে বেসাতির বৈসএ হাট।
ভেটিব তো স্বরূপনারাণ ঘুচাহ কপাট ॥
তামাকর কড়ি দিল দুয়ারির হাথে।
কপাট ঘুচাএ দিল সুরজ মহাশএ ॥
আনন্দেত ভেটহ গিয়া পরভু নিরঞ্জনে।
সেই ত দুয়ারে বরত ঝি ফুলজল দিএ।
সুরযে মুকতি কৈল পুরব দুয়ারি।
দুয়ার ছাড় দুয়ারি সহিত কোটাল।
তুহ্মা দরশনে দেখা শ্রীধর্মর দুয়ার।

তামাকের পাটে বৈসএ বেসাতির হাট।
ভেটিব তো স্বরূপনারাণ ঘুচাহ কপাট ॥
তামাকের কড়ি দিল দুআরির হাথে।
কপাট ঘুচাএ দিল গড়ুর মহাশএ।
আনন্দেতে ভেটহ যাঞা পরভু নিরঞ্জনে।
সেই ত দুয়ারে বরত ঝি ফুলজল দিএ।
গরুড়েক মুকত কৈল গাজন দুয়ারে।
হীরকের পাটে বেসাতির বৈসে হাট।
ভেটিব জে স্বরূপনারাণ ঘুচাহ কপাট।
হীরকের কড়ি দিল দুআরির হাথে।
কপাট ঘুচাএ দিল উল্লূক মহাশএ ॥
আনন্দেও ভেটহ গিয়া পরভু নিরঞ্জনে।
সেই ত দুয়ারে বরত ঝি ফুলজল দিএ ॥
উল্লূক মুকত হইল বরত হৈল সায়।
শ্রীরামক শুনিতে হইল ভবনদী পার।
পরভু চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীযুত রামাই রচিল পাঁচালী সঙ্গীত। —শূন্যপুরাণ

চৈত্রমাসের গাজন উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে শিবমূর্তি গঠন করিবার সময় এই প্রকার গীত প্রচলিত আছে।

১

কোথা হইতে আইলেন গোঁসাই, কোথায় তোমার স্থিতি।
আহার নাই, পানি নাই, আস নিতি নিতি ॥
জল নাই স্থল নাই সকল শূণ্যাকার।
কর্পূরেতে ভর কর পবন আহার
শিবনাথ কি মহেশ। —মালদহ

২

না ছিল জলস্থল দেবের মণ্ডল।
কোনরূপে ছিল ধর্ম হয়ে শূন্যাকার।

কাঁকড়াকে পাঠালেন মৃত্তিকার তলে
কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা বিন্দু পরিমাণ।
বিন্দু পরিমাণ মধ্যে তিল পরিমাণ।
তিল পরিমাণ মধ্যে বেশ পরিমাণ॥
কুর্মের পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল সৃজন।
কহন ত গুরুগোঁসাই সরস্বতীর বরে।
পৃথিবীর জন্মকথা কহি সভার ভিতরে
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

৩

লালগিরি পর্বত দর্শন জোয়ার
তাহাতে জন্ম না হইল আমার॥
হাত মোর শুদ্ধ পা মোর শুদ্ধ
শুদ্ধ মোর পঞ্চ মুখের বাণী।
গা পুজিলাম আদ্যের ভবানী॥
আগম পুর্ববেদ দেহশুদ্ধ শিবদোয়ারে জানি
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

৪

উল্লূকে বলে গুরু এই যে কারণ,
গুরুর বচনে শুদ্ধ মন্দিরের চারিকোণ।
মন্দিরে বসিল গুরু দেবরাজ মন।
গুরুর বচনে শুদ্ধ মোর ভক্তগণ।
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

৫

কাল কামাখ্যার আজ্ঞা গড়ে দিল দা
আগে বসি ব্রহ্মা পাছে বসি বিষ্ণু মধ্যে বসি শিব।
শিব শিব স্মরণে আজ ব্যাতে পলো জীব।
ভোলানাথ বা শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

৬

স্বর্গের কপিলা মর্ত্যে নামিলা।
বিশ্বেশ্বর ব্যেত বাহনে চড়িলা॥
নরলোক তার বসে তারে গোথনে হয় পৃথিবী শুদ্ধ।
তাতে উজ্জে দধি-ঘৃত-ঘোল-দুগ্ধ।
কহন ত গুরু গোঁসাই সরস্বতীর বরে।
কপিলার জন্মকথা কহি সভার ভিতরে।
ভোলানাথ ইত্যাদি। —ঐ

৭

শুন শুন মহাদেব কি করিছ বসি
সমুদ্র মন্থন কৈল দেবগণে আসি।
ইন্দ্র নিল উচ্চৈশ্রবা লক্ষ্মী নিল নারায়ণ।
আর যত ছিল তাহা নিল দেবগণ॥
শেষে মহাদেব তুমি পোলে ফাঁকি।
ক্রোধে মহাদেব বলে আমি এখন করি কি।
ভোলানাথ ইত্যাদি। —ঐ

৮

জল বন্দ, স্থল বন্দ, বুড়াশিবের গম্ভীরা বন্দ—
আর বন্দ সরস্বতীর গান॥
বাসুয়া বাহনে শিব তারে চরণে প্রণাম।
দাতনাথ কি শিবনাথ মহেশ। —ঐ

চৈত্রমাসে শিবের গাজন উপলক্ষে গাজুনে ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসীদিগের শিব-প্রণামের সঙ্গীত—

১

জলময় সংসার চিন্তিত ভগবান।
কি মতে ছিলে, হে প্রভু, হইয়া শূন্যাকার।
কাঁকড়া সুতযোনি হেমের আকার।
কাঁকড়াকে করিল আজ্ঞা মৃত্তিকা আনিবার।

কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা হেম পরিমাণ।
সেই ডিম্ব হইল দুইখান।
কি মতে পৃথিবী সৃজল করিল ভগবান।
শিবনাথ কি মহেশ। —মালদহ

২

মাটি মাটি মাটি সৃজন করিল কে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনে মাটি সৃজন করিল যে।
সে কাল কামার বেটা গড়িয়া দিল দা।
আগা পাছা বুঝে তার মাথায় দিল ছ্যা।
আগে বসে ব্রহ্মা তার পাছে বসে বিষ্ণু তার মাঝে শিব
সেখানে শিবের দ্বাদশ থাকে সেখানে বস্নুক জীব।
শিবনাথ কি মহেশ। ঐ

৩

মাটি মাটি মাটি সৃজন করিল কে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ তিনে মাটি সৃজন করিল যে।
সে কালকুমার বলে গোঁসাই মনে পড়িল।
কালকুমার ব্যাটা ছিল দু'তিন ভাই
মাটি কাটিয়া তারা করিল ঠাঁই ঠাঁই।
মাটি কাটিয়া তারা চড়িয়ে দিল চাকে।
ঘট ধুব্‌চি ডঙ্কের পাতিল গড়াল আড়াই পাকে।
রবি শুকাইয়া দিল, ব্রহ্মা পোড়াইয়া দিল
ত্রিশকোটী দেবতা দিল বর।
ঘট ধুব্‌চির জন্মকথা বল্‌লাম সভার ভেতর।
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

৪

ধবল খাটে ধবল পাটে ধবল সিংহাসন
ধবল খাটে বসে আছেন ধর্ম নিরঞ্জন।

ধবল আকারে গোঁসাই ধবল নৈরাকার।
ধবল চরণে তাঁরে করিলেহ পার।
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

৫

উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ,
তোমাকে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ।
খোল, চন্দন কাঠের কপাট, দেয় দুধ গঙ্গাজল।
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

৬

আমরা আইলাম হরষে দরশে।
দরশন দাও গোঁসাই স্থবর্ণের দৃষ্টে।
আমরা আউলের ভক্ত,
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

৭

সোনারি তারে সোনারি বার সোনারি গা জলে।
শোভে মুক্তা প্রবাল শিবের ভক্ত যে বাণরাজা আছে।
তার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

৮

পবনের পুত্র বীর হনুমান।
আনিয়া যোগাল পাথর চারিখান।
চাঁচিয়া ছিলিয়া গড়াল শ্রীকান্ত
তাতে ঢালিল কাঁচ ঢাল।
শ্বেত চামরে ছাহিল চণ্ডীমণ্ডবের চারি চাল।
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

৯

তাঁবারি চট্‌পটি স্থবর্ণের নাল।
শিবের দোয়ারে দ্বারী নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল।
ঘুচায় ঘুচায় নন্দী চন্দন কেয়ায়।
দ্বারশুদ্ধ বালভক্ত কত লৈব নাম।
কাশীশ্বর শিবের দ্বার প্রবেশ করিল যত ভক্তগণ
আমরা আউলের ভক্ত বিষ্ণুবাই গম্ভীরা শুদ্ধ—
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

১০

ছয় মাসের খরচ দেব অঞ্চলে বাঁধিল।
ঝয় ঝঙ্কার বাটে দেব বনে প্রবেশিল।
চাকণ চিকণ গাছ তার তলা হতে পাত।
নয় হয় এই হয় করলীর গাছ।
আগাগোড়া কাটি তার মদ্ধখান নিলে।
চাঁচিয়া ছিলিয়া কাঠি নির্মাণ করিলে।
বাম কাঠি সরস্বতী দক্ষিণ কাঠি উর্দ্ধ।
শিবদুর্গার বরে এই গম্ভীরার ঢ্যাক্যার কাঠি হাতে শুদ্ধ
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

১১

লঙ্কা গেল হনুমান খায় আম্রফল।
মর্ত্যে ফেলিল আঁটি, তাইতে হইল বৃক্ষ অমরাবতী।
আগে বাহ্রাইয়া অঙ্কুর, তার পাছে বাহ্রায় গাছ।
ছয় ছয় মাসে বাড়ে দ্বাদশ হাত।
আগাল গোড়া কাটি তারে মধ্যখান নিলে।
চাঁচিয়া ছিলিয়া ঢাক নির্মাণ করিলে।
কামার গড়িয়া দিলো লোহার কড়ি।
মুচিরাম চড়াইয়া দিল কপিলার ছড়ি।

শিব শিব বলিয়া তাকে দিল ঘা।
মড়া চামড়া কাড়িলেক বিয়াল্লিশ রা।
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

১২

শুদ্ধ সভায় বসে গুরু গুরুর গলায় শতেশ্বরীর হার।
গুরু বাক্যে শুদ্ধ করি আগ্নের ভাণ্ডার।
কৃপাকরি গুরু মোরে শিখালেন বচন।
গুরু-বাক্যে শুদ্ধ করি চণ্ডীমণ্ডবের চারিকোণ।
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

১৩

শুদ্ধ আমার মাতাপিতা শুদ্ধ বসুমতী।
যা হইতে হইল আমার উৎপত্তি॥
দেবতার বল হইল আমার
আসন শুদ্ধ করি গেল ধর্ম গুরু মহাশয়।
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

১৪

জল বন্দ, স্থল বন্দ, বন্দ শিবের কুঁড়্যা।
আট হাত মৃত্তিকা বন্দ, চন্দ্র সূর্য জুড়্যা।
'কাউসেন দত্তের ব্যাটা' নয়ন সেন দত্ত,
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত।
তাহার চরণে আমার দণ্ডবৎ।
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

১৫

বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিলেন কার্পাস।
কার্পাস বুনিয়া শিব গ্যালা কুচনীপাড়া।
কুচনীপাড়া হইতে দিয়ে এলো সাড়া।
কার্পাস তুলিয়া দিলে গঙ্গার ঠাঁই।
গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল তাঁত।

হর সমুদ্র হরের জল ক্ষীর সমুদ্রের পানি।
উত্তম ধুইয়া দিল নিতাই ধুবিনী।
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

১৬

স্বর্গে গেল জগন্নাথ হরে আনিল পারিজাত।
রাঙ্গা পারিজাত।
ডানঠির শেষ কৌতুকের গোঁসাই হাতে নিল বেত।
স্বর্গের বেত মর্ত্যে নামিল।
শ্রদ্ধা করিয়া লক্ষ্মী ভূমেতে আরজিল।
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

১৭

জল বন্দ, স্থল বন্দ, আন্তের গম্ভীরা বন্দ।
ডাহিনে ডঙ্গর বন্দ বামে বীর হনুমান।
সিংহাসনে ভগবতী আছেন তাঁর চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
শিবনাথ কি মহেশ। —ঐ

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কাতিকী অমাবস্যার গো-পূজার নাম বাদ্‌না পরব। সেই উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে অহীরা গানও বলা হয়। এখানে বাদ্‌না পরবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কয়েকটি গান শুনিতে পাওয়া যাইবে।

১

ভালায় অহিরে,
কুলি কুলি যাতে ছিলি গাইও জাগাওরে॥
বাবু হু, আছ তো অমাবস্যা রাতি
জাগরণের প্রতিপদ দেবে মা লোচন পাঁচপুত্র দশধেনু গায়া।
—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

ভালায় অহিরে, কেহ তো লেগে ভালায়।
ঔপরে ঔড়াইরে বাবু তো বুঝে ভালায় রিঝেই বুঝাই। —ঐ

৩

আশ্বিন যাইতে কার্তিক পড়িতে কাঁদে তো শিরধনু গাই।
আর না কাইন্দনা গুলিনে দিবে ধান ॥ —ঐ

এখানে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া কয়েকটি ধাঁধা ও তাহাদের উত্তর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। আচার সঙ্গীতে অনেক সময় এই প্রকার ধাঁধা (riddle) শুনিতে পাওয়া যায়। আদিবাসীর অন্ত্যেষ্টি-আচারের সঙ্গীতে এই প্রকার বহু ধাঁধা প্রচলিত আছে; তাহাকে ইংরেজিতে Death Riddle বলা হইয়াছে।

৪

প্রশ্ন : কে হুতো তোরে আইরা
গুরুর গারারোহ্ বাবুহো।
কে হুতো চরে ভালা চমকি চমকি হো
কে হুতো চরে ভালা নিরবধি গো হো।

উত্তর : গরু চরে ভালা গারার গুরো হো,
হরিণ চরে ভালা চমকি চমকি হো,
বাঘতো চরে নিরবধিরে।

প্রশ্ন : ভালো ওহিরে এতদিন যে চরাইলাম গুলিন
রাতেরে ভিতেরে বাবু হো
কভু নাতো দিলে এক মুঠা মুড়িরে।
এমন মারন মারবো গুলিন
পারারোকা ঠেঙ্গা হো
চটরে চটরে মারব হেঁসাল সালরে।

উত্তর : ভালা ওহিরে
এতদিন যে চরালি বাগাল
রাতেরে ভিতেরে বাবু হো
কভু নাকো এক নূনা পাতারো
এমন মারন মারবো বাগাল
চাটুকা পাসারে
ঘসরে ঘসরে যাবি বাথান টারুরে। —ঐ

গাভীমাত্রকেই কপিলা মনে করিয়া এখানে তাহার জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। ঈশ্বর হীরা বাগাল (গোরক্ষক ও রাখাল) ও কপিলা গাভীকে সৃষ্টি করিলেন, এই কথা দিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

১

ঈশ্বর শিরি যে ও হীরা বাগাল।
ঈশ্বর শিরি যে কপিল গাই॥
চরাই বাজাই ওহিরা ডহরে ডহরাই।
তখন যে বাঘা ছেকল বাট॥
তখন যে ওইর‍্যা বাগাল জানিতে পাইল।
তখন যে ওইর‍্যা বাগাল গাছে উঠিল॥
তখন যে গাছে বলিতে লাগিছে।
নামো রে নামো ওইর‍্যা ভুঁয়ে যে নামো॥
তোর যে ডর ডর ওইর‍্যা নাহি সইতে পারি।
তখন যে ওইর‍্যা বাগাল বলিতে লাগিল॥
চলি গেল আপনার বাড়ী॥
তখন যে কপিলা গাই হাঁক পাড়িছে।
ঘুর রে ঘুর বাগাল॥
ঘুরিয়ে আস বাঘে ত' বধিবে প্রাণ।
তখন যে কপিলা গাই বাঘকে বলে॥
ছাড় রে ছাড়, বাগাল, বাট ছাড়ি দিও।
তখন বাঘা ভোলা কপিলাকে বলিতে লাগিছে—
নেহি ছাড়িব গেয়া আমি যে আজ গো।
বার বাসর টগারে আজ পেয়েছি গেয়া॥
খাব তো ইচ্ছা রে পুরণ।
তখন যে কপিলা গাই কাঁদিতে লাগিল॥
শুন যে শুন বাঘা আমারই বচন।
তোর যে সঙ্গে কথা সত্যা বারিলুম॥
বাছুরকে দুধ দিয়া আসি।

ঘরে যে আছে, বাঘা, আড়াই দিনের বাছুরী।
তাকে আমি দুধ দিয়ে আসি॥
তোর যে সঙ্গে বাঘা ভোলা বাট সত্যা করিলাম।
বাছুরকে দুধ দিতে আসি॥
তখন যে বাঘা ভলা বাট ছাড়িল।
তখন যে কপিলা গাই চলিতে লাগিল॥
কাঁদিতে কাঁদিতে দিয়া চলিতে লাগিল।
এক কোশো গেল গিয়া দুই কোশো গেল॥
তিনি কোশে আপনারো বাড়ী॥
তখন যে সেই আড়াই দিনের বাছুর দেখিতে পাইল।
এত যে দিন মা হাসি খেলি আসে।
আজত আসিছে মা কাঁদি কাঁদি॥
কি আজ দুখে, মা গো, কাঁদি কাঁদি আসি।
আজত দিও শুনায়ে॥
লিও যে লিও, বাছা, দুধ খায়ি লিও।
বাঘেরো সঙ্গে, বাছা, দুধ খায়ি লিও।
জনম জনম, মা, ফুরায়ে যাবে॥
নেহি যে খাব, মা গো, তুয়া যে দুধ গো।
আমি যাব মহাদেবের কাছ॥
ওতি যে বেগে বলদ চলিতে লাগে।
চলি গেল মহাদেবের কাছে॥
কি আজ দুখে বলদ তুমি আসে।
আমাকে দিও তো শুনায়ে॥
দিও যে দিও মহাদেব আমাকে ডর যে।
বাঘারো সঙ্গে মহাদেব সত্যা করেছে।
খাবে তো ইচ্ছা রে পুরণ॥
দিও যে দিও, মহাদেব, আমাকে দিও ডর।
জনম জনম পুঁজি ফুরায়ে যাবেক॥
তখন যে মহাদেব বলিতে লাগিল।

কোন যে ভর বল তুমি যে নিবে ভাই।
সেই ভর দিব আমি॥
দিহ যে দিহ মহাদেব অমৃত কুণ্ডের ভর।
বাহে ত দিও সোনার শিং॥
দাহিনেতে দিবে মহাদেব ছড়া বাঁধি।
বাঘা মারে খাই খেড়ো ঘাঁস॥
ওতি যে বেগে বলদ চলি আল আপনারো বাড়ী॥
তখন যে কপিলা গাই হাম্বা হাম্বা করে,
এস বাছা দুধ খায়ি লও।
নেহি যে খাব, মাগো, তোরই যে দুধ গো;
আমি যাব সত্যার পালন।
ওতি যে বেগে বলদ চলিতে লাগিল।
চলি গেল শিরি বিন্দাবন॥
শিরি বিন্দাবনে বলদ তিলা ধুনায়ে,
আর তো হুকার।
তখন যে বাগাল ভেলা শুনিতে পাল।
কোপিলা ত দুষমণ পাধাল॥
তখন যে বাগাল বাঘকে বলায়ে।
দেখ, বাঘা, দুষমণ পাধায়ে॥
তখন যে বাঘে বাঘানকে বলে।
আমারও লাগে নাহি কেহ বীর॥
হুকার মারি চলি আল সেই বলদের কাছ।
সাতো যে দিন যুদ্ধ নাগায়েল॥
সাতো যে দিন সাতো যে রাত,
যুদ্ধ নাগায়ে বাঘাকে মারয়ে দিল।
তখন যে বলদ চালিয়ে আল চলি॥
আল আপনার বাড়ী।
এবার ও যাবে, মা গো, নিয়ন্ত ভয়ে, বাঘারে মারে॥

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

গরু জাগানোর গান

১

ভাই রে, জাগো মা লক্ষ্মী, জাগো মা ভগবতী,
আর জাগে অমাবস্যার রাতি—
আর জাগে গো প্রতিপদ দেবমায়িনী,
পাঁচপুতার দশধেনুর গাই।
ভাই রে, এক আশিসে, বাবা, ধনে-বংশে বাড়বে,
আর আশিসে দশভাই—
তোরই জন্যে, বাবা, অতি না ভাগ্য রে,
জনমে জনমে দুধে ভাতে রই ॥ —মেদিনীপুর

২

কোনহ ফুলে মালীন্ অড়ন পিন্দন রে—
কোনহ ফুলের ভক্ষণ।
কোনহ ফুলে মালীন্ খোঁপয়া চিকণ রে—
কোনহ ফুলে রাখিল সংসার।
কাপাস ফুলে মালীন্ অড়ন পিন্দন রে—
ধানের ফুলের ভক্ষণ।
তিল-সরিষার ফুলে খোঁপয়া চিক্কণ রে—
সিন্দুরফুলে রাখিল সংসার। —ঐ

বাদ্না উৎসবে আনুষ্ঠানিক ভাবে গরু নাচানোর গান—

ভাই রে, কোনহি ছুলয়ে, কোনহি চাঁচয়ে,
কোনহি কাঠে করি ঠরকা,
আর অরুণ বনে ফিরি তরুণ লতা গো—
নবঘনে বাঁধিব জোত।
সেই না জোতে বাঁধিব কপিলাকা পুতে—
রাখি দেব বাগালেরি নাম। —ঐ

৩

আমি যে যাইতেছিলি কুলি বল, কুলিয়ে বাবু হো—।
রাঙ্গি গাই আনল ঘুরাইয়ে ॥

না কাঁন্দ, না কাঁদ ও রাঙ্গি গাইয়া,
সরোগে পাতোলে ধূলা উড়রে। —পুরুলিয়া

৪

কিয়া বরণ কাড়া তোরি দুই শিং রে
কিয়া বরণ দুই কান,
মাল খুঁটায় ঝুলত, ওরে ভাই, কাড়োয়া,
দুধা খায়েঁ হলি বলবান। —ঐ

শীতলা পুজায় এই প্রকার বন্দনা গান শুনিতে পাওয়া যায়। পুজার বন্দনা গানও পুজানুষ্ঠানেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; সুতরাং তাহাও আচার-সঙ্গীত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়—

১

বন্দনা বন্দনা মুই মা—
প্রথমে বন্দনা করি, জয় মা শীতলা,
বন্দনা বন্দনা মুই মা—।
তারপরে বন্দনা করি শীতলা-যুগিনী,
তারপরে বন্দনা করি বসন্ত কুঁয়ারী,
তারপরে বন্দনা করি মিলমিলা বুড়ী,
তারপরে বন্দনা করি ওলাউঠা বুড়ী,
তারপরে বন্দনা করি ছাঁদন-বাঁদন,
তারপরে বন্দনা করি বুড়ারে বড়াম,
তারপরে বন্দনা করি বেড়াজাল কন্যা,
দক্ষিণেতে বন্দি আমি জয় জগন্নাথ,
পশ্চিমেতে বন্দি আমি জয় মা মঙ্গলা,
ষোলঘড়ী ষোলবেশ গলায় মুণ্ডমালা,
উত্তরেতে বন্দি আমি জয় কালিঘাটা,
পুরবেতে বন্দি আমি জয় সূর্য চন্দ,
ভদ্রেশ্বরে বন্দি আমি জয় মা ভদ্রাণী,
নারায়ণ গড়ে বন্দি আমি জয় মা ব্রহ্মাণী।
বন্দনা বন্দনা মুই মা—। —মেদিনীপুর

২

গণেশ-বন্দনা :

কিবা বন্দিতে পারি অজ্ঞান হে,
নম নম গণেশ বন্দি।
সর্ব দেবতা অগ্রে পূজা উত তুম্বর,
কৃপা করি আসবর হে গণেশ্বর,
মু অতি মুর্খজন, কি বন্দিবা তব চরণ,
ভবিস্থ পদ্মনাথ যতন যতন যতন হে,
নম নম গণেশ বন্দি।
চারি বাহু শোভা দিয়া স্কন্ধে পৈতা,
অঙ্কুকুঞ্জে অঙ্কুকু শোভা দিশে দ্বাদশ আঁখি।
ঠুর বদন তোর কি দিবা পাঠান্তর,
অঙ্গে দিশে তুরে মুখ দিখয়ে, তুর যতন যতন হে,
নম নম গণেশ বন্দি।
মস্তকে চুড়া তুর ষড়নামের আকার।
ভণি পদ্মনাথ হে নম নম গণেশ বন্দি। —ঐ

পশ্চিম সীমান্ত-বাংলার করম পূজার বিভিন্ন আচারে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত হইল—

১

আলি গেলিরে চাঁপার কলি শিরেতে কলি,
মোকে লেগি রাখো আমি খাইব।
পত্রি ভাসাতে যাই বলে লেগি রাখো।
নদী নেকবালা আমি উঠব।
মোর মাও বাপ ঘরে করম গড়োবে,
একাদশী দিনে করম গড়োবে।
কহনি শুনব কানে মোকে লেগি রাখো॥
অধম শয়নাল সঙ্গে নাচি ধরাবো।
তালে তালে পাও ফান্দাব রে।

নাচিব যেমন মেঘের বিজলী।
খেলিব যেমন মেঘের বিজলী।
ডালে ধরি পাঁচ পুত্র মাগব।
অধম শয়নাল সঙ্গে নাচি ধরাবো।
মোকে লেগি রাখো॥

—পচাপানি (মেদিনীপুর)

২

অযোধ্যা নগরে করম ভেলরাজা
চল সখি দেখতে যাব।
মালিনী উপাডালা তেলিনী উপাসালা
রাজা এরে লিও রাণী একা নাম।
নারায়ণ সিংয়ে বলে, ঝুমুরির নায়ে বলে,
রাজা এবে লিও রাণী একা নাম॥
হে রাম, হে সখি, এ গামিন্দি।
কিনো লামাই গীত যে।
হনুয়া বলে, ঝুমুরির নায়ে বলে,
কিনো লামাই গীত যে॥ —ঐ

ষষ্ঠী ব্রতের আচার পালন উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এই প্রকার। শোলার সঙ্গে কলা বউ-এর বিবাহ ও তাহার সন্তান কামনা করিয়া এয়ো স্ত্রীরা গায়—

১

আগাহাটের বামনা রে, পাছা হাটের বামনা।
কলাতি পুছেছে—ও বামনা ঠাকুর রে।
কি করিবেন আগ্‌বল হাটের ফলারে।
তোর মাথা হইয়াছে পাকিয়া শণ,
কোমর হইয়াছে ধনুক বাণ।
এখন কি তোমাকক সাজে ছাওয়ালের বাপ রে॥ —দিনাজপুর

কোন কোন পর্ব উপলক্ষে এই প্রকার বন্দনা গান শুনিতে পাওয়া যায়—

পশ্চিমে বন্দিয়া গামু, ক্ষীর নদী সাগর—
যার জলে ভাইস্যা ফিরে সায় সদাগর।
উড়িষ্যা বন্দিয়া গামু ঠাকুর জগন্নাথ,
চণ্ডালে আনিয়া দিলে ব্রাহ্মণে খায় ভাত।
শূদ্রে আনিয়া অন্ন থুইল বামন বাড়ী,
লুইটা লুইটা খায় পরসাদ বলে, হরি হরি।
পুবেতে বন্দিয়া গামু যথা, উদয় ভানু,
দশরথের ঘরে জন্মিল রামকানু।
পুবে উদয় ভানুরে পশ্চিমে যায় লীন,
চাঁদ সুরুজ দুইটি ভাই কভু নহে ভিন্।
দক্ষিণে বন্দিয়া গামু মাধবের চরণ,
যথায় হৈছেরে ভাই পর্বতের জনম।
স্বর্গেতে আছিল ভাঙ্ আন্‌ল গোরখ নাথে,
ভাঙ্গে জন্ম কার্তিক মাসে সরিষা খেতের মাঝে।
ভাঙ্গ জালাইয়ারে মাথায় করল মাথি,
জল বরিষণ কালেরে তুইলা ছাতি।
ডাল পাল মেলিল—ভাঙ্গের চিরল চিরল পাত,
প্রথম বৈশাখ মাসে ভাঙ্গে দিলাম হাত।
কাচি দিয়া কাইটা ভাঙ্গ রোদে দিল শুকা,
লাঠির বাড়িতে অঙ্গ হৈল গুড়া গুড়া,
বার কুড়ি টেকি শিবের তের কুড়ি কুলা,
রাত পোহাইলে মর ভাঙ্গেরা জুইটা ভাঙ্গে গুড়া॥
ভাঙ্গ বানাইয়া রে ভাঙ্গে দিল দই,
ভাঙ্গ বানাইয়া দে লো, গোয়ালিনী সই।
পুলাপানে খাইয়া ভাঙ্গ টালুমালু চায়,
মায় বলে, অভাগীর পুত যমে লইয়া যায়।
হাইলা ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ পাকে পাকে মই,
জাইলা ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ ডুবাইয়া ধরে কই। —মৈমনসিংহ

আঞ্চলিক গীতি

বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশিষ্ট প্রকৃতির যে সকল লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে তাহাদিগকেই আঞ্চলিক গীতি (regional song) বলা হয়। সমগ্র বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চল ব্যাপিয়াই লোক-সঙ্গীতের দিক দিয়া এক অখণ্ড ঐক্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যেও কতকগুলি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তাহা সর্বত্র এক নহে। সঙ্গীতের বিষয়-বস্তু ও প্রয়োগ-রীতি উভয় ক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখা যায়। সঙ্গীতের দিক দিয়া সমগ্র বাংলা দেশকে চারিটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায় ; যথা রাঢ়, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ। নিম্নবঙ্গে লোক-বসতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতেই সেখানে লোক-বসতি বিস্তার লাভ করিয়াছে বলিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যই প্রধানতঃ সেখানে বর্তমান রহিয়াছে। তবে একথাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না যে নিম্নবঙ্গে অরণ্য অঞ্চল অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া এক শ্রেণীর কাহিনী-গীতি (narrative song) বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তবে প্রয়োগরীতির দিক হইতে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের লোক-গীতি অপেক্ষা তাহাদের বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। বাংলার চতুঃসীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির মধ্যেই প্রধানতঃ আঞ্চলিক সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়। (বাংলার আঞ্চলিক গীতির সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা ও উদ্ধৃতির জন্য 'বাংলার লোক-সাহিত্য' ৩য় খণ্ড, ১৯৬৫, পৃ. ৫৬-৩৫৯ দ্রষ্টব্য) আঞ্চলিক সঙ্গীতের মধ্যে রাঢ়ের পটুয়ার গান, ভাদু, টুসু, জাওয়া, ঝুমুর, সাথী ; পশ্চিম বাংলার আলকাপ, বোলান, পাঁচালী, তর্জা ; উত্তর বাংলার গম্ভীরা, গমীরা, ভাওয়াইয়া, চটকা, জাগ ; পূর্ববাংলার ভাটিয়ালী, ঘাটু, জারি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যথাস্থানে ইহাদের প্রত্যেকটিরই বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে।

আড়খেমটা

প্রধানতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে উত্তর ভারত হইতে আগত বাংলা গানের একটি তালের নাম খেম্‌টা (পরে দ্রষ্টব্য)। ইহার অন্তর্ভুক্ত আরও দুইটি তাল আছে—একটির নাম আড়খেমটা, আর একটির নাম গড় খেম্‌টা। খেম্‌টা বার মাত্রার তাল, আড় খেমটাও বার মাত্রারই তাল, গড় খেম্‌টা (পরে দ্রষ্টব্য)

ছয় মাত্রার তাল। যে খেম্‌টা তালের মধ্যে একটু আড় আছে তাহাকেই আড় খেম্‌টা তাল বলে, খেম্‌টার মত আড় খেম্‌টাও তাল-প্রধান গান এবং নৃত্যের সঙ্গে সংযুক্ত। যে গানে আড় খেম্‌টা তাল ব্যবহৃত হয়, তাহাকে আড়খেম্‌টা গান বলে।

১

ওগো সোনা দূতো
নগরে নগরে ইহা বোলিও
ওরে লয়না যেন কোন জনে
হরি না না বোলিও,
নিষেধ যদি না মানে,
মত্ত হয়ে হরিনামে,
তারে আনিয়ো শ্যামা মায়ের স্থানে।

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

ওহে রসরাজ, কেন আজ,
ডাকিলে আমায়, এমন সময়ে বল না।
মনোলোভা, বনশোভা,
কুঞ্জে হেরিব ছিল হে বাসনা॥
প্রফুল্ল কুসুম ললিত রসে,
আমোদিত সুধা-সম সুবাসে,
সরসি সলিলে কুমুদী হাসে,
হেরিলে নয়ন ফিরে না॥
এ সুখ যামিনী শারদ-শশী,
সঘনে বরিষে পীযুষ রাশি,
যুব জন মন হয় উদাসী, ফুল শর দেহে সহে না॥

—২৪ পরগণা (বা-গা)

আদ্যের গম্ভীরা

গম্ভীরা শব্দের অর্থ প্রকোষ্ঠ। কিন্তু মালদহ অঞ্চলে আদ্যের গম্ভীরা বলিতে আদ্য বা শিবের গাজন বুঝায়। গম্ভীরা অর্থাৎ যাহার অর্থ প্রকোষ্ঠ তাহা দ্বারা কেন যে গাজন বা শিব স্তুতিমূলক সঙ্গীত বুঝায় তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না।

আদ্যের গাজন

লৌকিক শিব কিংবা ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা ও উৎসবের নাম গাজন। বাঁকুড়া জিলার অযোধ্যা গ্রামে মনসার নামেও গাজন (পরে দ্রষ্টব্য) হয়। অন্য কোন দেবতার নামে গাজন হইতে বর্তমানে দেখা যায় না। শিবের এক নাম আদ্য, সেই জন্য শিবের গাজনকেও আদ্যের গাজন বলা হয়। তবে বিশিষ্ট দেবতা অর্থে আদ্য শব্দটির বৌদ্ধধর্ম বিশেষতঃ মহাযান বৌদ্ধধর্ম হইতে আসিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ, মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে বুদ্ধের নাম আদিনাথ, আদিদেব বা আদ্য। মালদহ বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের যুগে সেই অঞ্চলের সমাজে যে বাৎসরিক লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তাহাকে আদ্যের গাজন বলিত। রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের গাজনকে আদ্যের গাজন বলা হয়। যেমন 'কত পদ্য বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে।' (ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল।) গাজন প্রধানতঃ লৌকিক ধর্মমূলক অনুষ্ঠান, ইহার বিভিন্ন আচার পালনের সময় বিভিন্ন সঙ্গীত গীত হয়। ইহারা আচার সঙ্গীত (পূর্বে দ্রষ্টব্য)-এর লক্ষণাক্রান্ত।

আধ্যাত্মিক সঙ্গীত

বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান অংশকে সাধারণভাবে আধ্যাত্মিক সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করা যায়। অনেকে এমন কথা মনে করেন যে, যাহা ধর্ম, তাহা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না ; কারণ, ধর্ম অলৌকিকতা-নির্ভর এবং সাহিত্য প্রত্যক্ষ জীবন-নির্ভর। কিন্তু পৃথিবীর সকল ধর্মমতই যে অলৌকিকতা-নির্ভর তাহা নহে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম বৌদ্ধধর্ম মূলতঃ অলৌকিকতা-নির্ভর ছিল না, চরিত্র-নীতির উপরই ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে নানা দিক হইতে প্রভাবের ফলে ইহার উপর অলৌকিকতার কথাও আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। বাংলাদেশের লৌকিক ধর্মের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাও অলৌকিতাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিহার করিয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষ জীবনকে আশ্রয় করিয়া ঐহিক কল্যাণের উদ্দেশ্যেই ইহা পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে লৌকিক শাক্তধর্ম এবং নাথধর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লৌকিক শাক্তধর্ম অলৌকিকভাব পরিহার করিয়া প্রত্যক্ষ জীবনকেই সত্য বলিয়া জানিয়াছিল বলিয়া তাহা দ্বারা মঙ্গলকাব্য নামে এক বিপুল সাহিত্যের সার্থক সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে মঙ্গলকাব্য বৈষ্ণব-সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাববশতঃ অলৌকিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই শেষ পর্যন্ত তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

লৌকিক শাক্তধর্ম ব্যতীত বাংলার জলবায়ুতে আরও যে সকল ধর্মমত জন্মগ্রহণ করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বাউল ধর্মমত (বাউল দ্রষ্টব্য) অন্যতম। বাউল ধর্মমত একটি অবিচল আদর্শ যে সামনে রাখিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা নহে—ইহা প্রথম হইতেই একটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ইহার এই ক্রমবিকাশের ধারায় ইহা বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন লৌকিক ধর্মমতগুলিকে অস্বীকার করিতে পারে নাই, বরং তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইয়াই অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য যে মৌলিক আদর্শের প্রেরণায় একদিন বাউল ধর্মমত বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে নাই। বিশেষতঃ শাস্ত্রীয় বা আচার-সম্মত বাউলধর্মের বাহিরেও ইহার আর একটি লৌকিক শাখার জন্ম হইয়াছিল, তাহা কোনদিনই বাউলের শাস্ত্রীয় ধর্মের

আচার-আচরণকে স্বীকার করে নাই, বরং তাহার পরিবর্তে এই বিষয়ে একটি লৌকিক ধারা সৃষ্টি করিয়া সেই পথেই অগ্রসর হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বাউলের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক অনুভূতির কোন স্থান ছিল না, সাধারণভাবে জীবনের নানা রহস্যের অনুসন্ধান করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। জীবনের পরপার সম্পর্কে অনিশ্চয়তার আশঙ্কা কোন কোন সময় মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিবার ভাবও তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইত। সাধারণভাবে ইহা বিশেষ কোন ধর্মমত নহে, সকল ধর্মেরই মানুষ জীবনের এক একটি মুহূর্তে যে উদাস বৈরাগ্যের ভাব অনুভব করিতে পারে, ইহা তাহাই। সাধারণভাবে তাহা বাউল বলিয়া ভুল হয়, কিন্তু বৈরাগ্য ও বাউল একার্থবাচক শব্দ নহে। বাউল বিশেষ একটি শাস্ত্রীয় আচার-আচরণের ধারা অনুসরণ করিয়া চলে; কিন্তু বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক এক সময় যে একটি বৈরাগ্যের অনুভূতি প্রকাশ পায়, তাহা কোন শাস্ত্রীয় নির্দেশের ধার স্বীকার করিয়া চলে না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

মিছে কেন ভবঘোরে ঘুরে মর দিবানিশি,
ভবের খেলা সাঙ্গ হলে ফুরাবে তোর হাসিখুসি।
এই যে ভবের বাজার—আসা যাওয়া কেবল সার,
এ-ভবেতে কেউ কারো নয়, মিছে ভালোবাসাবাসি।
যারে ভাব আপন আপন, কেউ সঙ্গে যাবে না তখন,
যেদিনেতে মুদবে নয়ন শমন দিবে গলায় ফাঁসি।
এই যে অনিত্য দেহ, এ দেহের সদাই সন্দেহ,
এ দেহ পতন হলে পুড়ায়ে করবে ভস্মরাশি।

ইহা প্রত্যক্ষ জীবনের কথা, কোন অলৌকিক আচার-আচরণের কথা নহে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটি বিবাগী মন প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, ইহা মনুষ্যচরিত্রের অঙ্গীভূত, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য-জীবন গঠিত হইতে পারে না—এই সঙ্গীত মনুষ্যচরিত্রের সেই অনিবার্য গুণ হইতে জাত বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। মানুষ তাহার জীবনের বিশেষ পরিবেশের মধ্যে তাহার বিবাগী মনটির সন্ধান পায়। কোন কোন সময় তাহা যখন কোন বিশেষ প্রণালীর মধ্যস্থ হইয়া প্রকাশ পায়, তখনই তাহা কোন সম্প্রদায়িক পরিচয় লাভ করে, কিন্তু মানুষের স্বাধীন মনোভাবের

অভিব্যক্তির মধ্য দিয়াও এই বৈরাগ্যের ভাব যখন প্রকাশ পায়, তখন তাহা ব্যক্তি-চরিত্রের গুণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। বাংলার লৌকিক ধর্ম সম্পর্কেও এই কথাই বলিতে হয়। তাহা কোন শাস্ত্রীয় শাসন স্বীকার করে না, প্রত্যক্ষ মানুষেরই চরিত্রগুণ প্রকাশ করে মাত্র। সুতরাং ইহাকে ধর্ম বলিয়া ভুল করিবার কিছু নাই।

বাংলার লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বহু বৈরাগ্যমূলক সঙ্গীত আছে, তাহাদিগের ধর্মসঙ্গীত বলা সঙ্গত হয় না; কারণ, বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগ নাই, অথচ প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ানুভূতির সঙ্গেই তাহাদের সংযোগ আছে।

ভগবানের অস্তিত্বের অনুভূতি অলৌকিকতার অনুভূতি। কিন্তু বাংলার লোক-সঙ্গীতের যে অংশে ধর্মচিন্তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, তাহাতে যে ভগবান আছেন, তিনি মানুষ ব্যতীত কিছুই নহেন। কোন সময় তিনি হয়ত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত হন, কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণের গুণ যখন বিচার করিয়া দেখি, তখন তাঁহার মধ্যে আমাদের প্রতিবেশীর গুণের সন্ধান পাই, বৈকুণ্ঠের কোন গুণ তাঁহার মধ্যে অনুভব করি না। সুতরাং তিনিও অলৌকিক চরিত্র নহেন, তিনিও মানুষেরই চরিত্র। বাংলা দেশে 'কানু ছড়া গীত নাই' সত্য, কিন্তু এই কানু যদি শ্রীভগবান হইতেন, তবে বাংলার মাটিতে তাঁহার স্থান হইত না, তিনি বৈকুণ্ঠবিহারী হইয়াই থাকিতেন; তিনি যে রক্তমাংসের দেহে গড়া মানুষ, সেইজন্য মানুষের অনুভূতির স্পর্শে তিনি সজীব। সুতরাং রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত কেবলমাত্র বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী ব্যতীত কোনদিনই সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির স্তরে পৌঁছিতে পারে নাই, তাহা প্রত্যক্ষ জীবনের রসে সরস হইয়া আছে। বৈষ্ণব পদাবলীর রচনার ধারা যে লুপ্ত হইয়া গিয়া এখনও লৌকিক রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনার ধারা বাংলার লোক-সঙ্গীতে অব্যাহত রহিয়াছে, তাহারও কারণ ইহাই। যাহা জীবন-নিরপেক্ষ হইয়া কেবলমাত্র নৈর্ব্যক্তিক ভাবধারা অনুসরণ করিয়াছে, তাহার ধারা শুষ্ক হইয়া যাইবে, ইহাই ত স্বাভাবিক; কিন্তু তাহার পরিবর্তে যাহা হৃদয়ের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া প্রত্যক্ষ মনুষ্য-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহার ধারা অবিনাশী, হইবে তাহাও স্বাভাবিক। বৈষ্ণব পদাবলী তাহার সুনির্দিষ্ট কয়েকটি রচনার মধ্যে একদিন যে শক্তি লইয়াই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, তাহার প্রেরণা আজ লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু

যে রাধাকৃষ্ণ মহাজনসম্প্রদায়ের বাহিরে বাঙ্গালীর জন-মানসে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালীর লোক-সঙ্গীতের মধ্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিষয়ক কোন সঙ্গীতই ধর্মসঙ্গীত নহে, বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক নাই; সেইজন্য সকলেই তাহাকে আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছে।

বাংলার লোক-সঙ্গীতে মানুষকেই চিরকাল বড় করিয়া দেখা হইয়াছে—এখানেই ইহার সার্থকতা। অথচ লোক-সাহিত্যের স্তরে মানুষকে বড় করিয়া দেখা সহজ কথা নহে। কারণ, যে যে-অবস্থার মধ্যে বাস করে, সর্বদাই তাহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থার কথা ধ্যান করে। সেইজন্যই সাধারণ লোকের সাহিত্যের মধ্যেও অভিজাত চরিত্রের বাড়াবাড়ি দেখা যায়। সুতরাং সাধারণ মানুষ তাহার নিজের স্তরের মানুষের কথা ভাবিতে অভ্যস্ত নহে। তথাপি বাংলার লোক-সাহিত্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। সংগৃহীত একটি সঙ্গীতে শুনিতে পাওয়া যায়—

মানুষে মানুষে করো না হীন,
হীন হবারও তোর আছে রে দিন ॥
নব এ-যৌবনে মনের গুমরে
নয়ন ভরে মানুষকে চিন।
মরিলে সে রাজাও সে মড়া,
আগুনে পোড়াবে নরকে ডোবাবে
চন্দ্র-সূর্য তারা গমনে গমন
মানুষের জন্য রাত্রিদিন,
মানুষে মানুষে করো না হীন,
হীন হবার তোর আছেরে দিন ॥

এই সঙ্গীত নিরক্ষর গ্রাম্যকবির রচনা, মানুষে মানুষে ঐক্যবোধের সুগভীর প্রেরণা যেভাবে ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সুশিক্ষিত মানব-প্রেমিকের মধ্যেও অনেক সময় দেখা যায় না। ইহার মধ্যে ধর্মের কথা নাই, যে বৈরাগ্যের সামান্য ইঙ্গিতটুকু আছে, তাহা সরল ধর্মচিন্তা-নিরপেক্ষ একান্ত মানবচরিত্রসম্মত। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বৈরাগ্যের কথা ধর্মের কথা নহে। সুতরাং এই সঙ্গীতটির মধ্যে ধর্মের কথা নাই; মানুষের শাশ্বত জীবনকথাই

আছে। এই গুণেই ইহাও সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতে পারিয়াছে।

বাংলার যে কোন তথাকথিত ধর্মসঙ্গীত যদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, ধর্মের পাশ্চাত্ত্য সংজ্ঞা অনুযায়ী অলোককতায় বিশ্বাসের কথা তাহাদের মধ্যে নাই। বরং যাহা অলৌকিক, তাহাকে লৌকিক স্তরে নামাইয়া আনাই হইতেছে বাংলার লোক-সঙ্গীতের লক্ষ্য, এইভাবে ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ বাঙ্গালীর প্রতিবেশী হইয়াছেন; রামায়ণের রাম-সীতা বাঙ্গালীর ঘরের পুত্র-কন্যারূপে নবজন্ম লাভ করিয়াছেন। বাংলার ধর্মসঙ্গীতে দেবতাকে অপদেবতা না করিয়া তাঁহাকে মানুষ করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়াই তাহা ধর্মের আবেদন সৃষ্টি না করিয়া সাহিত্যের আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে।

বাংলার এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত দেহতত্ত্বের গান বলিয়া পরিচিত। দেহতত্ত্বের সাধনাও অলৌকিক ধর্ম-সাধনা নহে; কারণ, এই সাধনার লক্ষ্য কোন অদৃশ্য শক্তি কিংবা ভগবান নহেন, বরং মানুষের প্রত্যক্ষ দেহ। দেহের অসারতা এবং তাহার মধ্যস্থ আত্মার নিত্যত্ব নানা অলঙ্কারের প্রয়োগদ্বারা দেহতত্ত্বের গানের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করা হয়। নিরক্ষর পল্লী-কবির রচিত একটি সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করা যায়—

তুমি জগৎকে মাতালে, নিতাই, কোন ফুলে,
গাছটির নাম চম্পকলতা, পাতাটির নাম হেম,
এক ডালে তার রসের কলি, আর এক ডালে প্রেম।
আসমানে তার গাছের আড়া জমিন বেড়া ডাল,
ফুল ছাড়া যেন হয় রে, নিতাই, পাতা ছাড়া ডাল।
তেকুন্যা পৃথিবীখানি মধ্যে আছে জল,
তাতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর তারাও না পায় স্থল।
একটি জীবের পেটে আছে তিনটি জীবের মাথা,
আর নাগের পেটে জন্ম নিয়ে, দুধ খেল সে কোথা।
আনন্দ চাঁদ গোঁসাই রটে, মিছে ভারে ভরে বটে,
মাটির দেহ মাটিই রবে মাণিক যাবে চুরে।
তুমি জগৎকে মাতালে, নিতাই, কোন ফুলে।

এখানে রূপক অলঙ্কারযোগে মনুষ্যদেহের একটি বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

ইহা প্রত্যক্ষ মানব-দেহেরই বর্ণনা, কোন অদৃশ্য কিংবা অলৌকিক শক্তির বর্ণনা নহে। সুতরাং ইহাতেও যে তত্ত্ব আছে; তাহা বাস্তব। বাংলার ধর্মসঙ্গীতে এই-প্রকার ধর্মের কথা বাদ দিয়া প্রত্যক্ষ জীবনের কথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

বাংলাদেশে আর এক শ্রেণীর লৌকিক আধ্যাত্মিক সঙ্গীত আছে, তাহা গুরুবাদী বা গুরুর মহিমাসূচক গান। বাংলার বলিষ্ঠতম গুরুবাদী ধর্ম নাথ-ধর্ম। কালক্রমে নাথধর্মের প্রভাববশতঃ বাংলার অন্যান্য যে সকল ধর্মমতের মধ্যে গুরুবাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক-ধর্ম অন্যতম। এই সকল সূত্র হইতে গুরুবাদ বাংলার ধর্মচিন্তায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু গুরুবাদের মধ্যে কোনপ্রকার অলৌকিকতার স্পর্শ আছে বলিয়া মনে করা ভুল হইবে। কারণ, ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষ, কিন্তু গুরু প্রত্যক্ষ। সেইজন্য গুরুর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহের যে প্রেরণা, তাহা কোনও অপ্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে জাত প্রেরণা নহে, প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতেই জাত। গুরু নিজে অলৌকিক সাধন-ভজনের জীবন জীবন যাপন করিতে পারেন ; কিন্তু শিষ্য যখন তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন তখন তাঁহার অলৌকিক শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেও তাঁহার প্রত্যক্ষ ব্যক্তিত্বের নিকটই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সংসারে একজনের উপর নির্ভর করিয়া চলার মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তির প্রেরণা নাই, ইহা লৌকিক জীবনেরই বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া পরীক্ষিত। সুতরাং এই মনোভাব অবলম্বন করিয়া রচিত সঙ্গীতও যে অলোকের (mysticism) নির্দেশ দিয়া থাকে, তাহা নহে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, চট্টগ্রাম জেলা হইতে সংগৃহীত—

মন পঅলা, গুরু কি ধন চিনলি না,
নৌকা খুলি দেশত চল না।
আইলাম ভবর মাঝত, দিন গেল মিছা কামত
সাধন ভজন অইল না।
উন্মত্ত পঅলার মত, অবিরত সন্‌সারের কামত
মিছা কামত ডুবি মরি ;
কন্‌ আছে আমার আপনা আপনা ?
মন পঅলা, গুরু কি ধন চিন্‌লি না।

সাধারণ বৈরাগ্যমূলক সঙ্গীতের সঙ্গে ইহার কোন পার্থক্য নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, মানুষের বিষয়ী মনের পাশে একটি বৈরাগী মনও সর্বদাই সজাগ হইয়া থাকে; মানুষের স্বাভাবিক জীবন-ধর্মের মধ্যেই এই গুণ নিহিত আছে। সুতরাং ইহাও মানুষের স্বাভাবিক জীবনেরই কথা বলিয়া লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার অধিকার অস্বীকার করা যায় না।

১

দেখা দিবে নাকি ফিরে চাইবে না
আমি আবার কত জ্বালা সব'
নন্দলালা অদর্শনে প্রাণ বাঁচে না।
আবার বিনা সাধু গুরুর চরণ-কৃপাতে
তুমা ধনে কভু মিলে না॥
ভক্তি ভক্ত আর ভগবান তিন
একত্রিত এরা তবু নহে ভিন্
গোরা পাগলিনীর মুক্তি চির সাধু-পদে লীন
থাক চিরদিন এই কামনা॥ — বাঁকুড়া

২

নারী কভু নয়রে সরল, দেখ্‌রে চেয়ে জগৎবাসী,
শ্যাম কাঁদে চরণ ধর্যে, মান করেছেন রাই রূপসী॥
চতুর্ভুজা এক নারী, নাচে নারীর বক্ষোপরি,
তার বিবসনা ভয়ঙ্করী, বাম করে ধরেছে অসি।
আরেক নারী দশভুজা, সেও তো নয় রে সোজা,
দেখিয়ে দিল কীর্তিধ্বজা,
স্বামী তার অবাক হয়ে রইল বসি॥
নারী কখনও কঠিন কখনও তরল,
কখনও সরল, কখনও গরল,
কখনও গৃহলক্ষ্মী, কখনও সর্বনাশী॥
পাগল গোঁসাই বলে—
ঐ নারীকে দেখতে পেলে থাকতে হয় তার চরণমূলে
কাজ কি তার গয়া কাশী॥ —ঐ

৩

আকাশে আর পাতালে, জলে স্থলে অনিলে
আছেন সর্বস্থলে প্রাণের প্রাণ গুণনিধি।
প্রেমের মূর্তি প্রেমে ভরা, বিশ্বজন মনোহরা,
আছেন তোমার হৃদয়ে জোড়া, দেখ খুঁজে পাও যদি ॥
তাঁর পদে রেখে মতি, পাপ পুণ্য যত ইতি,
বিসর্জিয়া তায় দিবারাতি, ডুবে থাক আনন্দ-বারিধি।
বিষয়-বিষ পরিহরি, তাঁহাকে নির্ভর করি,
ভাল মন্দ ছাড়ি পাড়ি দাও ভব-জলধি ॥ —বীরভূম

৪

হরি-ভবনদী আমায় কর পার,
ভবনদীর পারে পারে ধূলায় অন্ধকার।
দয়াল হরি হে, ভবনদী কর আমায় পার ॥
একটা নদীর তিনটা ধারা দেখিতে চমৎকার,
শিমুল কাঠের নাওখানাতে করে পারাপার ॥ —কুচবিহার

৫

ও দয়াল গুরু, উপায় কি করি,
যত করিলাম ভবের আশা, সব হইল ফাঁকি।
দুঃখে সুখে গুরু যায় বোল চিরকাল,
আর কত দুঃখ দিবেন, গুরু, মোর পোড়া কপাল।
ভাই দেখং, ভাতিজা দেখং পুত্র পরিবার,
অসময়ে নিদানকালে কেউ নয় আপনার। —ঐ

৬

হরি বলো মন-রসনা,
মানব-দেহের কেউ গৈরব কৈরো না।
ওরে, মানব দেহ মাটির ভাণ্ড,
ভাঙ্গিলে রে হৈবে খাণ্ড খাণ্ড
ভাঙ্গিলে দেহা জোড়া লাগে না। —ঐ

৭

সাধের নৌকা বয়
এলুয়া কাশের ফুল
নদী হইল কানাই হুলাস্থুল রে
কেমন করিয়া দরিয়া হব পার,
কানাই রে—পার।......
যে নাইয়া করিবে পার,
তাকে দিব আমি গলার হার,
তাকে দিব আমি গলার চন্দ্রহার। —ঐ

৮

আজ আমার কাদা মাখা সার হৈল,
ধর্ম মাছ ধর্‌ব বলে, নাম্‌লাম জলে
আমার ভক্তি জাল চিরা গেল।
কি ক্ষণে বিল গাবালাম, কুসঙ্গে সঙ্গ লইলাম,
ডাঙ্গায় খইল হারালাম,
এখন উপায় কি করি বল।
দুইটা ভূত লাগ্‌ল পিছে,
মাছ ধরার ফাঁদ পেতেছে,
ভয়ে প্রাণ শুকায়ে গেছে
পিছে আছে গোটা যোল। —রাজসাহী

৯

এখন আমি জানিলাম, কেউ ত কার নয় রে,
আশায় আশায় এ সংসারে বিচ্ছেদ ভাবনা শেষ হয় রে।
ও উদাস মন,
মন সায়রে মনের সাথে
আইলাম গাহিতে বিচ্ছেদের গান,
কার্তিক গণেশ দুটি ভাই
অন্তিমকালে দিও পানি
দিও বৈকুণ্ঠে স্থান। —ফরিদপুর

১০

আর মন পাখী তোমার অন্ত পাইলাম না।
তুমি থাক্যা থাক্যা শিকল ঝাঁকাও
তা দেখ্যা প্রাণ বাঁচে না॥
তুমি যাই যাই বল্যা সদা করছ বাসনা,
এবার যাই যাই শব্দ ক্ষান্ত কর,
গুরুর চিন্তায় কর তার উপাসনা।
তোরে খাওয়াইছি কত মিছরিপানা,
আর খাওয়াইছি মাখন ছানা,
তবু তোর মন পাইলাম না।
আর মন পাখী তোমার অন্ত পাইলাম না॥ —ঐ

১১

নদী উজাবার উপায় নাই আর,
মন-মালী উপায় কর তরী পার করিবার॥
নদীর বেগ আসিয়াছে ফিরে।
কূল পাবে সে ভরসা আছে॥
পার না গুণ খাটাতে, পাল খাটাতে
সার ভাটাতে টান ধরেছে।
কত কি হবে গতি যে ভাবগতি
ক্রমেই গতিরোধ হতেছে॥
ক্রমে জল কমে যে রকমে
সব চর জেগেছে।
কি মিছে কর আশা সুখ-প্রয়াসী
বল ভরসা যায় ঘুচে॥
থাক জলের কাছাকাছি
ভক্তি কাছি বাঁধ মন, সাধন গাছে।
ক্রমে জল কমে যে রকমে
সব চর জেগেছে॥ —রাজসাহী

১২

যদি অমর হৈতে সাধ থাকে, যদি ওরে পামর মন।
কর সুধা পানের আয়োজন ॥
সুধা পানে মরে না প্রাণে চিরজীবী সুরগণ।
হৈলে সাধনে সিদ্ধ, তবে অসাধ্য সাধ্য,
তবে গুরু সাধন ক্ষীর সমুদ্র ॥
করিলে তা মন্থন, পাবে শুদ্ধ প্রেমামৃত এড়াবে জন্মমরণ।
শ্রম হৈবে না পণ্ড শুন তার কাণ্ড
মনকে কর মন্দার-গিরি মন্থনের দণ্ড
কর, অনুরাগে রজ্জুযোগে বাসুকি নাগের মতন ॥
সুধা এমনি কি মিলে, দেবাসুর মিলে
কত কষ্ট কৈরেছিল মন্থনের কালে।
কর সেই অনুরাগে রিপু ইন্দ্রিয় যোগ মিলে রতন। —ঐ

১৩

কামিনী-কাঞ্চনে ভুলে সেই ধন অবহেলে,
বাজে খরচে খোয়াইলে
হৈবে তাঁর সঙ্গে কিসে জানা।
পূর্ণ মন তুমি ছিলে ওজন
দিনে দিনে লাঘব এখন,
হৈলে রে তুমি মূঢ় মন,
ওজন কৈরে দেখ ষোল আনা ॥
বলি ও মন, তোরে প্রেমভক্তি রত্নাকরে।
ডুবে যাও তাঁর অগোচরে
হৈবে বাপে-পুতে জানাশুনা ॥ —ঐ

১৪

না তো ডুইব্‌ল রে, কেত কাল রাইখ্‌ব্যাম, গুরু, এ বারতে।
ওরে, কাউয়া কাণ্ডারী অইল রে, শগুন অইল রে ভাণ্ডারী ;
ওরে বনের শিগালে বলে রে, এই নায়ের অদিহারী।

খাকীর[১] বানাইছে রে নৌহা, খাকীর দিছের ছাঁউনী,
ওরে, মোন পবনে চলেরে নৌহা, বাইচ দিতে মানা ॥ —ঢাকা

১৫

তুই যাইস্ নারে মনগাহী, তু ফির্‌য়া আয়।
ওরে, ছামহুক নামে পাহী আমার, আয়রে ইন্দির পিঞ্জিরায় ॥
আমার হিদ্‌পিঞ্জিরায় বৈস্যা পাহী, কিষ্ট নাম শুনাইয়া কর সুখী.
প্রেমে অঙ্গ জরজর, হৃতল মদুরায় ॥
গোঁসাই কইছেন দর্‌রে জালে, পালা পাহী উইড়্যা গেলে,
বনের পাহী বনে গেলে, আর নি তারে দরা যায় ॥ —ঢাকা

১৬

আল্লা গো।—
তোমার বিছনায় হান্‌কি পাইত্যা নিমক ছালুন[২] খাইতেছি।
তোমার বুহের অক্ত দিয়া বাইচবার করূছ ফিহিরী ॥
(ওগো মেহেরবান! ওগো মেহেরবান, মেহেরবান)
কোন্ হানে বস্‌তি তোমার, যাইবার লাইগ্যা মন উচ্ছান[৩] ॥
যি মাট্টিতে বিন্নার ছোবা, যি মাটিতে বাঁশ বরই[৪]।
ওরে, হি মাট্টি, চিরিয়া দিছ, আম কাঠাল নাই ধান কলই ॥
(ওগো মেহেরবান্)
ওরে হায়!—
হেই মাট্টিতে পাঞ্চর চুনা, তেওতো দোয়া হুজে না।
কোন হানো থাইক্কিয়া আল্লা, কইরতাছ এই কারহানা ॥ —মৈমনসিংহ

১৭

এ ভব-সংসারের মধ্যে দয়াময় নাম কে ধরে।
দয়াময় নাম কে ধরে গো, দয়াময় নাম কে ধরে!
এ ভব সংসারের মধ্যে—
তুমি ডালও, তুমি মূলও, তুঁমি সক্কলে!
তোমার নামের গুণে গহিন বনে শুক্‌না গাছে ফল দরে!
দয়াময় নাম কে ধরে!

১। মাটির ২। ব্যঞ্জনবিশেষ ৩। উচাটন ৪। বদরি।

তুমি বর্‌মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি সকলে !
তোমার রাঙ্গা চরণ অমূল্য ধন, সকলেই বাঞ্ছা করে !
দয়াময় নাম কে ধরে ! —মৈমনসিংহ

১৮

সুজন কাণ্ডারী ধা'রে, চিন্না ল' মন ডান কি বাও।
মনমাঝি তুই কেমনে যা'বি, পচা নাও ॥
যে জন জাত পাটনী হয়,
(অ) তার তুফানে কি ভয়,
মতে সতে ঢেউ কাটিয়ে টের গলুইতে হয়।
সে বাতাস বুইঝা নৌকা ছাড়ে,
ভাটী ছাইড়া উজান ধরে,
বাইয়া যায় প্রেম-পাথারে,
তার কি লাগুর পাওয়া যায়,
ঐ নাও বাইছের নামে চলে উড়ে,
আর আমার নাও যে থাকে কুইড়ে,
সারানিশি তার জল ফালায় ॥
আমার নাও হইয়াছে বুড়া,
ও নায়েব লাইগাছে গুড়া,
অনেক দিনে হইল বুড়া,
ভাই পুরাণ মাস্তলায় ॥ —ঢাকা

১৯

ওগো দরদী,
ওগো দরদী, আমার মন কেন উদাসী হইতে চায়।
ও তার ডাক নাহি, হাঁক নাহি গো, আপ্‌নে আসি চইলে যায়।
ধৈরয না ধরে অন্তরে—
সদা কেঁপে ওঠে মন শিহরি, নয়ন ঝরে,
যেন নীরবে, স্বরবে সদা—ডাকিতেছে, আয় গো আয়।

যেন ভাটীর স্রোতে ভাটার গড়ান, সাগর যেমন সদা গো টানে
নদীর পরাণ,
সে টান এতই সরল, মনেরই গরল অমৃত হইয়ে যায়। —ঢাকা

২০

গেল দিন অসাধনে, মন, একবার হরিগুণ গাও রে।
মুখ আছে, বলতে পার, তবে কেন আলস্য কর।
ক্রমে ক্রমে হরিনামে রুচি কর;
ও রে, ভজনের মূল মানবজনম, আর কি তুমি চাও রে।
হরিনাম সিন্ধুনদী, পান কর নিরবধি,
ভবনদী পার হয়ে যাবে যদি,
ওরে হরিনামে ডঙ্কা মেরে ব্রজধামে যাও রে। —ঐ

২১

ভাঙ্গা কাষ্ঠর তরী লইয়া মাজি অইয়া, আইলাম সন্‌সারে।
ও রে, নৌকার মইদ্যে উইট্যে জল, দাঁড়ী নাই রে মাঝি নাই রে,
হাবা বলাবল।
মারা গেল সাধর তরী রে,
গুরু ডুবাইলি আয়া রে ও রে আয়ারে। —চট্টগ্রাম

২২

আর কত দিন খেলা খাইবা, পোয়ার মতন ধুইল লই ?
যমে যেদিন সময় অইব, হেই দিন ধরি নিব গৈ।
খেলার ঘরত খেলা রইল, তারা কডে লুকাইল গৈ।
আয়ু যখন শেষ অইব, যমে আই দেখা দিব।
আচম্বিতে যম আইয়া, তোরে ধরি নিব গৈ। —ঐ

আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত

যে সঙ্গীত বিশেষ কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত এবং তদ্ব্যতীত যাহার কোন স্বাধীন প্রয়োগ-ক্ষেত্র নাই, তাহাকেই আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত বলা যায়। ইংরেজীতে ইহাকেই Calendric song বলে। সমাজ-জীবনের বিশেষ এক একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক এমন নিবিড় যে, সমাজের অপ্রয়োজনে সেই সকল অনুষ্ঠানের ব্যবহার লুপ্ত হইয়া গেলে, সেই সঙ্গীতও লুপ্ত হয়, অন্য কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। অথচ ইহারা যে আচার-সঙ্গীত (ritual song) তাহাও নহে। আচার-সঙ্গীত কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মন্ত্রস্বরূপ, পুরোহিত-স্থানীয় ব্যক্তিদিগের দ্বারা তাহা গীত হয়, কিন্তু আনুষ্ঠানিক কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া গীত হইলেও, তাহা প্রকৃত পুরোহিত বা ওঝার ব্যবহার্য নহে, প্রকৃত পূজানুষ্ঠানের ক্ষেত্রের বাহিরে উন্মুক্ত গৃহাঙ্গিনায় কিংবা উৎসবের বারোয়ারী প্রাঙ্গণে ইহারা গীত হয়। নানা প্রকারের পার্বণ-সঙ্গীতই ইহার বিশিষ্ট নিদর্শন। (আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের বিস্তৃততর আলোচনা ও উদ্ধৃতির জন্য 'বাংলার লোক-সাহিত্য' ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩২-৫২০ দ্রষ্টব্য)

আলকাপ

প্রধানতঃ মুর্শিদাবাদ জিলায় এবং নদীয়া, বীরভূম ও মালদহ জিলার কোন কোন অংশে এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহাকে আলকাপ গান বলে। ইহা প্রধানতঃ মুসলমান কৃষক সমাজেই প্রচলিত; সেইজন্য ইহার নামটিও মুসলমান সমাজ হইতেই আসিয়াছে। ইহার দুইটি প্রধান অংশ—গান ও ছড়া। গান অংশে উচ্চভাব-মূলক রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বিষয় যেমন শুনিতে পাওয়া যায়, তেমনই ছড়া অংশে সমসাময়িক ঘটনামূলক নানা লঘু বিষয় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। (ইহার বিস্তৃততর বিবরণ 'বাংলার লোক-সাহিত্য' ১ম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ২৭৪-৭৬ ও তৃতীয় খণ্ড পৃ. ৩০১-৩১১ দ্রষ্টব্য)। ইহা পশ্চিম বাংলার আঞ্চলিক সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত।

১

নেইয়া তোর নাম নাও ছাপা রে……
না ছাপা, না ছাপারে নেইয়া, না ছাপা মোর কোলে,
গাগরি ভরিয়া দিব রে ॥
দুই নয়নের জলে রে ॥
শ্বশুর মরুক, ভাসুর মরুক, মরুক ছোট দেওরা,
শাশুড়ি ননদী মরুক রে
বাঁচুক কেলে সোনা রে ॥ —মুর্শিদাবাদ

২

কে কে যাবি আয় লো, যমুনাতে যাই লো
যমুনার জল বড় ঠাণ্ডা ॥
ঐ যমুনার কালো জলে কৃষ্ণ নামের ঢেউ খেলে,
তারই তলে ছায়া গো মন করে উদাসী গো,
আজকে যমুনার জল বড় ঠাণ্ডা ॥
কালা যখন বাজায় বাঁশী, আমি তখন জলকে আসি
তারই তলে ছায়া গো, মন করে উদাসী গো
আজকে যমুনার জল বড় ঠাণ্ডা ॥
কালা যখন যমুনার জলে আমি তখন কদমতলে,
কালার বাঁশীর স্বরে গো মন করে উদাসী গো
আজকে যমুনার জল বড় ঠাণ্ডা ॥ —ঐ

৩

কে যেন এসে মন চুরি করিল, মোহন বাঁশীর স্বরে প্রাণ হরিল ॥
মাথায় ময়ূর পাখা, চলিতে চলন বাঁকা,
মোহন বাঁশরি হাতে এসে দিল দেখা,
দেখা দিয়ে সে কেন মোরে কাঁদাল।
কেন কাঁদাও, প্রিয়, এস মোর কাছে ;
বাঁধিব আজ খেলাঘর কথা বল হেসে,
হেঁসে হেঁসে পাশে বসে কথাটি বল,
চোখের জলে যেন স্রোত বহিল ॥ —ঐ

৪

কার আশে রইলেম বসে চোখে কাজল দিয়া গো ॥
সে যে আমার প্রাণের বন্ধু আসব বলে গেছে চলে,
এল না মোর প্রিয়া গো—কাজল দিয়া গো ॥
সে যে আমার প্রাণের বন্ধু, দেখা হলে কইতাম কথা, —ঐ
ফেটে যায় মোর হিয়া গো—কাজল দিয়া গো ॥

৫

কালো রূপের ঢেউ লেগেছে দেখবি যদি চলে আয় ॥
নাম্‌বি যদি প্রেম-পাথারে সাঁতার দিয়ে চলে আয় ॥
দেখে যা, প্রাণ সুঁপে যা
দেখতে পাচ্ছি রাঙা পায়।
কালো রূপের ঢেউ লেগেছে, দেখবি যদি চলে আয় ॥ —ঐ

৬

ছি ছি, কিশোরী, ঘৃণাতে মরি
করেছি কি ঝকমারী পিরীতি করে ॥
আগে মজালে প্রেম শিখালে
ভাসালে অবশেষে অকূল পাথারে ॥
কে জানে এমন কঠিন তোমার মন
মনের দুঃখ মনে রাখি, মরি গুমরে ॥
নাহি ধরম না জান প্রেম
শরমে থাকি কেবল মরমে মরে ॥ —ঐ

৭

আগে না বুঝে পিরীতে মোজে, কে জানে,
এমন হবে দিবে যাতনা ॥
কত না সাধিব, কত না কাঁদিব,
কত না সবে প্রাণে বিচ্ছেদ যাতনা ॥
মরি লো লাজে মরমে বাজে তোমার পিরীতে ম'জে
একি হ'ল লাঞ্ছনা ॥

যৌবন প্রভাবে কত দিন যাবে,
কলি শুখালে অলি ফিরে চাইবে না॥ —ঐ

৮

তুমি যমুনাতে জলকে গিয়ে মজাইলে মন,
সেই অবধি হিয়ায় জাগে অকলঙ্ক চাঁদ-বদন॥
সেই দিনের দিন মনে হলে, মনের আগুণ দ্বিগুণ জ্বলে,
ধরে বেঁধে প্রেম ঘটালে আমার তখন ছিল না মন॥
তোমার লাগি, বিধুমুখী, বনে থাকি ধেনু রাখি,
সদা তোমার প্রেমে মাখামাখি, বাঁশীতে আলাপী তোমারই গুণ॥
প্রেম করেছ জেনে শুনে, কওনা কথা মন ও মানে
দীন হীন চাঁদ গগন ভণে, কেঁদে ফিরে যায় কাল রতন॥ —ঐ

৯

দেখ প্রেম করা কি কথার কথা, ও হে শ্রীমতি,
এক মরণে দুজন মরে এমনি প্রেমের রীতিনীতি।
যে জন প্রেমের মর্ম জানে, সে মজে না অভিমানে,
মন সঁপিয়ে সরল মনে, সাধিতে হয় নিতি নিতি।
যেদিন হতে প্রেম করেছি আমাতে কি আমি আছি,
এখান হতে গেলে বাঁচি সুখে থাক রায় দিবারাতি।
মনের খেদে গগন ভণে, আমি সার ভেবেছি মনে মনে,
প্রেম পিরীতির মর্ম জেনে শ্মশানবাসী পশুপতি॥ —ঐ

১০

ওহে পুত্রশোকে আমার যদি এ জীবন যাবে।
ভক্তাধীন গোবিন্দ নামে কলঙ্ক হ'বে॥
এই নিবেদন শ্রীচরণে, এনে দাও হে জীবন-ধনে,
নতুবা বাঁচি না প্রাণে গতি কি হবে॥
বংশে যদি কেউ না থাকে, মুখ দেখে না আপন লোকে,
থাকতে হয় নরকে তাকে বংশ অভাবে॥
গগন চাঁদ কয় মন দুখে, লাজে মরি বিচার দেখে,
কারে বা রেখেছ সুখে মরি তাই ভেবে॥ —ঐ

১১

তুমি যতই কর, হরি, ছলনা চাতুরি, পার কি আমারে ভুলাতে।
এনে দেহ মোরে জীবন-কুমারে, পারি না শোক সহিতে॥
ওহে দয়াময়, যদি নাহি পাই, জনমের মত দেখিতে।
বিফল জীবন, ভক্তাধীন নামে, কলঙ্ক রহিবে জগতে॥
তোমা বিনে আর মরম বেদনা কার কাছে যাব বলিতে।
ভেবেছ নিশ্চয়, যদি বুঝি দয়াময়, চিরদিন হবে কাঁদিতে॥
গগন চন্দ্র কয়, ওহে দয়াময়, চাতুরি না পারি বুঝিতে।
যা থাকে কপালে, ঝাঁপ দিব জলে, সাধ নাই জীবন রাখিতে॥ —ঐ

১২

ওরে আমার প্রাণ-বন্ধুয়া ঘরে নাই,
প্রাণ বন্ধুয়া ঘরে নাই, হায়রে সোনার যৌবন বিফলে চলিয়া যায়।
বন্ধু আমার জীবনের জঞ্জাল, আঁচল দিয়ে যত্ন করে
রত্নধন ঢেকে রাখবো কতকাল।
এবার কুল পুড়ি কয়লা কর মনের আগুন দিয়ে ছার। —নদীয়া

১৩

সত্য যুগে ছিলাম আমি লক্ষ্মীনারায়ণ গো,
পুজতে এলাম যুগল চরণ গো ;
ত্রেতাতে রাম অবতারে জন্ম দশরথের ঘরে,
রামের ধনুক ভাঙ্গা পণ, তোমার তাও কি নাই স্মরণ॥
জনকের ধনুক ভেঙ্গে, সীতা তোমারে করলাম বিয়ে,
কোথাকার পাপিষ্ঠ রাবণ, সীতাকে ক'রল হরণ।
বিমাতার কুমন্ত্রণা ঘটে রাম গেল বনবাসে,
ননী চুরি, বসন চুরি, মস্তকে বেঁধেছি গিরি,
রাধার পুরাতে বাসনা নাম ধরি কেলে সোনা।
দ্বাপরের কথা শুন দিয়া মন গো,
নন্দালয়ে ছিলাম আমি শ্রীনন্দের নন্দন গো,
ননী চুরি বসন চুরি মস্তকে বেঁধেছি গিরি,
দুবেশে বৈদ্য সেজে বেড়াই আমি ব্রজের বেশে,

রাধার কলঙ্ক ঘোচায়, বৃন্দে, তাইতো মনে নাই,
তোমার জন্য, রাধে, বল করি কিনা হায় রে। —ঐ

১৪

কোথায় হতে এলে বন্ধু, কোথায় ঘর বাড়ি,
এইবার মরে স্থতো হবো তাঁতি দাদার তাঁতে যাব।
ভাল ভাল গামছা হবো, আরও হবো ঢাকাই শাড়ী।
এইবার মরে সোনা হবো স্বর্ণকারের বাড়ি যাব,
ভাল ভাল পাশা হবো থাকবো নারীর কানেতে,
মন বাঁধা রয়েছে আমার এলোকেশীর গামছাতে।
এইবার মরে মাটি হবো কুমোর দাদার বাড়ী যাব,
ভাল ভাল কলসী হবো থাকবো নারীর কাঁখেতে.
মন বাঁধা রয়েছে আমার এলোকেশীর গামছাতে। —ঐ

১৫

যা, মা, তোর জামায়ের বাড়ী আমি তো যাব না ;
তোর জামায়ের বাড়ীর ঠেলা দূরের ঘাটে জল আনা।
শাশুড়ী ননদ বসে থাকে এক কুলো ধান কেউ ঝাড়ে না,
তোমার জামাই কোলকাতাতে চাকুরী করে
বছর অন্তর একদিন ফিরে,
সারা রাত্রি কাগজ মারে, ডাকলে কথা বলে না ॥ —ঐ

১৬

ধনি, পুরুষের মন সরল যেমন নারীর মন তা নয়।
নারীর মন তা নয় হে ধনি, নারীর মন তা নয় ॥
রমণীর মন আছে—বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।
পদে পদে দেয় যাতনা কঠিন হৃদয় ॥
নারী জাতি অবিশ্বাসী, অন্তরে বিষ মুখে হাসি।
গলে দিয়ে প্রেম ফাঁসী ফিরিয়ে না চায় ॥
ভেবে কয় দীন গগন চাঁদে, যে পড়েছে নারীর ফাঁদে। —ঐ
বঞ্চিত সে সুখ-সম্পদে ঘটে বিষম দায় ॥

১৭

পরের জন্য পরাণ দিলাম সই, তবু না পাই পরের মন।
পরের জন্য কাঁদে আমার মন, জীবন যৌবন সবই দিলাম রে ;
আরে…ও…ও,
তবু না পাই দরশন পরের জন্য…
আমি যখন জলকে আসি, কালা তখন বাজায় বাঁশী
রাঁধতে গিয়ে কাঁদতে বসি
হলুদ দিতে দেই লবণ ॥ —ঐ

১৮

কৈ এল সজনী, আমার প্রাণ নাথ না এলো।
আসিতে আসিতে কালা পথ ভুলে চলে গেল ॥
খাটের তলায় জলের ঘটী, সিকায় তোলা দুধের বাটী।
পাড়া রইল ছিতল পাটী, অমনি নিশি ভোর হোল ॥
কৈ এল, সজনী, আমার প্রাণনাথ না এলো। —ঐ

১৯

শ্যাম দে দে, তোহার মোহন বাঁশী ॥
তোর বাঁশী, তোর হাসি আমি বড় ভালবাসি।
তুমি বাজাচ্ছ রাধা বলে, আমি বাজাব শ্যাম।
তুমি কাঁদ কি আমি কাঁদি এমনি মোদের প্রেম।
তোর রূপে তোর গুণে আমি হব চিরদাসী। —ঐ

২০

এই হরিনাম ভব পারের কুল।
অ-কুলের কুল যদি দেয় কুল।
নতুবা ডুবিলাম এ ভব তরঙ্গে।
দেরে ভাই হরিনাম অঙ্গে। —ঐ

আলকাপের ছড়া

আলকাপের ছড়া অংশের গায়কগণ আসরে উঠিয়া ছড়া বা গান আরম্ভ করিবার পুর্বে প্রথমেই বন্দনা করে। তারপর ছড়া কাটে—

১

আমি দশের চরণ করে স্মরণ হইলাম উদয়।
দশচক্রে হয় গো অদ্ভুত ভগবান হয়েছিলেন ভূত
দশ জনে যা মনে করে করতে পারে তাই ॥
রাবণ হরে রামের সীতে দশে বলে ফিরিয়ে দিতে
না শুনে সে কোন মতে শেষে দশ মুণ্ড ক্ষয়।
এই পর্যন্ত ক্ষান্ত করি, আসরে ছড়া প্রকাশ করি
আছেন যত গুণ বিচারি সূক্ষ্ম বিচার চাই ॥
আমি কংসারি রূপ করি ধারণ তোমারে করি জিজ্ঞাসন
তোমার কিংকরী নাম কিসের কারণ, বলহে সভায়।
তোমায় আমায় সম্বন্ধ কি তুমি এই কথাটি বল দেখি
শুনিবে সকলি বল নাহে তায় ॥
আছেন যত মুসলিমগণে আমি সেলাম জানাই জনে জনে
একবার চাঁদ বদনে, আল্লা বলা চায়।
যত আছেন পৈতাধারী চরণে নমস্কার করি
একবার উচ্চস্বরে, হরি হরি, বলুন গো হেথায়—
যত আছেন মা জননী বলছি আমি বিনয় বাণী
উচ্চস্বরে উলুর ধ্বনি বলেন এ সভায় ॥ —মুর্শিদাবাদ

২

কত মজা দেখবো রে, দাদা, বাঁচলে কিছুদিন,
আগে ছিল চাঁদীর টাকা এখন কাগজ চিন।
বিদ্যাবুদ্ধি বিজ্ঞানবলে জগৎকে সব তুললো কলে
ধন্য গো এই ধরাতলে ক'রলো রে ইঞ্জিন ॥
রেল ষ্টীমার মোটর জাহাজ চলছে অবিরাম,
শূন্য দিয়ে যাচ্ছে উড়ে এরোপ্লেন তার নাম।
ছ'মাসের পথ '৬' ঘণ্টাতে আসছে যাচ্ছে দিনে রাতে,
যখন করে ছুটাছুটি তখন শব্দে কাঁপায় মাটি।
মজায় চড়ে শূন্য ভরে পাখীর মত যান,
ইহার চেয়ে শুনতে ভাল গ্রামোফোনের গান।

মানুষ নাই মানুষের মত গাইছে সঙ্গীত অবিরত,
দিয়ে রাগ রাগিণীর টান শুনে জুড়ায় দুটি কান।
ফ্লুলেট কর্ণেট হারমোনিয়ম বাজছে সঙ্গীত কি মনোরম,
বাজে তবলা পাখোয়াজ তাহার কি সুন্দর আওয়াজ।
এ সব মজা ইচ্ছা মত সব জাগাতেই দেখি,
ইহার চেয়ে দেখতে ভাল বাইছকোপের বাজি।
পাহাড় পর্বত মহাসাগর দেশ মহাদেশ কত নগর
দেখায় কত দেশের লোক দেখে জুড়িয়ে যায় রে চোখ।
দেখতে গেলে মূল সত্ব ফুরিয়ে গেলে ফাঁকি,
বহরমপুরে হচ্ছে যে, ভাই, তাহার নামটি টকি।
সে আজগুবি দেখলে চোখে জ্ঞান হারাবে আপনারে,
হাত নাড়া পা নাড়া ফটোতে তুলে চেহারা,
ও যে করছে তৈয়ারী সে যায় গো বলিহারি।
এ সব মজা হতে কিন্তু এই মজাটি জবর,
দিনে রাতে আসছে যাচ্ছে তারে তারে খবর।
বিলেতে হচ্ছে ঘটনা, এখান থেকে যায় গো শোনা,
এ সব বিজ্ঞানের হেকমতি বল আগে ছিল কেতি,
ওস্তাদ জেসার মোল্লা ভেবে বলে, দেশ কর স্বাধীন॥ —ঐ

৩

আমি চাষার দুঃখ কহিব কেমনে।
চাষা মাটি খুঁড়ে তোলে সোনা তবু চাষার দুঃখ গেল না
মরে অন্ন বিনে,
চাষা, সকাল হতে সন্ধ্যাবেলা মাটি নিয়ে করে খেলা
লাঙল গরুর সনে,
তবু চাষা পায় না খেতে অশিক্ষার কারণে॥
এই চাষারই টাকার বলে বাস করে সব রঙ্ মহলে
চেয়ার বেঞ্চ সামনে।
কত কারেন্ট লাইট করেছে ফিট
হাওয়া খাচ্ছে ফ্যানে।

ওস্তাদ জেসার উদ্দিন কইছে বিনা চাষাকে করবে ঘৃণা
শত ধিক তার প্রাণে,
চাষার কর সম্মান ও রহমান হাসরের ময়দানে ॥

৪

ভাল কথা আছে গাথা ঐ রামায়ণে।
অযোধ্যাতে রামের বাস জানে সর্বজনে
শিকার কারণ রাম লক্ষ্মণ গিয়েছিল বনে ॥
মৃগ মারিবার তরে রাম গেল বন মাঝারে,
সেখানে দেখছে ঘোড়ার গাড়ী, কত চলছে সারি সারি।
রাম তখন অবাক হয়ে লক্ষ্মণকে তা জিজ্ঞাসিলে,
লক্ষ্মণ বলে, ওগো দাদা, এখানে তো জনক রাজা
জনকের আছে একটি বেটী তাহার রূপে পরিপাটী।
পাহাড় ও পর্বত আকার করে রেখেছে ধনুক তৈয়ার,
ধনুকের 'ছিলে' যে জন দিবে তাহার সঙ্গে বিয়ে হবে।
কথা শুনে রাম লক্ষ্মণ মিথিলায় করিল গমন,
মিথিলাতে গিয়ে রামের হল বিয়ে।
হাতে হাতে ঐ সীতাকে সঁপে দিল রামের হাতে,
রাম বেড়ায় দেশবিদেশে লক্ষ্মণ থাকে সীতার কাছে।
ও সীতা কেমনে হরিল রাবণ লঙ্কায় লয়ে গেল ॥ —নদীয়া

৫

তুমি মায়ের গুণে গেলে বনে, জীবনের জীবনের জীবন,
কাঁদে মা জননী পাগলিনী ধরা অচেতন।
নিশি প্রভাত কালে হবেন রাজা রাম গুণমণি,
এই কথা জানতে পেল কৈকেয়ী রাণী।
ওহে রাজা, বসে শুন করি আমি নিবেদন,
ভরত রাজ্যের রাজা হবে রাম বনবাসে যাবে,
চৌদ্দ বৎসরের কারণে রামচন্দ্রকে পাঠাও বনে।

এ কথা শুনে রাজা ভূমিতে পড়িল,
কৈকেয়ীর কথাগুলো শেলসম বিঁধিল।
ক্ষণ পরে চেতন হয় কৈকেয়ীকে ডেকে কয়,
আবার অচেতন হল রামচন্দ্র জানতে পেল,
পিতা মায়ের নিকটে আজ পড়েছে সংকটে।
দুই হস্ত ধরে তোলে পিতাকে বুঝায়ে বলে,
বাবা কোন দুঃখ নাই বনে যাইব নিশ্চয়।
কেঁদে বলে মা জননী, কোথা যাবে যাদুমণি,
বড় তপস্যার ফলে তোমায় পেয়েছিলাম কোলে।
মনের দুঃখ থাকলো মনে পাগল করে যাবে বনে,
বাবা জনমের মতন একবার দেখি চাঁদ বদন।
হায় বিধি একি হল মোর কপালে এই কি ছিল,
মায়ের দুই হস্ত ধরে রাম বুঝায় ধীরে ধীরে,
থাকগো মা ধৈর্য ধরে আসব চৌদ্দ বৎসর পরে,
পিতার আজ্ঞা পালনে আমায় যেতে হল বনে।
যত দুঃখ মা তোর অন্তরে দূর করব মা ঐ দ্বাপরে।
শ্রীকৃষ্ণ অবতার ঘুচাব মনের বিকার।
এই বলে, বিদায় হল, কৈকেয়ী মার কাছ গেল,
মা দাও গো বিদায় আমার দেরী নাহি সয়।
কৈকেয়ী বিদায় করে শোনেন যত শ্রোতা বরে,
যাবে যদি বনে তবে রাজবেশে কেনে,
খুলে পর জটা বাকল সাজাল জগৎ স্বামী পাগল,
কাঁদে সীতা আর লক্ষ্মণ রামের ধরিয়া চরণ।
কি বলব বিমাতারে সব কর্ম কপালে করে,
তুমি করলে দাসদাসী আজ হব বনবাসী।
এমন কথা না শুনিব আমরা তোমার সঙ্গে যাব।
সাজে এরাই তিন জন সীতা আর রাম লক্ষ্মণ।
ওস্তাদ জেকের বলে ভূমণ্ডলে সৎমায়ের এই গুণ॥ —ঐ

৬

তোর মাথায় দেখি সাপের ফণা, ও ভোলা নানা ॥
তুমি হর, তুমি হরি, তুমি জগৎপতি,
কৈলাস ধাম ছেড়ে কেন শ্মশানে বসতি।
ত্রেতায় রাম অবতারে হনুরূপ ধারণ করে,
তুমি সীতা উদ্ধারিলে।
রাবণের বাণ শক্তিশেলে, লক্ষ্মণ পড়ল রণস্থলে।
লক্ষ্মণ হইল কাতর শ্রীরাম কাঁদিল বিস্তর।
এই বলে রোদন করল শুষেণ বীরের কাছে গেল,
শুষেণ বলেন, রাম, তুমি করো না ক্রন্দন লক্ষ্মণ পাইবে জীবন।
বিশ্বলী করবী এনে দাও বেটে পরাণে।
গন্ধ মদনে আছে হনুমানকে হইবে যেতে,
আজ্ঞা দিল নারায়ণ হনু করিল গমন,
গন্ধ মদনে গেলে ঔষধের নাম গেল ভুলে
হনু করে অনুমান, বুঝি বিধি হল বাম।
মনে মনে যুক্তি করে পর্বত নিল মাথায় করে,
পর্বত এনে যখন দেয়, শুষেণ ঔষধ খুঁজে নেয়।
সে ঔষধ করিয়ে বণ্টন লক্ষ্মণকে করাল ভক্ষণ।
লক্ষ্মণ জীবন পাইল রামের মন খুসি হল। —ঐ

৭

সাঙ্গ যুগের রঙ্গ হেরে আশঙ্কায় প্রাণ হয় আতঙ্ক,
মসজিদে পড়েনা আজান মন্দিরে বাজেনা শঙ্খ।
যেমন ব্রজের শোভা কৃষ্ণচন্দ্র নদের শোভা গোরা,
নিশির শোভা শশী যেমন শশীর শোভা তারা।
ঐরাবতের ইন্দ্র শোভা যোগীর শোভা জটা,
ব্রাহ্মণের পৈতা শোভা কপালের শোভা ফোঁটা।
মেঘের শোভা সৌদামিনী জাতির শোভা কুল,
বনের শোভা বৃক্ষ যেমন বৃক্ষের শোভা ফুল।

ময়দানের পাহাড় শোভা চরের শোভা বালি,
সরোবরে পদ্ম যেমন পদ্মের শোভা অলি।
উদাসিনীর ভজন শোভা গৃহের শোভা ধনী।
নগরের শোভা যেমন অট্টালিকা বাড়ী,
বৈষ্ণবের কোপিন শোভা মোল্লার শোভা দাড়ি।
দাঁতের শোভা মিশির রেখা মাথার শোভা চুল,
হাটের শোভা কলরব তাঁতীর শোভা তুল।
যুবতীর পতি শোভা দ্বারের শোভা দ্বারী
পুরুষের শোভা বিদ্যা যেমন ঘরের শোভা নারী।
অন্ধকারে আলোর শোভা সমুদ্রের শোভা ঢেউ,
বাসর ঘরে দেখতে শোভা বেটা আর বউ। —ঐ

৮

চুপে চুপে রাবণ করে সীতাকে হরণ,
একেবার হল তার স্ববংশে মরণ।
চুপে চুপে ইন্দ্র গিয়ে গৌতমের স্ত্রী হেরে
সহস্র লোচন হ'ল কত দুঃখের পরে।
চপে চুপে ইন্দ্র হ'তে বুধ ঠাকুরের জন্ম,
দেশ জুড়ে কলঙ্ক হ'ল করিয়া কুকর্ম।
চুপে চুপে আম ফল খেয়ে হনুমান,
গলে আঁটি বেধে তার যায় যায় প্রাণ।
চুপে চুপে অনিরুদ্ধ উষা হরণ করে
বন্ধন দশায় ছিলেন পড়ে বাণের কারাগারে।
চুপে চুপে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কেটে,
অশ্বত্থ অপমান অর্জুনের নিকটে।
চুপে চুপে রঘুনাথ বালি রাজায় বেঁধে,
নিজ বধের বর শেষে নিলেন অঙ্গেতে।
চুপে চুপে কচ গেলেন বিদ্যা শিক্ষা করতে
মেরে তার রক্ত খেল মিলে সব দৈত্যে।

চুপে চুপে রাবণের মূর্তি এঁকে ভূমে
জানকী গেলেন বনে বঞ্চিত হয়ে রামে।
চুপে চুপে কোম্পানী মোট জাল করে
রাজা কিশোর দত্ত পাইলেন জোচ্চরে।
চুপে চুপে প্রতাপ চন্দ্র রাজ্য ছেড়ে দিয়ে,
শেষে আর দখল পান নি আছেন ভেক হয়ে। —মুর্শিদাবাদ

৯

তোমার জন্যেতে করি নাই কি বল আমি,
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরেতে তুমি প্রিয়ে আমি স্বামী।
সত্য যুগে ছিলাম মোরা লক্ষ্মী-নারায়ণ
হরপ্রিয়া পুজতে গিয়ে যুগল চরণ,
ত্রেতায় রাম অবতারে জন্ম দশরথের ঘরে,
জনকের ধনুক ভাঙা পণ তোমার তাও কি নাই স্মরণ।
জনক রাজার ধনুক ভেঙে তোমায় আমি করলাম বিয়ে,
বিমাতার কুমন্ত্রণা বশে আমি গেলাম বনবাসে।
সেখানে পাপিষ্ঠ রাবণ সীতাকে করিল হরণ,
সেখানে পড়িয়া বিপদে মোরা বেড়াইলাম কেঁদে।
প্রধান ভক্ত ছিল আমার বীর হনুমান
অশোক বনে ছিল সীতা জানিল সন্ধান।
সেই সীতাকে উদ্ধারিতে সাগর বাঁধে বানরেতে
সেখানে অস্ত্রযুদ্ধ করে রাবণ স্ববংশেতে মরে।
তার পরে দ্বাপরের কথা শুন দিয়া মন,
বৃন্দাবনে রাধা প্যারী শ্রীনন্দের নন্দন।
নন্দ আমার পালন পিতা বসুদেব জন্মদাতা
পিতা-মাতা কারাগারে এ দুঃখ জানাবো কারে
ননীচুরি বসন চুরি মস্তকে ধরেছি গিরি
রাধার পুরাতে বাসনা নাম ধরি কেলে সোনা।
ছদ্ম বেশে বৈদ্য সেজে সত্য করলাম ব্রজের মাঝে,
রাধার কলঙ্ক ঘুচায় তোমার তাও কি মনে নাই।

তোমার ঋণ শুধিবার তরে ডোর কোপিন পরেছি আমি
ওস্তাদ মোল্লা বলে ভূমণ্ডলে নারীর কূলে পূজা স্বামী ॥

১০

এ জগতে সবদেশেতে কাপড়ের সম্মান
ভারত, চীন, জাপান আর জার্মান
ছত্রিশ জাতির নাইক গতি হিন্দু মুসলমান,
ওরে ভাই বৌদ্ধ শিখ খ্রীষ্টান।
কাপড় বিনে এই ভুবনে নাই মানবের গতি
কোথা থেকে হল এই কাপড়ের উৎপত্তি।
প্রথমে স্বর্গেতে ছিল আদম সফিউল্লা পেল
শয়তানের দাগাতে আদম যখন খাইল গন্দম
খোদাতালা নারাজ হল স্বর্গের সাজ কেড়ে নিল
আঞ্জিরা গাছের পাতায় আদম ইজ্জত ছাপায়
তারপরেতে এই ভাবেতে পয়দা কাপড় এই ভারতে
রাঙা, কার্পাস ও শিমুল গাছে উৎপত্তি হয় তুল
এদেশ ওদেশ বিদেশ হতে জন্ম তুলার এই ভারতে
ভারতের হিন্দু মুসলমান দিতেন বিলেতে চালান
অজ্ঞ যত ভারতবাসী বিলাতীদের বুদ্ধি বেশী
তারা খাটায়ে কৌশল করলো সুতো কাটার কল।
কত শাড়ী আরও ধূতি তাহার নাম ছিল বিলাতি,
তারপরেতে এই ভারতে ইংরাজেরা এল
বাণিজ্য করিতে এসে রাজ্য কেড়ে নিল।
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় মিল বসাল সব জায়গায়,
মিলের যত নাম শুন আমি তা বলি সামান্য ;
মিলে লক্ষ্মী-নারায়ণ মিলের শুন বিবরণ,
মিলেতে নাম রামপুরিয়া বঙ্গলক্ষ্মী বেলঘরিয়া,
মিল আছে ঢাকেশ্বরী, মিল আছে বঙ্গশ্রী,
কটন মিল, মোহিনীমিল, অরবিন্দ আর মণীন্দ্র,
লীলাময়ী আর বাসন্তী আছে, নামেতে জয়শ্রী,

সিঙ্গাপুর আর ভাগলপুর, পাবনা আর শান্তিপুর,
ও মিল বাংলার বাহিরে মিল আছে সব শহরে।
বর্তমান যুগে কত কাপড়ের নাম,
একে একে বলি শুন হিন্দু মুসলমান।
কাপড়ের দোকানে লেখা নামে শাড়ী চন্দ্রলেখা,
কত সুপার ফাইন ধুতি, কত সেনগুপ্ত বাসন্তী,
নামে ধুতি পশুপতি, ৫৩৩ নম্বর ধুতি,
কাপড়ের কত আছে নাম বলে কে করে সুমার।
হ্যাণ্ডলুম আর পাওয়ার লুম তাঁতের শাড়ী কত রকম,
যত আপ-টু-ডেট নারী পরে কলেজ পেড়ে শাড়ী।
কাপড় যদি না থাকিত মানুষ হ'ত বেইজ্জত,
কাপড় যে দেশেতে নাই তারে নেঙটার দেশ কয়।
কাপড় হ'তে এ ভারতে হচ্ছে কত কাজ
কাপড় কেটে সেলাই এটে গায়ে দেবার সাজ।
সুট, কোট-সার্ট, সুয়েটার গেঞ্জি, মাফলার আর আণ্ডার,
নেঙটা মোজা, জুতার ফিতা, তার ভিতরে আছে সূতা।
যত ভদ্রলোকে জড়ে গলে তারে আবার নেকটাই বলে,
কত পায়জামা পাঞ্জাবী, মুসলমানের মাথার টুপী,
বালক বালিকাগণে পরছে কাপড় জনে জনে
কত প্যাণ্ট পেনি ফ্রক কাপড়ের তৈরী হচ্ছে ব্যাগ।
চুল বাঁধিবার রঙিন ফিতা তার ভিতরে আছে সূতা,
যত ভদ্রলোকের মেয়ে নেট বুনে সূতা দিয়ে।
সেমিজ, ব্লাউজ, টাইট বডি, পরছে যত ইয়াং লেডি।
কত সায়া পেটী কোট তার সূতার আছে ডুরি,
কাপড়ের তৈরী হয় ছাতা, আমি বলি শোন শ্রোতা।
রোদে আর বৃষ্টি ঝড়ে এই কাপড়ে রক্ষা করে,
যারা বিষ্ণু-পরায়ণ পরে গেরুয়া বসন,
বৈরাগী ফকিরের মোল্লা, সূতোয় গাঁথা নামের মালা,
মুখে হরি হরি বলে আবার কপনি আঁটা তলে।

ঋতুমতী হলে রমণী, তাতে লাগে কাপড়ের কানি,
হলে সন্তানের উৎপত্তি সন্তান বিনে নাইক গতি,
ছেলে যখন ভূমে পড়ে জননী ন্যাকড়াতে জড়ে ;
ন্যাকড়ার শল্‌তে তৈরী করে আবার জ্বালায় আঁতুড় ঘরে।
এই কাপড়ের যত গুণ বলতে মানুষ হবে খুন
কাপড়ে তৈরী হয় মশারী আমি যাইগো বলিহারি
জনমে মরণে কাপড় কয়
সঙ্গের সাথী হবে সাদা থান ॥ —ঐ

১০

প্রথম ছিদ্রেতে যায় পাষাণ গলিয়া,
দ্বিতীয় ছিদ্রেতে ধবলী ফিরে উর্ধমুখী হইয়া।
তৃতীয়ে মায়ের প্রাণ প্রবোধ মানায়।
চতুর্থে যমুনার জল উজান ধায়।
পঞ্চমেতে যাইয়া ধ্যানে ভঙ্গ হয় মুনি।
ষষ্ঠেতে গোপীর প্রাণ করে টানাটানি।
সপ্তমেতে মৃত্যু তরু গুঞ্জরিত হয়।
অষ্টমেতে পশুপক্ষী সকলে ফিরায়।
নবমেতে অনিবার শব্দ বিমোহন,
দশমেতে পেলে প্রাণ দান কোয়াগণ।
গোবিন্দ দাস বলে এইরূপ নাও বাঁশী,
সর্বচিত্তে আকর্ষীয় শ্রবণ ও পরশী। —ঐ

১১

নিম্নোদ্ধৃত আলকাপের ছড়াকে ঠেস্ পাঁচালী বলে—

খেজুরকে খোরমা বলে দেখেছ ভাই কোনকালে।
দেখেছ ভাই কোন কালে শুনেছ ভাই কোনকালে ॥
খেজুর ফল হয়গো আটা খোরমা ফল হয় গো গোটা।
তোর এক কিলে ভাঙব মাথা থাকতে হবে পায়ের তলে ॥
খেজুর ফল রোগীতে খায় খোরমা ফল সকলে নেয়।
তারে দুধে চিনিতে খায় মিল কেমন খোরমা ফলে ॥

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ভূমি সৃষ্টি করেছেন যিনি।
সত্য ভাবে বল শুনি কি ভাবে সৃজন করিলে॥
পাতাল কি ব্যাঙের মুতে, তোরে গান শিখালো কোন পণ্ডিতে।
কথা বলিস্ শাস্ত্রমতে নইলে বাঁচবি নাকো কোন কালে॥ —ঐ

১৩

নররূপে জন্মিল প্রভু নারায়ণ, বানর রূপেতে জন্ম নিল দেবগণ,
বিধাতা বলেন শুন যত দেবগণ যে যেথা বানরী পাও কর আলিঙ্গন।
এক বানরীতে রতি ইন্দ্রসূর্য করে দুই পুত্র জন্মিল তাহার উদরে।
হইল ইন্দ্রের তেজে বালি কপিবর সুগ্রীব বীরের জন্ম দিলেন ভাস্কর
কিস্কিন্ধ্যার ফলমূল খাইতে রসাল ফলমূল খায় দোহে বিক্রমে বিশাল
তেজ হইতে তেজ বাড়ে সম্পদ হইল বালির পুত্র কুমার অঙ্গদ
হইল ব্রহ্মার তেজে মন্ত্রী জাম্বুবান, হইলেন পবনের তেজে বীর হনুমান।
হেমকুট নামে কপি বরুণ নন্দন পঞ্চপুত্রে যমের সে সম দরশন,
জন্মিল শিবের তেজে কেশরী বানর দিনে দিনে বাড়ে যেন শাল তরুবর।
অগ্নিতেজে হইলেন নীল সেনাপতি কুবেরের তেজে জন্ম বানর প্রমাথি।
শুষেণের জন্ম হয় ধনন্তরী তেজে অহি বিদ্যা বিশ্বশাস্ত্র দিল তার মাঝে।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র হইল শুষেণ নন্দন চন্দ্রতেজে দধিগণ হইল তখন।
প্রত্যেক বর্ণিলে হয় পুস্তক বিস্তর এক এক দেবের তেজে এক এক বানর,
কৃত্তিবাস পণ্ডিত যে সুখী সর্বদণ্ডে,
বানরের জন্ম এবে গায় আদি কাণ্ডে॥ —ঐ

আলকাপের রঙ্

১

ছড়াদারগণ আলকাপ গান করিতে আরম্ভ করিয়া ছড়া বলে ও মাঝে মাঝে 'কমিক' বা রঙ্ দিয়া শ্রোতাদের মাঝে হাস্যরসের আসর জমাইয়া তোলে—

নারী— আর কতদিন থাকবো বন্ধু তোমারি আশায়,
বিরহেরি এত জ্বালা আর কি সহা যায়॥

চাকরি কর মিলেটারী আমায় করে পর,
একলা ঘরে কেমন করে থাকবো ছেড়ে বর।
আমায় নিও সঙ্গে করে হে॥

পুরুষ— কেঁদ না কেঁদ না ধনী করবো না রে পর,
ক্যাজুয়াল লিভের পাব ছুটি আসব দুদিন পর,
শোনেক শোনেক সোনার কন্যা হে॥

নারী— পরাধীন হয়েছ, বন্ধু, ছাড়ব নাকো আর,
সঙ্গে ধাব জড়িয়ে রব হে, বন্ধু, ভাড়া নিয়ে ঘর।
গলে গলে রইব বন্ধু হে॥

পুরুষ— পরাধীনের এত জ্বালা কি বলিব আর,
ডিউটি নিয়ে থাকি, কন্যা, তোমায় করে পর
এবার ছেড়ে দিয়ে আসব কন্যা হে॥

নারী— ওস্তাদ সাগর আলি ভেবে বলে চাকুরে স্বামীর যার,
অঝোরে ঝরিছে আঁখি হে, বন্ধু, প্রেমের অনাচার।

পুরুষ— সবুর করে থাকো কন্যা হে॥ —মুর্শিদাবাদ

২

পুরুষ— আমি তো প্রেমের মাঝি ভাই,
প্রেম-তরঙ্গে প্রেমের ঘাটে প্রেমের ডিঙ্গা বাই।

নারী— কোন বা দেশে বাড়ী হে, মাঝি, কোন বা দেশে ঘর
কে বা তোমার মাতাপিতা কেবা আপন পর।

পুরুষ— মাতাপিতা জন্মের দাতা হে, কন্যা কর্মের কেহ নয়,
নারী হয়ে প্রশ্ন কর একি অবিচার, হে কন্যা, একি অবিচার।

নারী— ঠিক বলেছ মনের কথা হে, মাঝি, নৌকা বাঁধ ঘাটে,
কাঁখের কলস রইলো কাঁখে হে যাব তোমার সাথে।

পুরুষ— তুমি হ'লে রাজার কন্যা হে, আমি ঘাটের মাঝি,
তুমি যাবে আমার সাথে হে, মরি প্রাণের ভয়ে।

নারী— যার সাথে যার মন মজে হে, মাঝি জাতির বিচার নাই,
আমি যাব তোমার সাথে হে, মাঝি ভয়ের কারণ নাই।
ওস্তাদ যমের বলে ভুমগুলে দেরে প্রেমের জয়॥ —ঐ

৩

পুরুষ— দখিন সমীকরণে অঙ্গের বসন হিল্লোলে দোলাই,
গন্ধে পরাণ আকুল করে রামধনুকে রঙ্ মেশায়।

নারী— এস হে বিদেশী, বন্ধু, অভিমানটি রাখ,
কোথায় তোমার বাড়ী বন্ধু কোথায় তুমি থাকো হে
কাজল কাল রূপটি কেন ঢাকো।

পুরুষ— চিনতে কেন পারবে প্রিয়ে বহুদিনের দেখা,
ফুলের দেশে থাকি আমি ফুলকুমারীর সখা হে,
জনম গেল কাঁদতে একা হে।

নারী— ভ্রমর বন্ধু মুখে মধু, মধু মুখের কথা,
অসময়ে এলে তুমি সময়ে যাও কোথা হে,
মরমে মরমে ব্যথা হে।

পুরুষ— তোমা ছেড়ে কোথাও যেতে মন তো আমার চায় না,
যখন আমার আসার সময় তখন তোমায় পাই না হে,
ফুলে যখন মধু রয় না হে।

নারী— এস, হে পরাণ বন্ধু, বস আমার সনে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো প্রেম আলিঙ্গনে হে,
জেকের আলির শুভ মিলনে।

উভয়ে— ফুলের গন্ধে ভ্রমর ছন্দে বিশ্ববাসীর মন ভোলায়॥

৪

নারী— রোজ দুবেলা নতুন খেলা হে, বন্ধু শিখলে আবার কোতি,
আমি যে অবলা নারী বুঝিতে না পারি, বন্ধু হে॥

পুরুষ— কদম তলায় বাজাই বাঁশী হে কন্যা তোমার প্রেমের লাগি,
বাঁকা চোখের আঁখির ঠারে টিকতে না পারি কন্যা হে॥

নারী— কদম তলায় বাজাও বাঁশী হে, বন্ধু, লাজ নাইক মনে,
পঞ্চ প্রেমে আছি বাঁধা আসিব কেমনে বন্ধু হে॥

পুরুষ— তোমায় ভালবাসি কন্যা হে, তুমি প্রাণের বৈরী,
তুমি হও যমুনার জল আমি ডুবে মরি, কন্যা হে॥

নারী— ও কথা বলো না বন্ধু হে, থাক ধৈর্য ধরে,
নিশি যোগে তোমায় নিয়ে হইব দেশান্তরী বন্ধু হে ॥
পুরুষ— সাগর আলি ভেবে বলে হে, কন্যা মন করিলে চুরি,
নিশি যোগে তোমায় নিয়ে হইব দেশান্তরী, কন্যা হে ॥ —ঐ

৫

নারী— আরে ও বন্ধু শোন মুখের বাণী—
চার প্রশ্নের উত্তর দিলে তোমায় আজকে মানি, বন্ধু হে।
পুরুষ— চার প্রশ্ন কেমন কন্যা হে, তুমি বল আমার কাছে,
এ প্রশ্নের উত্তর দেব আজ দশ সমাজের মাঝে কন্যা হে।
নারী— চারিটি কালোর প্রশ্ন দিলাম হে বন্ধু, বল আমার কাছে,
এই চার কালোর উত্তর দিলে যাবো তোমার পাশে বন্ধু হে।
পুরুষ— কাক কালো, কোকিল কালো হে কন্যা, কালো মাথার বেণী,
তার চেয়ে অধিক কালো তোমার চোখের মণি কন্যা হে।
নারী— কালো প্রশ্নের উত্তর পেলাম হে বন্ধু, তাহা কানে শুনি,
চারিটি সাদার উত্তর পেলে তোমায় আমি মানি, বন্ধু হে।
পুরুষ— বক সাদা, বস্ত্র সাদা, হে কন্যা, আরও সাদা টাকা,
তার চেয়ে অধিক সাদা তোমার হাতের শাঁখা কন্যা হে।
নারী— বেশ উত্তর দিলে বন্ধু হে, আমার শুনে প্রাণটি জুড়ায়,
তিতোর মধ্যে চারিটি তিতোর উত্তর দেওয়া চায়, বন্ধু হে।
পুরুষ— নিম তিতো, নিসিন্ধা তিতো, হে কন্যা, আরও তিতো মহাকাল,
তার চেয়ে অধিক তিতো, দুই সতিনের ঘর কন্যা হে।
নারী— আরও প্রশ্ন আছে বন্ধু হে, বন্ধু বলি তোমার কাছে,
চার মিষ্টির নাম কর এখন আমার পাশে, বন্ধু হে।
পুরুষ— গুড় মিষ্টি, মধু মিষ্টি, হে কন্যা, আরও মিষ্টি চিনি,
তার চেয়ে অধিক মিষ্টি তোমার মুখের বাণী, কন্যা হে। —ঐ

আলকাপের ছড়াদার রচিত গান

কৃষ্ণের উক্তি (বাসর সাজান সংবাদ)

১

রাধাকে বলো বৃন্দে সই হে, রাখিতে কুঞ্জের বাসর সাজাইয়া
যাব আমি গভীর রাতে উদয় হব সেই কুঞ্জেতে
রাধা রাখে যেন ফুলবিছানা পাতিয়া।
যা কিছু তার মনের আশা বড় রস তার প্রেম-পিপাসা
ভালবাসার আশা দিব মিটাইয়া ॥
ওস্তাদ সমীরুদ্দীন ভাবছে সদা প্রেমের পথে এই তো রস
সবে শুদ্ধ প্রেমে থাক সদা মজিয়া ॥ —মুর্শিদাবাদ

কৃষ্ণের উক্তি

২

সই রে, ভালবাসা সুখের আশা জানাব কারে,
জানাব কারে সইরে শুধাব কারে ॥
যার সঙ্গে যার ভালবাসা সে বিনে কি পুরে আশা,
যেমন রাধা আমার ভালবাসা, হৃদয় মাঝারে ॥
তাকে ছেড়ে ওলো ধনি যে সুখেতে আছি আমি
আমার বলতে কথা বুক ফেটে যায়, বৃন্দে, তোমার হুজুরে ॥
আমি তো সই তোমাদেরি সখিগণের আজ্ঞাকারী,
আমি তোদের প্রেম-ভিখারী ঐ ব্রজপুরে ॥ —ঐ

কৃষ্ণ উক্তি

৩

কোথায়, হে রাধিকা সুন্দরী, ওহে বৃন্দে নারী।
সাজাতে বলিয়া বাসর সুখের নিশি করিছে ভোর
অপরাধ মোর ক্ষম হে সুন্দরী।
আমার চন্দ্রাবলীর কুঞ্জবনে হইয়াছে কিঞ্চিৎ দেরী ;

আমার এই অপরাধে ক্ষমা কি দিবে না রাধে
শ্রীপদে স্থান দিও হে প্যারী ॥
রাধা, তোমার নামে ব্রজধামে সদায় বাজায় বাঁশরী ॥

বৃন্দের নিকট কৃষ্ণের উক্তি।

৪

সখি আজ আমারে বারে বারে দিও দুঃখ,
যাও ফিরে যাও বৃন্দে ধনী রাধাকে দেখাইব না মুখ ॥
শ্রীরাধার মানের তরে ভস্ম মেখে অঙ্গের পরে
ফিরলাম কত দ্বারে দ্বারে হইয়া বৈমুখ ॥
কান্ধেতে মান ভিক্ষার ঝুলি অঙ্গের উপর রামাবলি
একবার চাইলে না রায় নয়ন মেলি, আমারে বলিয়ে ভিক্ষুক। —ঐ

মৃত পতি লয়ে বেহুলার যাত্রা

৫

ভাসিলাম এখন আমি আজ একা দুখের সাগর নীরে ॥
আমি করি নিবেদন যত শ্রোতাগণ হরি বল বদন ভরে,
আমি বণিকা নন্দিনী ফুলের কামিনী ফুলোপরি উলু দাও রে
কহিছে অঘোর ছাড়িয়া এ ঘর বেহুলা ভেসে যায় রে ॥ —ঐ

৬

সত্য যুগে ছিলাম আমি লক্ষ্মী-নারায়ণ।
হরপ্রিয়ার পুজিতে গিয়া যুগল চরণ গো,
ত্রেতায় ও রাম অবতারে জন্ম দশরথের ঘরে,
জনকের ধনুক ভাঙ্গা পণ সেটা হয় নাকি স্মরণ গো।
জনকের ধনুক ভেঙ্গে তোমায় বিবাহ করলাম বনে,
বিমাতার কুমন্ত্রণা ঘটে আমি গেলাম বনবাসে গো।
কোথাকার পাপিষ্ঠ রাবণ সীতাকে করিল হরণ,
সেখানে বেড়ায় কেঁদে কেঁদে আমি পড়িলাম বিপদে গো।
প্রধান ভক্ত ছিল আমার বীর হনুমান,
অশোক বনে ছিলো সীতা করিল সন্ধান,

তোমাকে উদ্ধারিতে সাগর বাঁধে বানরেতে,
সেখানে অস্ত্র যুদ্ধ করে রাবণ স্ববংশেতে মরে।
তারপর দ্বাপরের কথা শুন দিয়া মন,
বৃন্দাবনে রাধার প্রিয়া শ্রীনন্দের নন্দন গো।
নন্দ হয় মোর পালন কর্তা, বসুদেব হয় জন্মদাতা,
পিতামাতা কারাগারে এ দুঃখ জানাবো কারে,
ছিলাম আমি ব্রজপুরে বেড়াই আমি ব্রজের দ্বারে দ্বারে,
ননী চুরি বসন চুরি মস্তকে ধরেছি গিরি,
ও নাম ধরি কেলে সোনা রাধের পুরাতে বাসনা
অন্য বেশের বৈদ্য সেজে শুচি করলো সে ব্রজের মাঝে,
ও রাধের কলঙ্ক ঘুচায় তাও কি মনে নাই।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরেতে তুমি প্রিয়া আমি স্বামী,
তোমার জন্যেতে, রাধে, করি নাই কি বল আমি। —ঐ

৭

এ জগতে সব জায়গাতে লোহারই সম্মান।
এলো ভারতে জাপান ও জার্মানি।
লোহার খবর ভারি জবর বলতে লাগে ধাঁধা।
লোহার হচ্ছে হাতুড়, নিহান, বাইশ, কুড়ুল, বাঁধা।
করাত আরো ভুমর আরি, ইস্ক্রুপ, কবজা তৈয়ারী,
কত কপাটের হাঁসকল, কামারের সাঁড়াশী।
বঁটি, নারিকেল কোরাকুন্নী, কত হাতা চিমটা ছরনী।
আরো ছাতার বাট, নাপিতের ক্ষুর, কাঁচি নরুণ পাটিসুচ।
এখানে কথা গেলাম ভুলে
চুড়ুনের মুখে লোহার গুলে
লোহার হয়রে জলই কাটা, গেরাপী জিনজিরী গাঁথা,
কপি যারে বলে সে তো মাস্তুলেতে ঝুলে।
লোহার হয়রে রেল-ষ্টীমার, লাইট হাউস করলেন তৈয়ার,
কত ঝাড় আর লণ্ঠন হ্যাচাক, ডেলাইট প্রদীপ গো।

লোহার হয় রে তীর বর্শা, আর রেল সড়কের খাম্বা
কত টাঙাইল তার দেখতে চমৎকার গো।
দেখ লোহা টকী হলে, কত রকমের লোহার কলে,
কত বাজনা বাজে হরেক তালে।
লোহাতে হয় কাজললতা, চাকু, কত জোলাদেরও মাকু,
লোহাতে হয় নাঙলের খিল ও তালা-চাবি, হ্যারিকেন,
দেখ, লোহা সারাঘাটে পুল বাঁধিল বুদ্ধির চোটে,
ও থাম বসায় সারি সারি লোহার জাফরি সারে সারে গো।
হায়রে, লোহার নাইকো সীমা নদী বেঁধে করল লুমার,
কত বন্দুক আরও সীক, আরও রেল লাইনের শিক
বাংলা গাড়ীর উলুয়া বন্দ্ ঘোড়ার মুখের লাগাম
কত জীনের রেকাবদল এলো কুশোর মাড়া কল
গরুর গলার হচ্ছে বালা কত রকমের ঝাঁটার গুলা
কত কাপড় সেলাই সূঁচ।
কর্মকাররা পয়সার লোভে কত তীরও তৈরী করে।
কত ছেলের হাতের বালা, তরকারী রাধা কড়া।
কি বলিব লোহার গুণ, হন্দরগুলি থাকে একমন,
কত আধমন দশ সের খুঁজলে মিলবে পাঁচ সের।
খুচরা বিক্রী করলে বাজারেতে ঢালো মিলে,
ও টাকার চোদ্দ আনা দাম ইংরেজের লেখা আছে নাম ;
লোহার হয় রে জালের গুটি, বিলে ফেললে মারা যায় পুঁটি
কত ডোমকলের ও ভারা,
আর লোহার কথা বলব কত ইস্ক্রুপ ডাইভার যত। —ঐ

আলকাপের সাময়িক গান

১

দেশে কেনেল এল হায় কি হোল পশ্চিমবঙ্গেতে।
কোন দেশে কেনেলের গোঁড়া জানাই সভাতে।

প্রথমেতে পশ্চিম দেশে কেনেলের গোড়া।
ধীরে ধীরে তাহা আমি জানাই আগাগোড়া গো।
পশ্চিম বাংলা সরকারে, দেশ জুড়ে খবর করে,
দেশে দুর্ভিক্ষ বা কেনে আমরা বুঝাতে নারি মানে গো।
শেষে বুঝতে পারল ভাই, কেবল ফসল ফলে নাই,
রোম চীন শ্যাম জাপানে দেখয়ে কেনেলের টানে,
তাদের কত ফসল ধরে, তারা কি উন্নতি করে গো।
এই বলে কেনেল ছাড়িল, তাইতে দেশে কেমেল এল
কথা জানাই ধরে ধরে এই সভায় প্রকাশ করে গো।
পাহাড় পর্বত বিল খাল কেটে করলে পয়মল,
কথা জানাই আমি ধরে, বাঁধ পড়ল মশানজোরে
মশানজোরে ১টি বাঁধ তৈয়ার হয়ে গেল গো।
সেই বাঁধের কথা কি বলব ভাল গো।
বাংলা এত লোক থাকিতে কেউ পারলে না বাঁধ বাঁধিতে,
পরদেশী লোক এল, এসে বাঁধের কার্য করে গেল,
কুলি খাটে দিনে রেতে, ইলেকট্রিকের আলো তাতে,
সেটা দিবস কি রজনী আমি কিছুই নাহি জানি,
মশানজোর যে বাঁধটি তৈয়ার হয়ে গেল গো।
সংক্ষেপেতে বাঁধের কথা প্রকাশ করা গেল।
সেখান হ'তে দিল ছাড়ি, এল বোদরা বাগান বাড়ী,
ছিল বনজঙ্গল ভারী এখন হোল ইন্দ্রপুরী,
জমীর উপর দিয়ে কেনেল চলে যাই,
কিছু বলবার উপায় নাই।
উড়ে পাশী ভাটিয়ালা কেনেল কেটে চলে তারা
কেবল মাটি কেটে যাই, তাদের বিশ্রাম বল্‌তে নাই,
গরীব দুঃখীর ছিল যারা কেঁদে তারা হোল সারা
যাদের ছিল অল্প জমি, জমি যাচ্ছে কমি, গো।
গভর্ণমেণ্ট দর বাড়াইল, আবেদন জানাইল
তোমার ১ বিঘা জমি তাতে হোক বা জমি কমি,

তোমার ১০ কাঠা থাকিবে ১২ মাস ফসল পাবে,
সকল অভাব দূরে যাবে ভাবনা থাকবে ভবেতে। —বীরভূম

তুলসী উক্তি

১

(মরমে) মরম ব্যথা আর সহে না কোমল প্রাণে।
এই তোমার উচিত হল, বিবেচনা নাই কি মনে।
ছি, ছি, লাজে মরি চিতে, চিতের আগুন জ্বালালে চিতে।
বিনা দোষে প্রাণনাথে, বধিলে বল কোন প্রাণে॥
তোমা বিনে কারেও জানি না, তোমারই ভিন্ন কয়েও জানি না।
তোমার ভক্ত আমরা দুজনা, জ্বালাই জ্বলি (হরি) নিশিদিনে।
কারেও তুমি করে নির্ধন, কারেও দিলে রাজ-সিংহাসন,
সতীর সতীত্ব হরণ, করলে হরি স্বভাব-গুণে॥

কৃষ্ণউক্তি—

আর আমারে পাগল করো না অমন নয়ন টানে,
কি কথা কও চোকে চোকে, তুমি জান আর মন জানে।
যখন যেখানে থাকি, তব চারু মুখ নিরখি,
হিয়াতে জড়িয়ে রাখি, মাখামাখি ঠিক দুজনে।
তোমার বাসনা জন্যে, আসতে হল তোমার স্থানে,
এ হল শুভ মিলন, ঠিক যেন হে মনের মতন,
তুমি আমি হলেম দুজন ছাড়াছাড়ি নাই কোন দিনে।

তুলসী উক্তি—

ওহে হরি বংশীধারি দাঁড়াও একবার বাঁকা হয়ে,
তোমার জীবন রাধা অঙ্গ, আধা সে রাধার বামে লয়ে,
ও রাধানাথ গাও রাধাগান, দিবানিশি সাধয়ে নাথ,
আমি যুগলরূপ হেরব হরি, বড় সাধ জাগে হৃদয়ে,
মুনিগণের শিরোমণি, যোগে ভাবে এ রূপখানি,
সেই রূপখানি সেই রূপধর মণি রাধার বদন চেয়ে,

ভক্তাধীন নাম ধরেছ নাথ, ভক্তে পূর্ণ কর হে কাম,
উপেন্দ্রের পাপ হৃদয়ে দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ হয়ে।
আই গো সখী জল আনিতে যায় গো যমুনায়,
কদম তলা করে থানা কালা বাঁশরী বাজাই।
চরণে চরণ ছাঁদা, মোহন চূড়াটি বাঁধা,
দেখলে আমার প্রাণ-বঁধুয়া জীবন জুড়ায়,
শ্যাম যে আমার ভুবন-মোহন, অবলার হৃদয় রতন।

২

পশু পক্ষী, মগ্ন হয়ে যার গুণ গায়।
যে হেরেছে শ্যামসুন্দরে, সেকি ঘরে থাকৃতে পারে,
সরম ভরম জলে দিয়ে চরণে বিকায়।

৩

কুলনাশা মূল মন্ত্র কোথা শিখে এসেছে,
দেখতে পেলে কুলবালা (অম্নি) পাগলা করেছে।
চাইলে শ্যামের বদন পানে, আর কি প্রাণে ধৈর্য মানে,
চেয়ে দেখ্ গো আমায় প্রাণে আমার কি আছে।
যা ছিল গো সব দিয়েছি, জন্মের মত বিকায়েছি,
ধরম ভরন সরম আমার সবি গিয়েছে।

৪

কুলবতীর পতি ছাড়া আর যে কিছু নাই।
ধর্ম কর্ম যত কিছু ঐ সে পতির পায়,
অবলা যে নারী জাতি, কেবল মাত্র পতি গতি,
সকল কষ্ট হয় গো নষ্ট, যদি বদন পানে চায়।
পতিরে সোহাগ বাণী, নয় অমৃত খনি, হতে সোহাগিনী
তার সম কেহ নাই।

৫

একা ঘরে কেমন করে থাকি গো আমি,
যে যাতনা পায় প্রাণে, জানে (তাই) অন্তর্যামী।

আমারে রাখিয়ে বাসে, পতি গেল পর বাসে
কত বা মনের হুতাশে, পুড়ে মরব গো আমি,
বল গো তোরা বল গো সখী, এ জীবন আর কেন রাখি।
পতির উদ্দেশে জীবন ত্যজিব আমি।

৬

ছল করে কল পাত্‌তে পারে নারী, ওদের ঐটা বাহাদুরী॥
মুখে বলে ভালবাসি গো, অন্তরে বিষের হাঁড়ি,
মন মাতান কয়ে ভাষা, বাড়ায়ে প্রেম পিয়াসী।
আশার উপর দিয়ে আশা শেষে মারে ছুরি।
তখনি শক্তিদায়িনী, তখনি বিশ্বাসঘাতিনী,
নারী ভুজঙ্গিনী দেয় গো গলায় দড়ি।

জীবের দশা দেখ ভগবান॥
কেমন করে থাক্‌বে বল গরীব দুঃখীর প্রাণ
দিনে রেতে খেটে খেটে দেহ হল মাটী হে,
রোদ বাতাসে জলে ভিজে মাঠে নিতুই,
খাটী হে মাঠে নিতুই খাটি॥
নিজের নাই দুকাঠা মাটি, কেবল চষি পরের মাটী,
হাড় কখানা করলাম মাটী দিন রাত্রি খাটি খাটি,
কোদাল কুপিয়ে তুলি মাটী দেখতে লাগবে দাঁতকপাটি,
টিকল না আর চাটি বাটি তকলিব হ'লে মুনিব চটি,
পিঠে পিটায় সটান লাঠি,
যাদের তরে এত খাটি তবু হ'তে নারলাম খাটি,
আঁটি খাঁটি বেঁধে দিলে ভরে নাকো পেট,
প্রভু তবু বলে শালা লেট।
যাক তাদের দয়ায় বেঁচে আছি॥
গরীবের কি গরব হে যেদিন আনব সেই দিনটি পরব।
পড়লাম দোকানদারের হাতে, কি মন্ত্রণা দিলে রেতে,
মানুষ বুঝি নাই দেশেতে,

এই দশা হোল শেষেতে,
দেখ্‌লে না কেউ চখেতে, গরীব চাষা এ জগতে
দেখতে নিতুই পায় গো ॥
আমরা প্রভু দিনের অধীন, চিনার দেশে সাজি অচিন,
মনটাকে করলে উদাসীন ॥
কণ্টোল বিকায় কেরোসিন, আধ ছটাকে চলা কঠিন
নুনের কতগুণ দামটি চতুর্গুণ।
ভেল মিশান সরিষার তেলে, একশো চল্লিশ টাকা দর বাড়ালে,
আগুন জ্বেলে দিলে চালে, সাড়ে তিন সের মুখে বলে,
পেটের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, খাটব বল কিসের বলে
একটু হিসাব করে দেখুন ভদ্রের সন্তান।
আমারা স্ত্রী পুরুষে রোজগার সারাদিন দশ আনা গো।
তারি ভিতর ছেলে মেয়ে আমরা দুজনা,
দুই সের চেলে পয়দা ফুরাই তেল নুন তরকারী ত নাই
ছেলে মেয়ের কি হয় উপায় ;
কাপড় কেনা ঘটিছে দায় দশ টাকায় হাত বুলায় মাথায়।
ধুতি বইতো শাড়ী নাই।
ভাতকাপড়ে কাঙ্গাল যে তায় হোল সোনার বাঙ্গালায়,
রক্ষা করে কে যে নাই কোথায় আছ দীন দয়াময়।
নিলাম তোমার চরণাশ্রয়, কর প্রভু দীন হীনে কর প্রভু ত্রাণ।

—বীরভূম

অন্নপূর্ণা ও শিবের পালা

১

কুঘটন ঘটনা আজ হবে মর্ত্যেতে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিপুরারির গর্ব নাশিতে।
সুসাধ্য হবে অসাধ্য অসুরাদি হব বাধ্য,
অসম্ভব ঘটনা আজি হবে কাশীতে।

নাশিব দেবের শক্তি প্রকাশিত নিজ শক্তি,
চিরস্থায়ী মম উক্তি, বইবে জগতে।
করিব অভিষ্ট পুর্ণ করাইব অন্নশূন্য,
হইবে দীন দৈন্য আমার শাপেতে॥
সবে হবে লক্ষ্মীভ্রষ্ট, অন্নাভাবে পাবে কষ্ট,
রইল মম কোপদৃষ্ট দুষ্টের পক্ষেতে। —বীরভূম

২

কি নাম তোমার কোথায় বা ধাম কও সত্য কথা।
কি কারণে এলে তুমি যাবে বা কোথা,
রুক্ষ কেশে রুক্ষ বাসে, কেন এলে মম বাসে, কি অভিপ্রায়।
স্বপ্রকাশে বল না হেথা,
কি নাম ধর ও মহাজন, এক্ষণে বা কি প্রয়োজন,
কি কারণে ঝরে নয়ন, কি পেলে ব্যথা।
কার গর্ভেতে জন্ম নিলে, কেবা তোমার জন্ম দিলে,
কেন বা এখানে এলে, কেন হেট করে মাথা।

৩

কি কারণে ভিক্ষার ঝুলি নিলে স্কন্ধেতে,
কাপালি করিতে হাড়ের মালা কণ্ঠেতে।
কি কারণে করে ত্রিশূল, বল বল এ বেশের মুল,
উজল করে এলে কোন ফুল, উদ্ভব হও কোন কুলেতে।
এ দৈন্য বেশ কেন হেরি তোমার ভারি,
কবে হতে হও ভিখারী, বল সাক্ষাতে।
শুধায় একটি কথার সূত্র, আছে তোমার কন্যা পুত্র,
কেবা দারা কে হয় মিত্র, কেন দীনের বেশেতে॥

৪

এখানে ভিক্ষা কি পাবে ও ত্রিপুরারি।
ইচ্ছামত নাওগে কুচুনি বাড়ী॥
যে তোমারে ভালবাসে, যাও, ভিখারী, তারি বাসে।
ভিক্ষা দিবে হেসে, রসিকা নারী॥

যাও না তুমি তারি ঘরে, যারে রাখ শিরোপরে,
কেন বা পাঠায় তোমারে, আমার পুরী,
যেখানেতে পাও আনন্দ, যাও হে তথায় সদানন্দ,
উপেন্দ্র কয় দাও, মা, ভিক্ষা তুমি রাজ-রাজেশ্বরী।

৫

কি গর্বেতে গর্ব কর, ওহে মহেশ্বর।
নাইক ঘরে অন্ন কণা ফুটনি বিস্তর।
সতী নারীর গাত্রাভরণ, যোগাড় সাধ্য নাই ত্রিলোচন,
গঙ্গানামে সতিনীকে রাখ শিরোপর।
এই ত তোমার বুদ্ধির ঘটা তেল অভাবে মাথায় জটা,
বস্ত্রাভাবে চর্ম আঁটা রয় কটি পরে।
ছি ছি ভাঙ্গড় লাজ লাগে না, ঘৃণাতে মোর প্রাণ বাঁচে না।
আমার সঙ্গে ঝগড়া নানা তখন মূর্তি ভয়ঙ্কর।
দারা পুত্র পায় না অন্ন, কুচুনি পাড়ায় মান্যগণ্য,
উপেন্দ্র কয় কেন গো মা এত কট্‌ত্তর।

৬

এস এস নাও হে ভিক্ষা নব ভিখারী,
তোমার জন্য আছে অন্ন স্বর্ণ পাত্র ভরি।
কে বুঝিবে তব তত্ত্ব, কে বুঝে তোমার মহত্ত্ব,
তব নামে যেবা মত্ত সভ্য সেই অধিকারী।
ঐ পদেতে শরণ নিচ্ছে না বুঝে কত বুলেছি,
ঐ চরণে দোষ করেছি, আমি অবলা নারী।
অদ্য অক্ষয় অন্ন দানে, করব তুষ্ট মনে মনে,
স্বর্গ মর্ত্য ত্রিভুবনে অন্ন বিতরি॥
দ্বিজ উপানন্দ ভণে বড় আশা আছে মনে,
একবার বস হরের পাশে, আমি হেরি, শঙ্করি॥

শিবের উক্তি—

১

কোথায় যাব কি করিব ভেবে বাঁচি না,
অন্নাভাবে ক্ষুণ্ণ প্রাণ বড়ই যন্ত্রণা।
প্রজ্জ্বলিত জঠরানল, মন প্রাণ সদা বিকল,
সকলের নাস্তি সমবল হয় বিড়ম্বনা।
বল, নন্দী, কি করিব, কোথায় গেলে অন্ন পাব,
কি করে জীবন ধরিব হয় না ধারণা,
সহ্য হয় না অন্নদুঃখ কে ঘটাইল এ দুর্ভিক্ষ
ধ্বংস বুঝি জীব পক্ষ, কেহ বইবে না।
শুন ওগো, কাশীশ্বরী, তোমার দ্বারে ভিক্ষা করি,
উপেন্দ্র কয় চরণ দাও ত্রিনয়না॥

২

এ বেশেতে চিন্তে কেন পারবে, শঙ্করী,
এসেছি তোমার কাছে সঙ্কটে পড়ি।
অসম্ভব বড় শুনিলাম, জিজ্ঞাসিলে আমারি নাম,
এখন আমার বিধি যে বাম বল কি করি॥
যার যখন হয় বিড়ম্বনা, আত্মীয় তার কেউ থাকে না,
চিনেও সে চিন্তে পারে না তায় হল আমারি॥
যে দুঃখ পাচ্ছি অন্তরে, সে কথা আর বলব কারে
সাধে কি মোর আঁখি ঝরে, এখন উপায় কি করি।
সে জ্বালা ঘুচাবার আসে তায় এলাম গো তোমার বাসে,
ভিক্ষা নিব তোমার পাশে আমি ভিখারী॥

৩

ভিখারীরে কটুবাক্য বলিলে কেনে,
সতী হয়ে পতি নিন্দা করলে কেমনে।
এই কি তোমার সতীর গর্ব সে গর্ব আজ হবে খর্ব,
ক্ষণে প্রকাশ হবে সর্ব শুনবে সব জনে।

আমার নাইক পিতা, নাইক মাতা, নাইক বন্ধু, নাইক ভ্রাতা,
শুনলে পরে ধরবে মাথা ব্যথা পাবে গো প্রাণে।
উপস্থিত হয় গো জননী জন্মান্তরে হয় রমণী।
এই ত বিধির বিধান জানি, তায় শুধায় কেনে ॥

৪

ছি ছি আমি লাজে মরি কি কথার ধারা।
কি কারণে কোথা যায় গো কুচুনি পায় কেন।
অন্যায় বল, ধনি, মাথায় রাখি কোন্ রমণী,
কিসে বা দেখ ফুটস্তি ওগো প্রখরা
তোমার মর্ম সবই জানি, তুমিও পাষাণ-নন্দিনী,
কোন গরবে গরবিণী, হয়েছে তারা।
নারী জাতির স্বভাব মন্দ, কথায় লাগাই দ্বন্দ্ব
স্বামীর প্রতি সদাই সন্ধ কলহের গোড়া।
প্রবলা প্রখরা নারী তুমি শঙ্করী অন্নপুর্ণা,
হের আমি ভিখারী,
স্বামীর পেটে নাইক অন্ন, নাম ধরেছ অন্নপুর্ণা,
হল বুঝি মতিছন্ন, (তায়) ব্যঙ্গ করছো সুন্দরী ॥
চিরদিন যায় না সমানে একথাটা সবে মানে,
ভেবে দেখ মনে কথা আমারি ॥
সে কথা যাক্ দাও না ভিক্ষা কর আমার জীবন রক্ষা
কর না গো আর প্রতীক্ষা যন্ত্রণায় মরি।
কলহে হায় আনন্দ, হেসে কহে উপানন্দ,
যেমন ক্ষেপা তেম্নি ক্ষেপী আ মরি মরি ॥

৫

শুন শুন হৃদিশ্বরী অন্যায় বল না।
তোমার লেগে সাজি যোগী, অন্য জানি না।
শ্মশানে মশানে আমি, ধ্যানে সদাই তোমায় দেখি
তব মুর্তি হৃদে রাখি করি উপাসনা।

শুন ওগো কালী ঘুচাও মম মন কালী,
উপেন্দ্র কয়, ওমা কালী, ঘুচাও মনের ভাবনা।

আলকাপের ডাক ছড়া

আগে বন্দী উমাশক্তি যাহার কৃপাতে সব উৎপত্তি,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্রী মুক্তি ভক্তি প্রদায়িনী
তারা প্রণমি তব চরণে তব গুণ বর্ণি কি গুণে
তব গুণে আগুনে পুড়ে হলাম সারা ॥
মহামায়া কি মায়াতে, ফেলে দিলি, মা, অধম পুত্রে
মা, দিবা রাত্র কর্মসূত্রে টান, তোরে ডাকা হলো কই,
ডাক দিলি না ব্রহ্মময়, ধোঁকাই বোকা সেজে রই
হৈ চৈ বই কে জানে ॥ —বীরভূম

ই

ইতু পূজার ছড়া

সমগ্র অগ্রহায়ণ মাস ব্যাপিয়া পশ্চিমবঙ্গের কুমারী কন্যাগণ ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবনের সুখসমৃদ্ধি কামনায় সূর্য বা আদিত্যের উদ্দেশ্যে যে ব্রত পালন করিয়া থাকে, তাহা ইতু ব্রত নামে পরিচিত। সেই উপলক্ষে গানের সুরে কতকগুলি ছড়া আবৃত্তি করা হয়। তাহাই ইতু পূজার ছড়া। তবে ইহাদিগকে প্রকৃত গানের মধ্যে স্থান দিবার মত কিছু নহে।

১

ইতি ইতি নারায়ণ,
তুমি ইতি ব্রাহ্মণ।
তোমার শিরে ঢালি জল,
অন্তঃকালে দিবে ফল॥

ইঁদ পরবের গান

বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে সামন্তরাজ অথবা স্থানীয় ভূস্বামীদিগের মধ্যে প্রচলিত ভাদ্রমাসের এক উৎসবের নাম ইঁদ উৎসব বা ইঁদ পরব। এই উপলক্ষে শাল গাছের একটি সুদীর্ঘ খুঁটি আনুষ্ঠানিকভাবে পোঁতা হয় এবং তাহা ঘিরিয়াই নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই উৎসব জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত না থাকিলেও রাজভক্ত প্রজাগণ ইহাতে নানা ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং নৃত্যগীত দ্বারা উৎসবের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। এই শালের খুঁটিকে বর্তমান হিন্দু প্রভাবিত যুগে এই অঞ্চলে ইন্দ্রধ্বজ প্রতিষ্ঠা উৎসব বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। কিন্তু মূলতঃ ইন্দ্র কিংবা কোন বৈদিক দেবতার সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্কই নাই। এই শালের খুঁটির উপরে একটি বিশাল ছাতা বাঁধিয়া দেওয়া হয়; সেইজন্য ইহা জনসাধারণের মধ্যে ছাতা পরব বলিয়াও পরিচিত। মনে হয়, ঐন্দ্রজালিক উপায়ে অতিবৃষ্টি নিবারণের জন্য ভাদ্রমাসে উৎসবের অনুষ্ঠান হইত। পরে হিন্দুধর্মের প্রভাব বশতঃ ইহাকে

ইন্দ্রের ধ্বজা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বৈদিক কিংবা পৌরাণিক কোন কাহিনীতে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ধ্বজা কিংবা দণ্ড প্রতিষ্ঠা করিবার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাংলার অন্য কোথাও ইহা প্রচলিত নাই।

এই উৎসব উপলক্ষে যে গান গাওয়া হয়, তাহা ঈদ পরবের গান, কিংবা ছাতা পরবের গান বলিয়া পরিচিত। ইহা বাংলার আনুষ্ঠানিক (Calendric) বা পার্বণ সঙ্গীতের অন্তর্গত। (ছাতা পরবের গান দেখ)

১

বাড়ীর নামোয় বেশ চলে, দুনিয়া সবল,
ধুঙ্গা উঠে সিন্দূর বরণ। —বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

তাল তলাতে তাল তলাতে কে করেছে পথ গো,
ইত বটে ঈদ দেখা লোক গো ! —ঐ

৩

ঈদ দেখ্‌তে গেলি, দাদা, ঈদের বড় রাগ গো !
ডেগে ডেগে পঞ্চ ডেগে, উঠে রাজার ঈদ গো ! —ঐ

রাগ শব্দের অর্থ জনসমাগম এবং ডেগে ডেগে শব্দের অর্থ ধাপে ধাপে।

ইসলামি গান

মুসলমান ধর্ম বিষয়ক সঙ্গীত ইসলামি সঙ্গীত নামে পরিচিত। ইহাতে প্রধানতঃ নবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়। বাংলা দেশের সর্বত্রই মুসলমান সমাজের মধ্যে ইহাদের ব্যাপক প্রচলন আছে। ইহাদের সুর প্রধানতঃ বাংলার অন্যান্য ভক্তিমূলক সঙ্গীতের সুর; ইহাদিগকে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভক্তিমূলক সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

১

আলেক সোয়ারী নৌকা, মহম্মদ কাণ্ডারী
আল্লা আছে আলে
মহম্মদ আছে কলে
যে নামটি নিলে তরব বান্দা।

তিলের মধ্যে তৈল
ঘৃতের মধ্যে ননী
ডিম্বের মধ্যে বাচ্চার জনম।
জান দিয়াছে কেমনে রে সাঁই॥
আলেক রাত্রে উদয় সূর্য দিবসে জ্বালে বাতি
শুনি এক সাধুর মুখে মশায় খায় হাতী॥ —রাজসাহী

২

নবী প্রেমে যার মন মজে না,
তার সমান আর নেই জিন কাণা॥
নবী আমার গুনমণি,
নবীর গুণ জানি আমি॥
আমি নবী বিনে দোজাহানে
আর ত কেউ দেখি না,
নবী প্রেমে যার মন মজে না॥ —ঐ

৩

নবীর আইন পরশ-রতন—চিনলি না মন দিন থাকিতে,
ওরে সুধার লোভে গরল খাইয়া মলি রে বিষের জ্বালাতনে।
ওরে রোজা কর, নামাজ পড়, মুর নবীজির তরিক ধর,
ও আবার নবীর তারিক না ধরিলে ঠেক্‌বি রে রোজ হাসরেতে।
আবার নৈয়া মান্‌সের কথা শুনিলে মনে লাগে ব্যথা,
তাই লালন বলে, ভাঙবি মাথা—পড়েছ কাঠ গোঁয়ারের হাতে॥
—লালন ফকির

উত্তম ঠাকুরের গান

মৈমনসিংহ জিলার পূর্বাঞ্চল এবং শ্রীহট্ট জিলার পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু সমাজের কুমারী কন্যাদিগের মধ্যে বসন্তকালের প্রারম্ভে উত্তম ঠাকুর নাম এক লৌকিক দেবতার পূজা হইয়া থাকে। তিনি বসন্ত-প্রকৃতির দেবতা। কুমারী-কণ্ঠের সঙ্গীতেই তাঁহার পূজা, সঙ্গীতেই তাঁহার পূজার অঞ্জলি। ইহা বাংলার প্রকৃতি-বন্দনা বিষয়ক সঙ্গীতের একটি বিশেষ নিদর্শন।

১

কদম পুষ্পের ঝুরু গো ঝুরু, পরথম মাইলানী,
তার নীচে পাইলেন গো ঠাকুরে পরমা সুন্দরী।
তুমি ধর সাজি, লো কন্যা, আমি তুলি পুষ্প,
স্ত্রী হইয়ে তোলে গো পুষ্প, কি না কার্যে লাগে।
পুরুষ হইয়ে তোলে গো পুষ্প, দেবকার্যে লাগে।
বকুল পুষ্পের ঝুরু গো ঝুরু, পরথম মাইলানী,
তার নীচে পাইলেন গো ঠাকুরে পরমা সুন্দরী।
তুমি ধর সাজি, লো কন্যা, আমি তুলি পুষ্প,
স্ত্রী হইয়ে তোলে গো পুষ্প, কি না কার্যে লাগে,
পুরুষ হইয়ে তোলে গো পুষ্প, দেবকার্যে লাগে। —মৈমনসিংহ

২

তোরা কে যাবি ফুলবনে কুল মজাইতে।
চণ্ডী যায় গো রাউলের পুষ্পবনে।
আখটিয়া চণ্ডিকাগো আখইট ভালা করে,
সাজি বুইনা দেন বাবা পুষ্প তুলিবারে।
চণ্ডী যায় গো রাউলের পুষ্পবনে॥
সকলের বাপে পূজা করে পুষ্প দূর্বা দিয়া,
চণ্ডীর বাপে পূজা করে ভাইট বাকস্ দিয়া।
সাজি বুইনা দেন, বাবা, পুষ্প তুলি গিয়া।

নবকোঠা সাজির পত্তন দিলেন যে বাপে,
সন্তইর কামনার আগে,
সত্বরে বুনিয়া সাজি দিবে চণ্ডীর হাতে।
মাতাপিতার নিষেধ চণ্ডী না ভাবিল মনে,
আপনার সাজনে চণ্ডী সাজি লইল হাতে।
তোরা কে যাবি গো ফুলবনে কুল মজাইতে।
চণ্ডিকার পঞ্চ ভাই গেল পঞ্চ পুষ্প হইয়া,
অষ্ট নিশান দিল বাপে অষ্ট স্থানে পুতিয়া।
এক নিশান লড়লে ঝি গো না নিবাস ঘরে,
উপস্থিত হইল গিয়া চণ্ডী পুষ্পবনের মধ্যে।
নারদে গিয়া খবর কইলো সদাশিবের কাছে,
কোন্ ধাতুরিয়া বেটী, মামা, আসছে তোমার কমল বনে।
একথা শুনিয়া শিবে ত্বরিতে চলিল,
ত্বরিতে চলিয়া শিবে বসুয়া সাজাইল।
বসুয়া সাজাইয়া শিব গো ত্বরিতে চলিল,
উপস্থিত হইল গিয়া পুষ্পবনের মাঝে,
শিব হাঁটে ডালে ডালে, চণ্ডী পাতায় পাতায়,
হস্তে না ধইরো, শিব গো, হস্তের শঙ্খ লড়ে। —ঐ

বসন্তকালে নানা ফুলে পল্লীর বনভূমি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ফুলই বসন্তের পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ; এইবার ফুল তোলার গান শুনিতে পাওয়া যাইবে।

কেশে না ধইরো শিব গো বেশে লজ্জা পায়।
চাম্পা ফুল, চাম্পা ফুল, তুমি সোদর ভাই,
ক্ষণিকের লাগি, ভাই গো, ছাপাইয়া রাখ মোরে।
ময়ূরের পেখম হেন তোমার ডাগুর খোঁপা,
কি ভাবে রাখবাম ছাপাইয়া?
তোরা কে যাবি গো ফুলবনে কুল মজাইতে।
চণ্ডী যায় গো রাউলের পুষ্প বনে। —ঐ

সংস্কৃত নাটকে যেমন চুতমঞ্জরী ঋতুরাজ বসন্তের অর্ঘ্যরূপে উপহার দেওয়ার

কথা শুনিতে পাওয়া যায়, বাংলার পল্লীর বসন্ত-আবাহনের মধ্যেও সঙ্গীত সহযোগে এই পুষ্পোপহার দিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

৩

সুগন্ধ মালির ঝি, তোর নি ঘরে আছে ফুলের আলি ?
আছিল জবার আলি, বিকায়ে লয়েছি কড়ি।
গো ভাগিনা, কাইল কেন না আসিলে সকালে ?
সুগন্ধ মালীর ঝি, তোর কি ঘরে আছে তুলসীর আলি ?
আছিল তুলসীর আলি, বিকায়ে লয়েছি কড়ি,
গো ভাগিনা, কাইল কেন না আসিলে সকালে।
সুগন্ধ মালীর ঝি, তোর নি ঘরে আছে তিলের আলি ?
আছিল তিলের আলি বিকায়ে লয়েছি কড়ি,
গো ভগিনা, কাইল কেন না আসিলে সকালে। —ঐ

৪

ভ্রমর, কইওরে কালিয়া,
শ্রীরাধিকা ক্রন্দন করে কৃষ্ণহারা হইয়া,
সাপলা পুষ্পে গৌরব করে, আমার ষোল পাখি,
অরুণ উদয়কালে সূর্যের সঙ্গে আসি।
ভ্রমর, কইওরে কালিয়া,
পদ্মপুষ্পে গৌরব করে আমার বিশ পাখি,
না করছিলাম পতির সেবা ডালেতে শুকাইছি।
ভ্রমর, কইওরে কালিয়া,
বকুল পুষ্পে গৌরব করে আমার পাখি রেণু,
আমায় নিয়া খেলা করে নন্দের ঘরের কানু।
ভ্রমর, কইওরে কালিয়া,
শ্রীরাধিকা ক্রন্দন করে কৃষ্ণহারা হইয়া। —ঐ

৫

ঠাকুর, বলিরে তোমারে !
তুলসী পত্রে রাধার নাম লেইখ্যা দেও আমারে।

কেওয়া-কেতকী পুষ্প একত্র করিয়া,
ব্রতী সকলে দেয় পুষ্প উত্তমের লাগিয়া।
ঠাকুর, বলিরে তোমারে।
পদ্মপুষ্পে রাধার নাম লেইখা দেও আমারে।
জয়া-জয়ন্তী পুষ্প একত্র করিয়া,
ব্রতী সকলে দেয় পুষ্প উত্তমের লাগিয়া।
ঠাকুর, বলিরে তোমারে। —ঐ

৬

অমুকে লাগায় ফুল, বাড়ীর সম্মুখে,
কে তোলরে ফুল রাজবাড়ীর মধ্যে ?
অমুকের ভগ্নীয়ে তোলে ফুল মনের উল্লাসে,
ডাল ভাঙি তোলে ফুল খোঁপা ভইরে পরে।
কে তোলরে ফুল রাজবাড়ীর মধ্যে ?
তোলে বা না তোলে ফুল ডাল ভাইঙে পড়ে।
অমুকের বউয়ে তোলে ফুল মনের উল্লাসে।
কে তোলরে ফুল রাজবাড়ীর মধ্যে ?
পঞ্চ ভাইয়ের ভগ্নী আমি পুষ্পের অধিকারী,
সাজি ভইরে তুলি ফুল খোঁপা ভইরে পরি।
কে তোলরে ফুল রাজবাড়ীর মধ্যে ? —ঐ

অমুকের স্থলে গৃহস্থ ও তাহার আত্মীয় এবং আত্মীয়াদিগের নাম উল্লেখ করা হয়। উত্তম ঠাকুরের পুজা সমাপন করিয়া মেয়েরা সেই পুজিত বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া নানা প্রকারের গান করেন—

৭

কুঞ্জের মাঝে কে রে, কুঞ্জের মাঝে কে ?
নন্দের ছাইলা কালাচান্দ কৃষ্ণ আইসেছে।
এক দেউরী, দুই দেউরী, তিন দেউরী পরে।
তিন দেউরীর পরে গিয়া, পাইলাম ঠাকুরের লাগ রে।
(কুঞ্জের মাঝে কে ?)
কুঞ্জে গিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ খাইলাইন একটুক্ পান।

রাধিকারে দেখইন ঠাকুর রে পুন্নমাসীর চান ॥
(কুঞ্জের মাঝে কে ?)
কুঞ্জে গিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ খাইল একটুক্ গুয়া।
রাধিকারে দেখইন্ ঠাকুর রে পিঞ্জরের সুয়া ॥
(কুঞ্জের মাঝে কে ?) ॥ —ঐ

৮

কে তুলরে ফুল রাজবাড়ীর মাঝে ?
ঠাকুর বাড়ীর ঝি গো আমি ফুলের অধিকারী।
কে তুলরে ফুল ?
আগা ধর‍্যা তুল ফুল, মাঝে ভাঙ্গ্যা পড়ে।
কে তুলরে ফুল ?
সাজি ভইরা তুলে ফুল, খোঁপা ভইরা পরে।
কে তুলেরে ফুল ?
সাত ভাইয়ের বইন গো আমি ফুলের অধিকারী।
কে তুলরে ফুল ? —ঐ

উমাসঙ্গীত

অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া প্রধানতঃ কবিওয়ালাদিগের দ্বারা উমা-মেনকা বিষয়ক যে সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, তাহা আগমনী-বিজয়া গান বলিয়া পরিচিত হইলেও (আগমনী ও বিজয়া গান দেখ) সাধারণভাবে তাহা উমাসঙ্গীত বলিয়াও পরিচিত। সে যুগের শ্যামাসঙ্গীতেরই পরিপূরক (complement) স্বরূপ উমাসঙ্গীতের উল্লেখ করা হইয়া থাকে। আগমনী ও বিজয়া গানের পর্যায়ে উমাসঙ্গীতের ব্যাপক উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে।

১

ছেড়ে যাবে কি মা, উমা, গিরিপুরী আন্ধার করে।
আমি, কেমন করে শূন্য ঘরে রইব গো তোরে না হেরে ॥
এ ঘর হইতে ও ঘর যাইতে নেচে নেচে নেচে,
অঞ্চল ধরে বেড়াইতে থাকতে কাছে কাছে ॥

নিশিতে ঘুমেতে থাকি, স্বপনে, মা, তোরে দেখি,
সে ধন কিসে ভুলে থাকি, বলে যা পাষাণী মা'রে ॥
সঁপিলাম, উমা, তোমায় ভিখারীর করে,
ক্ষুধায় শুধাইয়ে, মাগো, কে দিবে গো তোরে,
তাই যখন মনে পড়ে যে করে মায়ের অন্তরে,
আমি সে দুঃখ জানাব কারে, তুই মা হলে, মা, বুঝবি পরে ॥

—ত্রিপুরা

২

নয়নতারা প্রাণ গৌরী হারা হইলাম গিরিবর।
কি স্বপ্ন দেখিলাম আমি উমা নিতে আস্‌ল হর ॥
কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, ঐ দুঃখে বুক ফেটে যায়।
উমার বিচ্ছেদ-খেদে প্রাণে বাঁচা হইল দায় ॥
কত দুঃখের উমা আমার, গিরি, তুমি জান না,
গর্ভ-নারীর গর্ভ বেদন, বন্ধ্যা নারী বুঝে না।
কি স্বপ্ন দেখিলাম, গিরি, আজ্‌ নিশি প্রভাতে,
উমা আসি শিরে বসি, মা বলিয়ে কান্দ্‌তেছে ॥
হায় গিরিবর, হায় গিরিবর, হায় গিরিবর, কি করি,
উমা ছাড়া প্রাণ বাঁচে না, এনে দাও মোর প্রাণ-গৌরী ॥
সপ্তমীতে আস্‌ল উমা, অষ্টমী ত বঞ্চিল,
নবমীতে যজ্ঞপূর্ণ, মাগো দশমীতে চলিল ॥
লেঙ্‌টা বেটা, বুদ্ধি মোটা, ভাঙ ধুত্‌রা সদাই খায়,
ব্যাঘ্র চর্ম পরিধান ভাল ভাল শোভে তায় ॥
কান্দিতে কান্দিতে উমায়, মাকে প্রণাম করিল,
শিরে হস্ত দিয়া মায় গো আশীর্বাদ করিল ॥
সাবিত্রী সমান হওগো, যাউক গো তোমার দুর্গতি,
পাগ্‌লা মতি ছাইড়া মাগো, জামাইর হউক গো সুমতি ॥ —ঐ

উল্টা বাউল

সাধন-ভজনের বিষয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করা হয় না, প্রধানতঃ রূপকের মধ্য দিয়াই প্রকাশ করা হয়। অনেক সময় উল্টা বা বিপরীত-ধর্মী চিত্রের সাহায্যেও ইহার কোনও নিগূঢ় ইঙ্গিত ব্যক্ত হইয়া থাকে। বাউল গানের (পরে দেখ) চিত্রগুলি যে সকল ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী ভাব কিংবা অসম্ভব চিত্র প্রকাশ করে, সেই সকল ক্ষেত্রে গানগুলিকে উল্টা বাউল বলিয়া উল্লেখ করা হয়। সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে গূঢ় অর্থকে গোপন করিবার উদ্দেশ্যে বিরোধী ভাব এবং অবিশ্বাস্য চিত্র প্রকাশের রীতি অত্যন্ত প্রাচীন। বৌদ্ধগান ও দোঁহার মধ্য হইতেও তাহার নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়।

১

দুলি দুহি পীঢ়া ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই॥
আঙ্গন ঘর পণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চোরে নিল অধরাতী॥
সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগই।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগই॥
দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরু জাই॥
অইসন চর্যা কুক্কুরী পাএঁ গাইল।
কোড়ি মাঝে একু হিঅহি সমাইল॥ —বৌদ্ধগান ও দোঁহা

ইহার অর্থ,

কচ্ছপীর দুধ দুহিয়া ভাঁড়ে ধরা যায় না;
গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়।
আঙ্গিনা ঘরের মধ্যে, শোন রে বাদ্যকরী।
নেকড়া চোরে নিল মাঝ রাতে।
শ্বশুর নিদ্রা গেল বউড়ী জাগে,
নেকড়া চোরে নিল কি গিয়া মাগে?

দিবসে বউ কাক হইতে ভয় পায়,
রাত্রি হইলে কামরূপ যায়।
এ হেন চর্যা কুক্কুরীপাদে গাইল,
কোটি মাঝে এক হিয়ায় সামাইল ॥

২

গুরু, মীননাথ রে, উল্টা উল্টা ধারা।
পুকুর মোড়ে ধান শুকাইয়া উগার তলে বাড়া ॥
গুরু হে, আম গাছে শৈলের পোনা বগায় ধরি খায়।
তা দেখিয়া খুদি পিঁপড়া পল লইয়া যায় ॥
গুরু হে, পাঁচ পণ দিয়ে কিনলাম নাও নয় বুড়ি তার জলই।
কচু বনে রাখলাম নাও বেঙে গিলিল গলই ॥
গুরু হে, একটি কথা শুনেছিলাম ত্রিপিনীর ঘাটে।
মরা মানুষে ভাত রান্ধে জিতা মানুষের পেটে ॥
গুরু হে, এরালি বনে করালীর ছানা বাঘিনী গেল চাইতে।
কোলা বেঙে খাপদি রইছে বাঘিনীরে খাইতে ॥ —চট্টগ্রাম

৩

সাঁই দরবেশের কথা, একথা বলবো কারে ?
শুন্‌বে কেরে, কারে বল্‌ব কি ?
পরকে বুঝাতে পারি নিজে বুঝি নি।
বলদ রলো গাভীর প্যাটে, লাঙল রলো হাটে,
কিষাণের জন্ম না হতে পাহা গেল মাঠে।
আগ্‌নে গেল গড়গড়াতে সূর্য ম'ল দীপে,
গঙ্গা মল জল পিপাসায়, ব্রহ্মা মল শীতে।
আমি একটা কথা শুন্যা আলেম ত্রিবেণীর ঘাটে,
একটা ছেলে জন্ম হল তিন পোয়াতির প্যাটে।
রাজার বাড়ী চুরিরে পুষ্করিণীর পারে সিঁদ,
জলের পর শয্যা পাড়্যা চোরা পাড়ে নিদ। —রাজসাহী

এ

একক সঙ্গীত

লোক-সঙ্গীত পরিবেষণের দিক হইতে ইহার দুইটি প্রধান বিভাগ—একটি একক বা solo এবং অন্যটি সারি বা group। কেবলমাত্র একজনই যে সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করে, তাহাই একক সঙ্গীত, যেমন ভাটিয়ালী ও ভাওয়াইয়া সুরের গান। ইহারা নিঃসঙ্গ অবসরের গান এবং একান্তভাবে আত্মবিনোদনের গান। একক সঙ্গীত পরিবেষণের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র গায়কই থাকে, তাহার কোন শ্রোতাও সব সময়ে থাকে না; একান্ত আত্মগত সঙ্গীত বলিয়া বাদ্যযন্ত্রও ইহাতে নিতান্ত গৌণস্থান অধিকার করে। পূর্ব বাংলার ভাটিয়ালী সুরের গান (পরে দ্রষ্টব্য) ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই সঙ্গীতে প্রধানতঃ কোন তাল নাই, কেবলমাত্র সুরের ওঠা-নামার ভিতর দিয়া ইহার প্রকাশ।

একতারার গান

একতারা বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে যে একক সঙ্গীত গীত হয়, তাহা কখনও কখনও একতারার গান বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই শ্রেণীর গান প্রধানতঃ বৈরাগ্যের গান; কারণ, একতারার সুরের সঙ্গে উদাসী বৈরাগ্যের ভাবটিই প্রধানতঃ যুক্ত হইয়া থাকে। একতারা বৈরাগ্যের প্রতীক্, কিন্তু সকল বৈরাগ্যের গানই একতারার সাহায্যে গীত হয় না; সেইজন্য সাধারণ অর্থে সকল বৈরাগ্যের গানকেই একতারার গান বলা যায় না। তবে একতারার গান বলিলে বৈরাগ্যের গান ব্যতীত আর কিছু বুঝায় না। ইহাদের সুর প্রধানতঃ ভাটিয়ালি; কোন কোন ক্ষেত্রে কীর্তন। কিন্তু সর্বত্রই ইহারা একক (solo) গীত হয়।

১

আমার মন বড় অবুঝ—
দুই জনেতে এক যোগেতে হলি না বুঝ সাজ।
হায়রে, আমার মন-রসনা,

হারাইলি ষোল আনা ;
পাবি যদি কালো সোনা গুরুর চরণ
পুজায় মন বড় অবুঝ।
কি করিতে কি করিলি
মহাজনের সব ভুলালি
মিছে কাজে সব ঘুচালি
এখন তুই বুঝ।
রে মন বড় অবুঝ।
গুরু বলে তুই বিষম বোকা
মিছে কেন ঘুরিস ফাঁকা
যেখানেতে হারালি টাকা
সেইখানেতে খোঁজ।
রে মন বড় অবুঝ।
কষ্ট কেন পাবি প্রাণে
রচন কর তুই মনে মনে
যে চলে যাব এই জগৎ ছেড়ে
আমার চোখ দুটি বুজ
রে মন বড় অবুঝ। —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

হায়রে, সাধের খাঁচা পড়ে রবে সাধের খাঁচা,
আমি, ময়না বলে পুষলাম যারে সে হল ভুতুম পেঁচা।
শুনব, ময়না পাখীর কৃষ্ণকথা,
এই জীবনে হইল না তা,
এমন ভুতুম পেঁচায় ঘুরায় মাথা এই ছিল কপালে।
আমার গোলায় চারটা ধান ছিল
ইন্দুরে তা খেয়ে গেল,
এখন পাতলে কি হয় গাবের ঢেঁকি ভান্‌বি কি ধান খালি মাচা॥

—ফরিদপুর

ওঝার গান

ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া (magic) সম্পন্ন করিবার জন্য অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলিয়া যাহাদিগকে মনে করা হয়, তাহারাই ওঝা নামে পরিচিত। তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তাহারা যাহা ছড়া কিংবা ক্বচিৎ গানের আকারে ব্যক্ত করে, তাহাকে মন্ত্র (incantation) বলাই সঙ্গত; সাধারণ গানের ধর্ম তাহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় না। তথাপি ক্বচিৎ এই সকল মন্ত্রের মধ্যেও কিছু কিছু সঙ্গীতের গুণ যে একেবারেই দেখা যায় না, তাহা নহে। নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি সঙ্গীত প্রকৃতপক্ষে ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র, অথচ লোক-সঙ্গীতের গুণ ইহাদের মধ্যে নাই, তাহা বলা যায় না। ইহাদিগকে মন্ত্রের গানও বলা যাইতে পারে।

১

জল আদি জল মূল জল নিরাকার।
জলেতে জন্মিল জীব জলেত সংহার॥
আদি ধর্ম নিরঞ্জন প্রভু নিরাকার।
গগন ধরণী নাহি বিশ্ব জলাকার॥
ব্রহ্মরূপে নিরঞ্জন বিস্ময় ভাবিঞাঁ।
বটপত্রে ফিরে প্রভু জলশায়ী হঞাঁ।
আপনার চরণ তার বদনে আরোপিয়া।
বিশ্বরূপে ফিরে প্রভু অঙ্গুলী চুষিয়া॥
আঙ্গুলী চোষনে নাথ পাইলা বড় প্রীত।
করপদ বহিয়া পড়িল মুখামৃত॥
কর হৈতে জনমিল পীযুষ প্রধান।
পদ হৈতে কালকূট হৈল উপাদান॥

—বগুড়া

২

সোনারগাঁইয়া মাঝিরে,
নাও আন বাইয়ারে
কালাচান পার অইত আইয়া॥

জবা ফুলের তলে তলে
রসের দামালী গো—
দেও, পরী, দেও দরশন ॥
কালী মায়ের যত গুণ
করতে আছে দুনা গো দুন,
দুর্গামায়ের গুণের সীমা নাই ॥
মাগো, দোহাই দেই ভর কর আইয়া ॥
নাইওরী গো, নাইওর যাইতে
কে কইর‍্যাছে মানা,
নয়ালী যইবনের কালে
আনন্দের দামালী গো।
দেও পরী, দেও দরশন ॥
আসনে মোর চান বৈরাগী
চাঁদে গো বাইরইয়া দেখ্
দোহাই দেই ঐ আল্লার
ভর কর আইয়া ॥ —মৈমনসিংহ

২

নেতাই ধুবনী কাপড় ধুয়, পুত যায় তান পাছে,
কালধা সাপে কামর মাইল, কাপড় ধুইতে আছে।
ডাইনে চাইল, বায়ে চাইল, মঞ্চুবে বাড়ায় পাও,
চল, পুত্র, ফিরে যাইরে, বিষে ছাইলরে গাও। —ঐ

৩

শুন শুন সন্ন্যাসিগণ, সিন্দুর বিবরণ।
সিন্দুর জন্মিল কোন স্থানে ॥
সাত সমুদ্র বালুর চর।
তাতে সাউদের নিজ ঘর ॥
সাউদের নাম শ্রীহরি।
আনিল শঙ্খ ডিঙ্গায় ভরি ॥
ডিঙ্গায় ভরিয়া শঙ্খ করাতে দিল টান।

শঙ্খরে না রেণু পরে সিন্দুর পরিমাণ ॥
সেই সিন্দুর না তুলিয়া দিলাম শ্রীকবিলার ঘাটে।
সেইখানে সিন্দুর করলো গোলা, রামলক্ষ্মণ ত্বটি পোলা ॥
দশ কড়া, পাঁচ কড়ায় বিকায় সিন্দুরের তোলা।
সেই সিন্দুর কিইন্যা আনলাম্ পাটের তরে ॥
আমি তো না দেই বড় বাড়ীর কর্তারে।
বাড়ীর কর্তারে দেয় বর ভোলা মহেশ্বরে ॥ —ঐ

৪

কৈ গেলা বিশাই মেস্তরী, মোর বচন ধর।
নিমগাছ কাইট্যা আইন্যা পাট স্বজন কর ॥
চাইয়া চিইল্যা পাট করলাম ভাল।
তার উপর তুইল্যা দিলাম লোহার ত্রিশূল ॥
লোহার ত্রিশূল নারে কাঁটা সারি সারি।
তল পত্র তাকে দিলাম, পাটের নিশারী ॥
পাটবর মুনি ছিনান করে দূর্বা লইয়া হাতে।
জীবন-সন্ন্যাসে পাট তুইল্যা লইলাম মাথে ॥
হর্ শিব হর্।
জনমে জনমে পূজা করি, শিব, তর ॥ —ঐ

৫

ওরে রে কালিন্দর বিষ, মুঞ করলাম মানা,
উজান মুখে না যাইও, বিষ, গফুর করছে মানা। —ঐ

৬

মেঘ আধারী আঁধার রাত্তি,
না জানি সাপা কোন্ কোন্ জাতি চিতি চৌমালস্তি।
আগুনা বাড়ায় পা,
হরির মন্থনে মহাদেব বিষ পাতাল পথ সে ক্ষয় যা।
কার আজ্ঞায় নরসিং গুরু কাউর কামাখ্যা ?
মা চণ্ডীর আজ্ঞায় ॥

—পুরুলিয়া

৭

পদ্মপত্রে উপজিল বালী মাথায় চক্র গলায় কালী।
এলেন মা মনসা দিলেন তো ভর, চড়ন্ত বিষ যা মুখে ঝড় ॥ —ঐ

৮

শ্মশানে-মশানে আমার আছে ব্রহ্মকপাট
তিনমুঠে তিল তেউড়ী মানুষ মুড়ে দিয়ে
মাই রক্ষা রাক্ষিচন্দ্র, আমার দেবতা চন্দ্র আমার খড়িতা
দে দেবতা লাগাল পারে ন ঘা লাগ লাগ পাথর বন্দা
চৌখট বন্দা, কার আজ্ঞায়, কাউর কামাখ্যা।
মা চণ্ডীর আজ্ঞায় শীঘ্র ছাড় ॥ —ঐ

৯

কেশে বন্দী ইন্দ্র, মুখে বন্দী সরস্বতী
হৃদে বন্দী পার্বতী, সনে বন্দী সনেশ্বরী
আঙ্গুল বেড়ী গজড় গেলে সব ঘাট রক্ষা করে
লবি গুরু চণ্ডীর দোহাই। —ঐ

১০

স্বর্গে ছিলি ডাইনী, দিদি, দেবীর আসরে,
মর্ত্যে আইলি, দিদি, কিসের কারণ ;
ছয় ভাই-এর বহিন তুমি একেলা ঝিয়ারী
কিসের কারণে, দিদি, মেরেছিলে তুমি।
রোগীকে ছাড়িলে, দিদি, বিছানায় বসিলে,
শ্রীরাম লক্ষ্মণের আজ্ঞায় শীঘ্র ছাড়িলে,
ছাড় ছাড় শীঘ্র ছাড়, কার আজ্ঞায় কাউর
কামাখ্যা মা চণ্ডীর আজ্ঞায় শীঘ্র ছাড় ॥ —ঐ

১১

গড়ুর গড়ুর মুহ্ পুজন্তি কহত বাপা বসতি কোথায়
শিমুলের আগে ডঙ্কা, কাঁপে ঝুঁপে সর্বাঙ্গের বিষ থরহরি কাঁপে
কার দোহায় বিষহরি দোহায়।
কাউর কামাখ্যার দোহায় ॥ —ঐ

ওলাইচণ্ডীর গান

পশ্চিমবাংলার প্রায় সর্বত্রই 'ওলাইচণ্ডীর থান' নামক একটি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ওলাওঠা মড়কের সময় কিংবা বৎসরের কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে মহা-আড়ম্বর সহকারে ওলাইচণ্ডীর পূজা হয়। পূজায় অগণিত পশুবলি হয়। ওলাইচণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া এক শ্রেণীর পাঁচালী প্রচলিত আছে। মৃদঙ্গ-মন্দিরা সহযোগে উৎসবের সময় তাহা গান করা হয়। গানে একজন মূল গায়েন ও দোহার থাকে। এক রাজার রাজত্ব কিভাবে ওলাওঠায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছিল, অতঃপর রাজা ওলাইচণ্ডীর উপাসনা করিয়া তাহা হইতে তাঁহার রাজ্যকে মুক্ত করেন, সেই কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হয়। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট কোন বৃক্ষমূলে মৃত্তিকা বেদীর উপরই তাঁহার পূজা প্রচলিত। তাঁহার মাহাত্ম্যসূচক গানও সাধারণ পাঁচালী গান মাত্র।

ওলাবিবির গান

চব্বিশ পরগণা জেলার প্রধানতঃ দক্ষিণ অঞ্চলে মুসলমান-প্রধান পল্লীগুলিতে 'ওলাবিবির থান' নামক একটি দেব-স্থানের প্রায়শঃই সন্ধান পাওয়া যায়। তাহাদের কোন কোনস্থলে একটি মৃণ্ময়ী মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়, মূর্তিটির আকৃতি কোন মুসলমান সম্ভ্রান্ত পরিবারের কিশোরীর ন্যায়—নারী মূর্তি হওয়া সত্ত্বেও মাথায় টুপী ও পাজামা পরা, পায়ে নাগরা জুতা, নানা অলঙ্কার ভূষিতা। ইনি কলেরা রোগের দেবী—ওলাবিবি নামে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পূজিত হইয়া থাকেন। তাঁহার মাহাত্ম্যসূচক গানই ওলাবিবির গান। অনেক সময় ওলাবিবি একাকিনী না থাকিয়া সাত ভগিনী এক সঙ্গে বাস করেন, সাত ভগিনীর মাহাত্ম্যসূচক সঙ্গীত এক সঙ্গেও শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে সাতবিবির গানও বলা হয়। সাতবিবির গান মধ্যযুগের লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক গানের অন্তর্গত।

কথকতা

সাধারণতঃ পুরাণ পাঠকে কথকতা বলা হয়। ইহা অবিমিশ্র সঙ্গীত নহে, সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে গদ্য বিশ্লেষণও পরিবেষণ করা হয়; ইহাতে নানা লৌকিক উদাহরণ দ্বারা দুরূহ ও নীতিমূলক বিষয়কে সরস করিয়া প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এই গদ্যও সঙ্গীতের মত সরস, অনেক সময় তাহাও সুরযুক্ত হইয়া থাকে। ধর্মীয় কোন নীরস বিষয় জনসাধারণের মধ্যে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার জন্য ইহাতে মধ্যে মধ্যে যে সঙ্গীত যুক্ত হইয়া থাকে, তাহা একক সঙ্গীত, সমবেত সঙ্গীত নহে, কিংবা কোন দোহারের সাহচর্যেও তাহা গীত হয় না। ইহা আনুপূর্বিক একক—গীতি ও গদ্য-ব্যাখ্যার মিশ্র অনুষ্ঠান। পুরাণাদিতে সুপণ্ডিত ব্যক্তি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারী হইলেই সাধারণতঃ এই বৃত্তি গ্রহণ করিতেন; একদিকে পাণ্ডিত্য, অপর দিকে সুরবোধ ও স্বরমাধুর্য কথকতার আকর্ষণ সৃষ্টি করিত। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই শাস্ত্র পাঠ প্রচলিত আছে, তাহাতেও অনেক ক্ষেত্রেই বাদ্য ও সঙ্গীতের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। শিখজাতির গ্রন্থ সাহেব পাঠও সঙ্গীত ও বাদ্যের সহযোগেই হইয়া থাকে, তবে তাহা যেমন সমবেত অনুষ্ঠান, বাংলাদেশের কথকতা তেমন নহে; পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কথকতা একক অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশে কথকতার মধ্য দিয়া যে সঙ্গীত পরিবেষণ করা হইত, তাহা প্রধানতঃ ভাঙ্গা কীর্তনের সুরে রচিত, কোন কোন সময় বিষয়ানুসারে মালসী বা রামপ্রসাদী সুরও শুনিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে সকল সঙ্গীতের সুর লৌকিক স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল, উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পর্যায়ে উঠিতে পারে নাই, তাহাই জনসাধারণের আকর্ষণের বিষয় ছিল বলিয়া ইহাতে তাহাই অনুসরণ করা হইত। তবে কোন কোন সময় নিধুবাবুর টপ্ পা (পরে দ্রষ্টব্য)-র সুরও শুনিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কীর্তন এবং মালসী ব্যতীতও বাউল, ভাটিয়ালী সুরও ব্যবহৃত হইত।

কথকতার কবে হইতে প্রবর্তন হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না; তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে যে ইহা বাংলা দেশে ব্যাপক লোক-প্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাভারতের বাংলা অনুবাদকারী কাশীরাম দাস মেদিনীপুর জিলার এক রাজবাড়ীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা কথকতা শুনিয়া তাঁহার মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই বাংলাদেশে দুইজন শ্রেষ্ঠ কথকের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও শ্রীধর কথক। ইঁহারা নিজেরাও সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন ও স্বরচিত সঙ্গীত নিজের কণ্ঠে গাহিয়া তাঁহারা শ্রোতৃবর্গকে অভিভূত করিতেন। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা তাঁহাদের বিষয় হইলেও তাঁহারা মহাজন পদাবলীকে অনুকরণ করেন নাই—লৌকিক ধারায় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের রচিত কয়েকটি সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; কারণ, বহুল প্রচারের জন্য ইঁহাদের বহু সঙ্গীতই ক্রমে লোক-সঙ্গীতের স্তরে আসিয়া ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছে।

১

"অমন করে যাস্‌নে গো !
কত কণ্টক আছে গো বনে,—
ফুটিবে দুটি চরণে গো !
কত বিজাতি ভুজঙ্গ আছে, গহন কানন মাঝে,
কমল-পদে দংশে পাছে গো !
হল,—নয়ন ধারায় পিছল পথ,—
যাস্‌নে, রাধে, এত দ্রুত গো !"

২

"সখি ! যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে,
বিচারিলাম আগে, পাছের কাজে।
প্রেম করে রাখালের সনে, ফিরতে হবে বনে বনে,
ভুজঙ্গ-কণ্টক-পঙ্ক মাঝে ॥
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল,
চলাচল তাহাতে করিতেম।
হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি,
গতাগতি করিয়ে শিখিতেম ॥

এনে বিষ বৈদ্যগণে, বসিয়ে নির্জন বনে,
তন্ত্র-মন্ত্র শিখেছিলেম কত।
বঁধুর লাগি কৈলেম যত, এক মুখে কব কত,
হত বিধি সব কল্লে হত॥"

৩

"বল কে কে যাবে, চলগো যে যাবে,
শশিমুখে বাঁশী কতই বাজাবে ?
গেলে কুল যাবে, ব'লে যে না যাবে,
না যাবে না যাবে, আমার কি যাবে ?
কে যাবে না যাবে, করে সময় যাবে,
বিলম্ব দেখিয়ে, সে রসময় যাবে,
যে যাবে সে যাবে, থাক্—যে না যাবে,
এখন, না গেলে আমারি পরাণ যাবে॥"

কন্যাবিদায়ের গান

এই শ্রেণীর সঙ্গীত সাধারণতঃ বিবাহ-বিষয়ক সঙ্গীতের অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, বিবাহের আচার-নিরপেক্ষ ইহাদের একটি শাশ্বত মূল্যও প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ কেবলমাত্র যে বিবাহোপলক্ষে কন্যার গৃহে এই শ্রেণীর সঙ্গীত গীত হয়, তাহা নহে—যখনই বালিকা কন্যা পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে যাত্রা করিত, তখনই পল্লীনারীদিগের কণ্ঠে এই সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যাইত। বর্তমানে বাল্যবিবাহ প্রায় লুপ্ত হইয়া যাইবার ফলে এই সঙ্গীত লুপ্ত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই এই গান প্রচলিত ছিল।

১

ছিরিরাম বিরায় সাজে জোড়া মন্দির ঘরে রে
ছিরিরাম আরো ডাকায় দয়ারে না দাদাক্ রে—
দাদা আরে কি করেন নিচিন্তে বসিয়া
ওরে, দাদা, বিয়ার নগ্‌গন যায় বোল বিতিয়া।

হাতে দর্পণ মাথায় মটুক মারোয়ার তলে দিয়া পাও
বাবায় পুছারি করে "বন্ধু যায়রে কোন দ্যাশে ?"
"কথার দোসর নাই, যাই বাবা শ্বশুর দ্যাশে ?"
মায়ে পুছারি করে "বাছা যায়রে কোন দ্যাশে ?"
"মুখের দোসর নাই যাই যাও শ্বশুর দ্যাশে।"
নাল কাপড় পরণে, ধবল ঘোড়ায় চড়নে,
ওকি যায় যার বন্ধু দূরের শ্বশুর দ্যাশ্।
শ্বশুর বাড়ীর ঘাটায় রে, বড বাঁশের আরা রে,
ওকি বাবা তার ঝিকে আউলাইবে দ্যাখেন ক্যাশরে।

—গোয়ালপাড়া, আসাম

২

চল, কন্যা, দেশে যাই, আর বিলম্বে কার্য নাই ;
মা রৈছেন্ বৌ-ঘরা পাতিয়া।
চল, কন্যা, দেশে যাই, আর বিলম্বে কার্য নাই ;
ভগ্নী রৈছে ময়ূর-পাখা লৈয়া।
চল, কন্যা, দেশে যাই, আর বিলম্বে কার্য নাই,
পিসী রৈছেন ধান্য দূর্বা লৈয়া।
চল, কন্যা, দেশে যাই, আর বিলম্বে কার্য নাই,
(আমার) মামী রৈছেন্ ঘৃতের বাতি লৈয়া। —মৈমনসিংহ

৩

নদীর কুলে কিসের বাজনা বাজে রে ?
সোনার ফাতেমা রে।
নদীর কুলে মা কিসের হাউই উড়ে রে ?
সোনার ফাতেমা রে !
যারে দিচ্ছি, মা, এ মুখের জবান রে—
সোনার ফাতেমা রে !
যারে দিচ্ছি, মা, এ মুখের বাণী রে—
সোনার ফাতেমা রে !

তারাই আলো[1], মা, ওলোট-বাজী লিয়া রে—
সোনার ফাতেমা রে !
তারাই আ'লো, মা, পালোট-বাজী লিয়া রে—
সোনার ফাতেমা রে !
কেমনে সইবো, মা, পরার পুতের[2] জ্বালারে ?
সোনার ফাতেমা রে !
কেমনে সইবো, মা, তার বাপ-মা'র জ্বালারে ?
সোনার ফাতেমা রে !
নদীর কুলে, মা, বট বিরিক্ষ আছে রে,
সোনার ফাতেমা রে !
নদীর কুলে, মা, কল্‌মিলতা আছে রে,
সোনার ফাতেমা রে !
তারা যে সয়, মা, ভরা গাঙ্গের তাফাল রে,
সোনার ফাতেমা রে !
তারা যে সয়, মা, চৈড়-বৈঠার বাড়ি রে,
সোনার ফাতেমা রে !
তেমনি সয়ো, মা, পরার পুতের জ্বালা রে,
সোনার ফাতেমা রে !
তেমনি সয়ো, মা, তার মা-বাপের জ্বালা রে,
সোনার ফাতেমা রে !! —ঐ

৬

যত যত নারী দিল মঙ্গল জোকার
যাত্রা কৈল বরকন্যা আনন্দ অপার।
হাতেতে আরসি-মাইজ বান্ধা গামছা দিয়া—
সোনার চান্দ ঘরে যায় রে নতুন বউ লইয়া।
দুয়ারে মঙ্গল ঘট চিত্র আলিপনা।
ধান্যদূর্বা দই পঞ্চপল্লব যোজনা।

১। আসিল
২। পরার পুতের : স্বামীর

নবরঙ্গে বাদ্য বাজে মঙ্গল জোকার।
চিরজীবী হৈয়া থাক, সুন্দর কুমার॥　　—মৈমনসিংহ

৭

আগে যদি জানতাম রে, ময়না,
তোরে নিবে পরে রে সুন্দর, ময়নামতী রে।
পাটার চন্দন পাটায় না থুইয়া
তোরে লইতাম কোলে, লো সুন্দর ময়নামতী রে।
আধেক গাঙ্গে ঝড়বৃষ্টি,
আধেক গাঙ্গে বিয়া রে, সুন্দর ময়নামতী রে।
ময়নারে যে নিয়া গেল
চিলের ছোঁও দিয়ারে সুন্দর ময়নামতী রে।　　—ফরিদপুর

৮

পরের ঘরে যাওরে কন্যা, কন্যা, আরে কইয়া দেই তোর আগে,
দুঃখিনী জননীর কথা, মা গো, তোমার মনে যেন থাকে।
কত কষ্টে পালন কল্ল্যাম, কন্যা, আরে কল্ল্যাম আলা ঝালা,
না চাইতে হাতে তুইল্যা দিলাম কত সোহাগের ডালা।
দশ মাস দশ দিন, কন্যা, আরে গর্ভে ধল্ল্যাম তোরে,
খাইতে শুইতে চলতে ফিরতে মল্ল্যাম কত দুর্ভাবনা করে।
কত নিয়ম পালন কল্ল্যাম, কন্যা, বইসা ঘরের কোণে,
ভোগলাম কত বিষ-বেদনা কেউর কাছে না কইয়া গোপনে।
নিদ্রা নাহি গেছিরে, কন্যা, দিছি, কন্যা, পেট ভইর‍্যা না দানা,
অসুখে বিসুখে আমি তোমার লাইগ্যা হইয়াছি দেওয়ানা।
কত মন্ত্রে কত ঔষধ দিছি আইন্যা কত মুলুক খুঁইজ্যা,
অত বড় কল্ল্যাম তোরে কত নারে দেব দুর্গা পুইজ্যা।
বর ভালা, ঘর ভালা পাইয়া, কন্যা, তোরে কল্ল্যাম রে কোল ছাড়া,
তুই যে আমার প্রাণের নিধি, তুই যে আমার নয়নের তারা।
দিবা নিশি ভাবলাম রে, কন্যা, কন্যারে, তোর সোনামুখখানি,
ঘরের বস্তু পরকে দিয়া কাইন্দ্যা মরবে অভাগী জননী।
মনে অইলেই মরবাম রে, কন্যা, তোমার লাইগ্যা জলিয়া পুড়িয়া,

পাখ থাকিলে পঙ্খী অইয়া পড়তাম যাইয়া তোর কাছে উড়িয়া।
যাওয়ার কালে একটিরে কথা, কন্যা, আরে কইয়া দেইরে তোরে,
বিষ খাইয়া বিষ হজম কইর‍্যা, কন্যা, তুমি থাইকো জামাইর ঘরে।
শাশুড়ী ননদীর কথা, কন্যা, তুমি শুইনো মন দিয়া,
হই না যে কলঙ্কিনী, কন্যা, তোমায় গর্ভেতে ধরিয়া। —মৈমনসিংহ

২

সীতা কি মোর ঘর যাইবে গো।
বড় পুকুরের ভদ্‌ই চিংড়ি কে খাইবে গো,
মাছের তলায় ছাতুর হাঁড়ি কে খাইবে গো।
সীতা মোর ঘর যাইবে গো।
সীতা হামারের ধান খাবিয়ে
সীতা তবু মোর পরের বৌ
সীতা মোর ঘর যাইবে গো।
সীতা পুকুরের মাছ খাবিয়ে
সীতা তবু মোর পরের বৌ
সীতা মোর ঘর যাইবে গো। —মেদিনীপুর

কন্যার বিদায় সঙ্গীত

ইংরেজিতে এই শ্রেণীর গানকে bridal farewell song বলিয়া উল্লেখ করা হয়। পতিগৃহে যাইবার সময় এই গান কন্যা স্বয়ং গাহিয়া থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই গানের প্রচলন আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল মাত্র উড়িষ্যা এবং ছোটনাগপুরের আদিবাসী অঞ্চলেই এই শ্রেণীর গানের ব্যাপক সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চল হইতেও তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

১

দেখ গো, দয়ার সাত ভাই দুই নয়ন মেলিয়া,
কালি যে আছিলাম, গো সাত ভাই,
তোম্‌রার উর-ভরা,
আজু উতি যে যাইবাম গো সাত ভাই,
তোম্‌রার উর-খালি॥

দেখ গো দয়ার মাওজান দুই নয়ন মেলিয়া,
কালি যে আছিলাম গো মাওজান
তোম্‌রার উর-ভরা,
আজু উতি যে যাইবাম গো মাওজান
তোম্‌রার উর-খালি। —মৈমনসিংহ

২

এখন কেন কান্দ, বাপধন, মুখে গামছা দিয়া,
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া।
এখন কেন কান্দ, মাগো, শানে পাছাড় খাইয়া।
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া॥
এখন কেন কান্দ, ভাই গো, খেলার সজ্জা লইয়া।
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া॥
তারপরে, ভাঙ্গা নাও মাদারের-বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাওরে, মাঝি, মায়ের কান্দন শুনি॥
নাইয়ারে দিয়াম তাড় বালা মাঝিরে দিয়াম কড়ি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি মায়ের কান্দন শুনি॥
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢল্‌কে ওঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাওরে, মাঝি, বাপের কান্দন শুনি॥ —ফরিদপুর

কবিওয়ালার গান, কবিগান

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কবিওয়ালা নামক এক শ্রেণীর গীত-ব্যবসায়ী যে সঙ্গীত দ্বারা বাংলার জনসাধারণের সকল কৌতুহল আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা কবিওয়ালার গান বা কবিগান বলিয়া পরিচিত। ইহার ধারা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। কবিগান বিশেষ কোন কবিওয়ালা স্বয়ং রচনা করিয়া থাকে, কিন্তু রচনা ও গীত-রীতির মধ্যে অনেক সময় লৌকিক রূপ আরোপ করিয়া থাকে। রাধা-কৃষ্ণের স্বর্গীয় লীলা কাহিনী ইহাদের মধ্যে স্বর্গীয়তার পবিত্র বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তাহার পরিবর্তে পার্থিব রস ও রুচি দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর

ইহাই শেষ অধঃপতিত নাগরিক রূপ। এই বিস্তৃত সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক খ্যাত ও অখ্যাত কবিওয়ালার নাম ও তাহাদের রচিত সঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলার পল্লীঅঞ্চলে বহু অজ্ঞাতনামা কবিওয়ালাও এই সঙ্গীত রচনা করিয়া সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। ইহাদের রচনা অনাবশ্যক ভাষার আড়ম্বর এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভাব দ্বারা ভারাক্রান্ত—স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বের অভাব ইহাদের ব্যাপক প্রচারের অন্তরায়। নিম্নোদ্ধৃত কবিগানগুলির রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না।

১

সরস্বতী নমস্তুতে, মা সরস্বতী নমস্তুতে,
হবে তরাতে মা, ও মা, তুমি তরাও ত্বরিতে।
ওমা, বিদ্যা-প্রদায়িনী, তুমি শ্বেতাঙ্গিনী ;
দাও চরণ ধূলি এই সভাতে।
সরস্বতী নমস্তুতে, মা সরস্বতী নমস্তুতে ॥
ওমা, জয়া যোগীন্দ্র মহামায়া,
মহিমা অসীম তোমার।
মুখে তারা-তারা বলে যে ডেকেছে তোমায়
তারে তুমি কর ভবসিন্ধু পার ॥
তাই শুনে এই ভবের কুলে, ডাকি দুর্গা দুর্গা বলে।
বিপদ কালে দুর্গা কোথায়, মা, এ সন্তানের মুখ চাইলি না, মা,
একবার দয়া করলি না মা ॥
পাষাণে বুক বাঁধলি গো, মা, মায়ের ধর্ম এই কি তোমার।
যে জন কুপুত্র, কুমাতা বলে আপনি যে কুমাতা হয়ে আমার ॥
তোমার জন্ম যেমন পাষাণী কুলে, তেমনি ধর্ম রেখেছ।
দয়াময়ী মা কোন কালে তুমি কারে দয়া করেছ ॥
ওমা, তোমার চরণ সাধন করি, ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী।
দণ্ডধারীর চরণ পাব বলে ক্ষীরোদ জলে, ভাসলেন শ্রীহরি ॥
তুমি ত্যাজ্য করে সোনার কাশী, শিবকে করলে শ্মশানবাসী
সন্ন্যাসী তাই সাজিয়েছ।
দয়াময়ী মা কোন কালে তুমি কারে দয়া করেছ ॥

করুণাশূন্য হয়ে তুমি, নাম ধরেছ করুণাময়ী।
তুমি দক্ষ রাজার কুমারী, দক্ষ যজ্ঞে গমন করি,
যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেরিলে নয়নে শিব-অপমানে।
সাধের যজ্ঞ ভঙ্গ দিলে ও সেই অভিমানে॥
দক্ষ রাজায় নিদয় হলে আপনি মরলি, তাকেও মারলি
কি তার দুঃখ, একবার ভাবলি না॥
তুমি সে অভিমান করে মনে
প্রাণ ত্যজেছ বিষাদ বনে।
তেমনি তোমার সন্তানে॥
তোমার জন্ম যেমন পাষাণী কুলে তেমনি ধর্ম রেখেছ।
দয়াময়ী, মা, কোন কালে তুমি কারে দয়া করেছ॥ —মুর্শিদাবাদ

২

বৃন্দে কহিলেন, গোকুলেতে কৃষ্ণ আর আসবেন না।
পড়ে ধরাতলে, ভাসে নয়নের জলে রাধে আর ধৈর্য মানে না॥
বলে এই নে গো তোর কুসুম হার, হার নিয়ে কি করব আর
এ হার আর কারে পরাব॥
ওগো ললিতা গো, ললিতা গো নীলকণ্ঠ হার হারিয়ে সখী
এ হারে আর প্রয়োজন কি?
মনে মনে বাঞ্ছা, সখী, একবার শ্যামকে দেখব,
আমার মনে যা ছিল আশা
আর আমার নয় আশা, ও গো ললিতা।
ভেঙেছে আশার বাসা ঐ কালো শশী;
তোমা চল গো সবাই মধুর মথুরায়,
যায় মদনমোহন, দেখে আসি।
কুবজা গো এমন রাজমহিষী॥
সখী দাসী হব কুবজার, অনুগত হব তার;
শ্যাম আদরে রাখবে॥
শ্যামের বামে বসবে যখন, সম্মুখে দাঁড়াব তখন,
দাসী বলে মদনমোহন ভুলেও একবার ডাকবে॥

মনে যা ছিল আশা, আর আমার নয় সে আশা
শ্যাম বিনা হব না দেহবাসী ॥
তোরা চলগো তোরা সবাই, মথুরায় দেখে আসি মদনমোহন।
সখী এই ছিল কপালে, দেখা হল না আর হল না,
কৃষ্ণ আসবেন নাকি গোকুলে, সখী এই ছিল কপালে।
কৃষ্ণ-সেবা করবার আশে, আমরা নিকুঞ্জবনে ছিলাম বসে,
আমার আশাতে নৈরাশা, আমার মনে ছিল আশা,
আশার বাধা বিধি ভেঙ্গে দিল, সখী এই ছিল কপালে ॥

—মুর্শিদাবাদ

৩

আমি বৃথা জন্মিলাম ভবে, এই ভবার্ণবে মুগ্ধ মায়ার্ণবে,
ভজিনি সে ভাবে ভবানি-বল্লভে।
জননীগর্ভে জননী গরবে যত্ন না উদ্ভবে জরায়ু পঞ্জরে ত্রাহি
নাহি রবে গরব উরবে লিপ্ত হনু স্তবে স্বর্গ বৈভবে।
আনন্দ উৎসবে মূল মন্ত্র স্তবে লভিনু কেশবে দেবাদি সবে
তবে ভজি হে ভবে যেন দিব্যজ্ঞান রবে হরিয়া না লবে।
ধ্যান ভগ্ন যবে জননী প্রসবে সবে আসিয়া এ ভবে হারাইয়াছি,
যবে মহা মহা রবে ডাকি উচ্চরবে আর পাব কবে শ্রীরামরাঘবে।
কদাচ শৈশবে না ভজি কেশবে যৌবন উৎসবে পুজি নি বাসবে,
রিপু উপদ্রবে অসৎ সংস্রবে মজিয়া গৌরবে ডুবেছি রৌরবে।
এস গো মা, শিবে, সঙ্গে লয়ে শিবে, হৃদয়ে পশিবে যুগলে বসিবে,
অহং নাশিবে কভু না আসিবে দণ্ডে বিনাশিবে যেরূপ সম্ভবে।
উপেক্ষি মানবে পুষেছি দানবে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হেরিনু সৈন্ধবে
আত্মায় বান্ধবে তারা সবান্ধবে তর্ক অবলম্বে বিনাশ বিপ্লবে।
মানব কর্তব্যে আজি কু কর্তব্যে মজি অকর্তব্যে মন্ত্রণা মন্ত্রবে
মেতেছি অসভ্যে লোক পরদ্রবে কুটভাষা কাব্যে
চাহি নিত্য নব্যে মুকুন্দ মাধবী মুকুন্দ মাধবে নিরক্ষিয়া কবে,
দেখা দিল ব্রজে উদ্ধারি উদ্ভবে রাক্ষস পাণ্ডবে ধ্বংসিলা কৌরবে।
শঙ্করে গরবে করে কবে কক্ষে লবে।

৪

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগতপতে।
তুমি দীন দয়াময় নাম ধরেছ করহে এই দীনের গতি।
আমি হে অধম পামর, তুমি হে করুণা সাগর
আমি বসত করি কামনগরে, তোমার স্থিতি প্রেম নগরে।
গোপবেশ মুরলীধর নবকেশর নটবর রসস্বাদ রাজ
রসিক শিখর রসে গড়া তব মুরতি।
হে নন্দ সুত, রাধাকান্ত, গোপবেশ গোপীকাকান্ত
আমার সেবার বাসনায় কান্ত চাই না তোমার মোক্ষ মুক্তি।

—মুর্শিদাবাদ

৫

তুমি দিগ্বিজয়ী রাবণ রাজা, একথা জগতে প্রচার।
তোমার মামাতো বোন পরম সুন্দরী, সে নারী ভার্যা হয় আমার।
ওই মধুদৈত্য নামটি ধরি সর্বদায় আপন কাজে রই,
তোমার অন্য পর তো নই।
তোমার ভগ্নী কুম্ভলশী, সে হয় আমার প্রাণ-প্রেয়সী,
সে সুবাদে আমি তোমার হই ভগ্নীপতি।
কার সঙ্গেতে বাদ বিসম্বাদ সেইটা শুনতে চাই—
কাল নিশীথে তোমার ভগ্নী কত ফুফিয়ে ফুফিয়ে কেঁদেছে।
এলাম জানতে তাই তোমার কাছে সম্বন্ধি,
তোমার লঙ্কাতে বিপদ ঘটেছে॥
তুমি স্বপদেতে সম্বন্ধি হও আমার তাই দুঃখ হয়েছে।
ধরে নেহর মূর্তি রাখলে কীর্তি ঢুকলে সে আমের বাগানে
সে তা সকলে জানে।
বাগানে রক্ষক ছিল যারা, তারা সব নিদ্রা গেল
সেই সর্বগ্রাসী বানর এসে ডাল ধরে টানে।
তোমার গোলাপ, জাম, লিচু কিছু নাইকো আর বাগানে।
বানর আম খেয়ে আটিগুলো সাগর পারে ফেলেছে।
এলাম জানতে, সম্বন্ধি, তোমার এই লঙ্কাতে বিপদ ঘটেছে॥

বল কি করে বনের বানর এল,
খুলে সেই রম্ভার বিচিটি তোমার মুখে ঠেকিয়ে দিল।
বল, কি করে সেই বনের বানর এল ॥

৬

আছে দশ হাজার সুন্দরী নারী, তাতে অসুখ কি তোমার,
তোমার শূর্পণখা ভগ্নীর বাক্যে লঙ্কাতে আনলে জানকী
নাক কাটা সে ভগ্নী তোমার, তার নাকি স্বামী বেঁচে নাই
কে খুলবে রসের খাই ॥
বেড়ায় সে বনে বনে, মদন বাণ সদাই হানে
রামকে দেখে তোমার বোনের চাপ্‌লো কামের বাই।
তোমার বোন গিয়েছিল সেই শ্রীরামের কাছে,
লক্ষ্মণ ঠাকুর নাকটী কেটে ঢাক বাজালো দেখ না
বললে বেশ মজার কথা, সম্বন্ধি, ভগ্নী তোমার
বোনের কথা শুনে গুণের রামকে কষ্ট দিও না।
একটা বানর এসেছিল সোনার লঙ্কা পুড়িয়ে দিল
স্বচক্ষে দেখলে তাই বসে।
আবার পাল শুদ্ধ ঢুকবে যখন লঙ্কাপুরেতে,
তখন তোমার নারী মন্দোদরী পালাতে পার পাবে না।
কিছুদিন বাঁচবি, শালার সম্বন্ধি, রামের সীতা রামকে দিগা
বিবাদ করিস না ॥

৭

মহাপাপে ঘিরেছে তোদের বেশী দিন বাঁচতে হবে না।
রাঢ় হবে সব তোদের নারী বেশী দিন আর নাইকো দেরী,
এসেছেন রাম জটাধারী, জান না তার পরাক্রম, যমের উপরে যম ॥
আর মদনমোহন রূপ-সনাতন মোহন মুরারি,
যোগীর বেশে করিতেছে ভ্রমণ।
তারা নানাতীর্থ ভ্রমণ করে সিদ্ধ পক্ক-আহারী।
এ কি শুন্‌তে পাই লোকের মুখে,
সম্বন্ধী, তাই নিরালে জিজ্ঞাসা করি।

তোমার ভগ্নীর ছিনালী শুনে,

আনলে এই লঙ্কাতে শ্রীরামের সুন্দরী ॥

(ওই) বাসরেতে তোমার ভগ্নীর মরেছে ভাতার

তোমার ভগ্নী কুলে রাঢ় ॥

আবার তোমার বোন রামকে দেখে কটূ কটানী ভারি। —মুর্শিদাবাদ

৮

একবার দেখ শ্যাম চক্ষেতে কে এলো যজ্ঞেতে—

কৃষ্ণ দয়াময়।

ওহে নীরদ বরণ, বলো এই বিবরণ, নিবেদন জানাই রাঙা পায় ॥

কার কামিনী চিন্তামণি কেঁদে এসেছে—দশা মলিন হয়েছে,

কয় না কথা কারো মনে চেয়ে আছে তোমা পানে

বসুধারা দু-নয়নে কেন বহিছে!

একবার দেখ কালাচাঁদ,

একবার দেখ হে কালাচাঁদ, চরণে কোটী চাঁদ যেন পূর্ণ চাঁদ;

চাঁদ বদন ঢেকে ধনি তখন বসে রইলো।

ওহে শ্যাম, রসময়, আমার কত দয়াময়, কে নারী প্রভাসে এলো ॥

আমায় বলো বলো বংশীধারী, আহা মরি হে শ্যাম মরি মরি,

রূপের বালাই লয়ে মরি—

দেখি নারীর রূপ, নারীর মন আমার বঁধু ভুলে রইলো ॥

ভাল ভাল, হে শ্যাম, আমায় বল্লে ভাল।…

ভুলালি মন, মদনমোহন রূপের কিরণে, এমন রূপ আর দেখিনে,

এসেছে শ্যাম তোমার কাছে, অভিমানে ব'সে আছে,

কার উপরে মান করেছে—এসে এখানে ॥

একবার দেখ কালাচাঁদ ॥

ভাব দেখে আজ ভাবি আমরা করি ভাবনা।

রূপের কি দিব তার তুলনা ॥

কি ভাবে এসেছে হেথা মনের কথা বলে না।

দেখি, নারীর, ঐ নারীর কাছে ডাক্‌লে কাছে আসে না ॥

—২৪ পরগণা

৯

সুবলকে কয় আনতে রাধায় কৃষ্ণ দয়াময়—
আনতে শ্রীরাধায় দ্রুতগতি সুবল ধায়
উপনীত আয়ানের আলয় ॥
ক'রে অনুজার বেশ ভানুজারে,
ভানুজার বেশ ধারণ করে অন্তঃপুরে রয়,—
দেখে কুটীলা তাই কয়—
আজ কেন, বউ, কেমন কেমন কোনদিন দেখিনা এমন,
আজ কেন, বউ, ঢেকে বদন, ধরা মনে রয়।
কুটীলা তাই ধেয়ে গিয়ে আয়ানেরে কয়—
আয় দাদা, তুই দেখ্‌সে এসে—কি সর্বনাশ ঘটেছে।
বড় দাদা, তুই দেখে যারে বউ কেন আজ এমন করে—
রান্না ঘরে কান্না জুড়েছে।
উল্‌টায়ে চড়ায়ে হাঁড়ি—উনুনে দেয় ভিজে খড়ি,
এ তো বড় দায়,
হলুদ ফিস্‌তে আঙ্গুল ফিসে—এতো আমাদের বৌ নয়।
খনেক খনেক মনে বলে, বউ গেছে যমুনার জলে—
ছলে বুঝি কোন্ রাখালে বউরূপী সাজ সেজেছে।
হয় কি না হয় দেখ্‌সে, দাদা, কি দায় ঘটেছে ॥
কেন বদন ঢেকে রোদন করে, কয় না কথা চায় না ফিরে।
অন্তরে কি দুখ, দেখা যায় না রে বৌয়ের মুখ—
রাঁধিতে রাঁধিতে কাঁদিতে কাঁদিতে অম্বল তা দেয় সুক্তানিতে।
ঝাল দিচ্ছে জাল দুধের সাথে সে বড় কৌতুক,
কেউ বলে ঐ দোষের সৃষ্টি—হ'লে ঐরূপ হয়,
কেউ বলে, তোদের বৌয়ের 'উপরি বাতাস' লেগেছে,
দাঁদা গো, বলি ও বড়দাদা, বৌ কেন আজ এমন হলো।
তোমার সাধের বৌ সেই রাধে মলো, দেখবে চলো এমন হলো।
আমরা যত ব্রজবাসী, রাখালে বেশ ভালবাসি।
কাঁদছে বৌ দিবানিশি রাশি রাশি বসন ভিজ্‌লো ॥ —ঐ

১০

বৌকে দাদা ভাবেন সদা সতী সাবিত্রী,
যে না জানে বৌয়ের গুণ তার কাছে কি বল্‌বো গুণ,
আগুন দেই তোর বৌয়ের মুখেতে।
এত দুঃখ দিলেন বিধি আমার ভাগ্যেতে॥
সেইজন্যে তোর বাড়ীতে চিরদিনের ভিখারী।
বড় দাদা তোর কথা শুনে এই প্রতিজ্ঞা হয় গো মনে
জীবনেতে জীবন ত্যাগ করি॥
নষ্টের গোড়া কৃষ্ণ ছোঁড়া মজায়েছে গোয়ালা পাড়া
দুষ্ট বুদ্ধি বড়॥
পাষাণ বুকো, মেয়ে মুখো বৌয়ের পায়ে গঁড়।
সুবল ছোঁড়া সর্বনেশে রয়েছে সে বৌয়ের বেশে
বৌ গিয়েছে বনবাসে—শুনে কালার বাঁশরী॥
(আমি) বৌয়ের জ্বালা সইতে নারি দিবা শর্বরী॥
আমি যা ভাবিলাম মনে মনে, দেখে এলাম দু-নয়নে—
বাঁচিনে লজ্জায়, একি প্রাণেতে সয়?
বড়দাদা, কি বল্‌বো তোরে এমন কাজ তো কেউ না করে
দুপুরে ডাকাতি করে অন্তরে নাই ভয়॥
ছোঁড়া কি বিষম গুণ শিখিয়াছে, গোয়ালা পাড়া মজায়েছে
আগুন দিয়েছে—নীরব হয়ে বসেছে,
তার ব্যবহার বল্‌বো কত, নাক ফোঁড়া সব পশুর মত
গোয়ালা পাড়া বোকার মত সে ছোঁড়ার কাছে।
এত দুঃখ দিলেন বিধি আমার ভাগ্যেতে,
সেজন্য তোর বাড়ীতে চিরদিনের ভিখারী॥ —ঐ

১১

ও তারিণী, সঙ্কটে পড়েছি—
সঙ্কটে পড়েছি মাগো, এবার তরাও, তারিণী॥
তুমি তারা, তুমি তারিণী, তুমি ত্রিনয়নী, তুমি শঙ্করী;
তুমি বিনে এ ত্রিভুবনে সন্তান যায়, মাগো, ভূমে গড়াগড়ি।

তাই মিনতি করিয়া ডাকি, মা, তোমারে,
অধম সন্তানে রেখ, মা, চরণে। —মুর্শিদাবাদ

১২

এবার ন্যাংটা সেজে রণসাজে নাচে শ্যামা মা,
এই কি, মাগো, তোমার লীলা, জলেতে, মা, ডুবাও শিলা।
শোলা ডুবাও পাথর ভাসাও, এই কি, মাগো, তোমার মহিমা।
ত্রিনয়নী তারা তুমি কালী তুমি রক্ষাকালী।
ন্যাংটা কালী এই কি মাগো, তোমার লীলা॥ —ঐ

১৩

মা গো, চিন্তা কর কি কারণ,
তোমার এই নীলরতন মরিবার না ধন।
যদি মরে এই ধন, করিও যতন।
একদিন ফিরে পাইবে পুত্র। —ঐ

১৪

কেবা আছে সতী নারী, ছিদ্র কুম্ভে আনতে বারি।
তবে সারবে, মাগো, তোমার নন্দের হরি॥
কেবা আছে সতী নারী, আমি মাগো বল্‌তে পারি।
জগৎ মাঝে দেখ, মাগো, আছে সতী রাধা।
যখন রাধা এনে দিল বারি, সেরে গেল তোমার নন্দের হরি।
সর্বজনে বল হরি হরি॥ —ঐ

১৫

ন্যাংটা সেজে রণমাঝে নাচে শ্যামা মা।
এই কি তোমার লীলা, জলেতে ডোবাও মা শোলা।
শোলা ডোবাও পাথর ভাসাও বলিলাম সঙ্গত গণে,
আউলায়ে, মা, মাথার কেশ, দেখতে, মাগো, লাগে বেশ,
এবার শিবের গায়ে পা তুলে দিয়ে তুমি আছ দাঁড়ায়ে,
সৃষ্টি নাশ করবার তরে এলে, মা, এই ত্রিভুবনে।
কত পুত্রের মুণ্ড তুমি করিয়াছ ছেদন,
সন্তানের রক্ত খাব বলে, উদ্যত তুমি হয়েছিলে।
এমন মা তো দেখি নারে আর॥ —ঐ

১৬

ওহে দশানন, এবার মরবার ঔষধ বাঁধিলে গলায়,
দশ মুণ্ড ধারণ করে, এলে তুমি লঙ্কাপুরে।
কি বা আছে তোমার ভাগ্যে।
কি জানি কোন রাগে পড়ে, পরের নারী হরণে।
নিয়ে এলে তোমার লঙ্কায়॥
তাই নাকি সেই দুই ভাই, হাতে নেয় ধনুর্বাণ,
বনে বনে ভ্রমণ করিল।
রাস্তার মধ্যে হলো দেখা জটায়ু বলে, কে গো, সখা,
সম্মুখেতে তুমি আমার।
রাম বলে শুন হায়, জিজ্ঞাসিলাম পক্ষী
জান নাকি সীতার সন্ধান।
পক্ষী বলে জানি ভালো, তোমার সীতা হরে নিল,
লঙ্কেশ্বর রাবণ দস্যু, হায়।
সম্মুখেতে পড়ে গেল, তায় বাধা দিতে হলো।
বাধা দিতে পেলাম এই শাস্তি॥ —ঐ

১৭

বুনে ওল পড়ে ফেরে, আনারসকে নিন্দা করে।
একখানা কাঁচা তেঁতুল ফেলে, বুনে ওলের দফা সেরে,
শোন, ওল, বলি তোমায়, তুমি যেমন বনে থাক,
আমি চিন্তা করি অবিরত কিসে তুমি শাসন হ'বে।
তাই এসেছি এই কবির গানে, ছাড়বো না তোমায় আজ,
এখানে সমানেতে পাল্লা দিয়ে যাও॥ —ঐ

১৮

ভাঙ্গা চালাতে চাঁদ উঠেছে, ভাই,
চাদের আলোয় জগৎ আলো দেখবি যদি আয়॥
দেখবি যদি আয় গো তোরা, দেখবি যদি আয়॥
আমার সেই পাল্লাদারের, কতকগুলি মুরগী চরে॥
বলে জানায় শ্রোতার সভায়॥

মনায় এই রকমের পাল্লাদার, বলিব তারপর,
এসেছে নাকি আমার সঙ্গে, সঙ্গ করিবে গানে,
এখন এসব কবির কথা, বলে যায় যখন যেথা,
শুনে যায় যত শ্রোতাগণে ॥
যত আছ কণ্ঠিধারী, আপনাদের বিনয় করি।
উচ্চৈঃস্বরে বলেন, হরি হরি ॥
যত আছেন ভাই ভগিনা, প্রণাম জানাই জনাজনা।
একবার চাঁদবদনে দিয়ে আল্লার ধ্বনি ॥
এই পর্যন্ত ক্ষান্ত করি, আমার বিপক্ষ কি বলে শুনি
এদিকেতে বেলা বহে যায় ॥ —ঐ

কবির ছড়া

১

ছিল সত্য ত্রেতা দ্বাপর শ্রেষ্ঠ, কলিকে ভেবে নিকৃষ্ট
সকল লোকে ঘৃণা বাসে মনে।
শুনিতে জঘন্য কলি, কর্মগুণে ধন্য বলি
কর্মে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট কেমনে ॥
সত্য যুগে পৃথিবীতে, মরে পুনঃ জন্ম নিতে
লক্ষবর্ষ ছিল পরমায়ু।
একবার সৃষ্টি, একবার লয়, চিরকালই এম্নি হয়,
কোন যুগে কে আছে চিরস্থায়ী ॥
কেহ ভাল কেহ মন্দ, দেবতা অসুরে দ্বন্দ্ব
ষণ্ডা-গুণ্ডা চিরদিনই হয়।
বামন রূপে বলির ঘরে, দান নিতে যায় পাতালপুরে
সে দিন না সত্যকাল হয় ॥
সত্য যুগে শত কর্ম, তখন ছিল সত্য ধর্ম
ভাল বুঝিয়া সবে কয়।
আপন কন্যার গর্ভ করণ, তুলসীর সতীত্ব হরণ
ধর্মের কর্ম সত্যের পরিচয় ॥

ইন্দ্রের ভগাঙ্গ ঘটে, চন্দ্রের কলঙ্ক রটে
কয় জনার বা সিদ্ধি যজ্ঞ যাগে।
মহারাজা অজামিলে, সেও ত পাতকি ছিলে
বৈকুণ্ঠে যায় সকলের আগে॥
পাপী আর পুণ্যবান্, চারি যুগে এক সমান
পাপের কারণ যজ্ঞ করে রাম,
কলিকালে কি সৌভাগ্য, নাই তপস্যা যাগযজ্ঞ
সর্ব যজ্ঞ হয়ে কৃষ্ণ নাম।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, পূর্বে যত আছে তারা
সকল বৃক্ষেতে আছে ফল।
আছে উদয় অস্ত পূর্বে নিয়ম যে সমস্ত
জোয়ার ভাটা নিত্য চলাচল॥
এখনো হয় গঙ্গাস্নান, গয়াতে হয় পিণ্ডদান,
কাশীর মহত্ত্ব আছে পূর্বের মতন,
একবার জন্মে একবার মরে, এখনো সব ঘরে ঘরে
তার কিছু হয় নাই পরিবর্তন।
ত্রেতাতে রাবণের বাড়ী চণ্ডী ছিল দ্বারের দ্বারী
ত্রিপুরারি আজ্ঞাকারী যার,
মালা যোগায় সুরেশ্বরে, যম ছিল যার ঘোড়ার ঘরে
বহুমূত্র ব্যারাম ছিল তার।
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী নামেতে পাতকের শান্তি
তারা মন্দোদরী আদি সতী,
এমনি সতী কলিকালে, খোঁজ করলে বহু মিলে
তাতে কলিকাল ধন্য অতি॥
পূর্ব কালে লেখাপড়া, ক-অক্ষর গোমাংস ছাড়া
জ্ঞান ছিল কার, অঙ্ক লিখতে কান্‌ত।
বিদ্যাবাগীশ যত দেখি, বৃহস্পতি ব্যাস-বাল্মীকি
সংস্কৃতের বেশী কি আর জানত॥

সন্দীপনাদির পাণ্ডিত্যে তিন চার স্কুল স্বর্গে মর্ত্যে
কলিতে টোল স্কুল কলেজ রয় হাজারে হাজার।
বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র, কবিগুরু সে রবীন্দ্র
কেন্দ্রে শিক্ষা করিল বিস্তার॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর ভাল, এর চেয়ে বেশী কি আর ছিল
তবে কেন ধন্য বলি মিছে।
ত্রেতাতে রাম রঘুবরে সাগর বাঁধে গাছ পাথরে
কলিতে রেল টেম্‌স্ নদীর নীচে॥
দ্বাপরে এক কর্ণ বীরে, বৃষকেতুর মাথা চিরে
দাতা কর্ণ নাম হল প্রচার,
কলিযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন, জগন্নাথ পাইবার জন্য
আঠারটী পুত্র কাটে তার॥
বুদ্ধ রামকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার অবতীর্ণ
পুণ্য ক্ষেত্রে জন্মিল কলিতে,
বিজয় আর বিবেকানন্দ তারাও ছিল না মন্দ
সত্য ধর্ম প্রচার করিতে।
মহম্মদ সাধক শ্রেষ্ঠ নানক আর যিশুখ্রীষ্ট
আরও কত পুণ্য ব্যক্তিগণ।
বাইবেল কোরাণের মতে বেদ বেদান্ত পুরাণেতে
ধর্মপথ করিল প্রদর্শন॥
সাধক সে শঙ্করাচার্য লাভ করেছে সর্বৈশ্বর্য
শিষ্য তার পদ্মপাদ জলের উপর হাঁটে।
জয়দেব পদ্মাবতী ধন্য প্রভু খেল পাতের অন্ন
মেহের সর্বানন্দ ধন্য জোড়া লাগায় পুণার মাথা কেটে॥
কলির বিজ্ঞান বিদ্যুৎ বলে, আকাশেতে জাহাজ চলে
বিদ্যুৎ অগ্নি ইলেক্‌ট্রিকের পাখা করে গায়।
ত্রেতায় ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ মেঘের আড়ে এ'কার সাধ্য
এখন হাজার ব্যোমযান শূন্যেতে বেড়ায়॥

ব্যাবিলনে শূন্য উদ্যান রয়, আফ্রিকার গাছে দুগ্ধ হয়
মরা মানুষ কথা কয় আমেরিকার স্পিরিটের গুণে,
বয়স সাতাশ বৎসর হরিনাথ দে চারি যুগে কে তুলনা দে
কয়েকটি এম. এ. ষোল ভাষা জানে ॥

সত্য যুগের মন্দির যত আগ্রার তাজমহলের মত
কোথাও না চক্ষে দেখা যায়—
কি আশ্চর্য এই পৃথিবীর রাজ্য জোড়া চীনের প্রাচীর
অন্য যুগে ছিল বা কোথায়।

সাইপ্রাস দ্বীপের পিত্তল মূর্তি, পিরামিড মিশরের কীর্তি
মীরার সতীত্ব আর খনার ছিল গণা—
সাত বৎসরে সাধন সিদ্ধা, মদন শিখে সঙ্গীত বিদ্যা
অন্য যুগের কারে দিব তুলনা।

অন্য যুগে যত শোন রেডিও আর গ্রামোফোন
বিনা তারে জগদীশ বোস টেলিগ্রাম চালায়,
স্পুটনিক যন্ত্র বেলুন যন্ত্র মাইন যন্ত্র আর তারের তন্ত্র
সত্যত্রেতা দ্বাপরে কি হয় ॥

বন্দুক বোমা কামানগুলি কলিকালে এ সকলি
ক্রমে ক্রমে হলো আবিষ্কার,
রেল জাহাজ আর কল কারখানা বাংলার খবর বিলাত জানা
পাঁচ মিনিটে জানা ছিল কার ॥

মানুষ হতে দেবতা বড় কিসে মনে বিশ্বাস কর
কর্ম গুণে মানুষ জগৎ জয়ী।
কলিতে বিজ্ঞানের গুণে, পুত্র জন্মায় ইন্‌জেকসনে
দেবের মধ্যে এ গুণ ছিল কই ॥

কলিতে মহাত্মা গান্ধী, করিয়ে একতা বন্দী
বিনা যুদ্ধে করে এই ভারত উদ্ধার,
কি আশ্চর্য হাওড়ার পুলে থাম্বা নাই উপরে ঝোলে
এই ক্ষমতা পূর্বে ছিল কার ॥

ট্রামগাড়ী আর মোটর গাড়ী চলে কত তাড়াতাড়ি
এ কৌশল জানত না অন্য যুগে,
সিনেমাতে যাত্রা কীর্তন বাইজী আর খেমটা নর্তন
কেউ জানত কি কলিযুগের আগে ॥
ধন্য বলি কলির নরে, আরও ধন্য হবে পরে
ঘরে ঘরে কর সবে কর্মের আন্দোলন।
ছেড়ে দিয়ে বাবুয়ানা শিক্ষা কর কল কারখানা,
চাষ আবাদে সদা রাখ মন ॥ —নদীয়া

২

বৃটিশ তাড়াইব ভাবিলাম সবাই,
বহু দিনের কষ্টের ফলে স্বাধীনতা পাই।
তাতে হল পার্টিশান হিন্দু-মুসলমান,
দুই রাষ্ট্র হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান।
পুর্বে মোরা পাকিস্তানে নিরাপদে রই,
বিধাতা দিয়েছে দুঃখ কার কাছে কই,
একজন মানুষ কিলায় হলুদপুরের মাঠে,
তার প্রতিশোধ নিল পটুয়াখালীর হাটে।
হিন্দুগণের ঘরে নাই বিড়াল মারার লাঠি,
শহরে বন্দরে মাঠে লাগল কাটাকাটি।
স্ত্রী-হরণ অগ্নিকাণ্ড আরও লুট তরাজ—
তখন মনে চিন্তা করি পেয়েছি স্বরাজ।
জানের ভয়, মানের ভয় ছাড়লাম বসত বাটি,
আসবার সময় পথে কেড়ে রাখ্‌ল ঘটিবাটি,
ফিরে কথা বল্লে মারে দুই গালে থাপর,
আনছারেরা কেড়ে নিল প্রস্রাবের ডাবর।
মেয়েলোকের উপরেতে করে অত্যাচার,
কারও রাখে তার বাজু কারো গলার হার,
সর্ব হারায়ে যখন হইলাম নিপুঁজী
হিন্দুস্থানে আসা মাত্র নাম রাখে রিফুজী।

'বিফুজী'র অর্থ হল ভিখারীর দল।
ধনী-মানী জমিদার নাম হইয়াছে তল।
পাকিস্তানে ফিরে যেতে সবাই করে মানা,
প্রথম এসে ভর্তি হলাম 'রিলিফ' লঙ্গরখানা।
সেখানে এক ঘুষখোরের দল, লরি নিয়ে ঘোরে,
নিয়ে গেল বাসা দিল দোতলার উপরে।
কৌশল করে গবর্ণমেণ্টের চাকা করে ঢিল,
উনা যদি খরচ করে তুনা লেখে বিল।
এমনি ভাবে স্বার্থ সাধন হইল যখনে,
ক্যাম্পেতে পাঠায়ে দিল যেখানে-সেখানে।
পোষ্যপুত্রের মত মোরা খোস খোরাকি পাই,
ইহার চেয়ে স্বাধীনতা আর কি আছে ভাই।
মুখে বলি স্বাধীন স্বাধীন অধীনত সবাই,
কার বাড়ীতে বসত করি ঠিক ঠিকানা নাই।
হিন্দুস্থানে মালামাল বেশী কিছু নাই,
ব্লাক মার্কেটের মালের গুদাম কোন দেশেতে, ভাই।
এক বেলা আটা রুটি, আরেক বেলা ভাত,
দুঃখেতে বসিয়া সদা করি অশ্রুপাত।
তারপরে পুনর্বসতি লাগল গণ্ডগোল,
কেহ বা উড়িষ্যা-বিহার, কেহ আসানসোল।
কেহ বা মেদিনীপুর কেহ বাঁকুড়ায়,
বিনা খুনে কোন জনে আন্দামান পাঠায়।
এমনি ভাবে বসতি দেয় ঝাড়ে আর জঙ্গলে,
শৃগাল আর শূকরের বাসা ছিল এককালে।
চোরের মেলা চোরের খেলা চোরের বাজার,
ঘুষ খোরের মরণ না হলে হবে না সু-সার।
নিঃস্বার্থে কে করিতে চায় পরের উপকার,
সরকারী বেতনের টাকা ঘুষের কি দরকার?
ব্লাক মার্কেটে যত জনে যত জিনিস আনে,

পথে যেতে কেড়ে রাখে, জমা দেয় কোন খানে ?
দশ টাকা বেতনের চাকর যারে যারে জানি,
সিগারেট না খেলে বাবুর স্বাস্থ্য করে হানি।
ক্যাম্পেতে রিফুজী যত গুদামেতে ভরা,
ক্যাম্প গার্ডের মাসিক দু'টাকা ঠিকা চুক্তি করা।
শখের খানা মাখন ছানা ঘৃত দুগ্ধ দই,
চাকুরির আগে এ সব টাকা জমা ছিল কই ?
হিসাব করলে বিচার মত ভাত মিলে না যার,
কোন বাবার টাকাতে গড়ায় সোনার অলঙ্কার ?
কতক দেয় পুনর্বসতি কতক রাখে বাকী,
এক সময় মিটায়ে দিলে চাকুরী থাকে নাকি।
ফেরি কর্তে লাইসেন্স লাগে, আর লাইসেন্স ঢেঁকি—
এর চেয়ে আর স্বাধীনতা গাছে ধরে নাকি।
'রিফুজী'দের দাবী যত দিতে চায় সমস্ত,
দিতে চায় না চাষের জায়গা খাবার বন্দোবস্ত।
সবে কর পাকা ঘর পাকা কর ভিটি,—
ভাত বিনে কি করবে সবে দালান চাটাচাটি।
বিবাহের করেছে যেমন সকল আয়োজন,
এক মাত্র কন্যার অভাব—এইটা সেই মতন।
বাংলার লোক জংলায় মাঠে বসায়েছে গ্রাম,
বিনা পয়সার জমির কাঠা হাজার টাকা দাম।
স্বাধীন স্বাধীন কর্তে কর্তে এমন স্বাধীন পাই,
গঙ্গা প্রাপ্তি বিনে ধ্যানে অন্য স্বাধীন নাই। —মুর্শিদাবাদ

৩

ও, ভগবান, গেল প্রাণ আশ্বিনের বন্যাতে।
শক্তিশেলে ফেলেছিল ছিষট্টিতে ॥
সন ১৩৬৩ সালে, যেমন হয়েছিল বন্যাফলে
কত জনা ছিল চালে, অনাহারেতে।
কত গ্রাম ভেঙ্গেছিল, কত জীবজন্তু মরেছিল

ডাকগাড়ী বন্ধ ছিল, বন্যার স্রোতে ॥
মোদের সরকার বাহাদুর, কত চাল চিড়া দিল গুড়
মজুর খাটায় 'রিলিফে' প্রচুর দুর্দিনেতে।
কোন রকমে সেরেছিল, আবার বান কে ছাড়িল
ধনে প্রাণে সব গেল, দারুণ বৃষ্টিতে ॥
এমন দেখি নাই কোন কালে, যা হয়েছে '' সালে
দামোদর শালেগ্রাম শিলা হানে বক্ষেতে।
কাউরি ভাসে ভাতের থালা, কাউরি ভাসে ধানের গোলা
কাউরি ঘরের ভিতর জল এক গল্লা সিঁড়ি কুঠাতে ॥
পনের আশ্বিন ঝড়বৃষ্টিতে, পারে না কেউ বাহির হ'তে
থাকতে ধান পাই না খেতে, দামোদরের খেলাতে।
দামোদর শিলা শালগ্রাম, লাগাইল ধুমধাম
ঢেউয়ের মাথায় দিয়ে কামান মারে বক্ষেতে ॥
রহিগ্রাম, সাদল, গাঙ্গর পাড়া, জেমো কান্দি চাঁড়াল পাড়া
করে দিল ভিটে ছাড়া, পারেনি দালান ভাঙ্গতে।
রতনপুর, নবদ্বীপ, শিবপুরে জ্বলে না প্রদীপ
গহিরাগ্রামে করে দ্বীপ রাইপুরেতে ॥
এমনভাবে গ্রাম ধ্বংস, সূর্যপুরে ভাসে হংস
ভাটকাঁধার নাই কোন অংশ, শিশু বাঁচাতে।
হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, কেবল শব্দ গেল গেল,
কে কোনখানে প্রাণ হারাল দুর্গাপূজার মেলাতে ॥
সাঁইথিয়ার কিছু নিকটে, মহিষাচটির চটা উঠে
যাওয়া হয়না খাগড়া ঘাটে, মটর থাকতে।
যাতায়াত বন্ধ হ'ল, পাকা সড়ক সব ডুবিল
বনগ্রামেতে কয়জন ম'ল নৌকাডুবিতে ॥
পুরন্দরপুরের কিছু আগে, কয়টি ছেলে ভাতে পাতনা যোগে
ডাকে হে ভগবান একযোগে, করুণ ভাষাতে।
পতিছাড়া কত নারী, পতি ছাড়ে ঘরবাড়ী
কোলের সন্তান নিল কাড়ি আচম্বিতে ॥

পুরাডাঙ্গার দক্ষিণ ধারে, তিনটি মড়া লাগল ধারে
প্যাণ্ট বুতাম ঘড়ি প'রে বিজয়ার দিনেতে।
জীবজন্তু কতো মোল, মহাজীব মারা গেল
মা দুর্গা ঢাকা গেল ঘর ভাঙ্গাতে ॥
লিখতে গেলে দারুণ কথা, অন্তরে ধরে না ব্যথা
বক্ষভাসে যাব কোথা অশ্রুবারিতে।
দেশের সন্তান বাঁচল কিসে, দেশ দশের অবশেষে
এরোপ্লেন এলো ভেসে, মোদের পল্লীতে ॥
কান্দির মোহনবাগানে, ৪ দিন এরোপ্লেনে
পর্বত হয় মোহনবাগানে, চাল চিড়াতে।
চাল গম আর কাপড়, ভেলী চিড়ে দিচ্ছে প্রচুর
'ড্রাই ডোল' দিচ্ছে প্রচুর দেশের জন্যেতে ॥
তাই খেয়ে বাঁচল বন্ধু, সরকার হয় করুণাসিন্ধু
সরকার বাহাদুর দীনের বন্ধু অভাব নাশিতে।
এইখানে ভাই সমাপ্ত হ'ল, বেড়ে যায় গ্রন্থগুলো
পার্বতী কয় হরি বল, শমন নাশিতে ॥ —ঐ

৪

কিঞ্চিৎ কিছু বলব আমি শুনেন দশজনা।
মেম্বারদের ভোটের কীর্তি করি ঘোষণা ॥
প্রথমে করি প্রণতি, সিদ্ধিদাতা গণপতি
ঐ চরণে থাকলে মতি, অভাব থাকে না ॥
বন্দি আমি শ্বেত বরণী, হংসপৃষ্ঠে আরোহিণী
যার কৃপাতে বলে বাণী, পুরায় বাসনা ॥
প্রণাম জানাই সর্বদেবে, যাদের কৃপায় এলাম ভবে
মা অভয়া অভয় দিবে, শমনে পারবে না ॥
বলি কিছু ভোটের, বাজল যেদিন ভেরী
দালালেরা সব ব্যস্ত ভারি, রাতে ঘুমায় না ॥
দালালে দালালে বিবাদ করে, বেড়ায় সারা গ্রামটি ঘুরে
মাঝে মাঝে মিটিং করে, টাকা দিয়ে 'রিজাপ' করে টাকায় তিন জনা ॥

ডাক্তারবাবুরা ব্যস্ত ভারি, বেড়ান তাঁরা বাড়ী বাড়ী
রোগী দেখেন যত্ন করি, ভিজিট চান না ॥
একদিন ভাই রাত দশটাতে, মিটিং করে কয় জনাতে
না গেলে ভাই আমার মতে, ধান ডেরী পাবা না ॥
দোকানদারে যুক্তি করে, ভারে তারা দিন দুপুরে
হাবুকে ভোট না দিলে পরে, বাকী দোকান দিবে না ॥
হাবুকে ভোট দিলে পরে, বোঁদে দেবে আধপ' করে
সুশীল হাঁটি পেছু পড়ে, একটু প্যারাও পেলো না ॥
একই গ্রামের হয় তিন জনা, এই নিয়ে ভাই হয় ভাবনা
কারে দিই কারে দিব না, করে ভাবনা ॥
ঈশ্বরদাস ভাই জেনে শুনে, পালিয়েছিল গঙ্গাস্নানে
কতক থাকল ঘরের কোণে, তারা দিতেই গেল না ॥
বড় ভোটে ছিল ভালো, লেবেল মারা বাক্স ছিল
ইচ্ছামত দিয়েছিল, চিন্তা ছিল না ॥
এই ভোটের, ভাই, নূতন নিশান, ভোটের ঘরে সব খতিয়ান
সবার মান রাখা হয় না, মূলে তিনখানা ॥
উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ধারে, বাকী নাই ভাই পূর্ব ধারে
করে মিটিং ঘরে ঘরে, গ্রামের কয় জনা ॥
গেলাম যখন ভোটের তরে, ইস্কুলেতে লোক না ধরে
যতই বেড়ায় ক্যানভাস করে, কিন্তু মূলে তা না না ॥
কতকগুলো ফিরিয়ে দিল, কাউরি বাবার নাম ছিল না
দিতে গিয়ে ফিরে এল, ভোট দিতে পেলো না ॥
যত মেম্বার এক সাথে, বসে আছে খাতা হাতে
নিষেধ আছে আইন মতে, কাউরি কথা চলে না ॥
যেমন সোনাপোকা আরশুলা ধরে, তেমনি ধারা ভোটের ঘরে
বাঁধা আছেন আইন ডোরে, কাউরি সারা চলে না ॥
যাহার ভোটার 'রিজাপ' ছিল, তাকে তো ভাই নাহি দিল
পিঁপড়ের ভারে জাহাজ ডুবলো, স্রোতে টিকল না ॥

বলতে নারি ভোটের ধারা, ছিল কত দিব্বি করা
কতই ছিল শপথ করা, তারাও দিল না ॥
কত ছিল টাকার চুক্তি, দিয়েছিল কেউ প্রতিশ্রুতি
বাহাদুরের কি বিপত্তি, সে মেম্বর হল না ॥
পাথাই মাড়গাঁ কিছু কিছু, ওদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কচু
কড়িবাবু কচুর পেছু, গেল সব জানা ॥
খেঁসরের ঐ শিরিষ ঘোষ, রহমানের সঙ্গে পাতাল দোস্ত
গহিরা গ্রামের সুধীর ঘোষ, ডুবেও ডুবল না ॥
গারুটিয়াতে দাঁড়ায় হাবু, ভোটে ভোটে হল কাবু
সতীশ কয়াল হ'য়ে কাবু, স্বভাব ছাড়ে না ॥
দ্বিজেনবাবু উপযুক্ত, সেই কারণে হয় নিযুক্ত
প্রেসিডেণ্ট মোদের মনের মত মোদের বাসনা ॥
চেষ্টা কর পরস্পরে, মনের বিবাদ ফেলে দূরে
গুরুসিয়াতে বোর্ড হ'লে পরে মিটবে বাসনা ॥
এইখানে সমাপ্ত করি, ভক্তের আশিষ শিরে ধরি
পার্বতী চরণ কয় হরি হরি, বলুন সব জনা ॥ —ঐ

করম-সঙ্গীত

পশ্চিম সীমান্তবর্তী বাংলার প্রধানতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বাংলা ভাষাভাষী আদিবাসী এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে বর্ষাকালীন একটি উৎসব প্রচলিত আছে, তাহাকে করম উৎসব বলে। মূলতঃ ইহা এই অঞ্চলের আদিবাসীর একটি জাতীয় উৎসব ছিল, কালক্রমে প্রতিবেশী হিন্দুসম্প্রদায়ও তাহা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার ফলে ইহার উপর একটু আভিজাত্য আরোপ করিবার প্রয়াস হইয়াছে। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী তিথিই করম উৎসবের তিথি। আদিবাসীর জীবনে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নৃত্য ও গীত, ইহারও তাহাই। করম গাছের একটি শাখা বন হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে কাটিয়া লইয়া আসিয়া একটি প্রকাশ্য স্থানে তাহা প্রোথিত করা হয় এবং তাহাই ঘিরিয়া নৃত্য ও গীত চলিতে থাকে। নানা লৌকিক কাহিনীও ইহার সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার গানের ভাষা যেমন সরল, বিষয়বস্তু তেমনই

প্রত্যক্ষ, ইহাদের মধ্যে নিগূঢ় (mystic) ভাব কিছুমাত্র নাই। করম সঙ্গীত নৃত্যসম্বলিত বলিয়া তালপ্রধান; মাদল ও বাঁশী ইহার বাদ্যযন্ত্র। আদিবাসীর প্রতিবেশী রূপে বাস করিবার ফলে হিন্দুসমাজও একদিক দিয়া ইহা দ্বারা কি ভাবে যে প্রভাবিত হইতেছে, করম উৎসব তাহার একটি নিদর্শন। করম সঙ্গীত এবং নৃত্যরীতির মধ্যে আদিবাসীর সর্বময় প্রভাব এখন অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

১

কা কা কর়লি, কাউয়া, বস্‌লি ঘরের চালে রে,
সত্যি করে বলবি, কাউয়া, মা কেমন আছে রে।
কা কা করলি, কাউয়া, বসলি ঘরের চালে রে,
সত্যি করে বলবি, কাউয়া, বাবা কেমন আছে রে।

—কাঁঠালিয়া (বাঁকুড়া)

২

মা এলো সিনাইয়ে কি পরিতে দিব লো,
হাড়ঁয়ে আছে পাটের শাড়ি সেই পরিতে দিব লো।
বাবা এলো সিনাইয়ে কি পরিতে দিব লো,
বাক্সে আছে পাটের জোড় সেই পরিতে দিব লো। —ঐ

৩

ঝিঙ্গা মাঝে রেঁধেছি ননদিনীর লাগে লো।
অনেক রাতে খবর এলো ননদ মরেছে লো॥ —ঐ

৪

সব পরবেই আসবি ভাই, করম পুজায় আসবি রে,
করম ফুল আনবার সময় সাথী মনে পড়ে রে। —ঐ

৫

বারো মাসে বারো পরব
ভাদর মাসে ঈদ করো,
চল, দেওরা, বাইড়াম যাব
ঈদ দেখতে যাব,
শাঁখা পরা লো রে
ঘর ফিরিবার বেলা
মার খাইল রে। —বাঁশপাহড়ী (মেদিনীপুর)

৬

আসনপাত করে টলমল, বধূ, যাছ হে ছাড়িয়ে।
গায়ের গামছা হাতে ধরি, বঁধূ, যাছ হে ছাড়িয়ে। —ঐ

৭

পদ্ম পাতারই জল করে টলমল
কন্যা করি ছেড়ে ধন,
তোকে দেখিতে আসিছি আছ কেমন। —ঐ

৮

আম গাছে আম নাই,
ফাবর কেন মার হে ;
তুমার দেশে আসি নাই,
আঁখি কেনে ঠার হে। —ঐ

৯

গাছের মধ্যে তুলসী, পাতের মধ্যে পান গো,
তিরির মধ্যে শ্রীরাধিকা, পুরুষ ভগবান গো। —ঐ

১০

সর্ষে বহুলা হুলা, সর্ষে কাটিয়ে গেল মারুয়ারে
কি ডালিরে যাওয়া,
কুঁদলা বহুলা হুলা, কুঁদলা কাটিয়ে গেল মারুয়ারে।
কি ডালিরে যাওয়া।
কুর্তি বহুলা হুলা কুর্তি কাটিয়ে গেল মারুয়ারে
কি ডালিরে যাওয়া।

—কাঁঠালিয়া (বাঁকুড়া)

১১

একদিনকার হলুদ বাটা, তিন দিনকার বাসি,
মা বাপকে বলি দিবি বড়ই সুখে আছি। —ঐ

১২

ডালা ভরি ভরি আঁকরি, কিয়া ভরি ভরি সিদূঁর
আমি শশুর সহিত করম কি সেবা কি ধনি ধনি। —ঐ

১৩

কলির বাগানে ধাসনে ভাই একাসনে
বলিব মনের কথা রাখবি ভাই গোপনে।
তুমি আমার বাঁকা সিঁথা তুমি আমার সিঁদূরের ফোঁটা
ভাই রসোল্লৎ।　　—বাঁশপাহাড়ী

১৪

আমতলে ফুলের মালা, নিমতলে গোখের ঠারা
বন মাঝেরে কালা কে দিল বনফুলের মালা,
কে দিল পরায়েঁ॥　　—ঐ

১৫

যত দিন জীবন—হাসিব খেলিবো গো
মরিলে সে তানা নানা দোলায় সাজিব গো।
হেলা কাটা মুক হোবি এবার কে জন ছাড়িলো গো॥　　—ঐ

১৬

ঘাটেতে বসন রাখি জলেতে নামিল সখীরে,
অদন বদন বংশীবদন, কদমের ডালে রে।　　—ঐ

১৭

বাড়ী না মোর কাড়া বাগাল
সবাই বলে রাঁঢ়া রাঁঢ়া,
রোস না গো রোস না গো দাঁড়া টুকু
শৃগালে আনিছে ধব ষাঁড়া।　　—ঐ

১৮

লোকে বলে, ছি ছি, জনার পুড়া বটে কি,
সকালে সিনাই উঠে মাথা ঘুটেছি।　　—ঐ

১৯

কুলি কুলি যাতি ছিলাম
ঝিঙা টোপায় ঠেস্ খালাপ,
ননদ লো টিঙায় বোল্যা
ডাহায় ঝাঁপ দিলি।

(আমার) বঁধু সদাগর, সুচম্পন নগরে ঘর
বঁধু হে, আসিতে যাইতে বড়ি দূর।
বঁধু আসিবেন বলে কপাট না দিলাম গো,
বঁধু আসিতে যাইতে বড়ি দূর ॥ —ঐ

২০

কাশীপুর ভাঙ্গল রে যশোপুর ভাঙ্গল রে,
রেলগাড়ী চলে, ধনি, ধীরে ধীরে ॥ —ঐ

২১

হরিণের দু'টো শিং, হরিণ চলে গো তিরিং তিরিং,
হরিণ দেঙা দেঙিলে, গো দিদি,
আর আমি বাঁচব না। —ঐ

২২

সারা বন ঘুরি ঘুরি বনপুষ্প তুলিতে,
হায় হায়, বন ফুল
বন মাঝে মনকে ভুলেছে,
কত প্রেমের ছলে। —ঐ

২৩

কোন কোণে উনান, ঝড় বাদল গঙ্গাজল,
কোন কোণে বরষার পানি ॥ —ঐ

২৪

মন ভাঙ্গিল রে, মন ভাঙ্গিল রে,
হাতের সরু শাঁখা ভাঙ্গিল রে।
গলার মঘা মালা ছিটিল রে ছিটিল রে,
গলায় সিকি ছড়া আদলি লেগেতে
তাং হিয়া বানাতি ॥[১] —ঐ

২৫

ঘরকে বাসিবে পর, পরকে বাসিবে ঘর,
নিজ নাহি যতন করিও পিয়াকে।
যান কতি কাল পালাবে জীবন।[২] —ঐ

---

১ স্বামীর মৃত্যুতে সর্বহারা স্ত্রীর বিলাপ। ২ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কথোপকথন।

২৬

চারি দিকে চৌকি বসে সকলে পালঙ্ক দেখে ;
আহা কি রূপে নিয়ে গেল, রামকে রাজা মহীরাবণকে।
শ্বেত মাছি হয়ে হনু আছে হনু পাতাল ভিতর,
আজ হনু দেখিবে বলিদান গো, কেমন কালী দেখিবে এখন ॥
মন্দির সহ দেখিবে এখন গো, কেমন কালী দেখিবে এখন,
রাজাকা পুত্র আমি দণ্ডবত নাহি জানি,
ওগো দণ্ডবত করি দিও রামকে রাজা মহীরাবণকে ॥ —ঐ

২৭

রথ শ্রাবণ মাসে, ছেলার হাতে ঘুগীরে
কি মাছ ধরিলে ছেলা, শুধুই গোড়ই টুনিরে। —পুরুলিয়া

২৮

নদীয়া ভরল দেশে পিয়া গেল পরদেশে
ভাসি ভাসি নইন্যায় বেয়াকুল
কিসে রাখব কুল, পিয়া ভেলে ডুমুরীকা ফুল। —ঐ

২৯

উকুল ইকুল নদী তাতে আমার পাথর বাদী
ঝাঁপ দিলে ডুবিয়া মরিব,
বঁধু হে, কেমনে নদীয়ায় পার হব। —ঐ

৩০

রথ শ্রাবণ মাসে, কাঁচা আড়্যে ভমর বসে
বিজলী চমকে হিয়া ডোলে
রসিকাকে ছেঁকল ডহরে ॥ —ঐ

৩১

তুমি যাবে পরদেশ আমি যাব সঙ্গে
রাঁধিব বেগুনভাত পরশিব রঙ্গে। —ঐ

৩২

আজ যে করম ভেল রাতি
গোপীরা সব কয়ে একাদশী
আজ যে করম ভেল রাতি। —চাণ্ডিল (সিংহভুম)

৩৩

শ্বশুরঘরে রহল হাঁড়িশালে ঘুরল, ও লহর গেলে খেলাব ঝুমর,
ই দুয়ারে শ্বশুর শুয়ে, উ দুয়ারে ভাসুর শুয়ে মধ্যে কুকুর ভুঁকেরে।
পায়েতে পঁইরি বাজে রম্‌ঝম্‌ কেইসে বাহির হবরে। —ঐ

ইহা একটি উৎকৃষ্ট উৎকণ্ঠিতার পদ। ইহার অর্থ—শ্বশুর গৃহে রন্ধন শালায় আবদ্ধ হইয়া আছে। ঝুমুর খেলায় কি ভাবে যোগ দিব? এক দুয়ারে শ্বশুর ঘুমাইতেছে, এক দুয়ারে ভাসুর শুইয়াছে, মধ্যস্থলে কুকুর রহিয়াছে। পায়ে ঝমঝম মল বাজিতেছে, কি ভাবে ঘর হইতে বাহির হুইব?

৩৪

আজ তয়ে করম রাজা ঘরে দুয়ারে ঘরে দুয়ারে
কাল তয়ে করম রাজা নালনদীর পারে। —ঐ

৩৫

ভাই লাগি দিও গোঁসাঞ সভাদর বরে হে।
সৈঁয়া লাগি দিও গোঁসাঞ শ্বশুর দুয়ারে হে॥ —ঐ

৩৬

হাসি গাইরে কইলি গাই বড় রে দুধালি গাই,
ছিমতি রাজা হাসি গাইকে দিও রে মুলান। —বাঁশপাহাড়ী

৩৭

হাক্কেতে[১] কাটিয়ো ডোঙ্গা বাইলে দাই সজনী,
বিনিরে পানিতে ডঙ্গা ছলকে সজনী, ভালার মন॥ —ঐ

৩৮

শিশু বয়সে কালে (ও যে গো), নাই জানি গো জ্বালা,
(ও যে) ধনী গো দুলালিনী শিশু কালের বেলা॥ —ঐ

৩৯

নিয়া হাতুরে হ্যাঁদে বাবা ফুণ্ডি বাবা,
কলম কলম বিস্তর তানা—
(গো) সুরধুনী বিল টাং পঞ্চী উড়া ও তানা।
(গো) সুরধুনী······॥ —ঐ

১ কুঠার

৪০

'তুমি নাকি যাছ, বঁধু, বুড়ু টামার[১] দে।
ঘরের খরচ দিয়ে যাও,
(হে হে বঁধু) ঘরের খরচ দিয়ে যাও।
হাড়ি এত আছে দানি ছটাকের চাল যে।
(হে হে ধনি) পরণে করবে বেসর।'
'বেড়ি আছে যে গো ধনি—আয়না চিরুণ
বোতলে তো আছে ধনি সরিষার তেল গো।[২]
(হেই গো) পরণে করবে বেসর॥' —ঐ

৪১

শুন, হে তপোধন
(আর) দিন গেল হে অকারণ।
শুন ভাই নলিতারে,
প্রেম ছাড়া আছে কি সংসারে ;
তুমি হইলে পরের পুত
তোমায় নিয়ে এত দুখ,
শুন, ভাই, নলিতারে॥ —ঐ

৪২

টাটানগরে ঘর,
(ও যে) জিওল বাঁশির কিসের ডর।
দাঁতে মিশি নয়নে কাজল,
এ কাজলে করেছে পাগল॥ —বাঁশপাহাড়ী

৪৩

এখন আমার ঢুল ঢুল, কেনে ধনী দাঁড়ায়ে রইলে।
হাসি লিয়ে ধনী ইহ জীবন আধা দিন লাগি॥ —ঐ

৪৪

আশ্বিন মাসে দুর্গা পুজা সবাই পরে নীল শাড়ী ;
হেই গো তোর হেংলা জামাই, ছাড়ি পালায় নীল বাড়ী।
হেই গো তোর হেংলা জামাই, ছাড়ি পালায় নীল শাড়ী॥

---

১ স্থান। ২ স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের উক্তি।

৪৫

সারা বন বুলি বুলি বাছে পুষ্প ফুল তুলি,
শ্যামের গলেতে ঐ নদীতে,
চল চল চল, সখি, ফুল তুলিতে
বাঁকা শ্যামকে সাজাবি যে ফুলেতে। —ঐ

৪৬

শিম ফুল সারি সারি,
খোঁপার জেঁনে লহকারি ॥ —ঐ

৪৭

কুলি কুলি যাইও না কাগজী ফুল তুলো না,
কাগজী ফুলের মালা কর্ণমূলে দিও না। —ঐ

৪৮

একরাহী জলজল কন ধনী জাড়ায়ে রহিল গো,
তাহা নানা নানা রে···
নাচিল ধনী খেলিল ধনী,
জীবন গো আঁধা আধি লাগি। —ঐ

৪৯

আমরা গোয়ালা জাতি
না রহব গো রাতি—
রাতি—রহিলে জাতি যায়,
কি করিয়া নদীয়া পার হব।
যে করিবে নদী পার
তাকে দিব গলার হার
আধা প্রাণ তাহারে সঁপিব
হায় গো, কি করে নদীয়া পার হব। —ঐ

৫০

লাজুড়া বড় বৌ কাঁধে বস্তা হাতে জঁাতি
দেখ যেন না ডুবায় মুন—
লাজুড়া বড় বৌ কাঁধে বস্তা হাতে জঁাতি। —ঐ

৫১

ও দিদি, ঝালিদার আম
ঠাররে মারিলে দিদি,
ঠোঁটে পড়ে ঘাম।
ও দিদি, ঝালিদার আম। —ঐ

৫২

প্রশ্ন—কোন ঘাটে নাম হে, রাজা দশরথ লাল, ১৩—৪
চিকন কালারে, কোন ঘাটে নামে হনুমান।
উত্তর—উপর ঘাটে নাম হে, রাজা দশরথ লাল
চিকন কালারে, নাম ঘাটে নামে হনুমান। —ঐ

৫৩

উচু উচু ডুঙ্গুরি বড়ই ধরে ফুছঁড়ি
দেনা, দাদা, ঠেঙ্গা কাঠি বহু যাবেন বাগাড়ী॥ —ঐ

৫৪

বাড়ীর নামোয় ছাতি উঠে মাথায় মাটি নিয়ে রে,
আমার বঁধু পসর খুলে নিশি ভোর রাতেরে॥ —পুরুলিয়া

৫৫

ছুটু মুটু গড়্যাটি কমল পাতের ঘেরা রে,
ডুবিলে না ডুবে ভাই কাঁখেরি গরয়া॥ —ঐ

কর্মসঙ্গীত

প্রত্যক্ষভাবে দৈহিক পরিশ্রম সাপেক্ষ কোন কর্মের মধ্যে লিপ্ত থাকিবার সময় কর্মের শ্রম লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে সমবেতভাবে যে গীত গাওয়া হয়, তাহাই কর্মসঙ্গীত , ইংরেজিতে ইহাকে work song বলা হয়, বাংলায় ইহাকে শ্রমসঙ্গীতও বলা যাইতে পারে। কারণ, দৈহিক কোনও পরিশ্রম করিবার কালীন শ্রম লাঘব করিবার উদ্দেশ্যেই সাধারণতঃ ইহা গীত হয়। কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী এই শ্রেণীর সঙ্গীতের তাল নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। নৌকার বাইচ খেলিবার সময় যে গান গাওয়া হয়, তাহার মধ্য দিয়াই কর্মসঙ্গীতের তালের বিভিন্ন বিভাগও সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। বহু ব্যক্তি বিপুল শক্তিদ্বারা

একসঙ্গে যদি কিছু আঘাত কিংবা আকর্ষণ করে, তখন গানের তাল মন্থর হয়; কর্মের গতি যখন তীব্র ও দ্রুত হয়, তখন তালও সেই পরিমাণে তীব্র ও দ্রুত হয়। কর্মসঙ্গীতের একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, বহির্মুখী শারীর ক্রিয়া ইহার প্রধান লক্ষ্য থাকে; সেইজন্য ইহার মধ্যে ভাব নিবিড়তা প্রকাশ পাইতে পারে না, ইহার ভাব নিতান্ত তরল। জীবনের কোন গুরুত্বপুর্ণ বিষয়, অর্থাৎ প্রেম কিংবা আধ্যাত্মিকতা ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইবার উপায় নাই। তাল (rhythm)-ই ইহার মুখ্য, তালের নিকট ইহার ভাব সর্বদাই বিসর্জিত হইয়া থাকে; সুতরাং উচ্চ ভাব বর্জিত এই রচনা বিশেষ কোন সাহিত্য-গুণান্বিত হইতে পারে না। কর্মসঙ্গীতের মধ্যে সারিগানই প্রধান।

বাংলা লোক-সঙ্গীতের যে শাখা কর্মসঙ্গীত বা ইংরেজীতে work song বলিয়া পরিচিত, সারিগান তাহারই অন্তর্ভুক্ত। সমাজ-জীবনে কর্মের যেমন বৈচিত্র্য দেখা যায়, কর্মসঙ্গীতেও তেমনি বৈচিত্র্য আছে। কর্মসংগীত কর্মের সহচর, ইহা কর্মের শ্রম লাঘবকারী; কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী ইহা একক, দ্বৈত এবং সমবেত সঙ্গীত হইতে পারে; কিন্তু সারিগান সর্বদাই সমবেত সঙ্গীত; সমবেত সঙ্গীতের সকল বৈশিষ্ট্যই ইহার বৈশিষ্ট্য।

বাংলা পল্লী-সঙ্গীতের দুইটি প্রধান বিভাগ ভাটিয়ালি ও সারি। ভাটিয়ালির বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া বলা যায় যে, ইহার সুর প্রথমেই আকস্মিক ভাবে একান্ত চড়ায় পৌঁছাইয়া ধীরে এবং মন্থর গতিতে খাদের দিকে নামিতে থাকে। ইহার অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা তাল বা rhythm-বিহীন একক সঙ্গীত; কর্মসঙ্গীত বা সারিগান সম্পূর্ণ ইহার বিপরীত। সাধারণ ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ইহার সুরের মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ-গত একটি সমতা থাকে, বিশেষ উত্থান-পতন থাকে না। তবে অনেক পদের প্রারম্ভেই একটি মাত্র শব্দ কখনও প্রথমে সমগ্র পদটি হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবেই পদাবলীর আখরের মত বা ইংরাজি yell-এর মত উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহার ধর্ম ভাটিয়ালি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহা ছন্দ, তাল বা rhythm-যুক্ত সমবেত সঙ্গীত, ইহা কদাচ একক গীত হয় না। ইংরেজীতে work song বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহারই অন্তর্গত বলিয়া ইহার সঙ্গে একটি বিশিষ্ট শারীর ক্রিয়া (physical action) অবিমিশ্র ভাবে জড়িত হইয়া থাকে। ভাটিয়ালি কোন কর্মের

সঙ্গে জড়িত নহে ; তাহা নিঃসঙ্গ অবসরের সঙ্গীত। কিন্তু সারি গান সঙ্গী সমভিব্যাহারে কর্মরত অবস্থায় সমবেত সঙ্গীত। সেই জন্য ভাটিয়ালির সঙ্গে ইহার মৌলিক পার্থক্য স্বভাবতই লক্ষ্য করা যায়।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে একদিন নৌকা চালান একটি প্রধান কর্ম ছিল, সেই সূত্রে সারি গান প্রধানতঃ নৌকা চালনার সময় গীত হইত ; সুতরাং অনেকে নৌকা চালাইবার সময় সমবেত কণ্ঠে যে সঙ্গীত গীত হয়, একমাত্র তাহাকেই সারিগান বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু নৌকা চালনা ছাড়াও যে সকল সঙ্গীতের মধ্যে সমবেত ভাবে একই প্রকৃতির শারীর ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তাহাকেও সারি গান বলা যায়। তবে কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী সারি গানের বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে ; যেমন, ছাত পেটার গান, ধান কাটার গান, পাট কাটার গান, তাঁত চালাইবার গান, ধান ভানিবার গান ইত্যাদি। ইহারাও প্রকৃতপক্ষে সারি গান ; কিন্তু এখন সারি বলিতে কেবল নৌকা চালাইবার সময় যে সমবেত সঙ্গীত গীত হয়, তাহাই মনে করা হয়। সারি কথার অর্থ শ্রেণী, সারি শব্দটিও শ্রেণী হইতেই জাত। সেই জন্য যাহা এক সঙ্গে গাওয়া হয়, তাহাই সারি গান বলিয়া পরিচিত। কিন্তু যাহাই সমবেত কণ্ঠে গীত হয়, তাহাদের সকলই যে সারি গান, তাহাও নহে। এমন অনেক পল্লী-সঙ্গীত আছে, যাহা এক সঙ্গে গীত হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে কোন শারীর ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, তাহা সারি গান নহে। যেমন মেয়েলী বিবাহ-সঙ্গীত কিংবা বিবিধ ব্রত সঙ্গীত ; এই সকল সঙ্গীত কোন শারীর ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত নহে বলিয়া ইহাদের মধ্যে কোন তাল বা rhythm সৃষ্টি হইতে পারে না, সেই জন্য ইহারা অন্যান্য প্রকৃতির সঙ্গীত। বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রম-সঙ্গীতের পরিচয় এবং তাহাদের ব্যাখ্যার জন্য 'বাংলার লোক-সাহিত্য' তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৪৮৫-৬৩৪ দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থেরও যথাস্থানে প্রত্যেক শ্রেণীর কর্ম-সঙ্গীতের স্বতন্ত্রভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে।

কাওয়ালী

কাওয়ালী উত্তর ভারতীয় উর্দুভাষী মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গীত। উত্তর ভারতীয় ভজন গানের মত ভক্তিমূলক সঙ্গীত ইহা দ্বারা গীত হয়। বাংলা সংকীর্তনের মতই ইহা সমবেত সঙ্গীত। বাংলায় কাওয়ালী গানের ব্যাপক

অনুশীলন হয় নাই। সামান্য কয়েকটি যে নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহারা উত্তর ভারতীয় কাওয়ালী গানের মতই ভক্তিমূলক গান।

১

হরি বল রে মন।
বিষয়-বিষে দহে জীবন
নামামৃত পান করিলে জুড়াবে জীবন।
হরি হরি বল, পাবে প্রেমধন,
হরি ভ'জে গেল ব্রজে শ্রীরূপ-সনাতন॥
হরি বলে মার ডঙ্কা, ঘুচে যাবে ভবের শঙ্কা,
অন্তিমেতে কিসের শঙ্কা পলাবে শমন।
হরি নামটি নারদ করে বীণাতে ভজন,
যোগী ঋষি দিবানিশি করে যোগ সাধন,
নামে ব্রহ্মা হল ব্রহ্মচারী, বৈষ্ণব হল শঙ্করী,
পঞ্চানন ত্রিপুরারি করেন সংকীর্তন॥
হরি হরি হরি বল, ওরে আমার মন,
হরি বলে অজামিলের বৈকুণ্ঠে গমন,
প্রহ্লাদ জপে এই হরিনাম, বিষ অগ্নিতে পায় পরিত্রাণ,
জগাই মাধাই তাহার প্রমাণ, হল উদ্ধারণ॥
গুরুচাঁদ কয়, হরিচাঁদের ভজ শ্রীচরণ,
গোলোকচাঁদ আর বদনচাঁদ আর ভজে হীরামন,
মৃত্যুঞ্জয় কয় আর ভেব না, হরি বল তারক রসনা
অক্রূরের এই বাসনা দশের শ্রীচরণ॥ —মুর্শিদাবাদ

২

(হরি) দোকান পেতেছ ভব সংসারে।
আশি চুরাশি রকম দ্রব্য আদি মনোরম,
রেখেছ মনের মত সাজাইয়ে ব্রহ্মাণ্ডাগারে॥
আপনি হয়ে মহাজন বসে আছ, হে হরি,
রেখেছ তিনজন গুণবান্ কর্মচারী,
ব্রহ্মা আর বিষ্ণু আর ত্রিপুরারি।

দিয়েছ তহ্‌বিলদারী দোকানদারী তারাই করে ॥
মালের আমদানী যত করে চুতরানন,
বিষ্ণু করিছেন রক্ষা করিয়ে অতি যতন,
আপনি বসে বিক্রয় করিছেন পঞ্চানন,
আছে মাল যে যে রকম তাহারই সেই দরে ॥
কুসঙ্গ ভুঁসি মিশাল, যত সব দোষী মাল,
মায়া বস্তাতে পুরে রেখেছ বহুকাল,
এই সংসার-আড়তে বার বার ফেরে মাল,
বিনামুল্যে লয়ে যায় শমনাদি সদাগরে ॥
নির্ম্মল বিশুদ্ধ স্বত্ব যত উৎকৃষ্ট মাল,
নাহি কোন শোক তাপ, নাহি কোন খাদ মিশাল।
নাহি তার মন্দা বিক্রি সমান দর চিরকাল,
হরিভক্তি ছাপ মোহর দিয়ে পাঠাও আনন্দ বাজারে ॥
দ্বিজ নীলকণ্ঠ কয় পড়ে কর্ম্মক্ষেত্রেতে
হয়ে আনাড়ি মাল রইলাম সংসারেতে।
আমি বিকাইলাম হরি তোমারই শ্রীচরণেতে।
তোমা ভিন্ন এই ত্রিজগতে কেহ না লয় আমারে ॥

কাঠিনাচের গান

কাঠিনাচ পশ্চিম বাংলার যুদ্ধনৃত্যের একটি আধুনিক অধঃপতিত রূপ। ইতিপুর্বে সামন্তরাজদিগের গৃহে তাহাদের বৃত্তিভোগী পাইকদিগের দ্বারা এই নৃত্য আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইত। বর্তমানেও দুর্গোৎসবের সময় একটি লৌকিক আনন্দানুষ্ঠান রূপেই ইহা আজ পর্যন্ত পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কোন কোন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কাঠি নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়, তাহাই কাঠিনাচের গান বলিয়া পরিচিত। সামন্তরাজগণের দুর্গোৎসবের সময় ইহা অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া ইহার সঙ্গীতের কথার মধ্যেও রামায়ণ-ভাগবতের কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; লৌকিক-কাহিনী প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই।

১

হেরে এলাম তারে, সাকী, হেরে এলাম তারে।
এক অঙ্গে কত রূপ নয়নে না ধরে॥
এক সে কালিয়া চাঁদ চন্দনেতে মাখা।
আমা হতে জাতি-কুল নাহি গেল রাখা॥
কালিয়া চঞ্চল আঁখি যার চানে চায়।
সাপিনী দংশিলে যেন বিষ ভরে গায়।
সাপিনী দংশিলে যেন সাপে ঝাড়ে গুণীজনে।
কালিয়া দংশনে মন্ত্রতন্ত্র না মানে॥
নটবর বেশ ধরে আছে দাঁড়াহিয়া।
যদুনাথ দাস বলে চল দেখি গিয়া॥ —বাঁশপাহাড়ী

২

মরমে নাগাল গোরা না যায় পাসরা।
নয়ন অঞ্জন হরে নেগে বেল পারা॥
জলে যদি ডুবে থাকি সেথাও দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় গোরাচাঁদ হ'লো পারা॥
কে জানে সে গোরারূপ অমিয় পাথার।
ডুবিল তরণীর মাঝি না জানে সাঁতার॥
যদুনাথ দাস বলে গোরা অনুরাগে।
সোনার মতন গৌর আমার হৃদয় মাঝে জাগে॥ —ঐ

৩

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
খেলিবার প্রবন্ধে কৈলেন॥
গড়াগড়ি যান প্রভু নিজস্ব কীর্তনে।
ঘরে ঘরে হরি নাম দেন সর্বজনে॥
চেতন করেন জীবে কৃষ্ণনাম দিয়া।
ছল ছল আঁখি যাঁর নয়নের জলে॥
জগৎ পবিত্র কৈলেন গোউর কলেবর।
ঝলমল মুখ যার পূর্ণ শশধর॥

এ মত নাহিক আর দয়ার সাগর।
টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিভোর ॥
ঠমকে ঠমকে যায় গোউর গদাধর।
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধরের গায় ॥
অন প্রসঙ্গ গোরা না শুনে কানে। —ঐ

৪

খাব না খাব, বঁধুহে, কালো মুরগীর মাস,
আমার জন্যে এনে দিবে দয়ের মাগুর মাছ।

—বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৫

ওরে ময়রা, কেমন ভিয়েনদার জানব রে এইবার,
ওরে, আখের রসে হয় চিনি,
ময়রা বলে চিনির রসে বাঁধব রে জিনিস।
ওরে, ওলা খেজা মণ্ডা আদি চিনি দিয়ে করল পাক
জানব রে এইবার।

একটা মনে রেখেছি,
ভিঁড়া গুড়ে পাটি নাড়ু মুড়কি করেছি।
ওরে জিলাপীতে রস পুরিয়ে,
বাতাসাদি করল সার,
জানব রে এইবার।

মুকুন্দ বলেরে তোরে,
সিঙ্গাড়াদি মিহিদানা করলি কি করে!
আবার রসগোল্লা পানতুয়াদি চিনির রসে করলি পাক।
জানব রে এইবার।
ওরে, হরিবোল বলে একটা দে মুখে ফেলে
মনের আশা মেটাতে,
ওরে অধম গিরির মনের আশা মিটল নারে চিরকাল
জানব রে এইবার। —ঐ

৭

মাঘেতে মাধবে কইলাম মথুরায় গমন
ফাল্গুনে ফুটিল পুষ্প কিরূপ মধুর,
চৈতে চাতকী বৈশাখেতে খরা
চাহিতে না পারেন সীতা কাঁপেন থরা থরা।
জ্যৈষ্ঠিতে যমুনার জলে খেলেন বনমালী
আষাঢ়ে নবীন মেঘ ডাকে গুড়ু গুড়ু।
শ্রাবণে নবীন বর্ষা পড়ে ঝর ঝর।
ভাদ্রেতে নবীন নদী দুকুল সাঁতার।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে ঘরে ঘরে,
কার্তিকে কালীর পূজা মিশিলেন হরি
অগ্রাণেতে নব অন্ন খায় সর্বজন
পৌষেতে নব শীতে কাঁপে অঙ্গময়। —ঐ

৮

ভাঙ্গা ঘরে দিনের আলো রোদ সুখ সুইম না,
তুই আমার নয়নের কাজল জলে ধুইয়া দিস্ না।
জলে ধুইয়া দিস না॥ —ঐ

৯

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কাঁচা অহিরে ভ্রমর বসে,
চমকে চমকে হিয়া জাগে হৃদয়ের আনন্দ ওগো ভাঙ্গিব ভামরে॥ —ঐ

১০

নিমতলে জন্মিলে, নিমাই, নিম তরু তলে রে।
মাকে ফাঁকি দিয়ে নিমাই সন্ন্যাসী সাজিল রে॥ —পুরুলিয়া

১১

হাঁকাতে হাঁকাতে বাগাল গেলি অনেক দূরেতে,
গোধন চরাতে যাবো বলরামের সাথেরে॥ —ঐ

১২

অহড়ে বহড়ে, বাগাল, গাই চরালি কোথা রে,
খুরে না লাগিল কাদা জল খাওয়ালি কোথা রে॥ —ঐ

১৩

বার হাতের কাপড়খানি তের হাতের দশি,
পিছুলে পিছুলে পড়ে কাঁখের কলসী!
সীতা ধান মেলো গো ঐ কদমের তলে। —বাঁশপাহাড়ী

কাড়া খেলার গান

কার্তিকী অমাবস্যার পরবর্তী দ্বিতীয়া তিথিতে বঙ্গের পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের আদিবাসী এবং কুর্মি প্রভৃতি জাতি একটি গরু কিংবা মহিষ (কাড়া) কে খুঁটিতে বাঁধিয়া মৃত গোমহিষের চামড়া তাহার চোখের সামনে ধরিয়া এবং লাঠি দিয়া খোঁচাইয়া ভয় দেখায়। ইহাকেই কড়া খেলা বলে। খুঁটিতে বাঁধা জীবটিকে ঘিরিয়া উদ্দাম নৃত্যগীত চলিতে থাকে। সেই উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার একটি নিদর্শন এই—

১

কোন কালে দেখি নাই, নাড়ের হাতের শাখা,
আলাটি সার কচুগুলা ঝুরে ঠেকা ঠেকা।
বাড়ীদিগে যেও না, ভাই কালাচাঁদ, ইঁদুরে বইছে গড়াধনে।
ও ভাই কালাচাঁদ, ইঁদুরে বইছে গড়াধন॥

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

কার্তিক পূজার গান

হেমন্ত ঋতুর মধ্যভাগে কৃষি-সম্পদ গৃহে তুলিয়া আনিবার পুর্বক্ষণে উত্তর ও পুর্ব বাংলায় কার্তিক মাসের শেষ তারিখে যে শস্যরক্ষক দেবতার পুজা হয়, তিনি কার্তিক ঠাকুর বলিয়া পরিচিত। কালক্রমে হিন্দু-পুরাণের প্রভাব বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কার্তিক ঠাকুর পৌরাণিক শিবের পুত্র কার্তিকেয়ের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার শস্য রক্ষা করিবার গুণটুকু তাহা হইতে বিসর্জিত হয় নাই। পশ্চিম বাংলায় কার্তিকেয় ঠাকুর অন্য উদ্দেশ্যে পুজিত হইয়া থাকেন।

কার্তিক ঠাকুরের পুজার প্রধান অঙ্গ মেয়েলী সঙ্গীত। কুমারী সধবা বিধবা সকল শ্রেণীর নারীই ইহাতে অংশ গ্রহণ করে বলিয়া এই অনুষ্ঠান একদিকে

যেমন বিস্তৃত, তেমনই আর একদিকে বিচিত্র। এই উপলক্ষে গীত মেয়েলী সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

১

বুলে আরে কার্তিক যাইবাইন,
অভিলাসে, এয়ো কে কে যাইবা ?
সঙ্গে লো ঠমকী রাধা, কে কে যাইবা ?
ঘরে থাক্যা রামের পিসী বুলে—
আমি এয়ো, আমি যাইব সঙ্গে লো,
ঠমকী রাধা আমি যাইবাম। —মৈমনসিংহ

২

এই উপলক্ষে শস্যক্ষেত্র বিনষ্টকারী বাঘ মারিবার গীত গাওয়া হয়—

বাঘায় বুলে বাঘুনী, কিসের ঢোল বাজে,
অমুক গায়ের নারীলোক, আইজের রণে সাজে ।
বাঘায় কান্দেরে……
বাঘায় বুলে বাঘুনী, ঐনা পথে যাইও…
অমুকের গরু দেখ্যা সেলাম জানাইও।
সাজিল কামিনীকুল, কানে তুলে কন্নফুল
মারে তীর হুমকা বাঘের গায় রে,
রেবতী আর চন্দ্রকলা, এক হাতে ধনুছিলা
আর হাতে বাচ্ছ্যা তুলে বাণ রে। —মৈমনসিংহ

বাংলার পল্লীর মেয়েরা একদিন নিজ হস্তে বাঘ শিকার করিতেন, উপরের গানটি হইতে তাহাই বুঝিতে পারা গেল।

৩

পাখীতে পাকা ধান খাইয়া যাইবার কথাও কার্তিক পুজার গানে শুনিতে পাওয়া যায়,

পক্ষী রে, আরে রে বাবুই রে, ক্ষেতের পাকেনা ধান খাইলে।
উইড়া উইড়া ধান খায়, পইড়া পইড়া রং চায়।
সন্নাইনলের আগ বাসারে।
এক বাবুই ধলিয়া, আর এক বাবুই কালিয়া,

আর এক বাবুইর কপালে তিলক।
কাল না ছেলেটায়, ডাক দিয়া কইয়া যায়,
বাদুড় পড়িছে রাধার ক্ষেতে।
একেলা না পুতের বৌ, সাত ক্ষেত রাখে গো,
আরও জোগায় পান তেলের কড়ি।
আরে রে বাবুই রে, ক্ষেতের পাকেনা ধান খাইলে।

নিম্নোদ্ধৃত কয়টি পদে বাঙ্গালী নারীর বাণ নিক্ষেপ করিবার রূপটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে—

হাতীবান, হাতীবান, দেবী তোরে ডাকে রে।
কি কারণে দেবী, মাগো, আমার তলবরে।
তুমি নি পারিবা উষার ব্রত ভাঙ্গিবারে।
আমি, মাগো, না পারিলে, পারিবে কেমুন জনেরে।
হাতীবান মারিল উষা দুই পা খেঁচিয়ারে। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে পাইকের যুদ্ধসজ্জার বর্ণনা আছে—

৪

সাজ কি, আরে পাইক, রণের বালা।
যুঝ কি, আরে পাইক, রণের বালা।
অমুক বাড়ীর যত পাইক জিত্যা ঘরে আইল রে।
অমুক বাড়ীর যত পাইক হাইরা ঘরে গেলরে।
অমুক বাড়ীর যত পাইক সবের কানে সোনারে।
অমুক বাড়ীর যত পাইক সবের পিন্ধন তেনারে। —ঐ

ইহাতে স্বপক্ষের পাইকের প্রশংসা এবং প্রতিপক্ষের পাইকের নিন্দা শুনিতে পাওয়া গেল। অমুক শব্দটির স্থলে প্রয়োজনমত স্বপক্ষ ও বিপক্ষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

প্রধানতঃ কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, গোয়ালপাড়া ও রংপুর জেলার রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের গ্রামীণ নারীসমাজের মধ্যে প্রচলিত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ‘কাতি পুজা’ বা কার্তিকপুজা। এই অনুষ্ঠান কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিনে হয়। কার্তিক ঠাকুরকে মানত করিয়া ছেলের জন্ম হইলে কার্তিক সংক্রান্তির দিন অবশ্যই তাঁহার পুজা করিতে হইবে। মালী কার্তিক ঠাকুরের মূর্তি

নির্মাণ করে। কার্তিক ঠাকুর সোলা দিয়া তৈয়ারী হয়। হাতির উপরে ময়ুর, তাহার উপরে বসিয়া থাকেন কার্তিক ঠাকুর। কখনও বা 'জোড় কাতি' অর্থাৎ একজোড়া কার্তিক ঠাকুরের মূর্তি নির্মাণ করিয়া পুজা হয়, পুজার শেষে 'গিদালী'রা অর্থাৎ পেশাদার গায়ক ও নৃত্যশিল্পীর দল সারারাত ধরিয়া গান গায় ও নৃত্য করে। ঢাকীরা নাচের তালে তালে ঢাক বাজাইতে থাকে। পূর্ববাংলায় পরিবারের মেয়েরাই নাচে ও গায়।

শাস্ত্রীয় আচারে পুজার পর্ব শেষ হওয়ার পর আরম্ভ হয় মেয়েদের হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কতকগুলি বিশেষ ধরণের মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে পুজার ঘট বসানো, পুজা পাতা, মাড়োয়া গাড়া, চাইলন বসানো, ব্রাহ্মণকে বরণ করা, গিদালী অর্থাৎ যাহারা পুজাশেষে গান গাহিতে ও নাচিতে আসিয়াছে এবং ঢাকুয়া প্রভৃতিকে বরণ করিয়া লইবার জন্য 'বসুমতী মা'র কাছে একটুকু মাটির জন্য প্রার্থনা সঙ্গীত।

৫

বসুমতী মাও, একটুক মাটি দ্যাও,
এ ঘট বসেবার চাঙরে।
বসুমতী মাও, একটু মাটি দ্যাও,
এ পুজা পাতিবার চাঙ্।
বসুমতী মাও, একটুক মাটি দ্যাও,
মাড়োয়া গাড়িবার চাঙ্।
বসুমতী মাও, একটুক মাটি দাও,
বামোনেকে বসেবার চাঙ্।
বসুমতী মাও, একটু মাটি দ্যাও,
গিদালীক বসেবার চাঙ্।
বসুমতী মাও, একটুক মাটি দ্যাও,
ঢাকুয়ারোক বসেবার চাঙ্।
মাড়েয়ার আগদুয়োর খ্যাও
আইসচে চাউইয়া মানসি পীড়া ভাড়া দ্যাও।
সোনার খড়ম পাঙোত নিয়া বেল বা গচি রুহু
বেল তোক কিসের বাদে রুহু ?

এক জোড়া বেল পাত হইলে কালে মোর কাতিপূজা হয়।
এক জোড়া গুয়া হইলে তেঁই মোর কাতিপূজা হয়।
ফুলের গচ তোক কিসের বাদে রুছু ?
এক জোড়া ফুল হইলে কালে মোর কাতিপূজা হয়।

—কুচবিহার

তারপর শিবের বিবাহ-সম্পর্কে গান গাওয়া হয়—

৬

ফুলের বাগাম যায়া বুড়া শিব ফুলের যতন করে,
ভাঙ্-ধুতুরা খায়া বুড়া শিব চিতোর হয়া পড়ে।
নারদ ভাগিনা বুলিয়া বুড়া শিব ডাকাইতে লাগিল,
নারদ ভাগিনা আসিয়া তখন জিজ্ঞাসা করিল।
এক ড্যাকো দুই ড্যাকো তিন ড্যাকো দিল,
ফিরা ড্যাকের বেলা বুড়া শিব উত্তর করিল।
তল্‌তা পাড়া করিয়া শিবোক মন্দিরোতে নিল,
চ্যাতোন পায়া বুড়া শিব ভাবে মনে মনে,
নিধুয়া পুরীতে আমোক স্থাখে বা কোন জনে।　　—ঐ

বুড়া শিব ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। এই বয়সে সেবা ও শুশ্রূষার প্রয়োজন; সেইজন্য তিনি নারদ ভাগিনাকে তাহার জন্য পাত্রীর সন্ধান করিতে নির্দেশ দিলেন,—

৭

শোনেক শোনেক, নারদ ভাগিনা, কতা শোনেক মোরে।
পাত্রীর খোজোৎ যারে, বাবা, পণ্ডিতের গোচরে ॥
সেই কতা শুনিয়া নারদ না করিল হেলা।
পণ্ডিতের বাড়ীত যায়া দুয়োরাৎ দিলেক ঠেলা ॥
এক ড্যাকো দুই ড্যাকো তিন ড্যাকো দিল।
তিন ড্যাকের বেলা পণ্ডিত ঘরের বাইরা হইল ॥
ক্যানে ড্যাকাইস, নারদ ভাগিনা, কওতো দেখি মোকে।
'শিব মামার কইনা কোটে আচে গণিয়া দেখান মোকে।'　　—ঐ

৮

সোনার খাটে বইসে পণ্ডিত রূপার খাটে পা।
রূপার পাঞ্জি উল্টি বামোন সোনার পাঞ্জি চায়॥
পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ গণে চাইর কোণে।
গণাপড়া করে বামোন আপনার মনে॥
আকাশের তারা গণে পাতালের বালু।
তেতিলির পাত গণে তেতিলির গচে॥
ভরা হাঁড়ীর তাত গণে আন্ধার রাতির মাঝে।
গণিয়া গাতিয়া দেখে কন্যাক হিমালয়ের ঘরে।
শিবের সাথে চণ্ডীর জোড়া শাস্তোরে ধরা পড়ে॥
শোনেক শোনেক, শিব মামা, কই তোমার কাছে।
তোমার সাথে চণ্ডীর জোড়া হিমালয়ের মাঝে॥ —ঐ

তখন বুড়া শিব বিবাহের বাজার করিবার জন্য পাড়া-প্রতিবেশীকে ডাকিয়া সঙ্গে 'ভারভারাটি'কে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

৯

পাড়ার আশ পড়শীকে ডাকেয়া আনিল।
সোনার নও বুড়ী কড়ি আন্‌চোলে বান্ধিল॥
ভার-ভারাটিকে সঙ্গে নিয়া হাটের দিকে চলে।
সঙ্গে চলে পাড়া-পড়শী রঙ্গে কুতূহলে॥
পরথোমেতে কাঁইয়া হাটিৎ যায়া চণ্ডীর শাড়ী নিল।
শ*খারী হাটিৎ যায়া নারদ চণ্ডীর শাখা নিল।
বানিয়া হাটিৎ যায়া কেনে চণ্ডীর কানের সোনা।
শীষের সেন্দুর কেনে চণ্ডীর সেন্দুর হাটিৎ যায়া॥
কুমার হাটিৎ যায়া বিয়ার ঘট গচা নিল।
ডোম হাটিৎ যায়া ফির চাইলন কিনল॥
আরো না কেনে শিব মণিরাজ পাগুড়ী।
গুয়া হাটিৎ যায়া কেনে পান আর সুপারী॥
কলা হাটিৎ যায়া শিব কলার ঝুকি নিল।
দই হাটিৎ যায়া শিব দইয়ের ভার বান্দিল॥

ভার-ভারাটি নিয়া শিব ফিরিল আপন বাড়ী।
কুত্তি গেইলেন, নারদ ভাগিনা, আইসো তাড়াতাড়ি॥
কি করেন নারদ ভাগিনা নিশ্চিন্তে বসিয়া।
বামোন, সাগাই পরজাপলিক খবর দেও যায়া॥
ভাঙা কড়কা, ভাঙা ঢোল ডাকেয়া আনিল।
ভাঙা ঢোল, ভাঙা খোল বাজাইতে লাগিল॥
সাপের না মালা শিব গলাতে পিন্দিল।
চিতুয়া বাঘের ছাল শিব কমোরে বান্ধিল॥
কিসের ধুতি কিসের পাগুড়ী সগুল রইলো পড়ি।
যায় যায় বুড়া শিব চণ্ডীমায়ের বাড়ী॥
জই জোগারে আই বৈরাতি নিলো শিবোক বরি।
স্ববরণের ঝারি দিয়া পাও বা ধোয়াইল॥
শ্বেতের চণ্ডেরে শিবোক বরণ করি নিল।
শুভক্ষণ দেখিয়া শিব বিয়াতে বসিল॥
বিষ্টি পড়ে টুপুর টাপার শীতে ভেজে গাও।
শিব চণ্ডীর বিয়াও হয় ঢাক্কে জোগার দেও॥ —ঐ

এখানে বাংলার সুপরিচিত ছেলেখেলার ছড়াটি স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে—

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বাণ,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যা দান।

অবশ্য এখানকার শিব ঠাকুর একটি কন্যাই লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি ইহাদের মধ্যে যে একটি মৌলিক সম্পর্ক আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এই সময় মেয়েদের মধ্যে হুলুধ্বনির সাড়া পড়িয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকীদের মধ্যেও তৎপরতা বাড়িয়া যায়।

১০

মাড়োয়া ক্যানে হালেরে।
মাড়োয়া ক্যান ডোলেরে॥
কি দান দেয়রে কইনার আরো আবো।
এ বার দান না দিলে আর বার পাবো॥

দান দেয়রে কইনার আরো মামা।
এ্যাচিয়া ব্যাচিয়া দিল ভাঙা গাইলের সামা ॥
দান দেয়বে কইনার আরো মামী।
এ্যাচিয়া ব্যাচিয়া দিল ভাঙ্গা গাইলের সামা ॥
দান দেয়রে কইনার আরো পিসা।
দান নাই দক্ষিণাও নাই না পায় নিজের দিশা ॥
বিয়াও বাদা করিয়া চণ্ডীমাও এমন ধীরে যেইল।
কি দিয়া রাতি মাও চণ্ডী নিত্তি ছিনান পাইল ॥
কাজলী, আলো ধাইরে।
রূপার বাটায় ধূলা নিল সোনার বাটায় খইল,
বান্দী দুইজন সঙ্গে নিয়া দীঘির ঘাটে চইল।
কাজলী, আলো ধাইরে।
ছ্যাকা খইলা পাড়িয়া চণ্ডীমাও ধর্ম কুর্মক দিল।
ফিরাও বারের চইল চণ্ডীমাও গঙ্গাক দিল ॥
কাজলী, আলো ধাইরে।
ফিরাবারের চইল চণ্ডীমাও মস্তকে মাখিল।
আজি এক ঠাসা দুই ঠাসা তিন ঠাসা দিল।
ফিরা না ঠাসার বেলা মাথা ঘসা হইল ॥
কাজলী, আলো ধাইরে।
হাটু পানিত যায়া চণ্ডীমাও হাটু গাড়িয়া রইল।
বুক পানিত যায়া চণ্ডীমাও বুক পাড়িয়া শুইল।
গলা পানিত যায়া চণ্ডীমাও গলা শুদ্ধ করে,
মাথা পানিত যায়া চণ্ডীমাও পঞ্চডুব পাড়ে।
কাজলী, আলো ধাইরে।
কুঘাটে শুইয়া চণ্ডীমাও সুঘাটে উঠিল।
কাজলী, আলো ধাইরে।
ভিজা বস্ত্র ফেলেয়া চণ্ডীমাও শুক্লা বস্ত্র পরে,
শুক্লা বস্ত্র পরিয়া চণ্ডীমাও ধর্মক প্রণাম দিল।
ধর্মকে না প্রণাম করি শিবের মন্দির গেইল।

শিবের মন্দির যায়া চণ্ডীমাও শিবোক প্রণাম করে।
কাজলী, আলো ধাইরে।
শিবোক প্রণাম করি চণ্ডীমাও পানি পন্তা খাইল।
পানি পন্তা খায়া চণ্ডীমাও শয়ন মন্দিরে গেইল।
কাজলী, আলো ধাইরে।
ডাইন হাতে শ্রীফল বাম হাতে নারিকেল,
গেইল চণ্ডী শিবের মন্দিরে।
পান তামাকু খায়া চণ্ডীমাও রং তামাসা করে।
রং তামাসা করে চণ্ডীমাও বুড়া শিবের ঘরে॥
কাজলী, আলো ধাইরে। —ঐ

এইবার কাতিকের জন্মবৃত্তান্তের বিষয় গান গাওয়া হইবে; সুতরাং ইহা লৌকিক কুমার-সম্ভব।

১১

শেষ রাতি চণ্ডীমাও কাতিক জন্ম দিল।
কাতির জন্ম দিয়া চণ্ডীমাওএর খুশী উপজিল॥
কাজলী, আলো ধাইরে।
কাতিরে কাতি তোর মাতা বানাইল কোন জনে।
আমু জনমে নারিকল বিলাইচং
মাতা বানাইচে বাসুদেবে।
জনোম তোর বুড়া শিবের ঘরে।
কাতিরে, কাতিরে, তোর বুক বানাইচে কোন জনে।
আমু জনমে শিল বাটা বিলাইচং,
বুক বানাইচে বাসুদেব।
জনোম তোর বুড়া শিবের ঘরে।
কাতিরে কাতি, তোর পিটি বানাইচে কোন জনে,
পিটি বানাইচে বাসুদেবে,
জনোম তোর বুড়া শিবের ঘরে। —ঐ

এমনি করিয়া একের পর এক প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা করা হয়। যেমন চকু বা চোখের সঙ্গে তারা, নাকের সঙ্গে বাঁশী, কানের সঙ্গে পিটা অর্থাৎ পিঠে,

গালের সঙ্গে পান, কপালের সঙ্গে 'দেওয়ারী' অর্থাৎ দিয়ারী, চক্ষু অর্থাৎ জাহুদেশের সঙ্গে 'কলার পটুয়া' অর্থাৎ কলার গাছ, পেটের সঙ্গে শারিঙ্গা, কোমরের সঙ্গে মোড়া, 'নগুল' অর্থাৎ আঙ্গুলের সঙ্গে 'গচার অস্তা' অর্থাৎ প্রদীপের সলতে, চুলের সঙ্গে পাটা অর্থাৎ পাটজাত তন্তুর তুলনা করিয়া গান গাওয়া হয়।

এইবার ঘট তোলার গান শুনিতে পাওয়া যাইবে—

১২

ঘট তোলা মারেয়ারে।
তোমার পুণ্য ঘট নড়েরে।
জইজোগারে তোলো ঘট মস্তকের উপরে রে,
ঘট তোলো মারেয়ারে।
গিদালে বসাইচে ঘট, মারেয়ার মাইয়া তোলেরে।
তোমার পুণ্য ঘট রাখহ যতনেরে।
জোড়হস্ত করিয়া ঘট তোলহ যতনেরে।
ঘট তোল মারেয়ারে। —ঐ

কার্তিক পুজার অনুষ্ঠানিক পর্ব শেষ হইয়া যাইবার পর সারারাত ধরিয়া যে আনন্দানুষ্ঠান হয়, তাহাতে অংশ গ্রহণ করে 'গিদালী' অর্থাৎ পেশাদার নৃত্য-গীতে অংশগ্রহণকারিণী মেয়েরা। এই পর্বের কিছু গান উদ্ধৃত হইল :

১৩

দূর হাতে আইলরে বাদুর কলা খাবার আশে ;
আরে গচের কলা গচে রইলো বাদুর গেইল মোর দেশে রে।
আরে তীর পড়ে ঝাঁকেরে ঝাঁকে বাটুল পড়েরে রয়া,
আরে কুত্তি গেলুরে মারেয়ার মাইয়া বাটুল কুড়াও আসিয়ারে।
আরে গচের আড়ে থাকিয়ারে বাদুর কমোরের শাড়ী যাচেরে।
দূর হতে আইল রে বাদুর কলা খাবার আশে। —ঐ

১৪

কেনে, হে রাধা, বিরস মন, ও তোর কানাইয়ায়ে বাজায় বাঁশী।
আরে মুই গেনু যমুনার জলে, হেটা উঠাল মাটি,
ছিঁড়িল গলারই হার, আই মোর ভাঙ্গিল কলসী।

আরে যমুনার কূলে কূলে, কদম সারি সারি—
আরে ফুলতোলে ডাল ভাঙ্গে রাধা বিনোদিনী।
পরার ঘরে থুইচে নাম রাধা চন্দ্রাবলী।
আরে বাপ-মায় রাখিচে নাম আলালী দুলালী। —ঐ

কার্তিক পূজার গানে বিবিধ শস্যনাশকারী পশুপক্ষী শিকার করিবার যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ শিকারের অভিনয় করা হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাদুড় হইয়া কলাগাছ হইতে কলা চুরির অভিনয় করে। সুতরাং ইহাতে নৃত্য, গীত, অভিনয় তিনই হইয়া থাকে।

কালবৈশাখীর গান

চৈত্র সংক্রান্তির সময় বাংলা দেশে যে গাজন উৎসব হয়, তাহা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই সময়েই কালবৈশাখীর ঝড় হইয়া থাকে বলিয়া গাজনের গানকে কোন কোন অঞ্চলে বিশেষতঃ ফরিদপুর জেলায় কালবৈশাখীর গান বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। ফরিদপুর জেলায় গাজনের গানকে বলে নীলপূজার গান; সেই অঞ্চলে কালবৈশাখীর গান বলিতেও নীল পূজার গান (পরে দেখ) বুঝায়।

কালীকীর্তন

মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত বাংলা সাহিত্যের যে শাক্ত ধারা স্বাধীনভাবে উদ্ভূত হইয়া স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করিতেছিল, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আসিয়া মধ্যযুগ হইতে প্রবাহিত বৈষ্ণব পদাবলীর ধারার সঙ্গে সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের শক্তিধর্মের বলিষ্ঠ আদর্শ শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া বৈষ্ণব ধারার মধ্যে আত্মবিসর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৈষ্ণব পদাবলীর ধারাও যে ইহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা নহে—তাহার আদর্শও তাহাকে বিসর্জন দিয়া মঙ্গলকাব্যের আদর্শের সঙ্গে তাহার আদর্শের সমন্বয় সাধন করিয়া লইতে হইয়াছিল। শক্তিদেবী তাহার উগ্রতা পরিহার করিয়া করুণাময়ী জননী রূপ ধারণ করিলেন, শ্রীরাধিকাও কেবলমাত্র কৃষ্ণ-প্রেমময়ী না হইয়া জগজ্জননী রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। এই ভাব অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর

আধ্যাত্মিক ও সাহিত্য সাধনা রূপ লাভ করিতে লাগিল; সেই অনুযায়ী সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাহা স্বতঃই বিকাশ লাভ করিল, তাহা কালীকীর্তন নামে পরিচিত। ইহারই আর এক নাম শ্যামাসঙ্গীত। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধক কবি রামপ্রসাদ এই ধারার প্রবর্তক হইলেও শত শত অজ্ঞাত পরিচয় কবিও এই বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ধর্মের কথা যতদূর আছে, ততোধিক মানুষের স্বভাবজ সহজ সরল বিশ্বাসের কথা আছে। সেই সূত্রে ইহারা সাধকের রচনা সত্ত্বেও সাহিত্যের সামগ্রী। বিশেষত ইহাদের সুর-প্রয়োগের মধ্যে লৌকিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইয়াছে।

১

কলুষ-বিনাশিনি-কালি!
শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনার মন ভুলালি।
কখন বা করে অসি কখন মুরলী,
কভু মুণ্ডমালা গলে কভু বনমালী।
হইয়ে বামনরূপ ছলেছিলি বলি,
রাম-অবতারে, মাগো, রাবণ বধিলি।
প্রকৃতি পুরুষ তারা তুই তোমার বলি
সৃজন পালন লয়, মা, সকলি। —২৪ পরগণা।

আমার রসনার বাসনা আছে, ডাকি মা তোরে গো।
আমার মন পাজি না হয় রাজি, বাদী দেখ মোরে গো॥
দেহের মধ্যে রাজা মন, মন্ত্রী আছে ছয় জন;
প্রজা নব ইন্দ্রিয়গণ, সদা ভয় করে গো। —ঐ

৩

কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে, বল তাই।
পিতা হয়ে পালিতেছ,
কখন জননী রূপে দেখিবারে পাই।
অসহায় শিশু রবে জননীর কোলে,
আধ আধ মা মা বলে স্তন করে পান;
আমি তখনই তাহার মূলে নিরখি তোমায়,
অমনি মা বলে ডাকি কেহ না শিখায়।

স্বধু জীবের জীবন বাঁচাবারি তরে,
ঢেকেছ বসুধা-দেহ কত উপচারে,
তোমার এমন পালন-রীতি হেরি হে যখন,
ইচ্ছা হয় পিতা বলি সম্বোধি তোমায় ॥ —ঐ

৪

এখনো কি ব্রহ্মময়ী হয় নাই, মা. তোর মনের মত,
অকৃতি সন্তানের প্রতি যন্ত্রণা আর দিবি কত।
জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি, মসিল দিয়ে তশীল করিলি,
হিসাব করে দেখ দেখি, মা,
আমার দুঃখের বাকী কত।
ভুলাইয়ে ভবে আনিলি বিষয়-বিষ খাওয়াইলি,
বিষের জালায় সদা জ্বলি দুর্গা বলে ডাকবো কত ॥ —ঐ

৫

তাই তারা তোমায় ডাকি।
পাছে শিব বাক্য মিথ্যা হয়, শেষে দে'ও মা ফাঁকি ॥
তন্ত্রেতে শিবের উক্তি, তারা নাম নিলে মুক্তি,
তবে কেন এ ভবেতে পড়ে আমি থাকি।
তারিণি ব্রহ্মাণি বাণি, শুন, ওগো ও ভবানি,
অন্তকালে ও রাঙ্গা চরণ যেন দেখি ॥ —ঐ

৬

মন কালী কালী বল।
গত হ'ল কাল, জীবে কত কাল,
কাল পেয়ে কাল নিকটে এ'ল।
কাল ভয়ে কালী হলো এ অঙ্গ,
কবে দংশিবে রে সে কাল-ভুজঙ্গ,
কর সাধু সঙ্গ, কালী নাম প্রসঙ্গ,
কালে ইহকাল সাঙ্গ হলো।
কাল দণ্ড লয়ে কাল আসিবে,
কালের ভয় তখন কেবা নাশিবে,

কলুষনাশিনী সেই সবে শিবে,
কালিদাসে দিবেন চরণ কমল ॥ —ঐ

৭

যে হয় পাষাণের মেয়ে, তার হৃদে কি দয়া থাকে,
দয়াহীন না হ'লে কি লাথি মারে নাথের বুকে ॥
দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাই, মা, তোমাতে,
গলে পর মুণ্ড মালা, পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা মা বলে যত ডাকি, শুনেও ত, মা, শুন নাকি,
সবাই এমনি লাথি-খেকো! তবু দুর্গা বলে ডাকি ॥

কালীপূজার গান

কার্তিকী অমাবস্যা উপলক্ষে বাংলা দেশে সম্ভ্রান্ত হিন্দু গৃহে শ্যামা পূজার অনুষ্ঠান হয়, উহাতে কোন কোন অঞ্চলের মহিলাগণ শ্যামাসঙ্গীত গাহিয়া থাকেন। এই সকল সঙ্গীত অনেক ক্ষেত্রেই স্বরচিত; কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত রামপ্রসাদ কিংবা অন্যান্য কাহারও রচিত সঙ্গীতের পরিবর্তিত লৌকিক রূপ। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি মৈমনসিংহ জিলার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত; ইহাতে রামপ্রসাদের একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতের আংশিক পরিবর্তিত রূপ লক্ষ্য করা যাইবে। নিরক্ষর গায়ক-গায়িকার মুখে ইহা পরিবর্তিত হইয়া ইহা একটি লৌকিক রূপ ধারণ করিয়াছে।

১

ও মা, বসন পৈর। ধ্রু
বসন পৈর, মা গো, বসন পৈর তুমি।
চন্দনে চর্চিত জবা পদে দিব আমি।
পাতালে আছিলা, মাগো, হয়ে ভদ্রকালী।
মহীরাবণ কর্তো পুজা দিয়ে নরবলি।
মাথায় সোনার মুকুট ঠেক্যাছে গগনে,
মা, হইয়া উলঙ্গ কেন বালকের সনে ॥
বাম হস্তে রুধির ভাণ্ড ডাইন হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করছ রাশি রাশি ॥

জিহ্বায় রুধিরধারা গলে মুণ্ডমালা।
হেট্‌মুখে চাইয়া দেখ্‌, মা, পদতলে ভোলা॥ —মৈমনসিংহ

রামপ্রসাদ রচিত মূল সঙ্গীতটি এই প্রকার—

মা বসন পর।

বসন পর, বসন পর, মাগো, বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চিত জবা পদে দিব আমি গো॥
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো, কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধা প্যারী গোকুলে গোপিনী গো॥
পাতালেতে ছিলি, মাগো, হ'য়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা দিয়ে নরবলি গো॥
কার বাড়ী গিয়েছিলে; মাগো, কে ক'রেছে সেবা!
শিরে দেখি রক্ত চন্দন পদে রক্ত জবা গো॥
ডানি হস্তে বরাভয়, মাগো, বাম হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড ক'রেছ রাশি রাশি গো॥
অসিতে রুধির ধারা, মাগো, গলে মুণ্ডমালা।
হেঁট মুখে চেয়ে দেখ পদতলে ভোলা গো॥
মাথায় সোনার মুকুট, মাগো, ঠেকেছে গগনে।
মা হ'য়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো॥
আপনি পাগল পতি পাগল, মাগো, আরো পাগল আছে।
ওমা, রামপ্রসাদ হ'য়েছে পাগল চরণ পাবার আশে গো॥

২

কালীঘাটের কালী, গো মা, কৈলাসের ভবানী;
বৃন্দাবনের রাধাপ্যারী, গোকুলের গোপিনী,
গো মা, বসন পর।
দক্ষিণে চলিছ, মা গো, ও মা, হইয়া দিগম্বরা,
কার মানবজনম সফল করলে, গো মা, হয়ে দশভুজা,
গো মা, বসন পর।
এ মা, ঘাটে ঘাটে করি পূজা পুষ্প উজান ধায়;
সঙ্কটে পড়েছি, মা গো, মোদের রক্ষা করতে হয়।
গো মা, বসন পর। —ফরিদপুর

৩

মাগো, গঙ্গাজলে বিল্বপত্রে বামনের ছেইলা করছে পুজা।
কার বাড়ী গেছিলা, মাগো, কে করছে পূজা।
মাগো, শিরে দেখি রক্ত-চন্দন কমলপদে জবা গো,
মা গো, গঙ্গাজলে,
দশরথের ঘাটের আগে মালসী সারি সারি।
সেই মালসী তুইলা আমরা চরণ সেবা করি,
মাগো, গঙ্গাজলে। —ঢাকা

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে বাঙ্গালীর আসাম যাওয়ার বিরুদ্ধে দেবীর নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ইহার হয়ত কোন ঐতিহাসিক কারণ ছিল।

৪

কালিকে, ওমা ভবপালিকে, বাঙ্গালীকে নিও না আসাম।
তুমি আদ্যাশক্তি, ভগবতী,
সন্তানের প্রতি হইও না বাম॥ ইত্যাদি —মৈমনসিংহ

৫

আমি ঘরে বইসে চরণ পাব, কেন গঙ্গার তীরে যাব,
আপন জায়গা থাকতে কেন পরের জায়গায় বাস করিব।
আপন মাতা থাকতে কেন বিমাতাকে মা বলিব।
মায়ে পুতে মোকর্দমা শিবে শুনলে কি বলিব,
কালীর নামে ভক্তি থাকলে মকর্দমা ডিক্রী হইব। —ত্রিপুরা

কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতে পশ্চিমবাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রধানতঃ বঙ্গ ভাষাভাষী আদিবাসীদিগের মধ্যে এক উৎসব প্রচলিত আছে, তাহা শ্যামা পূজা নহে, বরং গো-পূজা। সেই উপলক্ষে গো-জাতিকে লক্ষ্মী বলিয়া পূজা করা হয়, তাহার দুইটি সঙ্গীত এই—

১

জাগো মা লক্ষ্মীণী,
জাগো মা অমাবস্যার রাত রে,
আর জাগে কাপতি ফল দেবী গো মালান
পাচ পুতায় দশ ধেনু গায় রে। —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

কোন বাবুর দুয়ারে (ভালা)
উচু উচু বাকুল রে,
কোন বাবুর দুয়ারে মদির
আর কোন বাবুর দুয়ারে চুয়ার চন্দন
আহ্লাদে শ্যামল ধেনু গাঁয়রে। —ঐ

কালুরায়ের গীত

দক্ষিণ বঙ্গের প্রধানতঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে অঞ্চলের ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের দেবতার নাম কালু রায়। তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া সেই অঞ্চলে কয়েকটি মৌখিক আখ্যায়িকা-গীতি রচিত হইয়াছিল, তাহা কালুরায়ের গীত নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে কোন কোন মৌখিক গীত কালক্রমে মঙ্গলকাব্যের আকারে লিখিত হইয়াও প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে কালুরায় মঙ্গল বলা হয়। কালুরায় নিম্নবঙ্গের ব্যাঘ্র দেবতা, দক্ষিণ রায়ের সহকর্মী; সেইজন্য কালুরায়ের গীতে দক্ষিণ রায়ের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। কালুরায়ের গীত পাঁচালীর আকারে রচিত এবং পাঁচালীর সুরেই একজন মূল গায়েন কর্তৃক দোহারের সহায়তায় গীত হয়; মৃদঙ্গ মন্দিরা ইহার বাদ্যযন্ত্র। নিম্নে কালু রায়ের গীতের একটি অংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল—

দক্ষিণ রায় কালু রায় অরণ্যের সিপাই।
বাইশ কাহন বাঘে রাখে দুটি ভাই॥
ঝাউ বৃক্ষতলেতে বসিল দুই জন।
লইতে আপন পুজা ভাবে অনুক্ষণ॥
সর্বদেবে কৈল পুজা মানব ভুবনে।
আমরা দেবতা বলে কেহ নাহি জানে॥
কালু বলে শুন, দাদা, আমার বচন।
আটেরে[১] জিজ্ঞাসা কর পুজার বিবরণ॥

১ আট নিম্নবঙ্গের অন্যতম লৌকিক দেবতা; কার্তিকী অমাবস্যার পূর্বদিন ইহার পুজা হয়।

শুনিয়ে আটেরে ডাকি দেব দক্ষিণ রায়।
পুজার বারতা কিছু তাহারে জানায়॥
উপদেশ বল, আট, সব কোথাকারে।
কোন ছলে লব পুজা কে পুজিবে মোরে॥

কিস্‌সার গান

মুসলিম লৌকিক কথ্যসাহিত্য সাধারণতঃ কিস্‌সা, কিচ্ছা বা কেচ্ছা বলিয়া পরিচিত। ইহারা সুদীর্ঘ গদ্য রচনা। কিন্তু বর্ণনার একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু সঙ্গীতের অবতারণা করা হয়, তাহার ভিতর দিয়া কোন বিশেষ অনুভূতির গভীরতা ব্যক্ত হয়; কোন কোন সময় কাহিনীর ধারাও অগ্রসর হইয়া যায়। রূপকথার মধ্যেও এই শ্রেণীর সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ কাহিনী-নিরপেক্ষ এই গানগুলির কোন অর্থ নাই, তথাপি কোন গানের মধ্যে যদি বিশেষ গীতিসুর প্রকাশ পায়, তবে তাহা স্বাধীন লোক-সঙ্গীত হিসাবেও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। ইহারা একক সঙ্গীত, কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যতীতই ইহারা গীত হয়।

১

সুবুদ্ধি আছিল সদাগরের কুবুদ্ধি ধরিলো.
আগপাছ না ভাবিয়া আনীক নৌকাত তুলি নিল।
দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা সরিয়া বৈসে কাছে,
কথা দিয়ে কথা নেয় পরাণ বধে শেষে। —ঢাকা

২

একলায় কেনে আইলচ, হে কন্যা,
তোমার সাথে নাই সাথী,
তোমার কাঙ্কণ তোমার হাতোত রইল
চল হামার বাড়ী। —রংপুর

৩

হুকুম পায়্যা মাঝিগণ না করে আরাম।
এক বাদাম আছিল নৌকায় জোড় বাদাম খাটান॥

জোড় বাদাম যখন নৌকায় দিলোরে তুলিয়া
মার মার করি নৌকা যায় কেবল উজান ধরিয়া।
একদিনের আহা ক্যাবোল এক ঘণ্টায় চলে,
দেখিতে দেখিতে গেল নৌকা মাঝ দরিয়ার পরে। —ঐ

কীর্তন

বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতের বিশিষ্ট কোন রূপের উপর নির্ভর করিয়া মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-প্রভাবিত যুগে বাংলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সঙ্গীত কীর্তন গানের প্রচার হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত কীর্তন গান যে লোক-সঙ্গীতের স্তরেই জনসাধারণের ক্ষেত্রে প্রচার লাভ করিয়াছিল, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' তাহার প্রমাণ। চৈতন্যদেবের প্রভাব যখন সমাজের সকল স্তরে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল, তখনই বৈষ্ণব সাধকগণ ইহাকে লৌকিক সংস্রব হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য ইহাকে তাঁহাদের নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী একটি বিশেষ প্রণালীবদ্ধ করিয়া লইলেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে কীর্তন গান সম্পর্কে একটি রসশাস্ত্র বা অলঙ্কার শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই পথে বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী রচয়িতা কয়েকজন অগ্রসর হইয়া গেলেন, একথা সত্য; কিন্তু দেশের বৃহত্তর জনসমাজ কীর্তনের লৌকিক ধারাটিই অনুসরণ করিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মধ্যেও ক্রমে রাধাকৃষ্ণের নাম আসিয়া যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহা বাংলার লোক-সঙ্গীতের স্তর অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিল না; কারণ, তাহা নিরক্ষর সমাজ কর্তৃকই রচিত ও প্রচারিত হইত, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের সন্ধান তাহারা জানিত না। এই শ্রেণীর কীর্তন গানকে লৌকিক কীর্তন বা লৌকিক পদাবলী বলিয়া উল্লেখ করা যায়। পশ্চিম সীমান্তবর্তী বাংলায় তাহা ঝাড়খণ্ডী কীর্তন বা ঝুমুর বলিয়াও পরিচিত।

এই কথা সত্য, এই শ্রেণীর লৌকিক কীর্তন অনেক ক্ষেত্রেই বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর ভাব এবং ভাষা অনুকরণ করিয়াও রচিত হইয়াছে; কোন কোন ক্ষেত্রে রচনার মর্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য কোন অজ্ঞাত পরিচয় লেখক, কোন কোন সুপরিচিত মহাজন পদাবলী রচয়িতার নাম তাহাতে ভণিতা রূপে

ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্বেও ইহাদের লৌকিক মূল্য হ্রাস পাইতে পারে নাই। কারণ, ইহার ধারা ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া ক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহাই শাক্ত পদাবলীতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। মহাজন পদাবলীর ধারা স্বভাবতঃই ক্রমবিকাশ লাভ করিতে পারে নাই ; সপ্তদশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আসিয়াই তাহার গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী আদিবাসীর কোন সমাজে কীর্তন গানের মৌলিক রূপটি সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইহা বাংলা দেশের বিশেষ কোন অঞ্চলের সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল ; সেইজন্য চৈতন্যদেব তাঁহার জনসাধারণের জন্য প্রবর্তিত ধর্মপ্রচারের বাহন রূপে কীর্তন গানকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার বাণী প্রচারের সুবিধার জন্য যেমন পল্লীর ভাষা বা পালি ভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, চৈতন্যদেবও তেমনই জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার প্রেমধর্ম প্রচার করিবার জন্য বাংলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় একটি আঞ্চলিক পল্লীসঙ্গীতকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। পালি ভাষা যেমন বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের ভাষা হইয়া গিয়া জনজীবনের ভাষা হইতে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কীর্তন গানের বৈষ্ণব মহাজন অনুশীলিত ধারাটি তেমনই জনজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া কেবল মাত্র বৈষ্ণব সাধকদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার লৌকিক ধারাটি নিজের পথে স্বাভাবিকভাবেই বিকাশ লাভ করিয়াছে।

ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতির লোক-সঙ্গীতে কীর্তন নামে গানের একটি রূপ আছে। ইহা নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীত। ইহার সম্পর্কে জানিতে পারা যায়, 'Uraon dance poems are fitted to the drum rhythms and are sung by the boys and girls while the dances revolve. Most of them are poems of four lines. In the dances which have definite advance and reverse action the first two lines are called the *or* or opening movement and the third and the fourth lines are known as the *kirtan* or reverse'. কীর্তন নামে পরিচিত এই শ্রেণীর কোন সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা এবং সাধারণের মধ্যে ইহার আবেদনের ব্যাপকতা দেখিয়া চৈতন্যদেব এই শ্রেণীর সঙ্গীতকেই মূলতঃ তাঁহার ধর্মপ্রচারের বাহন করিয়াছিলেন। ক্রমে অনভিজাত পরিচয় হইতে ইহাকে মুক্ত

করিবার জন্য ইহাকে সংকীর্তন এবং ইহার বাদ্যযন্ত্র মাদলকে মৃদঙ্গ নামে পরিবর্তিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই সম্পর্কে মতভেদও আছে। সম্প্রতি কীর্তন গানের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে 'বিশ্ববাণী' (১৩৭২) পত্রিকায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বিস্তৃত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ করিয়াছেন।

বাংলা দেশের বাহিরেও কীর্তনের অনুরূপ লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তবে বাংলার কীর্তন বলিতে প্রকৃত যাহা বুঝায়, তাহার প্রচলন আর কোথাও নাই। কীর্তন মূলতঃ প্রেম-সঙ্গীত হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবের বশবর্তী হইবার পর হইতেই ইহা ভক্তিমূলক সঙ্গীত রূপে পরিচয় লাভ করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের আলওয়ার সম্প্রদায় অনুরূপ ভক্তিমূলক সঙ্গীত গাহিয়া থাকেন, সমগ্র উত্তর ভারত ও রাজপুতনায় যে ভজন গান প্রচলিত আছে, তাহাও ভক্তিমূলক গান; কিন্তু বাংলার কীর্তন হইতে তাহার ব্যতিক্রম আছে। পশ্চিম ভারতের তুকারামের অভঙ্গ সঙ্গীত কীর্তনের মতই ভক্তিরসাত্মক।

কীর্তন প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—নাম কীর্তন ও লীলাকীর্তন। লৌকিক কীর্তনের মধ্যেও এই দুইটি ভাগ রক্ষা পাইয়াছে। বিষয়ের দিক হইতেও কীর্তনের মধ্যে দুইটি বিভাগ—গৌরবিষয়ক এবং কৃষ্ণবিষয়ক। কৃষ্ণবিষয়ক প্রত্যেকটি লীলাকীর্তনের পালার মুখবন্ধরূপে গৌরপদগান করিতে হয়, তাহা গৌরচন্দ্রিকা। ইহা প্রধানতঃ মহাজন কীর্তন পদাবলীর রীতি হওয়া সত্ত্বেও লৌকিক পদাবলী কীর্তনের মধ্যেও অনুসরণ করা হইয়াছে।

কীর্তন গানের মধ্য দিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে এক সাঙ্গীতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই নহে, ইহার মাধ্যমে বাংলার সাঙ্গীতিক সংস্কৃতি বাংলার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। বৃন্দাবন, উড়িষ্যা, মণিপুর বাংলার এই চারিদিকে বাংলার কীর্তনের সুর গিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

১

গৌর-চন্দ্রিকা

(ওহে) একবার দয়া করে, এস হে, ও চাঁদ গৌরাঙ্গ।
(ও) এসো হে ওহে, গৌরাঙ্গ, এস হে ॥
তোমার ভাই নিতাইকে সঙ্গে লয়ে গৌরাঙ্গ এস হে ॥
প্রিয় গদাধরকে বামে লয়ে গৌরাঙ্গ এস হে ॥

বড় দীনহীন কাঙ্গাল ডাকে গৌরাঙ্গ এস হে ॥
তোমায় ভক্তে ডাকলে আসতে হবে, গৌরাঙ্গ এস হে ॥
হরি-সংকীর্তনের মাঝে গৌরাঙ্গ এস হে ॥
গৌরাঙ্গ তুমি যদি না আসিবে,
হরি-সংকীর্তন আর কে করিবে ?
গৌরাঙ্গ একা যদি আসতে নার ;
প্রিয় গদাধরকে সঙ্গে কর, গৌরাঙ্গ ॥
নদে ছেড়ে আসতে নার,
আমার হৃদয় মাঝে নদে কর। —মুর্শিদাবাদ

২

নাম জানি না গোউর বরণ নবীন সন্ন্যাসী
কয় না কথা করে ভিক্ষা মুখে মৃদু মৃদু হাসি।
নদের বাজারে বাজারে ফেরে নাম শুধালে, হরি বলে,
চূড়া নাই তার ধড়া নাই তার করে নাই তার মোহন বাঁশী।
তোরা দেখে যা গো, নদেবাসী
নবীন যোগী তোরা দেখে যা গো, ওগো নদেবাসী ॥ —ঐ

৩

নিতাই পদ-কমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল।
যে ছায়াতে জগত জুড়ায়, হেন নিতাই বিনে ভাই।
রাধাকৃষ্ণ নাহি পাই, দৃঢ় করে ধর নিতাইয়ের পায়,
সে সম্বন্ধ নাহি যায় বৃথা জনম গেল তার।
সেই পশু বড় দুরাচার নিতাই না বলিলে মুখে।
কি করিবে বিদ্যা তার কুলে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে।
নিতাই পদ পাসরিয়ে অসতেরও সত্য করি মানি।
নিতাইয়ের করুণা ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
ভজ নিতাইয়ের চরণ দুখানি।
দীন নরোত্তম কাঁদে হিয়া ধৈর্য নাহি বাঁধে
মোর দশা কেন হইল ভঙ্গ ॥
আমি বড় দুরাচারী, এবার আমায় দয়া কর ॥

৪

ভাই, মাধাইরে, কি নাম শুনিলাম,
মধু হইতে সুমধু এই হরিনাম।
কোথায় ছিল নিত্যানন্দ কে এ নাম আনিল,
(ওই) সুনির্মল হরিনামেতে জগত মাতিল।
অঙ্গ শীতল হ'ল, মন প্রাণ জুড়াইল,
আজ হইতে ভাই পুনর্জন্ম হইল।
নিতাই চাঁদের পদে মন প্রাণ সঁপিলাম,
প্রেমরসে মাখা এ নাম, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।
এনাম যত শুনি তত ক্ষুধা পায় হ'রে কৃষ্ণ হরে রাম।
শুনে নিত্যানন্দের মুখে শুধালাম পিতামাতাকে,
পাপের ভাগী কেউতো হ'ল না কারে আপন বল মন
ভাই বন্ধু দারা পুত্র সংসার আমার মাত্র,
কর্মক্ষেত্রে পড়েছি বন্ধনে এতো সহজ নয়, সহজ নয়॥
মায়াসূত্রে গাঁথা বাঁধা এমন ভাগ্য আর কার হবে।
নিতাই দয়া করিবে ভববন্ধন মুক্ত হব ভাইরে
নিরবধি অপরাধী সাধুর সঙ্গ না করিলাম,
মুখে হরিনাম না বলিলাম, হরি বলতে বলেছিল
তাইতে ক্রোধ হল কান্দা ছুঁড়ে মারিলাম॥
গতি হবে নারে, ভাইরে মাধাই, গতি হবে নারে।
ও ভাই, আহা মরি মরি এমন মাধুরী, নামে সুধা মাখারে॥
এই সুধা মাখা হরিনাম কভু শুনি না ভাই,
শুনে কর্ণ জুড়াইল, এমন নাম আর শুনি না, ভাই।
হয়ে প্রেমে গদ গদ নিতাই চাঁদের পদ ধরিয়ে কয়,
করে নিজগুণে দয়া—দাও, হে প্রভু, পদ ছায়॥
এ জন হীনে হে দয়াময়! আমরা অজ্ঞান অকৃতি
অতি মূঢ়মতি। গতি কি হইবে ভবে। তখন শুন কাতর
উক্তি, মধুর প্রেম ভক্তি নামের সঙ্গে অর্পণ করে॥
দেয় অঙ্গে নামাবলী মুখে হরি হরি বলি, জগাই মাধাই

দুভাই সাধু সাধু শব্দ করি। ধন্য রে জগাই, ধন্য রে মাধাই,
প্রভু কৃপা করল তোরে। এখন বলে শ্যামাচার্য
হলে অন্তিমকাল হলে এমনি মত কৃপা করো কৃপা মোরে।
দিয়ে মুক্তি ভিক্ষা জগাই মাধাই দুভায়েরে, সদাই বল হরিবোল।

—ঐ

৫

নিতাই শমন দমন নাম এনেছে ভয় দূরে গেছে
কলির জীব তরাতে নিতাই চাঁদের মনেতে পড়েছে
নিতাই কহিছে কাতরে অতি সমাদরে
বদনে বলিছে হরি। এ নাম রাখবি এখন
জানবি তখন ভবপারের এলাম তরি।
ঐ দেখ নামের তরী বাঁধা ঘাটে॥
ভবে যাগযজ্ঞ যত কল্প আদি ব্রত।
কলিতে কি আছে আর। কহিছে শ্রীমন্ত ঘুচাও হে ভ্রান্ত,
নামে চতুবর্গের ফল আছে। নিতাই চলিতে চলিতে,
চলিতে চলিতে বলিতে বলিতে যায়
এ নাম বিনামুল্যে দিব জগতে বিলাব,
ও কে নিবি তোরা আয়, আয় আয় নাম নিবিরে॥
তোমরা কেউ জান না নামের মর্ম,
ভামা জেনেছে। দ্বারকাতে সত্যভামা জেনেছে॥
সে যে নিক্তি ধরে ওজন করে শিব জেনেছে॥
নামের মর্ম কেবল শিব জেনেছে রে।
জেনে শুনে শিব সকল ত্যজেছে রে॥
বাকী রেখেছে কোমল নয়ন দুটি।
গুরু পদ ভজব বলে কেবল বাকী রেখেছি।
ভবে হরিনাম বিনে নিস্তার পাবি নে।
হা রে কলির জীব শুন, নামে শমন-দমন ভূভার হরণ।
সদাই বল হরিবোল, বদন ভরে একবার বল হরিবোল॥

—ঐ

৬

চান্দ গৌর রূপের মাধুরী লেগেছে আমার অন্তরে
রইতে পারলাম না ঘরে।
গোঁসাই রামলাল বলে ভাবছি অন্তরে।
ঐ আমার কুল গেল কলঙ্ক হয়ে পেলাম না তারে॥
আমি কোথায় গিয়া গৌর পাব উপদেশ দাও মোরে॥ —মৈমনসিংহ

৭

সুন্দর গহুরা নারীর মন চোরা
প্রেম ভাবে নাচে গহুরা।
গহুর আমার ঐ সুন্দরা নয়ানের তারা।
রাত্র নিশাকালে গহুর আমি হইয়াছি দিশা হারা॥ —ঐ

৮

লাইগ্‌ল রে চৈতন্যের জাহাজ ওরে সুরধনীর ঘাটে রে।
চৈতন্যের জাহাজখানা—নাই হিংসা তার নাই নিশানা॥
যার হইয়াছে গুরুর উপাসনা, সেই জাহাজে চড়ে রে।
সেই জাহাজ চড়লে পরে যাইতে হবে বিষয় ছাইড়ে,
(আবার) না আসতে হবে এই সংসারে
সেত এক টিকটে যাইতে পারে,
(অ) যাইতে পারে বিরাজ ঘাটে রে॥
টিকট মাষ্টার নিত্যানন্দ, দূরবীণ ধরে অদ্বৈতচন্দ্র।
জল মাপে গদাধর আর রামানন্দ ;
(তারা) কলের বলে জাহাজ চালায় প্রেমের ধূমা উঠে রে॥ —ঐ

৯

রসের মূরতি গহুর (গৌর) নইদে এসেছে।
দেখবি যদি আয় না মরি গহুর প্রেমের ঢেউ উঠেছে॥
প্রেমময়ী শ্রীরাধাকে চক্ষে ভারি মন দুঃখে
সদাই করে আহার কারণ আশায় আশায় দিন গিয়াছে॥
গহুর মুখে বলে রাধা রাধা দুই নয়নে বহে ধারা।
সুরধনীর তীরে গহুরা ধরায় ধরায় বেনে গেছে॥ —ঐ

১০

রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ গাও।
গৌর প্রেমে রাধার নামে মাতিয়া মাতাও ॥
এসে সবে মিলে দুই বাহু তুলে
তালে তালে বাহু তুলে নাচিয়া নাচাও ॥
হরেকৃষ্ণ হরে বল ভাই উচ্চস্বরে
ভব ক্ষুধা দূরে যাবে নাম-সুধা নাও ॥
ভব-ভয়-কারণ ডাকে সে রাধার মন।
ভবপারের চাঁওর বেঁধে নাওঁ ॥
আশী লক্ষযোনি এমন কড়ি পেয়েছে
দেহমানী এমন জনম পাও কি না পাও ॥ —ঐ

১১

যদি গৌর চাও ধনী কেতা নেও।
কাতা নিবি সঙ্গে যাবি আনন্দে গাছতলায় রবি।
গাঁজার কল্কি আগুণ দিবি দিবা-রজনী।
যদি গৌর চাও ধনী কেতা নেও ॥
মিঠাই মুড়কি ফুল-বাতাসা মেইখে-জুইখে কইরলাম খানা।
খাবার তরে কইরলাম আশা পাত গেল ছিঁড়ে।
যদি গৌর চাও, ধনী, কেতা নেও ॥ —ঐ

১২

গউর (গৌর) কলঙ্কিনী ধনি হইল নারে কোন মতে। ধ্রু ॥
গউর প্রেমের কিবা আশা দেখে যা আমাদের দশা।
ঘর ছাইড়া জঙ্গলে বাসা কামড়ায় মশামাছিতে ॥ ধ্রু ॥
জগন্নাথে নাড়া নাড়ি দুই এক বাড়ী ভিক্ষা মাগি,
খাবার বেলা ভাতের কাঁড়ি শাক চর্চরা জল ভাতে ॥ ধ্রু ॥ —ঐ

১৩

গৌর রূপ সাগরে ডুবলো নয়ন তারা,
আমার হাত বিন্দিবি পাও বাঁধিবি
মন বান্দিতে কি পারবি তোরা। —ঐ

গৌর আমার সাধনের ধন
গৌর বিনা যায় রে জীবন
কে গো আছ আপ্‌ও কু-জন গৌর এনে দেখা গো তোরা ॥
গৌর আমার ব্রজের হরি হাতে লয়ে হীরার ছড়ি,
কাটবে এবার মায়া-ডুরি সম্মুখেতে হয়ে মারা ॥ —ঐ

১৪

গহুর (গৌর) আইস আমার আসরে।
বিনয় করি ডাকি গহুর তোমারে ॥
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভজন স্তুতি,
গহুর, ভক্তবৃন্দ সঙ্গে করিয়া আইস আমার আসরে ॥
আইস, মাগো, ভগবতী, সঙ্গে লক্ষ্মী করিয়ে হে
মাগো, এই আসরে না আসিলে শ্রীরাধার দোহাই লাগে। —ঐ

১৫

গহর আমার সর্ব সাধনা গহর মোলাধার।
গহর আমার অঙ্গের বসন গহর আমার গলার হার ॥
মালাতিলক নাসিকায় ভাইরে,
চলেছে গহর নবদ্বীপে যায় ধীরে ধীরে।
একখানা রামাবলী আছে হরিনাম কইরাছি সার ॥ —ঐ

১৬

আমার মন পাগলা হল গৌরাঙ্গ দেখে।
দেলরঙ্গ পাগলা হইল গৌরাঙ্গ দেখে ॥
আমি গিয়েছিলাম সুরধুনি দেখিলাম গুরুর চরণখানি,
এই জায়গায় বসে।
আমি অচল পয়সা হইলাম রে চৈতন্য বাজারে,
একখান পয়সা হয় না রে চৈতন্য বাজারে।
কামড়াইলে সে পোলক কনি, বিষ নামে ও সজনী,
আমি যাই কার কাছে কই কার কাছে
আমার মন পাগলা হল গৌরাঙ্গ দেখে ॥ —ঐ

১৭

আমাকে ছুঁইস্‌না তোরা ও সজনী,
আমারে ছুঁইলে পরে তোর জাইত কুল হবে যে হানি।
আমাকে ছুঁইস্‌না তোরা ও সজনী ॥
জাইত মোর রেখেছে ধইরে গৌরাঙ্গ গুণমণি।
আমাকে ছুঁইস্‌ না তোরা ও সজনী ॥
দাঁড়িতে কোকলি দিলে মুখে বইলবে শ্রীহরি।
আমাকে ছুঁইস্‌ না তোরা ও সজনী ॥
ব্রজে থাইকে তোদের লাইগে হব প্রাণের ভিখারী।
আমাকে ছুঁইস্‌ না তোরা ও সজনী ॥ —ঐ

১৮

আমি একা গৌর হব না রাইকিশোরী।
এখন জয় রাধে শ্রীরাধে বলে, ধুলায় দিচ্ছ গড়াগড়ি ॥
দাদা ছিল বলরাম   নিত্যানন্দ প্রেমধাম
জগৎ মজাইল প্রেমে আমারি ॥
ফাল্গুনে পুর্ণিমার নিশি শশীর পেটে অবস্থিত
চন্দ্রগ্রহণ চলে যেমন পেরি ॥
আমি একা গৌর হব না রাইকিশোরী ॥
চল্লিশ বছরের পর সন্ন্যাসী হইবে পর
যুগল করে দণ্ড কমণ্ডলধারী।
দাস, কেষ্টদাস বলে গৌর কহিল কৃষ্ণ নিলে
কিশোরী হয় প্রেমের ভাণ্ডারী।
তোমায় আমায় দুই দেহ একযোগে এক আত্মা ধরি।
একা গৌর হব না, রাইকিশোরী ॥ —ঐ

১৯

আমার মন নিল এক নিমিষে সোনার বরণ ঐ মানুষ এসে।
প্রাণ নিল হরিয়ে মন নিল হরিয়ে সোনার বরণ ঐ মানুষ এসে ॥
যে আমার কলঙ্ক গায় তার যে জাতি যায়
গৌরাঙ্গ বধূর সাথে ॥

তার নাগাল পেলে জাতি-কুলের দাবি লইব তার কাছে।
মনের মত বর পাবি আনন্দে মাতিবি বুদ্ধিমন্ত তনু রে।
অবলা বধিতে নদীয়াতে আসিয়ে
আমার গৌর রইল সেই দেশেতে ॥ —ঐ

গোষ্ঠ

১

ওরে নীল বসন নাও রে নীলরতন,
করে করে সঁপে দিই রে তোরে,
দিনু রে রতনে রাখবি রে যতনে
একা ফেলে বনে যাসনে দূরে।
ক্ষীর সর রইল বাছার ধড়াফলে বাঁধা,
খেতে দিও যাদুর পাবে যখন ক্ষুধা।
গেলে যমুনার কুল হয়ে তৃষাকুল
সাবধানে দেখ নামিবে নীরে।
নিশ্চিন্ত রহিলাম সঁপে নয়ন তারা
বাসিস যেন ঠিক জননীর পারা
যারে তিলে না দেখিলে হইবে আত্মহারা
বৎসহারা গাভী যেমতি ফিরে।
বিজন বিপিনে, যমুনা পুলিনে বাছাধনে নয়নে নয়নে
যেথা যাবি তোরা যাবি রে দুজনে
হস্‌নে ছাড়াছাড়ি তিলেকের তরে। —ঐ

২

ঐখানে একবার দাঁড়া দেখি বাপ্
তোর ভাই কানাইয়ের বামে।
একবার দেখি বদন সারা দিনের মতন,
তোরে লয়ে যেতে বারণ করব নারে।

একবার ফিরে আয়, মায়ের কথা রাখ
আয় আয় যুগল শিরে রক্ষামন্ত্র আমি বেঁধে দিব বাপরে।
আয় রে মন্ত্র বেঁধে দিব রক্ষামন্ত্র বেঁধে দিব,
তোদের বনেতে বিপদ ঘটবে নারে।
মা তোদের রক্ষা করবেন সর্বত্র। —ঐ

৩

আমার আরও কথা মনে হল বাপ্,
রবির তাপে যখন ঘামিবে বদন
নবীন পল্লবে করিবি ব্যঞ্জন।
মায়ের মতন করে রে কোলে নিবি
গোপাল আমার বনের বেদন
কিছু জানে না, বাপ রে।
কোলে লয়ে ছায়াতে বসাবি
আমি রইলাম গৃহে অন্ধের মত
তোর করে সঁপে নয়ন তারা। —ঐ

৪

এস রে কানাই কোথায় আছ ভাই,
তোমা বিনে ধেনু চরে না।
আয়রে গোপাল ব্রজের রাখাল
তোমা বিনে কিছু সাজে না।
হাম্বা রবে ধেনু ডাকিছে সদাই,
সকাতরে জলে যাই যমুনায়,
তৃণয় পরশে আঁখি জলে ভাসে,
ওরে, কানু, তা কি জান না। —ঐ

৫

যমুনা কো তীরে তরুতল শীতল
তাহা মিলল দুটি ভাইরে ;
সবে বলে ভাল ভাল কি খেলা খেলিবে বল
আজু খেলা খেলিব এই খানে রে। —ঐ

৬

আয় রে করি কোলে জীবনের জীবন কানাই—'
ও তোর মুখ দেখে বুক ফেটে যায় রে,
দুঃখে অধৈর্য হতেছে প্রাণ রে
আমি মনের সখা খেলাতে
হারাই পাছে জনমের মত হারাই।
ওরে তুই জীবনের ধন, অমূল্য রতন—
তিলেক্ না দেখিলে মরি, তোর সঙ্গ লাগি সদা অনুরাগী,
ধেনুর সনে বনচারী।
ও তোর সঙ্গছাড়া রইতে নারি ভাই,
ও তাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে থাকি রে।
আমার আঁখি হয়েছে চাতক পাখী
নীরদ নিরখিয়ে ভাসাই। —ঐ

৭

কি সাজ সাজিলে রাজভূষণে আসিয়ে রাজভবনে।
দেখিয়ে এ সকল মন প্রাণ বিকল।
যা বল তা বল ভাল লাগে না নয়নে।
ভুবন মোহন চূড়া ধড়াটি আঁটিয়ে,
বাঁকা হয়ে দাঁড়ালে, ভাই, প্রাণ উঠে কাঁদিয়ে।
গলাতে গুঞ্জহার কি শোভা হয়েছে তার
সে সাজের তুল্য আর নাই ত্রিভুবনে॥ —ঐ

৮

চরণ ধরে মোহন চূড়া বলে, ধরে কৃষ্ণ পদতলে,
মনের আশা পূর্ণ হলো ধন্য হলেম এত কালে।
ধন্য হে আনন্দময় শ্রীনন্দকুমার
এতদিনে বাঞ্ছাপূর্ণ হইল আমার॥ —ঐ

৯

তবাঙ্গে যাবে না রাধার অঙ্গ
এত অহঙ্কার কেন হে ত্রিভঙ্গ,

কেবা কার সঙ্গে যাবে কেবা কার সঙ্গে রবে,
বুঝিব তবে ওগো এ লীলা সাঙ্গ। —ঐ

১০

সখী, ধর গো রথ পূর্ণ কর মনোরথ
যেন যায় না রথ মথুরা পথে।
এমনি কর গো গোপীচক্র না চলে রথচক্র
ও যেমন চক্রীশ্যাম না যায় রথ চক্রেতে। —ঐ

১১

গোপাল লইয়ে কোলে প্রতি দ্বারে দ্বারে—
গোপালের প্রাণ বাঁচাব মুষ্টিভিক্ষা করে।
কি বলিলে গোপরাজ হয়ে মম পতি ;
পতি হয়ে করিতেছে সতীর দুর্গতি। —ঐ

১২

বাঞ্ছা যদি আছে মনে
তুমি যাও হে নিমন্ত্রণে
আমার প্রাণ থাকিতে দিব না বিদায়,
দিব না বিদায় গোপাল ধনে। —ঐ

১৩

মন কেন গো কেঁদে উঠে,
আমার প্রাণ কেন থাকে না ঘটে,
দক্ষিণে ভুজঙ্গ দেখি নাচিছে দক্ষিণাঙ্গরে।
আপনি কেন আসিছে করি ভাসিছে পাপাঙ্গরে,
শ্রবণে মুখভঙ্গ কি কুরঙ্গ আজি হোল। —ঐ

১৪

আমার আজ কেন দিদি
প্রাণ কাঁদি কাঁদি উঠিতেছে সর্বক্ষণে
কেউ যেন আসি সূচিকা বিঁধিছে
আমার মরম স্থানে। —ঐ

১৫

কার সাধ্য বাধ্য করে পা সরায় কৃষ্ণের পসরায়
কৃষ্ণপদ তুষ্ট হলে, ইষ্টপদ পসরায়।

১৬

খুড়োগো, শুনতে আর পারি না বল নাকো আর
যে কষ্ট দিয়েছে দুষ্ট কংস দুরাচার।
জন্মাবধি হল দুঃখ না হেরিলাম পিতৃমুখ
আর মাতৃমুখ বলিলে শুনিতে বুক বিদরে আমার। —ঐ

বিবিধ পদ

১

ওরে দেখিয়ে সামান্য নদী এত ভয় কর যদি
ভব নদী কিসে হবি পার।
নদীর কল্লোল জল বিপুল সাঁতার। —ঐ

২

কৃষ্ণবর্ণ নারি দৃষ্ট কৃষ্ণ প্রায় অকৃষ্ণ দর্শন হাতে মুখে পায়
কৃষ্ণ বর্ণা ভজি জীবে কৃষ্ণ পায় একি সুসন্ধান নিগ্রহরে।

৩

ইষ্ট মম ইষ্ট, পতি মম কৃষ্ণ
গতি মম লক্ষ্মী নারায়ণ।
শিবমম পিতা দুর্গা মম মাতা
আছেন শুভকারী ভ্রাতা গজানন॥ —ঐ

৪

ও প্রাণকান্ত কি হে তুমি নিতান্ত ভুলিলে,
আমরা তৃষিতা চাতকের মত চেয়ে আছি আশা পথ,
পুর্ণ কর মনোরথ ভাসি নয়ন জলে
আমি জানি না, পড়ে নাই মনে
তব প্রেম কাঙ্গালিনী তব প্রেম কাঙ্গালিনী
এবার এস এস, নয়নমণি, বসাই হৃদকেমলে॥

তাই কহে দাস গৌরাঙ্গিয়া, বঁধু হে, তোর কঠিন হিয়া
আমরা জীয়ন্তে আছি মরিয়া ফিরে না চাহিলে ॥ —বাঁকুড়া

৫

বসি এই কি ঘাটেরি নেয়ে গো,
নাবিক, বয়সে নবীন, গঠনে প্রবীণ আমরা যুবতী মেয়ে।
উহার গলেতে তুলিছে বনফুল হার আমা পানে আছে চেয়ে,
জঠর অঞ্চলে বাঁশীটি ঝুলিছে ঢুলিয়াছে রাঙ্গা আঁখি।
চাপাইয়ে নায় না জানি কি চায় উহার চঞ্চল দেখি। —ঐ

৬

প্রেমেরই অঙ্কুর হইয়েছিল
বিচ্ছেদ বিকারে জ্বলিয়ে গেল
মিলন বারি সেচন বিনে
না হল পল্লব না ফুটিল ফুল
যত্ন হলো অকারণ—
আমার কি কাজ এমন প্রাণে
যদি পাব নাক' কৃষ্ণধনে। —বাঁশপাহাড়ী

৭

ঐ বাঁশী রাধার নামে
আর বাজিবে এই ঘনে ঘনে গো।
দুয়ারে ননদী ভাবে মনে কলঙ্কিনী রাই,
আমি রাঁধিব না এখন
কাঁদিব গো সখী করিব কি উপায়।
মন ছুটে যায় কুঞ্জবনে
আর নিভে যায় আগুন উনানে গো।
ব্যঞ্জন রাঁধি কেমনে আঁখি ধুঁয়াতে ধাধায় গো।
মনকে সই মানে না মানা
আর ঘরের বাহির যাইতেও মানা
শ্যাম রাখি না কুল রাখি গো
সখী ভাবিতে প্রাণ যায়,

অনেক সাধনা করিলে
আর অনেক গঞ্জনা সহিলে গো,
বিপিন বলে তবে কৃষ্ণ মিলে এমনিতে মিলা দায়। —ঐ

৮

বৃথা কুঞ্জ মাঝা বৃথা ফুল সজ্জা
বৃথা এ কবরী হায় গো।
নিশি হইল গত বৃশ্চিকে শত শত
দংশিছে কমল হিয়ায় গো।
কি করি সজনী এই মধু রজনী
বিফলে গেল পোহাইয়ে গো।
বসন ভূষণ রত্ন আভরণ
খুলে দে মরি লজ্জায় গো,
এ ষোল শৃঙ্গার অঙ্গে লাগে ভার
বিরহ সহা না যায় গো,
নিদ্রাহীন আঁখি পথ পানে দেখি
নিরখিতে শ্যাম রায় গো।
আমি অভাগিনী তাই বুঝি সঙ্গিনী।
বঁধু না ফিরিয়া চায় গো।
আসা ভাল বাসা প্রেমের পিয়াসা
মিটিবে না বুঝি হায় গো।
তবু বিপিন তারে ডাকে বারে বারে
পাব হৃদে এই আশায় গো॥ —ঐ

৯

ও শ্যাম বল হে বল ব্রজের অভাব কি ছিল,
নীল কদম্বের তরু মূলে সুখেত ছিল।
তার তলায় বসে মোহন বাঁশি বাজাতে হে অবিরাম,
আমাদের রাই কমলিনী তাথে কি সাজিত নারায়ণী।
চন্দ্র কিরণ মাঝে যেন লুকায় দামিনী।
এত যদি কৃষ্ণ ছিলরে মনে, প্রেমের হাট ব্রজে বসালে কেনে ?

দিন দুয়েক তরে রে যত্ন হল অকারণে রে
না হ'ল পল্লব না ফুটিল ফুল
প্রেমেরই অঙ্কুর হয়েছিল বিচ্ছেদ তপন তাপে জ্বলিয়ে গেল
আমি যাব না হ্রদেরই কুলে হ্রদেরই সলিলে গরল ভাসে
পরশ করিলে পরাণ নাশে
বৃক্ষ লতা কোন কিছু নাই কো সেথা জ্বলে গেল বিষানলে। —ঐ

১০

সে যে নিঠুর কালিয়া ও চায়না ফিরিয়া
পায়ে ঠেলি চলে যায় গো সে যে কেমন যে ধনি
হায় গো সে যে কেমন যে ধনি সে যে কুল মজাবার চূড়ামণি
ও সে কাঁদিলে যে আসে সাধিলে না আসে
বাঁধিলে খুলিয়ে পলায় সে যে কেমন গো ধনি
হায় গো সে যে কেমন গো ধনি সে যে কুল মজাবার চূড়ামণি
হায় গো সে যে কেমন গো ধনি ॥ —ঐ

১১

আমার সাধনের ধন অমূল্য রতন ॥
তিলে না দেখিলে মরি।
ও তাই পেয়েছি তাপ ও গোপাল রে।
আমি বহুদিন তপস্যা করে ও তাই পেয়েছি, বাপ,
আমার সাধনেরি ধন অমূল্য রতন ॥
তিল না দেখিলে মরি আমি পূজেছিলাম হরগৌরী।
ও তাই পেয়েছি বাপ ও গোপালেরে তপস্যার ধন ॥
আমার সাধনেরি ধন অমূল্য রতন ॥
তিলে না দেখিলে মরি ॥

১২

এইখানে শ্যামের সঙ্গে গেঁথেছিলাম মালা
আঁখি দুটি পালটিতে ছেড়ে গেছে কালা।
কালা কালা বলি আমরা কতনা ধেয়াব
কালাকে কাজল করে নয়নে রাখিব।

লোটনে বাঁধিয়ে শ্যাম লোটনে রাখিব
বিরলে বসিয়ে শ্যামে এলায়ে দেখিব।
কতদিন যাই নি আমরা মথুরা নগরে
শ্যামচাঁদ কেমন আছে বলনা আমারে।
আমার বঁধুয়ার ঋণ না জান গো তুমি
শীঘ্র করে কর বেশ লয়ে যাব আমি
সখীর বচনে ধনি চলিলেন ধীরে
আচম্বিতে প্রবেশিল শ্রীরাধা মন্দিরে,
শিবরাম দাস বলে গাছে পাকে বেল
যত সখী থাকিতে আমায় দিয়ে গেল শেল। —ঐ

১৩

জাগো জাগো প্যারী প্রভাত শর্বরী
রাজকুমারী রাধিকে মনোমোহিনী
মনোমোহিনী, প্রেমতরঙ্গিণী জাগায় গুণমণি নাগরকে
ঘুমে অচেতন সে কালো রতন মুরলী ধারণ চিবুকে।
চন্দ্রবদনী সুচারু-নয়নী, উঠে বৈসে পালঙ্কে
ঘরে গুরুজন কবে কুবচন ননদী দুজন কুটীলে। —ঐ

১৪

এখন নাগর তোর ভাঙ্গিল না ঘুমের ঘোর
পথ ভুলে হে ভাঙ্গিলে বিহানে
বঁধু হে, থাকিতে না দিলি বৃন্দাবনে
কে তোকে করে সোহাগ
কে দিল রতির দাগ
যাও বঁধু ধুয়ে এসো যমুনা জীবনে হে নাগর
থাকিতে না দিব বৃন্দাবনে
মুখে দিব চুণকালি ঘুচাব তোর নাগরালি
ছাড়া ছাড়া লেখিব পাষাণে, হে নাগর
কে রাখে রাই রাজার শাসনে
মান সরোবরে যে হংসীটি খেলা করে

সেকি তুলে গো ঘাঁরই শামুকে নাগর
কে না তোরে এমন লোকে ॥ —ঐ

১৫

বেণুরব লাগিল কানে চিতে না ধৈরয মানে
অমনি উঠিল বিনোদিনী কে যাবি আমার সাথে।
ফুলধনু নে গো হাতে যাতি হবে তাও আমি জানি
ললিতা বলিছে রাধে সাধাব মনের সাধে
অমনি কেন যাইবে ধনী।
রাইকে সাজাব ভাল লবঙ্গ মালতী মাল
হরি চন্দনের বিন্দু আনি আভরণ পেড়ে আনি
বেশ করেন বিনোদিনী সহচরী যোগান জোগায়
আগে আচুরিলম্ কেশ বাঁধিলাম লোটন বেশ
মল্লিকা মালতী দিয়া তায় কাজরে উজর গোরী
নাসাতে বেশর পরি ললিতা সিন্দূর দিছে ভালে
নীলবসন বরা গায়ে কাচুলী দিয়েছে তাই
কত শোভা অধর-কমলে কত শোভা পেয়েছে
বাজুবন্ধ আর করে বাহু ঝলকিত তরে
তা দেখিয়ে বিধুমুখীর হাসি।
তাম্বূল পুরিয়া মুখে ঘন যুবা নারী দেখি
খঞ্জন নয়ন ফিরাইয়ে।
যদুনাথ দাস কয় নূপুর পরালে হয়
সহচরী দিছে পরাইয়ে ॥ —ঐ

১৬

দধি বিক্র ছলে যান শ্যাম-গরবিণী,
কৃষ্ট দরশনে যায় সঙ্গেতে গোপিনী।
কমলিনী চলিলেন মথুরার হাটে,
নাবিক হয়েছেন কৃষ্ট যমুনার ঘাটে।
সঙ্গেতে বড়াই ছিল কাজে বড় পাকা,
নাবিক ওপার বুঝি ঐ যায় দেখা।

নাবি কবলিয়া ডাক দিল যত সখী,
ত্বরায় আনিল তরী শ্যাম কমল-আঁখি,
কে গো তোমরা কোথা যাবে কার রমণী
পরিচয় দাও মোরে সবিশেষ শুনি।
পরিচয় পেয়ে ছল করেন কমল-আঁখি,
ঢাকা খুল বসন তুল পসরায় কি দেখি।
ললিতা বলেন, ইত বড় মজার কথা
কড়ি দিয়ে পারে যাবে দেখাই কি কাজ।
ললিতা বলেন, ইত বড় মজার কথা
দধি ছেনা না বিচালে কড়ি পাব কোথা।
আসিবার কালে তুমি যত কড়ি চাও
হাট বেলা বয়ি যায় পার করে দাও।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ক্ষতি নাইকো সুন্দরী,
কেমনে হইবে পার অতি জীর্ণ তরী
একে একে পার যদি হইতে পার সবে
ভাঙ্গা লাইয়ে পার আমি করে দিব সবে।
স্বীকার করিয়া গোপী চাপিলেন নায়
পরথম খেয়াতে রাধা বিনোদিনী যায়।
মাঝেতে লাগাইয়ে তরী রঙ্গ করেন হরি,
তরঙ্গ হইল বড় সামলাইতে নারি।
গৌর অঙ্গে নীল শাড়ী পরেছে বড়াই
সাজিল দারুণ মেঘ তাই তো ডরাই।
খুলহ আছে যত অঙ্গের অলঙ্কার
কাল অঙ্গ ভারে তোমার তরী ডুবে যায়।
ধীরে ধীরে খুলে রাধা অঙ্গের ভুষণ,
হাসিছেন রসিক কৃষ্ণ মুরলী বদন
নীল শাড়ী খুলে আমি তায় নাহি দায়
কাল অঙ্গের ভারে তোমার তরী ডুবে যায়।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মেঘ ধরেছে উত্তরে

ঐ মেঘের তরে জল হইলেও হইতে পারে।
এমন সময়ে জল ঝড়বৃষ্টি হইল
ছলকে ছলকে জল নৌকায় উঠিল
অকুল মাঝারে কালা ডুবাইল তরী
শ্যাম চাঁদ রাই চাঁদ যমুনার মাঝে
নীলপদ্ম লালপদ্ম আ মরি কি সাজে!
জললীলা সাঙ্গ কর ত্রিভঙ্গ কানাই
মাথাতে ঢালিব দধি এস হে নাগর
বড়াইয়ের করে রাণী করে সমর্পণ
এই মতে লীলা করে ব্রজের নন্দন। —বাঁশপাহাড়ী

১৭

আমারে ত্যজিয়ে গেছে, মথুরায় গেছে গো পিয়া
পিয়া চিনে হিয়া আমার যায় গো কাটিয়া।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহানলে দিবানিশি হিয়া জলে
নিভে না আগুন জল দিয়ে (আগুন) দ্বিগুণ ওঠে জলিয়া।
এই করিলে দারুণ বিধি কেন আমারে বাধিলে বাদী
কৃষ্ণ হেন গুণনিধি বিধি দিয়ে নিল হরিয়া।
মধুপুর নাগরী শুনেছি পাতি ভারী তবে কেন অবিচার
রাখিল বধূ ধরিয়া।
গোঁসাই চাঁদ বলিছেন স্পষ্ট রাধা শ্যাম দুরদৃষ্ট
ওরে, দুষ্ট, পাবি কষ্ট শ্রীকৃষ্ণ না ভজিয়া। —ঐ

১৮

রাজনন্দিনী শ্যাম কাঁদানো ভাল নয় ধনী,
ওগো ধনের ধনী বিনোদিনী ও রাধা বিনোদিনী,
যোগী না পায় যোগ ধেয়ানে
নারদ না পায় বীণার গানে।
সে হরিকে কাঁদাস কেনে, ও রাধা বিনোদিনী!
ব্রহ্ম পুজে শত ফলে সে হরি চরণতলে
রাই রাখ রাই রাখ বলে লোটায়ে যায় ধরণী।

যেদিন ঐন মান ভুজঙ্গ হবে সেদিন পালটিয়ে তোমার খাবে
সেদিন কৃষ্ণ মন্ত্রে ঝাড়িতে হবে অধম শ্রীপতির বাণী। —ঐ

১৯

ওহে নারায়ণ দাসীর এই নিবেদন জানাই তোমারে,
কৃপা চক্ষে লক্ষ বারে রক্ষ কর সুধাংশুরে জানাই তোমারে।
ও রাহুগ্রাসের ভয়ে বাঁশী কেঁদে বেড়ায় দিবানিশি হয়ে উদাসী,
বিপদকালে কালশশী যুগল পদ দাও হে শিরে জানাই তোমারে,
কোথায় হে, করুণাসিন্ধু, ভয়ে ম্লান হতেছে ইন্দু,
ও বিপদ বন্ধু প্রকাশিয়ে কৃপাবিন্দু বিতর ভাস্করে। —ঐ

২০

মাগো, খুলে দে বাঁধন, মা, সইতে নারি,
বেঁদে কি বসে আছ ধৈরয ধরি
করের জ্বালা তরে, বেন্ধেছে মা দুটি করে
বলি আমি শপথ করে আর করব না চুরি
মা গো খুলে দে বাঁধন সইতে নারি। —ঐ

২১

নূপুরের রুনুঝুনু পড়ে গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে রাই এলে কি পাড়া।
এস ধনি বিনোদিনী সঞ্জীবনী রাধা,
তোমা বিনা রইতে নারি তিলেক আধা॥
আনিয়ে যমুনার জল শ্যাম চরণ ধোয়ায়,
নিজ পীত বাসে শ্যাম চরণ মোছায়,
ভাঙ্গিয়ে চূড়ার ফুল নিজ করে নিল,
নব প্রেমময়ী বলে শ্রীচরণে দিল॥
শ্যামের বামে বৈঠল রসের মঞ্জুরী
গণি দাসে মাগে রাঙা চরণ মাধুরী॥ —ঐ

২২

দেগো, আমার জীর্ণ তরী পাছে ডুবে যায় না রে।
আগে লিব কড়ি গুণে তবে দিব পার করি।

কি করি পার করি এইবার তাই ভাবি গো অন্তরে।
রাধারে চাপায়ে তরী ছাড়ি দিব দরিয়ায়,
কত রঙ্গ কর হে শ্যাম রায়।
ও বিশাখা,
দেখলে আমার হাসি পায়।
কত রঙ্গ করছে শ্যামরায়॥ —ঐ

২৩

আমার কৃষ্ণ জ্বর হয়েছে পড়ে আছে এক পাশে,
লড়ে না চড়ে না কৃষ্ণ মা বলে না কাল হতে।
অগু আইল বৈদ্য রূপে কৃষ্ণধনকে বাঁচাতে,
অমূল্য রত্ন দিব বৈদ্য যদি কৃষ্ণধন বাঁচে। —ঐ

২৪

হরিনাম নরম লুচি গরম গরম উদরপুরে খেয়ে নে না।
সেই জিনিষ যাবে তোর সংসারে খোদা খেতে সোজা
এমন জিনিস আর হবে না॥
সেই লুচি খেলে মুচি তবু অশুচি আর হবে না।
সেই লুচিতে হইলাম রুচি শুচি অশুচি বাধে না॥
অনুরাগ ছোলার ডাইলে মিশিয়ে খেলে আর তুমি ভুলতে পাইরবে না।
মিঠা কফির তরকারী সহ করি পূর্ণ তোর বাসনা॥
ছত্রিশ জাত একত্তরে খেলে পরে কলারেতে জাত যাবে না।
গুরু রোগ ঘৃতে ভাজা খেতে রাজা রেয়ে মজা করে নে না।
পাবা পাঁচ ভাবের মণ্ডা-গণ্ডা ঠাণ্ডা হবে তোর মনের বাসনা।
কৃষ্ণ প্রেম সুখের নদী সুখ দেবে যত খাবে, তত আশ মিটবে না।
হরিদাস রূপ-সনাতন চৈতন্যগণ বেশ করালে এই কয় জনা॥
প্রাণ গোঁসাই করেন তর্ক ঘৃতে পক্ক এ তোমার পেটে সইবে না।
অনন্ত মুড়ি কুড়িয়ে খেলে এ লুচির আর স্বাদ পাবে না॥ —মৈমনসিংহ

২৫

গোবিন্দ বলিয়ে দু বাহু তুলিয়ে প্রেমেতে গলিয়ে কর সংকীর্তন।
হরে কৃষ্ণ রাম হরে রাম রাম অবিরাম রসনায় কর উচ্চারণ॥

উন্মত্ত সদা নাম সুধা পানে হাসে কান্দে
নাচে শঙ্কর শ্মশানে. নারদ বাজায় বীণে ॥
সুমধুর তানে হরিগুণ গানে মজাইয়া মন ॥
সাধন ছাড়া হরিনামের মহিমে
ডালে বসে পাখী গাইছে পঞ্চমে ॥
হরিনাম ধর্ম হরিনাম ব্রহ্ম নামের সহিত আছে শ্রীমধুসূদন ॥
এস ভাই সবে হরি হরি বলি,
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করি কোলাকুলি।
হরিনাম ধ্যান হরিনাম জ্ঞান
বলে দ্বিজ অজ্ঞান তারিণী ॥ —ঐ

২৬

আরে সাধে কি আর খুঁইজি বনমালী।
তৃষ্ণার্ত পরিশ্রম দেহ সন্ধ্যাকালে,
সাধে কি আর খুঁইজি বনমালী ॥
জীবন ভইরা কইরাছি পাপ
করি নাই কখনও পুণ্যের আশ্রয়।
কত লোভে কতই বা সময় গিয়াছে জীবন
তাও সন্ধ্যার কথা ভাবি নাই তখন ॥
কভু দেখা না কইরেছি বনমালী
হরদুর্গা শিব কিংবা মহাকালী।
সাধে কি আর ডাকি বনমালী ॥
ফকির বলে চল সকলে ভজিগে সন্ধ্যায় কালী।
সাধে কি আর ডাকি বনমালী ॥
তৃষ্ণার্ত পরিশ্রান্ত দেহ সন্ধ্যাকালে
সাধে কি আর ভজি বনমালী ॥ —ঐ

২৭

সকাল বেলা চিকন কালা এলে কি মনে কইরে।
কল্লেম বসন ভুষণ স্বামী তোমারি কারণ ॥
সারারাতি নানান পোষাকের কল্লেম আয়োজন,

সুগন্ধ পুষ্প আনি গাঁথে হার কমলিনী,

শ্যাম বিনে কে নিবে শুধাই তোমারে ॥

সত্য করে বলহে কৃষ্ণ কার ঘরে ছিলে

তোমার এই বদন-বিধু শুকায়ে গেছে বন্ধু

চাকে নাই এক বিন্দু মধু কাঁদালি কুলবতী রাধারে।

এলে কি মনে কইরে ॥ —ঐ

২৮

আমার সব সখীগণে বনফুল তুইলে,

মনের খেদে রাইখে নিয়ে বাসর ঘর সাজায়ে

যেমনি পাপ তেমনি সাজা দিলেহে রাখাল রাজা,

মজাইলে কুলবতী রাধারে।

এলে কি মনে কইরে ॥

সাঁজের বেলায় কে তোরে জল আনতে বলেছে।

ঘরের জল বাইরে ফেলে জল আনতে গেলে,

না জানি কোন কালার সনে পিরীতে মজেছে ॥

দাদা এলে বলে দিব, বলে দিয়ে মার খাওয়াইব,

জল আনা ঘুচাইব আয়ানের ঘরে ॥ —ঐ

২৯

সখী, তোমার পায়ে ধরি আমার পাখী দাও ধইরে ॥

অনুরাগের পাখী গো আমার গিয়াছে উড়ে।

এই পাখীর মাথায় ময়ূরের পাখা,

তোমরা নি দেইখাচ পাখীর দুই নয়ন বাঁকা,

সোনার বরণ পাখী গো আমার গিয়াছে উড়ে ॥

আমার পাখীর মন ছিল সরল,

কেমনে কাটিয়া তিন পৈইচা ছিকল ॥ —ঐ

৩০

সব সখী ডাইকা বলে পার করহে প্রেম-পাটুনী।

তোমাদের পাটনী জাতের স্বভাব খারাপ

সইরে সইরে বাওনা তরী ॥

হটা তোর ভাঙ্গা তরী, পার হব কি পাও থোব কি ভয়েতে মরি।
নোনা লাইগে গেছে খাইয়া দেখ না চাইয়ে,
ঝল্‌মলে হইয়াছে তোদের তরী ॥
ও তাই সব সখী পার করিতে চাও,
তুমি থানায় থানা ওছি অধিকারে পার করিত
চাচ্ছ তুমি কাণের সোনা।
এই কি মোতিসোনা ভেল্কীদানা
কখন পরতে জান না।
তোর ঘরে গেলে সোনা ও দিন-কাণা
জেলে যাইবে যখন ছাড়বে না ॥
পার কর হে প্রেম-পাটুনী মথুরাতে যাব।
দৈ দুগ্ধ বেচিয়ে তোমায় উচিত মাশুল দিব।
দৈ দুগ্ধ দেইখে পাটুনী করছো তুমি আনাগোনা।
তোদের পাটনী জাইতের স্বভাব খারাপ,
দৈ দুগ্ধ খাইতে জান না, ঘৃত আর মাখন ছানা,
খাইলে পরে তোর পেটে হজম হবে না।
চিঁড়ে গুড় পচা মাঠা খাওনা সেটা
দৈ দুগ্ধের দর কখন জান না ॥ —ঐ

৩১

সখী ধরগো আমায় কৃষ্ণ অনুরাগে বুঝি আমার প্রাণ যায়।
ললিতা নোলোক নেও গো, বিশাখা নেও গো চুড়ি,
চন্দ্রা নেও চন্দ্রহার, সুমিত্রা অঙ্গুরী,
অঙ্গের বসন নেও দেবী চন্দ্রহার।

৩২

নশ্বর ঈশ্বর লোকে বলে কি গুণে
বিদ্যা কেবল বেণু বাজায় ধেনু রাখেন বনে বনে।
দস্যুবৃত্তি নিত্য কীর্তি কুকর্মে সদা প্রবৃত্তি
দিবারাত্রি কি দৌরাত্ম্যি নারীর বসন ধরে টানে।
—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৩৩

গোকুলে পাঠব আমি কায়—
ও তা ভেবে ভেবে প্রাণ যায়।
এমন কে সুচতুর ব্যক্তি আছে আমার এই মথুরায়।
যে করিবে শত্রু নাশ ঘুচাবে মনের ত্রাস
চিরদাস হব তারি পায়।
শত্রুরে আনিয়ে পাশে দারুণ দুঃখ কেবা নাশে
এত ভাল কে বাসে আমায়। —ঐ

৩৪

ওরে সেই অক্রূরমুনি পরম ব্রহ্মজ্ঞানী—
স্বরূপেতে চিনবি তারি।
ও তিনি আছেন গুপ্তভাবে কেবল ঐ ভাবে মনে মনে সদা
চিন্তা করেন হরি। —ঐ

৩৫

কে মোরে করিবে শাসন
ওরে আমার, হে পরম প্রভু
এই ব্রহ্মাণ্ড তারই বিভু
যারে ভুলে না কভু বিভূতিভূষণ। —ঐ

৩৬

ওরে পরকালের ধনরে আমার কানাই বই নাই আর,
যদি মরতে পারি কৃষ্ণের কোলে পরকালের ভয় কি আর।
ওরে পুত্রধন কি সামান্য ধন নরক কারণ দুঃখনিবারণ বলে সর্বজন,
ওরে কৃষ্ণ আমার সেই ধনের ধন অবশ্য করবেন উদ্ধার।
তোমরা সবাই অভাগীরে দাও গো বিদায়।
আমি মরিলে এই করিও, না পুড়িও না ভাসাইও,
সখী গো, আমি মরিলে এই করিও, না ভাসাইও জলে,
আমারে বান্ধিয়া রাখিও তমাল বৃক্ষের ডালে।
তমাল সামান্য নয়রে, কৃষ্ণপ্রিয় হয়,
নামের সহিত কৃষ্ণ ভাসিবে নিশ্চয়॥ —ঐ

৩৭

শ্রীমতী বিন্দা দূতী শুনাই এস নূতন কথা,
গিয়াছিলাম ঘাটেতে তাই উঠে মনে।
চারব্যাকা এক নাগর চুর, হাতে বাঁশী মাথায় চুড় গো
সে যে নাগর কেমন ॥
চুর ব্যাকা, বাঁশী ব্যাকা নিজে ব্যাকা বামে হেলে
তাইত বৃন্দা আইলাম কইতে।
এক বাজারে দেখবো সরলো সে যে
যমুনা টোটে আন্ধার ঘরে পইড়ারে জানলে না ॥ —ঐ

৩৮

শ্যামে, যাবে কি তাই বল না।
মইল গো রাই কাঁচা সোনা ॥
রাই আমারে পাঠাইয়াছে, শ্যাম, তোমারে ধইরা নিতে।
কইয়া দিছে থুইয়া যাইতাম না।
তিন দিন শয্যাগত গো রাধে নয়ন মেলে চায় না।
মইল গো রাই কাঁচা সোনা, শ্যাম, যাবে কি তাই বল না ॥ —ঐ

৩৯

মানা করি অহে, রাধা, জলের ঘাটে যাইও না।
একে তো যৌবনের জ্বালা জলে গেলে সন্ধ্যাবেলা আর একেলা।
মনচোরার নাগাল পাইলে যাদু করবে তোমারে ॥ —ঐ

৪০

মন তো বোঝে না রে, শ্যাম,
আজ আমার কাঁচা ঘুমে জাগাইও না ॥
শিমুল কাষ্ঠের কেওয়ারখানি হাতে দিলে বাজে,
ধীরে শুনতে দিও টোকা শাশুড়ী জাগে।
শাশুড়ী জাগেরে বেইমান ননদী জাগে।
শিয়রেতে পানের খিলি কুটুরামে চুণ,
চৌকির নিচে তামুক টীকা চুলাতে আগুন।
মন তো বোঝে না দেলত মানে না ॥ —ঐ

৪১

মাগো, মা, রাই আমাদের ক্ষেপেছে।
নজর করে দেখ না কি ছিল কি হইয়াছে ॥ ধ্রু
যমুনাতে জল আন্‌তে যায়, হাসে আরও ফিরে যায়।
কালা বুঝি পাগলা করি দিয়াছে।
বাঁশীর সুরে রোদন করে তাই বুঝি রাই ক্ষেপেছে ॥ ধ্রু ॥
রান্না ঘরে রাইন্‌তে যায়, কৃষ্ণ বইলে কান্দে তায়।
শুধালে বলে আমার ধোঁয়া লেইগাছে গায়।
তল্লাসেতে হাঁড়ি ধ'রে নীল বসনে চক্ মিশেছে ॥ ধ্রু ॥
কখনো বা মানে উঠে কখন ও বা বনে ছুটে।
কাল জানি বউর কপালে কি ঘটে।
রাই ডাকে রাই নন্দ বইলে ও বৌর মন মজেছে ॥ ধ্রু ॥ —ঐ

৪২

ভাই রে কানাই মা'র কথা তোর কিছুই মনে নাই।
লুকালুকি খেলবি বলে লুকালি যমুনার জলে,
মা যে সদাই শোকানলে যমুনার জলে উজান চলে ॥
বৃক্ষ আদি ছাড়ি লতা পাতা যেমন জল ছাড়া মীন বাঁচে না।
তেমনি মায়ের দশা রে, কানাইরে, বড় দুঃখের কথা।
মায়ের চোখের জলে বুক ভেসে যায় দুগ্ধে বসন ভিজেরে।
কানাইরে বড় দুঃখের কথা,
মায় যারে দেখে আপন কাছে তারে গোপাল বলে রে ॥
কানাই রে, মা যশোদা পিতা নন্দ কেঁদে হলো অন্ধ,
গোপাল বসে করছে রোদন,
মায়ের চোখের জলে বুক ভেসে যায়
মায়ের চোখের জলে বুক ভেসে যায় দুগ্ধে বসন ভিজেরে ॥ —ঐ

৪৩

বারণ কর গো সখী সে যেন কভু আসে না,
নিপট কপট শঠের শিরোমণি চিনি গো চিনি তোমারে ॥
হাসি মুখ দিয়ে অবলা ভুলাইলে করেছ কত ছলনা ॥ —ঐ

৪৪

বংশারী বাজাইল শ্যাম নিঘোর কাননে।
সই গো বংশারীর ধুনে গৃহবাস না লয় মনে॥
শোন, ওগো প্রাণ-সজনী, একে শুনি মধুর ধ্বনি,
মনে লয় উড়িয়া যাই আমি সেই বনে।
মন মানে না রে।
সমুজ না মানে প্রাণে॥
বংশারী বাজায় শ্যাম কোন গহিনা বনমে
বংশীকিরা ধুন শুনি উলটিয়া বহে যমুনা,
কুলের বধূ কুলে রইল মধুর সে তান শুনি।
চিক্কন কালার বাঁশীর স্বরে জিউ নাই মানে,
বংশী হায় হায় রা॥ —ঐ

৪৫

পিরীতি পিরীতি মধুর মূরতি স্বরতি রসের সার।
সাপেরি মাথায় ভেকেরে নাচায় বিষম চতুর সে।
পিরীতি লাগিয়া পিরীতি সখী রে
কে না দিল হয় কারাগার॥ —ঐ

৪৬

প্রাণ কানাই ও, তৈলের বাটি গামছা হাতে
চল যাই যমুনার ঘাটে।
কলসী ভাসাইয়া নিল স্রোতেরে, ও প্রাণ কানাই ও।
প্রাণ কানাই ও, বন্ধু যদি সুজন হইত, কলসী ধরিয়া দিত,
কলসী লইয়া যাইতাম ঘরে, ও প্রাণ কানাই ও।
ও প্রাণ কানাই ও, আমি তো অবলা নারী বারা বানি
বদন চুষিয়া পড়ে ঘাম। আরে ও প্রাণ কানাই ও,
ও প্রাণ কানাই, বন্ধু যদি সুজন হইত, মুখের ঘাম মুছিয়া দিত,
চান্দ মুখে তুলিয়া দিতাম পান॥
জল ভর সুন্দরীরে কন্যা, কন্যা আরে জলে দেছ ঢেউ।
মোর সঙ্গে কর আলাপ প্রেমের আলাপন॥

কন্যা আরে, কলসী কর কাইত (কাত)।
আমরা দুই ভাই জল নিয়াছি তোমরা কোন জাইত (জাত) ॥

—ঐ

৪৭

প্রাণের নাথ তোমার বদল দিয়ে যাও বাঁশী।
তোমার বদল বাঁশী দেও
নইলে মোরে সঙ্গে নেও
নইলে মোরে কর নিজ দাসী ॥
শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যায়
ভাইয়ের কাছে বিদায় চায় গো
আমি নারী হইয়া কেমনে বিদায় দেই ॥ —ঐ

৪৮

প্রভাত কালে রাণী বলে, গাও তোল রে সোনার নীলমণি।
ডাকে তোমার জননী নিরবধি খাওরে ননী।
ধর ননী খাওরে তুমি একবার মা বইল বইলে
ডাকরে, গোপাল, প্রাণ ভইরে শুনি ॥
বেটার জ্বালা তমুর কালা ভবের পরে দিছে যার বুকে।
সে আছে কোন সুখে বারে বারে বুকে রাখি,
এখন কেন হওরে দুখী, সেই দশা আমার কইরে
দুঃখে ভাসাইলি ॥
স্বপ্ন যোগে দেখি, জোয়াব (জবাব) সরে না মুখে,
আমি স্বপ্ন যোগে দেখি সোনার খাট-পালং থুয়ে
জমিনেতে থাক পা থুয়ে আমাকে না গেলি কয়ে
তোমাকে না বোলে দিয়ে গৃহে রব কি ধন লয়ে
ওরে আমার, জাদুমণি, গেলারে ছাইড়ে ॥ —ঐ

৪৯

প্রাণবন্ধু কালিয়া আইল না শ্যাম কি দোষ জানিয়া,
শোন, এস সহচরী, আইনা দে শ্যাম বংশীধারী
আমার নয়ন জলে বুক ত যায় ভাসিয়া ॥

শোন, এস সহচরী, আইনা দে শ্যাম বংশীধারী।
বাটার সোহাগ চন্দন রাইখাছি সরাইয়া ॥ —ঐ

৫০

নাথের উদ্দেশে আমি যাই যাই যাই গো
পরাণ বান্ধিতে আর পরি নাই নাই গো ॥
যোগিনী সাজিয়া, তাহাকে খুঁজিয়া
আনিব বান্ধিয়া যদি দেখা পাই পাই গো ॥
দেখা না পাইলে, রসি দিয়া গলে
নৈলে ডুবে জলে, প্রাণ দিব কৈ কৈ কৈ গো ॥ —ঐ

৫১

নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ধন আসতে কে করে মানা।
ফুলের শয্যা হইল বাসি, আইল না গো কাল শশী,
ভাইবে বাঁচি না ॥
কইও গিয়া কৃষ্ণের কাছে কৃষ্ণ বিনা কেউ জানে না,
কদম্ব ডালে ডাকে পক্ষী শ্যামচান্দেরে দেখেছ্ নাকি কেন বল না ॥
লাগল পাইলে কইও তারে তোমার রাধা আর বাঁচবে না ॥ —ঐ

৫২

দূতি, কই আমার সে সব বন্ধু কই।
তোরা সব নাটের গুরু, শোন গো বিন্দের সই।
মানে খেত্তা দিতে, সখি, তোরাই সকলে বলেছিলি।
রাধের বন্ধু আইল ঐ এখন বাঁচিব না প্রাণেতে।
নিকুঞ্জ বনেতে মানে জানি অপমানী হই।
জানি জানি অপমানী কালার পিরীতি।
ঘরে বাইরের গঞ্জনা সব আইজকার ঘাটে পথে,
আর প্রতিজ্ঞা কইরাছি, মনেতে ভাইবাছি
আসিয়া বসো সে পথে।
সে কাল অতি রঙ্, সে কাল রঙ্
আমি হেরিব না এই নয়নে।
সাজারে সজ্জা পাইয়া লজ্জা আসিয়া নিকুঞ্জে

এখন কলঙ্কের ডালি মাথায় লয়ে
সই পিরীত কইরে রাখালের সঙ্গে সহে না আমার এ সব গঞ্জনা।
সে রাখালের পোলা প্রেমের মর্ম জানলে না—
তাই বলে প্যারী সখি আর কি করি
ওগো, দূতি, তারে করিও মানা
ছি ছি লাজে মরে যাই দর্প হারী
সে লম্পট যেন কুঞ্জে আইসে না ॥ —ঐ

৫৩

দারুণ পিরীতে আমায় কালান্ত করিল গো,
ভেবে তনু হইল সারা সখী তোরা জান নি।
বিষের তন্ত্র বিষের মন্ত্র বিষেরি ধারা ॥
রাই জিজ্ঞাসে বৃন্দার কাছে,
প্রেমের বিষের নাহিক ঝাড়া।
ভেবে তনু হইল গো সারা ॥ —ঐ

৫৪

তোরা কে কে যাবি আয় ঐ কদম্ব তলে,
কালার রূপ দেখিয়া হইলাম রে পাগল।
সে রূপ ভুলিতে না পারি, তোরা কে কে যাবি আয় ॥
সোনার কলসী কাঁকে রাধে চল্‌লো যমুনার ঘাটে,
কলসী বুড়াইয়া রাধে আছে দাঁড়াইয়ে,
তোরা কে কে কালার রূপ দেখিবি, তোরা কে কে যাবি আয় ॥
আসমানের দিকে চাইয়া দেখি কালা মেঘের আড়া,
তোরা কে কে যাবি আয় ॥
জল চাইয়া রূপ ভারী সেইরূপ লাগলো
আমার অন্তরে কালার রূপ, তোরা কে কে যাবি আয় ॥ —ঐ

৫৫

তোমাকে বলি কাল রে শশী, কদম ডালে বাজাও বাঁশী।
বাঁশীর রব শুনে উদাসী, রব শুনে উদাসী,
বাঁশীর রব শুনে উদাসী ॥

কোন বনে বাজে রে বাঁশী,
আমার মনে বলে দেইখা আসি,
মনেরে বুঝাইয়া রাখি গো প্রাণে ধৈর্য মানে না ॥ —ঐ

৫৬

জুয়াচুরি বংশীধারী খাটবে না তোমার,
আমরা দাসী রাধার ॥ ধ্রু ॥
কার ঘোলের হাঁড়ি চেটে কম্প জ্বর গেছে ঘটে,
শ্যাম, তুমি পড়েছ বিষম সঙ্কটে,
এ রোগের রাই বিনে নাই ডাক্তার;
এ রোগের ছন্দি পাওয়া ভার ॥ ধ্রু ॥
আমরা রাধার কিঙ্করী তোমার ধাত বুঝতে পারি,
বুঝে দেখ ভিজে কম্বল হয়েছে ভারী।
কইছে বিন্দু যাদু, শোন হে কবির বধূ,
আমি ভুলবো না শুধু শুধু,
আমাদের করতে হবে ভব পার ॥ ধ্রু ॥ —ঐ

৫৭

চল গো বিশাখে সত্ত্বদ সচিন্তে যমুনাতে জল আনতে যাই।
জলেরি ছলে কদম্ব মূলে প্রাণবৃন্দের দেখা না পাই ॥
উদয় হইল শশী, কালীয়ায় বাজায় গো বাঁশী ;
হা রে বাঁশী শুনিতে,
আউলাইয়ে মাথার বেণী যাইব বান্ধি খোঁপা।
খোঁপারই উপরে ভ্রমরায় গন্ধ রে,
তবু বৃন্দে ফিরিয়া না চায় ॥ —ঐ

৫৮

চিরদিন বাঁশী শুনি আজ কেন বাঁশী শুনি না।
শোনবো বলে আইসাছিলাম বাঁশী শোনা হলো না ॥
জল আনার ছিল না কেউরে আসলাম আমি জল ভরিতে।
কাঁখের কলসী রইল কাঁখে জল ভরা আর হলো না ॥

৫৯

গোপীর প্রেম করা সামান্য নয় রে,
হইতে হবে জ্যান্তে মরা, সহজে ডুবলো যারা।
ও সে ডুবলো যারা ডুবলো তারা॥ —ঐ
ত্রিপনীর উজান বাঁকে যে বেঁধেছে মহড়া,
ভোলা মন মন রে, সে যে আনন্দ সাগরের মাঝে,
রূপ সাগরে দেয় পাহারা।
শম্ভুচাঁদ ঠাকুরে বলে পারবিনে মন তোরা
আমার মন মন রে সে যে,
সে যে এক মরণে দুজন মরে
প্রেম-পিরীতির এমনই ধারা॥ —ঐ

৬০

কৃষ্ণ প্রেমের হাট বসেছে চমৎকার।
ও হাট দেখবি যদি মন আমার॥
ঐ হাট করে সব গোপীর মেয়ে অন্য মেয়ের গোচরে।
ভয় পেয়ে সব যায় গো চলে, সাধন করা—অসি করে।
সে হাটে মেয়া রবে, চাকনা পুরুষ যাওয়া হলো ভার॥
হাটে সকল যাইতে মানা আছে তিন থানায়।
তিন চাকি ঘর সে হাটে নাই চুরি—শুদ্ধমে হয়েছে বার॥ —ঐ

৬১

কি দিয়া শোধিব রাধার ঋণ, গো রাই, আমার সেইগুণ নাই।
গোষ্ঠ গোচারণে গহন কাননে তোমার সনেতে যাই।
শোনলো কিশোরী আর বা কয় দিন আছে বাকী
বাঁশীতে তোমার গুণ গাই ল রাই আমার সেই দিন নাই॥
এই দরখাস্ত দিয়া যাই দেখা দ্যাও হে গৌর নিতাই॥
তিন খণ্ড বাড়ী ছিল প্রেমানলে দগ্ধ হইল,
এখন আমার কিছুমাত্র নাই॥
সাড়ে তিন পোয়া বাড়ী জমি জরিপেতে হইল কমি,
আওয়াইল দুইয়ম ছিয়ামর ঠিক নাই,

আমি মালখানাতে পড়িয়া কান্দি,
আমার দলিল পত্র কিছুই নাই।
কি মত্ করব নালিশ তুমি হইল জাজর উকিল গো
আমি আপিলেতে ডিক্রী পাই
দেখা দেও হে গৌর নিতাই। —ঐ

৬২

করি হে বারণ কঠিন নারীর প্রেমে মইজ নারে মন।
নারীলোকের এমনি ধারা, আগে প্রেম বাড়ায় তারা
প্রেম হাসি গলে ফাঁসি লভিবে যখন॥
মনচোরা শ্যামের বেশে অবলা পাইয়া শেষে
মজাইলে রমণীর মন॥ —ঐ

৬৩

কালা চাঁদ আসবে বলে হেসে হেসে চাঁদ উঠেছে।
আকাশের কূলে কালাচাঁদ আসবে বলে,
সুধা রতন সুধা যতন সুধায় সুধায় ঢলাঢলি।
আয় আয় বনমালী দিয়াছ কুলে কালী সদা আঁখি হরে॥

৬৪

কোন না কোন গহীন বনে কে বাজায় মোহন বাঁশী।
শুনিয়া মন উদাসিনী রহিতে না পারি।
কোন সন্ধানে বাজায় বাঁশী আমি রইতে না পারি।
অবিরত বাজায় বনে শ্যাম জয় রাধা বলে॥ —ঐ

৬৫

কোন ঘাটে চান করলি কানাইয়া গামছা কোথায় হারালি।
মা যশোদা পিতা নন্দ তুই রে আমার প্রাণ গোবিন্দ,
তুই রে আমার শিরে নন্দ যশোদারে কেন কান্দালি।
হাঁটু জলে ফেইলে গামছা, গামছা গলা জলে খোঁজালি॥

৬৬

ও তুই যারে, মাধাই, একবার গিয়ে জাইনে আয়।
সুরধনীর তীরে বাঁকার মধুর ধ্বনি শুনা যায়॥

একদিন আমরা মন দুখে মইরেছিলাম কান্দারে ফেকে
দয়াল নিতাই-এর গায়।
দারুণ কান্দার চোটে মাথারে কাইটে রক্তে বুক ভেইসে যায়॥
আমরা দুই ভাই জন্মাবধি ভইরা ছিলাম পাপে গো,
ভরা পাপের সীমা,
এখন গিয়া পাপের গো ভরা ঢাইলা দিব নিতাই-এর পায়॥
সে যে মাইর খাইয়া মাইর চুরি রে করে,
এমন দয়াল আর কোথায়॥ —ঐ

৬৭

ওরে, রাই-সাগরে ডুইব্‌ল শ্যামরায়।
তোরা ধর গো হরি ভেইসে যায়॥
রাই-সাগরে তরঙ্গ ভারি,
একা ঠাঁই দিতে পারবে কি শ্রীহরি।
ও শেষে ডুবে ডুইব্‌ল শ্যামরায়॥
ফিরে আসতাম না এই নদীয়ায়।
রাই-সাগরে ডুইব্‌ল শ্যামরায়।
চাইড্ডি বাকা অভিলাষ কইরে
কৃষ্ণ জন্ম নিল নন্দেরি ঘরে,
থাইকত দাস অভিলাষ
শ্যামের মোহন চুড়া ভেইসে যায়॥
এত নিষ্ঠুর কেন হে বন্ধু,
কি প্রয়োজন কুঞ্জে কুঞ্জে খুঁজিয়া বেড়াই শ্যাম॥
তোমার বিহনে ধরা পইড়াছ,
এবার কোথায় লুকাইবি আর।
ছাড়িব না, মুরারি, আমি বিনা পরাণ পণে॥ —ঐ

৬৮

একদিন মনের সাধে কৃষ্ণপদে প্রাণ সঁপেছি।
এমন নিঠুর সনে না জেনে পিরীতি করেছি॥
না জানিয়া পিরীতি করবা, সই গো, মন-আগুনে জলতেছি॥

তাহার নাম কাণে শুনে কালা কালা,
চক্ষের মণিটি এমন না, কালার সনে প্রাণ সঁপেছি। —ঐ

৬৯

এখন কেন কাইন্দ রে, ধনি, নিরজনে।
পায়ে ধরে শ্যাম সেধেছিল চাইলে না বদন পানে॥
ওরে শ্যামের বামে বসাইব রে আমি বসাব শ্যামের বামে।
ফুলের মালা বাসি হইল রে,
হারে কেবল কালার শ্যাম বিনে॥
বিনা সূতার মালা গেঁথে রে
আমি দিব শ্যামের গলেতে॥
তোমার চইলে গেছে শ্যাম থাকবে না আর মন,
জলে অনল দিতে পারি, বিন্দে আমার নাম।
ফুলের মালা বাসি হইল রে,
হারে কেবল কালার শ্যাম বিনে॥
এখন কেন কাইন্দ, রে ধনি, নিরজনে॥ —ঐ

৭০

ঐ কদম্বতলে বাঁশী বাজায় চিকন কালা গো।
বাঁশীর সুরে প্রাণ উদাসী আমার প্রাণ করে উতলা গো॥
যমুনার ঘাটে গো যাইতে ইছল-পিছল মাটি,
কলসী ভরিয়া, রাধে, যমুনার ঘাটে ভাঙ্গল সাধের কলসী॥
যমুনার ঘাটে যাইতে পাইলে রাধা,
সব সখী নাম থুইল কলঙ্কিনী রাধা গো।
আন নৌকা গাঙ্গের কুমার বাটল কেন মার,
একেলা পাইয়া ঘাটে কালা চতুরালী করে গো।
দীঘল নদী থুইয়ারে কানাই পাতাইল নদী বাও,
অনুমানে বোঝা গেল কানাই চাতুরালী করতে চাও॥
কাঠের রাজ্যে থাক তুমি কাঠের কিবা মূল,
ভাঙ্গা নৌকায় দিচ্ছ খেওয়া, কানাই, কিবা পাইলা জুত রে॥
ভাঙ্গা নহে ভাঙ্গা নহে, বলিস্ নারে আর,

কত হস্তী ঘোড়া পার করিলাম, রাধে, তুই বলে কত ভার।
সব সখী পার করিতে, রাধা, নেব আনা আনা,
রাধিকারে পার করিতে, কানাই, ল'ব কানের সোনা গো।
সব সখী পার করিতে আমি নেব বুড়ি বুড়ি,
রাধিকারে পার করিতে আমি লব আগুণ পাটের শাড়ী।
তারা করে ইমির ঝিমি নাগরচান্দে করে আলো,
রাধিকার গৌরব দেইখা রে, আমার কৃষ্ণ হয় কালো॥
যমুনার ঐ ঘাটে যাইতে ইছল পিছল মাটি,
ছিঁড়িব গলার হার কন্যার ভাঙ্গিব কলসী॥
কিবা মনে তোর মাতাপিতা কিবা মনে তোর হিয়া,
একেলা পাঠাইছে ঘাটে কলসী কান্ধে দিয়া।
ভাল আমার মাতাপিতা ভাল আমার হিয়া,
কিবা মান তোর মাতাপিতা কিবা মনে তোর হিয়া,
এত বড় হইয়াছ, কুমার, না কইরেছ বিয়া॥
ভাল আমার মাতাপিতা ভাল আমার হিয়া,
তোর দেশে আসিব বইলা না কইরাছি বিয়া॥ —ঐ

৭১

একদিন জটিলে কয়, রাইকিশোরী, রেহঁখ ভানুর ঝি!
ছল কইরে জল আনতে যাওয়া, ঠাটের কথা ঘাটে কওয়া,
কদমতলে দাঁড়িয়ে রওয়া তার অনেক ভাব জানি।
কুল মজাইলি কালি দিলি কুলেতে কলঙ্কিনী,
ছি ছি মনে গৌরবিণী॥
একদিন আয়ান আইলে বইলে দিব কাটব তোমার নাক,
তুমি চান করতে যাও কালীদয়ে, সকল সখী সঙ্গে লয়ে,
আমোদ কর বসন থুইয়ে তাই শোনালো বজ্জাত।
বাড়ীত্ আইসে ঘোমটা টান, ছি ছি, নাই তোমার লাজ॥
সদাই তলে তলে চায়,
তুমি মইজাছ যার পিরীতে, সেই বাঁশী বাজায়।
ঐ দেখ, রাধা রাধা বলে বাঁশী বাইজতাছে সদাই।

সেই বাঁশী তোর গলার মালা বাজায় বাঁশী চিকন কালা,
ত্রিভঙ্গ কদম তলা, সেই বাঁশী বাজায়।
বাঁশীর স্বরে পাগল করে শুইনে প্রাণ কেড়ে নেয়
রাধের সময় বয়ে যায় ॥ —ঐ

৭২

আজ ফিরে যাও, কালাচান্দ বধূয়া, যদি ভালবাসবি রে ॥
নিত্য নিত্য আসবি যদি তুই পাড়ার লোক আমার হবে বাদী
তুই ধন খোয়াইলি সব হারাইলি অপমান হইলিরে ॥ —ঐ

৭৩

আয়, কে যাবি পারে, দয়াল নিতাই নাও রেখেছে,
ত্রিবেণী উজান ধারে ॥
ঘাটের উপরে থানা, লোভী কামী যেতে মানা ;
যদি যায় দুই এক জনা অমনি যায় সে ফিরে ॥
যে জন হরি হরি বলে, অমনি নেয় সে নায়ে তুলে
সে জন উজান বাতাসে দেয় পাল তুলে
আর কি ভয় আছে পারে ॥ —ঐ

৭৪

আমি কান্ত জ্বালায় মরি, পিউ গেল আমায় ছাড়ি,
দুঃখের কথা বলরে কোকিল।
সজনী, দারুণ কোকিলার রবে,
পাড়ার পড়শী জাগে, জাগে আমার কোকিল ননদী।
চাতকিনী কাঁদিয়া গেলে
ঝাঁপ দিব যমুনা জলে।
জ্বালায় আর প্রাণ বাঁচে না কি না ॥ —ঐ

৭৫

আমি জনম-দুঃখিনী, রে কোকিলা, আর জ্বালাইও না।
যেখানে হয় কৃষ্ণকথা, দূরে যায় মনেরি ব্যথা
এস, সজনী, কৃষ্ণ ভাবে মরলেম গো আমি দুঃখে বাঁচি না ॥ —ঐ

৭৬

অ ললিতে, ললিতা, কৃষ্ণহারা হইলাম গোকুলে,
কৃষ্ণহারা হইলাম গোকুলেতে, ললিতে।
পিরীতি ক'রে গো কার বা এত জ্বালা,
ভাবিতে চিন্তিতে আমার সোনার অঙ্গে কালা,
সোনার আঁখি কালা।
হাতে তুলে মাথে লইলাম শ্যাম ॥

কু কাটার গান

কু-কাটার গান ঐন্দ্রজালিক (magic) সঙ্গীতের অন্তর্গত। কেহ যদি কাহারও অনিষ্ট সাধন করিতে চাহে বলিয়া আশঙ্কা করা হয় তখন তাহার সেই উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে সঙ্গীতের মাধ্যমে যে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া সাধিত হয়, তাহাই কু-কাটা বা কু অর্থাৎ অসৎ উদ্দেশ্য কাটিয়া ফেলা।

১

ছাঁচি খড়কা পড়শী ঝাটি,
কু কাটে কুজ্ঞান কাটি।
বাদ বিদ্যার বাদ কাটে,
কে কাটে শ্রীরাম কাটে।
বল বল ভগবান,
শ্রীরামের অহঙ্কারে নাই কুজ্ঞান ॥

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

আট হাত বসুমাতায় গাড়িলাম গোজ,
ঘড়াকে করিলাম আগালি পাখালি।
হাতিকে দিলাম লোহার শিকলি,
যত শালা-শালীরা কুজ্ঞান করছে।
পালচ্ছে হকল বিকল ॥

—ঐ

কুড়া শিকারীর গান

পূর্ব বাংলার একপ্রকার জলজ পাখীর নাম কুড়া বা ডাহুক। ইহারা উত্তম শিকারী পাখী। সেই অঞ্চলের এক শ্রেণীর সৌখীন লোক পোষা কুড়া পাখীর সহায়তায় বন্য কুড়া শিকার করিয়া থাকে। বর্ষাকালে জলজ লতাগুল্মের উপর পোষা কুড়া পাখীর খাঁচাটি গোপন করিয়া রাখা হয়, পোষা কুড়ার ডাকে বন্য কুড়া আসিয়া সেখানে সেই খাঁচাটির উপর বসিবা মাত্র ইহার পা লোহার আংটির মধ্যে আট্‌কাইয়া যায়, বন্য পাখী আর উড়িতে পারে না। ইহাই কুড়া শিকার। কুড়া পাখীর শিকারীরা যে গান গাহে, তাহাই কুড়া শিকারীর গান হইবার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুড়া শিকারীর গান কথাগুলি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে একটি লোক-গীতিকা (folk-ballad) প্রচলিত আছে, তাহার নায়ক একজন কুড়া শিকারী, নায়িকার নাম মলুয়া। এই লোক-গীতিকাটি জনসাধারণের মধ্যে কুড়া শিকারীর গান বলিয়া পরিচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' (১৯২৩)-য় ইহা স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া 'মলুয়া' নাম প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার একটু অংশ এই—

চৈত বৈশাখ মাস গেল এই মতে।
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে বিনোদ পিঁজরা লইল হাতে ॥
মায়েরে ডাকিয়া কয় মধুরস বাণী।
কুড়া শিগারে যাইতে বিদায় দাও, মা জননী ॥
ঘুম থাক্যা উঠ্যা বিনোদ মায়েরে কহিল।
কুড়া শিগারে যাইতে বিদায় মাগিল ॥
টিক্কা না জ্বালাইয়া বিনোদ হুক্কায় ভরে পানি।
ঘরে নাই বাসি ভাত কালা মুখখানি ॥
ঘরে নাই ক্ষুদের অন্ন কি রান্ধিব মায়।
উপাস থাকিয়া পুত্র শিগারেতে যায় ॥
মায়ের আক্ষির জলে বুক যায়রে ভাসি।
ঘরতনে বাইর অইল বিনোদ বিলাতের উপাসী।
জষ্ঠি মাসে রবির জ্বালা পবনের নাই বাও।
পুত্রেরে শিগারে দিয়া পাগল হৈলা মাও ॥—মৈমনসিংহ গীতিকা

কুর্মিজাতির গান

পুরুলিয়া জিলার কুর্মিজাতির মধ্যে অনেক প্রকার লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, অন্যত্র ইহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যাইবে। এখানে কয়েকটি সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল। ইহাদের সংগ্রহকাল ১৩২১ সাল।

১

আওইতে যাওইতে
দশ জোড়া জুতোয়ে সেই গেল—
তোরে লাগিন, ধনি! —পুরুলিয়া

অর্থ—হে ধনি! তোমার জন্য যাওয়া আসা করিতে করিতে আমাদের বাড়ীর লোকের দশ জোড়া করিয়া জুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

২

আওইতে যাওইতে দশ কোশ পথ,
তোর মায়ে বাপে, ধনি, যাইতে নাহি দে'ল। —ঐ

৩

মায়ে বাপেক বাড়ীতে
ঘুঁইটা কুড়াওই;
আজু ধনি চড়লেক উপর। —ঐ

অর্থ—পিত্রালয়ে ঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জীবন যায়। কিন্তু আজ ধনী উপরে উঠিয়া বসিয়াছে।

ফুলের মাগনের গান

মাঘ মাসে পূর্ববঙ্গের কৃষক বালকগণ বাড়ীতে বাড়ীতে এক শ্রেণীর গান গাহিয়া যে মাগন সংগ্রহ করে, তাহাকে ফুলের মাগনের গান বলা হয়। তবে প্রধানতঃ ছড়াই এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ক্বচিৎ এক আধটি গান শুনিতে পাওয়া যায়—

১

কানাই বলেরে, শ্রীদাম,
বেলা গেল বিলম্বে আর কার্য নাই॥
বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল, রবি গেল তল,
বিলম্বের আর কার্য নাই ধেনু লয়ে চল॥

ধবলী, শ্যামলী গাই পালের প্রধান
হারায়ে ধবলীর বাছুর উড়িল পরাণ ॥
গাছে থাক, পাখীগণ, নজর কর দূর,
এই পথে কি যাইতে দেখেছ ধবলীর বাছুর।
দেখেছি দেখেছি বাছুর কালিন্দীর তীরে
গলায় ঘণ্টা পায়ে ঘুঘুর চলেছে ধীরে ধীরে ॥ —ফরিদপুর

কুষাণ গান, কুষাণে

কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রামায়ণ গানকে কুষাণ গান বা কুষাণে বলা হয়। ইহার কারণ একজন মূল গায়েনের পরিবর্তে এখানে লবকুশরূপী দুইটি বালক-গায়েনের মধ্যস্থতায় সমগ্র রামায়ণ কাহিনীটির উপস্থাপনা করা হয়। কুশের নাম হইতেই কুষাণ বা কুষাণে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় লবকুশের কণ্ঠে বাল্মীকি মুনি যে ভাবে রামায়ণ গান যোজনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে শুনাইয়াছিলেন, সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই এখানে তাহা উপস্থিত করা হয়। সুতরাং ইহা রামায়ণ গানের একটি অতি প্রাচীন রীতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পাঁচালী গানের প্রয়োগ-রীতির প্রভাববশতঃ বাংলাদেশের অন্যত্র ইহা পরিবর্তিত হইলেও বাংলার উত্তর সীমান্ত অঞ্চলে ইহার ধারা আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে বলিয়া মনে হয়। ইহাতেও পাঁচালী গানের অনুরূপ একজন বয়স্ক গায়েন থাকেন সত্য, কিন্তু তিনি সঙ্গীতে সাধারণতঃ কোন অংশ গ্রহণ করেন না, বালক-গায়েন দুইটির সঙ্গীত পরিচালনা করিয়া থাকেন মাত্র। বয়স্ক গায়েন বা অধিকারীর হাতে একটি দেশীয় বাদ্যযন্ত্র থাকে, তাহার নাম ব্যানা। ইহা তারযন্ত্র, অথচ ইহা উত্তরবঙ্গের সুপরিচিত তারযন্ত্র দোতারা নহে। বেহালার অভাব ব্যানা দ্বারা অনেকখানি পূর্ণ হয়। গানের দলে দোহার থাকে। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এই গান হয় বলিয়া ইহাকে জাগগানও বলা হয়।

১

বিশ্বামিত্র মুনিবর গাধীর নন্দন।
অযোধ্যা নগরীতে এসে দিলেন দরশন ॥
রাজারে চাহিয়া মুনি লইলেন রাম-লক্ষ্মণ।

সন্দেহ উদিল মনে জিজ্ঞাসে তখন ॥
কোন পথে যাবে বল, দাশরথি শূর।
বিনা বাধায় সাতদিন সহজে বিপদ দূর ॥
এতেক শুনিয়া কুমার উত্তরিল যবে।
বিলম্বে কার্য হইলে বিপদে কে পড়ে ॥ —কুচবিহার

কৃষি-সঙ্গীত

কৃষি সঙ্গীত বা Agricultural song বলিতে বাংলায় স্বতন্ত্র কোন সঙ্গীত নাই। পূর্ব ও উত্তর বাংলার প্রধানত কাতিক ব্রত বা কাতি পূজার গান এক শ্রেণীর কৃষিসঙ্গীত ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে তাহা কৃষির ফসল ঘরে তুলিয়া আনিবার পূর্ববর্তী সঙ্গীত অর্থাৎ Pre-harvest song. কৃষির ফসল ঘরে তুলিয়া আনিবার পরবর্তী কালীন সঙ্গীত, অর্থাৎ Post-harvest song বলিতে পৌষ পার্বণের গানকে বুঝাইতে পারে, তবে পৌষ পার্বণের ছড়াই অধিক প্রচলিত, গানের প্রচলন অধিক নাই। কার্তিক পুজার গন, পৌষ-পার্বণের ছড়া, মাগনের ছড়া ইত্যাদির মধ্যে কৃষিসঙ্গীতের কিছু কিছু রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পাট কাটিবার গান, ধান নিড়াইবার গান, ধান রোপার গান ইত্যাদিও কৃষি-সঙ্গীতের অন্তর্গত। যথাস্থানে ইহাদের প্রত্যেকটি বিষয়েরই পরিচয় ও উদ্ধৃতি পাওয়া যাইবে। নিম্নে কয়েকটি ধান রোপার গান উদ্ধৃত করা হইল। তবে গানগুলির মধ্যে কৃষিকার্যের কথা কিছু নাই।

১

হাঁড়ি তুললাম, বেড়ি তুললাম মধ্যে নিলাম ভাত ;
পরের পুরুষ আশা দিয়ে রুচি হয় না ভাত ;
ঘরেতে শ্বশুর ভাসুর দুয়ারে কুটুম,
কি করে বাহিরাব, শ্যাম, দুপায়ে নেপুর।

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

ঝাঁপ দিব যমুনার জলে, গলে ছুরি লিব বলে,
ও ললিতা, কুথা হে নবীন বংশীধারী। —ঐ

৩

বলেছিলি গো
আমরা বনাই শালার ভাত গো খাব,
দিদি বলে বহিরাল বুখে শেল মারিব। —ঐ

৪

ভাবে গুণে গো আমার দেহ্ হলো শাল গো বাতা,
রাস্তারি মাঝে যেন হয় হে দেখা। —ঐ

৫

আমার বন্ধু হাল করিছে নাল কানালের ধারে,
ও ননদিনী লো, আমি যাব নিজে বাসাম[১] দিতে॥ —ঐ

৬

তালপাতার ছাহুনি ঘর
জল পড়ে ঝর ঝর, ও কুইলাপালে ঘর,
বাধানিকে নিতে আসে জ্বর। —ঐ

৭

কুথা যাচ্ছ, হে বন্ধু, হলম বলম ধুতি পরে,
ছাতাটি ছাড়াব হে বনের বাধকি তলে। —ঐ

৮

রাস্তার মাঝে কোলে লিব,
লোক দেখলে নামায় দিব পাথরের উপরে,
বরণ চলুক ধীরে ধীরে। —ঐ

৯

মরে গেলে আমরা পুঁটি মাছের জনম লিব,
লদির জলে হে শ্যামকে ঝলক দিব। —ঐ

১০

বেলা গেল সন্‌জা ছিলো বন্ধু চল ঘরকে,
বুঝাব তোমার জনকে বন্ধু চল চল ঘরকে —ঐ

---

১ বাসাম: দুপুরে যে খাবার ক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

১১

বুতসুরি ধানের গুড়ি দুইজনে ছানাছানি
এ সময়ে নাহি ভেলী গুড়।
জনমের সম্মতি গেল দূর,
এ সময়ে নাইরে ভেলী গুড়। —ঐ

১২

জল দেখে ভাই খিধা লাইগাছে
তোমার জামার জেবে কি আছে,
জল দেখে······
আমি সিনবো না গা ধোব
তবু তোমার গামছা ভিজাবো। —ঐ

১৩

চারকন্যা পুকুরটি লবঙ্গলতা ঘেরা হে,
ডাল ভাঙ্গে ফুল তোলে বিদেশী ভ্রমর হে। —ঐ

১৪

বহুদিন পরে বঁধু আসিয়াছে ঘরে
বন্ধু, কি আইনাছ আমার তরে
বল বল, বন্ধু, আমায় খুল্যা হে বল। —ঐ

১৫

রান্না ঘরে কাঁদবে বসে ভিজা কাষ্ঠে আগুন দিয়ে
শ্যাম পীরিতি শ্যাম পীরিতি,
রাখ গোপনে কিছুদিন মনে
নইলে গেলে ঝইঙ্গলে যাবে মধু পাবে না,
বহুদিনের ভালবাসা মুখ মিঠাবে না। —ঐ

১৬

আকাশে উড়িল কাওয়া তালপাতার গলি,
এ বন্ধুরা গান জানে করে হে আদর। —ঐ

কৃষ্ণকীর্তন

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সংকীর্তনকে সাধারণভাবে কৃষ্ণকীর্তন বলা যায়; কিন্তু এই সম্পর্কে কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণযাত্রা, কৃষ্ণধামালী এই শব্দগুলিই অধিকতর প্রচলিত। বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে যে প্রাচীন গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নহে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি গ্রন্থের সম্পাদক নিজে দিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গীতিরচনা কৃষ্ণকীর্তন নামে পরিচিত হইতে পারিলেও ইহা লীলাকীর্তন, রস কীর্তন, নাম কীর্তন, ঢপ কীর্তন ইত্যাদি নামেও পরিচিত। ইহারই ধারা অনুসরণ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে কালীকীর্তন রচিত হইয়াছিল। যথাস্থানে ইহাদের প্রত্যেকটি বিষয়েরই পরিচয় ও উদ্ধৃতি পাওয়া যাইবে।

কৃষ্ণধামালী

কৃষ্ণবিষয়ক নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীতের নাম কৃষ্ণধামালী। ইহা প্রধানতঃ উত্তর ও পূর্ব বাংলায় এখনও প্রচলিত আছে। পশ্চিম বাংলায় ইহারই একটি রূপ বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। বস্তুতঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও নৃত্যসম্বলিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত, সুতরাং ইহাকেও যথার্থই কৃষ্ণধামলী বলা যাইতে পারে। ধামালীতে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী স্বর্গীয়তা লাভ করিতে পারে নাই; বরং স্থূল গ্রাম্য রুচির পরিচায়ক হইয়াছে। বৈষ্ণব কবি লোচন দাস কৃষ্ণধামালীর লৌকিক ধারা অনুসরণ করিয়া তাঁহার নাগরীভাবের সাধনমূলক পদাবলী রচনা করিয়াছেন। সেইজন্য অভিজাত বৈষ্ণব পদাবলী বা বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর মধ্যে তাঁহার রচনা স্থান পায় নাই। অনেক সময় কৃষ্ণবিষয়ের পরিবর্তে গৌর-বিষয়ক গানও শুনিতে পাওয়া যায়। নৃত্য ইহার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া এই সঙ্গীতে ভাব-নিবিড়তা প্রকাশ পাইতে পারে না। একটি সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

১

আজ কেন রে যৈবন তুই
মিছে পাগল করিস রে হায়!

ধোপ কাপড়ে কালীর ফোঁটা—
মাধব! যাবে যৈবন, রবে খোটা।
আড়ায় যেমন ময়না রে পোষে,
ও মাধব, ছুটে গেলে আর না আসে।
আড়ায় যেমন ময়না রে পাখী,
ও মাধব, তাই দেখে প্রাণ বেঁধে রাখি॥ —ফরিদপুর।

লোচন দাসের ভণিতাযুক্ত একটি কৃষ্ণধামালী নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইঁহার ধামালীর পদ অধিকাংশই গৌরাঙ্গ বিষয়ক।

২

তুমি যে সই বল মোরে গোরার সঙ্গে আছো।
এ কথা বলিতে মুখে লাজ নাহি বাসো॥
কে ধরিল হাতে নাতে কে ধরিল কোথা।
মিছে পাড়ার লোক সব তুলে নানান কথা॥
না জানি কিছুই আমি আছিনু শয়নে।
বঁধুর মরম কথা কই বুড়ীর সনে॥
চোর চোর বলে বুড়ী উঠিল তরাসে।
নাগর পালায় গুড়ি গুড়ি লোচন বসে হাসে॥

কৃষ্ণযাত্রার গান

ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়বস্তুই যাত্রার একমাত্র অবলম্বন ছিল। এই সম্পর্কে যে সকল বিচ্ছিন্ন নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা সকলই বৈষ্ণব ধর্ম-সম্পর্কিত এবং কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। সেইজন্য কৃষ্ণলীলা-সম্পর্কিত বিষয়-বস্তুকেই কেহ কেহ যাত্রার একমাত্র উপজীব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। অবশ্য এমনও হইতে পারে যে, কৃষ্ণলীলা বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই প্রাচীনতর যাত্রা সমূহ রচিত হইয়াছিল; কালক্রমে রামায়ণ, চণ্ডী ও মনসার পাঁচালী সম্পর্কেও এই রীতি অনুসরণ করা হয়—তাহার ফলেই অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা ও ভাসানযাত্রা সমূহের উদ্ভব হয়।

কৃষ্ণ বিষয়ক যাত্রাসমূহে যথার্থ নাটকীয় উপাদান (Dramatic Element) যে খুবই বেশী ছিল, তাহা নহে; শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন নানা প্রতিকূল ঘটনার

ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই সকল প্রতিকুল ঘটনা সর্বদাই দৈবশক্তি দ্বারা প্রতিহত হইত বলিয়াই ইহারা যথার্থ নাট্যিক গৌরব লাভ করিতে পারে নাই। অতএব যথার্থ নাটক রূপে এই সকল যাত্রার ক্রমপরিণতি লাভ করা সম্ভব হয় নাই। কৃষ্ণযাত্রার অন্যতম প্রধান ত্রুটি—হইতে গদ্য সংলাপের অভাব। সেইজন্য ইহার নাটগীত নামটি যথার্থই সার্থক। সঙ্গীতের পর সঙ্গীতের যোজনার দ্বারা ইহার শিথিল কাহিনী সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইত; কাহিনী ইহার লক্ষ্য ছিল না, রসই ছিল ইহার লক্ষ্য এবং তাহা সৃষ্টি করিবার জন্য যতটুকু কাহিনী অপরিহার্য, কৃষ্ণযাত্রাতে তাহাই শুধু অবলম্বন করা হইত। ইহাও ইহার নাটক রূপে ক্রমপরিণতি লাভ করিবার পক্ষে অন্তরায় ছিল।

তবে একথা সত্য যে, কৃষ্ণবিষয়ক যাত্রার কাহিনীর মধ্যে নাট্যিক উপাদান খুব বেশী না থাকিলেও, মঙ্গলকাব্য-বিষয়ক কাহিনীর মধ্যে যথার্থ নাট্যিক উপাদান ছিল; কৃষ্ণলীলার কাহিনী অপেক্ষা মঙ্গলকাব্যের কাহিনী অধিকতর মানবিক গুণ-সমৃদ্ধ। কিন্তু মনে হয়, স্বাধীন যাত্রার আকারে মঙ্গলকাব্যের কোন কাহিনী আপনা হইতে বিকাশ লাভ করে নাই, কৃষ্ণলীলার অনুকরণে পরবর্তী কালে এই বিষয়ক যাত্রা রচিত হইয়াছিল—সেইজন্য ইহাদের মধ্যে নাট্যিক উপাদান থাকা সত্ত্বেও ইহা যথার্থ নাটক রূপে পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই।

কৃষ্ণযাত্রার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার কাহিনীর ধারায় কোন বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় না, কিংবা কোন নাট্যিক ঔৎসুক্য (suspense) সৃষ্টি করিবারও ইহাতে কোন প্রয়াস নাই। একটানা গীতি-প্রবাহের বৈচিত্র্যহীন পথে ইহার কাহিনী অগ্রসর হইতে থাকে এবং একটি পরিমিত ছেদে আসিয়া ইহা থামিয়া যায়; ইহার গতি নাটকের কাহিনীর মত ক্ষিপ্র নহে, বরং ইহা মাহাত্ম্যপ্রচার-মূলক আখ্যায়িকার মত মন্দগতি। অতএব ইহা দ্বারা কোনদিনই নাটক সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই।

কৃষ্ণযাত্রাকে কেহ কেহ মধ্যযুগীয় ইউরোপের Mystery এবং Miracle Playর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। মধ্যযুগের Mystery ও Miracle Play হইতেই যেমন ইউরোপীয় সাহিত্যে আধুনিক নাটকের সৃষ্টি হইয়াছিল, বাংলা দেশের কৃষ্ণযাত্রাও ক্রমে আধুনিক নাটকে পরিণতি লাভ করিয়াছে, একথা কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। মধ্যযুগের ইউরোপে Renaissanceএর ভিতর দিয়া প্রাচীন কুসংস্কারের সহস্র নাগপাশ হইতে

মুক্তিলাভের ফলে তাহার আত্মবোধের যে আনন্দ জাতীয় জীবনের সকল দিকেই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার নাট্যসাহিত্যের ভিতর দিয়াও তাহারই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বাংলা দেশ ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে আসিবার পরও সমগ্রভাবে যে প্রাচীন সংস্কারের সর্ববিধ দাসত্ব হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, তাহা কিছুতেই মনে হইতে পারে না। অর্থাৎ ইউরোপীয় সমাজের মত সর্বতোমুখী Renaissance বাংলার সমাজে আজিও দেখা দেয় নাই; অতএব অর্থহীন প্রাচীন সংস্কারের দাসত্ব-বন্ধন হইতে তাহার সম্পূর্ণ মুক্তি এখনও আসে নাই। সুতরাং যে ব্যাপক সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে ইউরোপের Mystery ও Miracle Play সমূহ নাটকে পরিণতি লাভ করিয়াছে, এই দেশে তাহার অনুরূপ পরিবর্তনের অভাবে ইহার কৃষ্ণযাত্রাপ্রমুখ ধর্মবিষয়ক রচনা নাটকে রূপান্তরিত হইতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম যে নাট্যরচনা আবির্ভূত হইল, তাহা প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী হইতেই কৃষ্ণযাত্রার মধ্যে নূতন উপাদান প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়া ইহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লুপ্ত করিয়া দেয়। ধর্মভাবের বিকাশই কৃষ্ণযাত্রা সমূহের লক্ষ্য ছিল; কিন্তু এই সময় হইতেই কৃষ্ণযাত্রায় ধর্মভাব হ্রাস পাইতে থাকে। ইহা অবশ্য যুগ-চেতনার ফল বলিতে হইবে। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতচন্দ্রের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ধর্মবিষয়ে শৈথিল্যের ভাব দেখা দিয়াছে এবং ইহার পরবর্তী কাল হইতেই, বিশেষতঃ একদিকে ভারতচন্দ্রের সর্বব্যাপী প্রভাবের ফলে এবং অন্যদিকে প্রাচীন ধর্মাশ্রিত সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বসিয়া পড়িবার জন্য, যাত্রা হইতেও এই ভাব বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। তখন হইতেই কৃষ্ণযাত্রার মধ্যে সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে গদ্য-সংলাপ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। এই সংস্কার বিষয়ে যিনি অগ্রদূত, তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই বীরভূম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার নাম পরমানন্দ অধিকারী। তিনি 'কালীয়দমন যাত্রা' লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যদিও তাঁহার রচনার পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয় নাই, তথাপি জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার মধ্যেই সর্বপ্রথম একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন বৈষ্ণব গীতির পরিবর্তে নাট্যিক

ক্রিয়া (dramatic action) এবং সংলাপ (dialogue) প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। তারপর খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বিদ্যাসুন্দর এবং নল-দময়ন্তীর কাহিনী অবলম্বন করিয়া নূতন যাত্রা রচিত হয়।

কৃষ্ণযাত্রা আনুপুর্বিক সঙ্গীতে রচিত। সকল সঙ্গীত উদ্ধৃত করা অসম্ভব। নিম্নে কয়েকটি মাত্র বিচ্ছিন্ন ভাবে উদ্ধৃত করা হইল। প্রথমেই বন্দনা শুনিতে পাওয়া যায়—

১

কে মা সরোজ উপরে কে মা শোভা করি বাগ্‌বাদিনী।
আমরা কি হেরি রূপের মাধুরী,
মাগো হেরিলে সেই পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রে চন্দ্রে ভয়হারী
ও বর্ণনা করিতে বর্ণ, বর্ণমালা সকল বর্ণ হয়
মরি হায়,
মাগো, সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণে বর্ণে ভয় হারি। —কাঁঠালী (বাঁকুড়া)

২

তাপিত তনয়ে তার মা তারিণী,
মাগো, আমি নিগু'ণ ছাওয়াল, অধম চণ্ডাল,
মা, তোর ভজন সাধন কিছুই না জানি।
শ্রীবশিষ্ঠ মুনি আর রাজা রামকৃষ্ণ
যে যে ভক্ত তোমার ছিল মা উৎকৃষ্ট
মা গো, তা সবা অদৃষ্ট হয়েছে উৎকৃষ্ণ
এই নিকৃষ্ট তনয়ের কি হবে জননী।
(মাগো) বিদ্যাভাবীগণে, দাও মা বিদ্যাভার
পশ্বাচারীগণে দাও মা পশ্বাচার
বিলাসাচারীগণে দাও মা বিলাসাচার
এই জ্ঞানহীন কণ্ঠের কি হবে জননী। —ঐ

৩

আর রে ভাই জীবন কানাই যাই গোচারণে,
ও তোর চোরা ধেনু ভাই শ্যামলী ধবলী গেল রে দূরে।
কানাই, তুই না গেলে ও তোর ধেনু সকলে

চঞ্চল হতেছে মোহন বেণু না শুনিলে।
ওরে তুই চোরা তোর ধেনু চোরা ভাই,
হাঁক মানে না তো বিনে।
কানাই—তুই মায়ের কোল পেয়ে আছিস নিশ্চিন্ত হয়ে,
গোষ্ঠে যাবার কথা কি ভাই গেলি ভুলিয়ে,
তোর বলাই দাদা আদি করে ডাকছে সব রাখাল গণে।

—ঐ

৪

ও রোহিণী ধর রোহিণী ধর গো।
তোর বলাই বারণ কর গো দিদি বলাই বারণ কর গো,
কাল গোষ্ঠ হতে যেমনি আমার গোপাল এল ঘর গো,
অমনি বাছা ঘুমিয়ে গেল খেল না ক্ষীর সর।
কাল বাছারে লয়ে বলে হারিয়ে ছিল খেলার পণে
চেপেছিল গো জনে জনে স্কন্ধের উপর।
আসছে মত্ত বারণের মত উহায় বারণ কর গো
বলরামেতে দেখে গোপাল কাঁপিছে থর থর।

—ঐ

৫

গোপাল, সত্য কথা বলবে মাকে,
অসীম ব্রহ্মাণ্ড অতুল এ কাণ্ড
আমি ব্রহ্মাণ্ড দেখি তোর মুখে।
এই বদনে তোর নানাবিধ নারী
নানা দেশে গ্রাস নানাবিধ বাড়ী
কত ছুটেছে হস্তি, হয়, নানাবিধ গাড়ী
ওরে উড়িছে ধূলা উর্ধ্ব মুখে।
বাপরে, সত্য কথা বলবে মাকে।
এই বদনে তোর দেখি বিষ্ণুময়—
বিষ্ণু করেন পূজা বিষ্ণু পদদ্বয়।
কত দেবালয় শিবালয় আর ইন্দ্রালয়
আমি কেন রে দেখি তোর মুখে,

গোপাল সত্য কথা বলবে মাকে।
এমন বিদ্যা কোথায় শিখলি, যাদুমণি,
ইন্দ্রচন্দ্র দেখি আর দিনমণি
এ মহীমণ্ডলে যত আছে প্রাণী—
আমি সকলই দেখি তোর মুখে।
বাপরে, সত্য কথা বল মাকে।
এই বদনে তোর মৃদু মৃদু হাসি,
ঐ বদনে দেখি গয়া-গঙ্গাকাশী,
নানা তীর্থ সহ তীর্থ বারাণসী;
আমি সকলই দেখি তোর মুখে।
গোপাল, সত্য কথা বলবে মাকে।
এই বদনে তোর মেষমহিষ, গোপাল,
গোচারণ করছে কত তোর মত রাখাল,
তাদের কারো হাতে বাড়ি, কারো আঁচলেতে মুড়ি
কেউবা সারের ঝুড়ি লয়ে কাঁখে,
গোপাল সত্য কথা বলবে মাকে। —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৬

ও হে নারায়ণ, দাসীর এই নিবেদন জানাই তোমারে।
কৃপাময় লক্ষ্য করে রক্ষা কর সুধাংশুরে জানাই তোমারে।
রাহুগ্রাসের ভয়ে শশী কেঁদে বেড়ায় দিবানিশি হয়ে উদাসী।
বিপদ কালে কালশশী যুগল পদ দাও হে শিরে জানাই তোমারে।
কোথা, হে করুণাসিন্ধু, ভয়ে ম্লান হতেছে ইন্দু ও বিপদ-বন্ধু।
প্রকাশিয়ে কৃপাবিন্দু বিভাবরী কাতরস্বরে জানাই তোমারে।

—কাঁঠালি (বাঁকুড়া)

৭

ওগো কার তরে,
(ও) কমল করে মালা গাঁথ রাই।
যার জন্য গাঁথিছ মালা
তারে যে হারাই, গো রাধে।

(ও) একজনা যে অক্রূর সাথে
এসেছেন এই ব্রজধামে
নন্দের কানাই গো রাধে
মালা গাঁথ রাই। —ঐ

৮

(ওরে) যোগী যোগে যারে না পারে জানতে,
(ওরে) যোগী রাজারাণী কত বল মন্দ বাণী
অমনি ক্রোধে নন্দ রাণী চলিলেন রাঁধতে
হায়রে দেব দিয়ে পায় না যারে তুলসী চন্দন,
মায়ের কাছে তিনি করছেন ক্রন্দন।
সামান্য পুত্র জ্ঞানে যারে রাণী যান করিতে বন্ধন
ত্রিজগত বাঁধা যার চরণ প্রান্তে।
স্বয়ং বিষ্ণু যিনি গোকুলে গোবিন্দ
বৃন্দাবনের বনে চরাতেন গো বৃন্দ,
যার মায়া পাশে ত্রিজগৎ বন্ধ
তিনি বন্ধন ভয়ে পালান কাঁদিতে কাঁদিতে। —ঐ

৯

মাগো, খুলে দে বাঁধন, মা, সইতে নারি,
বেঁধে কি করে আছ, মা, ধৈরয ধরি ॥
কি ছার নবনীর তরে বেঁধেছ মা দুটি করে
শপথ করে বলি আমি আর করব না চুরি ॥ —ঐ

১০

আজ কেনে প্রাণাকুল হলো বলো সখীগণ গো—
থর থর কাঁপিছে আমার পরাণ গো, —ঐ

১১

ঘোষণা দূত নগরে নগরে ইহা বলি,
ওরে লয় না যেন কোন জনে হরিনাম বলি,
নিষেধ যদি না মানে, মত্ত হয় হরি নামে,
তারে আনিয়ে শ্যামা মায়ের স্থানে দেহ নরবলি। —ঐ

১২

কৃষ্ণযাত্রার গানে কখনও কখনও উমাসঙ্গীতও শুনিতে পাওয়া যায়—

ওরে জীবন উমারে···
আজি কেন আমারে লজ্জা দাও ভূষণ জন্য।
আমি নির্গুণ সন্ন্যাসী আজন্ম উদাসী
শ্মশানবাসী দশা দৈন্য।
বর্ণ ভূষা—আমার চাও গো শবাসনা
ভিখারী ঘরে বল কোথা পাব সোনা।
আমার সবে মাত্র—সোনা তব উপাসনা
সোনাতে বাসনা শূন্য।
অন্ন বিনে অমি খাই সিদ্ধ ঘুটা।
বস্ত্র বিনে আমার বাঘাম্বর আঁট।
তৈল বিনে আমার মস্তকেতে জটা।
তাই তো সকলে করে অমান্য।
ওরে, জীবন উমারে···। —ঐ

কৃষ্ণলীলা

রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তন কৃষ্ণলীলার গান নামে পরিচিত। কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে ইহার প্রধান পার্থক্য এই, কৃষ্ণযাত্রায় বিভিন্ন চরিত্রগুলি রূপসজ্জা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়, কিন্তু কৃষ্ণলীলা প্রধানতঃ কীর্তন গান, তাহাতে রূপসজ্জার প্রয়োজন হয় না। একজন কীর্তনীয়া এক একটি পালা সম্পূর্ণ গাহিয়া থাকে। পদকীর্তন কিংবা পদাবলী কীর্তনের সঙ্গে ইহার পার্থক্য নাই। প্রধানতঃ যাহাকে লীলাকীর্তন বলে কৃষ্ণলীলা তাহাই। ঝাড়খণ্ডী কীর্তন বা ঝুমুরের কয়েকটি প্রধান বিভাগের মধ্যে কৃষ্ণলীলা-ঝুমুর অন্যতম। ঝুমুর প্রসঙ্গে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

১

সরমেতে গো মরি বঁধুর তরে
মরমেতে গো মরি কালার তরে,
আজকে সই সন্ধ্যাবেলা
কুলে কালি গো দিল নন্দলালা।

অধরে চুম্বিল কালা যমুনার তীরে
রতি চিহ্ন দিল আঁকি,
রাখলো না গো সে আমার কিছুই বাকি।
যে কথা বলব ডাকি বলব কাহারে
চরণে চরণে ছাদি
বাহু ডোরে গো আমায় রাখল বাঁধি।
সরমে সরমে কাঁদি কাঁদি গো মরি,
কাল সন্ধ্যা হইল কি কাল,
বিপিনের গো সখী ভাঙ্‌ল কপাল।
হইল কি জঞ্জাল সখী কপালের ফেরে।

—কাঁঠালী (বাঁকুড়া)

২

সেদিন তোমার মেলার মাঝে,
দেখলাম অপরূপ সাজে,
সেদিন হতে হিয়ার মাঝে যতনে রেখেছি।
আমি তোর তরে, ও প্রাণ
সজনী, উতলা হয়েছি।
দিন কাটে তোমার ধেয়ানে
রাত কাটে মধুর স্বপনে,
তোমায় সই সঙ্গোপনে নয়নে রেখেছি।
পতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপ দিতে চায় প্রাণে প্রাণে
আমি তেমনি তোমার প্রেমে মরিতে বসেছি,
যা হবে হোক আমার ভাগ্যে তোমার প্রেমের অনুরাগে
বিপিন বলে তোমার লাইগ্যে সব কিছু ভুলেছি। —ঐ

৩

সখী কে জানিত ভাবেরই এত জ্বালা,
কে জানিত বিষের পাত্র দিবে চিকন কালা।
অমৃত মন্থনে বিষ উঠিবে বলিয়া,
কে জানিত সুধার পাত্র হবে বিষের পেয়ালা।

কুসুম কুঞ্জে কাল ভুজঙ্গে বেঁধেছ বাসা,
সে ভুজঙ্গ কাল হইল মোর হইল গলার মালা।
প্রেম নদীতে চড়া বালু আছে কে জানিত,
কে জানিত সে বালুতে সাঙ্গ হবে খেলা।
প্রেমের পথ কুসুমিত বিপিন ভেবেছিল,
কে জানিত সে পথ, সই, শ্বাপদ-সংকুলা। —ঐ

৪

চঞ্চল হইল মন আঁখি ছল ছল,
কালায় ভাবি জ্বালায় মরি।
অঙ্গ হইল কাল হে শ্যাম বাসিলে না ভাল।
কাঁদিতে ভাবিতে আমার বিফলে দিন গেল,
মনের আশা প্রেম পিয়াসা কিছু না মিটিল, হে শ্যাম।
বিষে অঙ্গ জর জর খেয়েছি গরল,
শেল বাজে হৃদয় মাঝে গেল জীবন গেল হে শ্যাম,
দুঃখের কথা কারে বলি কেহ না বুঝিল।
বিপিন ভণে কাজ কি প্রাণে মরণ ভাল ভাল হে শ্যাম। —ঐ

৫

প্রথম পিরিতির কালে আর মনে নাই কি বলেছিলে হে,
ভুলিব না কোন কালে কি ভুলিলে হে আজও।
তোমার ভালবাসায় কি কাজ? ফিরে যাও হে দাগাবাজ,
বাজে আসি এমন প্রেমে আর বাজে আসি এখন জেনে হে।
করব না প্রেম তোমার সনে তোমার নাই হে বঁধু লাজ।
জোড়া যায় না এ ভাঙ্গা মন, আর কেন কর জ্বালাতন হে,
শুনব না মধুর বচন, মন হইতেছে নারাজ,
চুপি চুপি আর এসো না মুচকি হাসি আর হেসো না হে,
বিপিন বলে পালঙ্কেতে তুমি বসনা হে রসরাজ। —ঐ

৬

জানলাম তোমার প্রেমের সখা, আজকাল কেন দাও না দেখা
আগের ভাব আর নেই হে তোমার, ভুলিতে বসিছ,

তোমায় জানা গেল হে বঁধু অন্তেতে মজেছো।
আগে কত আসতে যেতে মিলিতে জ্যোৎস্না রাইতে
অন্য রকম স্বপন এখন এই পথ ভুইলেছ।
দিতে হে শাড়ী উপহার আর কত হিমানী পাউডার
আজকাল কিছু দাও না হে আর, পর আমায় কইরেছ।
আজকাল কোথাও দেখা হলে কথা বল কথার ছলে,
ভালবাসা এই কি বঁধু বিপিনে দিয়েছো। —ঐ

৭

প্রভাতে হে নাথ করিয়া চকিত
হইলে উদিত হইলে কেন হেথা।
তোমারো সময়ের দাম আছে কি পাষাণ
আছে কি হে মান-মানবতা।
করি আঁধার বাসর রাধার
নিশীথে নাগর ছিলে কোথা ?
ঐ কপালের সিন্দুর দেখিয়ে বন্ধুর
রক্তসিন্দুর চিহ্ন কেন আঁকা ?
তোমার চোখের কাজল অধরে কে দিল ?
বল বল কালো সত্য কথা,
সে ভাগ্যবতী নারী পীতবাস করি
নিল বাস হরি দিল কেবা,
বল ছিলে কার সঙ্গে মিলি নবরঙ্গে
এলে অঙ্গে রতি-চিহ্ন আঁকা।
তোমার নবরূপরাশি হেরি কাল শশী
হাসা হাসি মোরা করি হেথা,
বঁধু, তুমি জেনে শুনে শ্রীরাধার প্রাণে
কাঁদালে বিপিনে দিলে ব্যথা। —ঐ

৮

রজনী করিয়া ভোর ঐ আসে গো মনোচোর
ঘুমে ঢুলু ঢুলু ধীরে ধীরে গো ফিরে যেতে বলবে নাগরে

সে রসরাজ দাগাবাজে হেরব না আর কুঞ্জ মাঝে
ভাসে নয়ন দুঃখের সাগরে যার তরে সেই এমন দশা,
তার সঙ্গে কি ভালবাসা আশা ও নিরাশা পাগল করে গো।
সে নিলাজ লম্পট বটে ধেনু চরায় গোঠে মাঠে
তার সঙ্গে প্রেম করে বিপিন মরেলো।　—ঐ

৯

এখন বেঁধ না বাহু ডোরে, বঁধু হলো যে নিশিভোর।
ঐ অরুণ নয়ন মেলি, আসে কুঞ্জের দ্বার খুলি গো,
মধু পানে বঁধু অলি দেখা হইল বিভোর।
আজ এ বাসরের খেলা আর কর সাঙ্গ হইল বেলা গো।
দাও খুলে এ বাঁশী মালা খুলে দাও হে বাহু ডোরে,
হবে লোকে জানাজানি আর রটিবে নাম কলঙ্কিনী হে।
পোড়ারমুখী কুল মজালি লোকে বলিবে মন চোর ;
তোমার তরে মালা গাঁথি আর আসব ফিরে হলে রাতি হে,
সরসে হরষে মাতি বিপিন হইবে প্রেমে বিভোর।　—ঐ

১০

সুবলের সনে বিপিন কাননে খেলিছে বিনোদ খেলা,
আনিয়া সুবল চম্পকের দল গাঁথে মনোহর মালা।
মালা করি কর বলে ধরো ধর লো প্রাণের ভায়া,
চম্পকের দাম অতি অনুপাম শ্যাম গলে দিল দিয়া।
কহে গিরিধরে একি রে একি রে প্রমাদ ঘটালি বনে,
তুষের অনল জ্বালিলি সুবল রস জাগাইল মনে।
যাও যাও ভাই আন গিয়ে রাই ব্যাকুল হইলেন হরি,
যদুনাথ বলে রাই না হইলে বিরহ দহনে মরি।　—ঐ

১১

চম্পকের দাম হেরি রাধা রাধা রব করি ভূমিতলে গড়াগড়ি যায়।
আশ্রিত কমল মুখ দেখিয়া বিদরে বুক সুবল করিছে হায় হায়,
দিবসে কেমনে যাব বনে রাধা কোথা পাব অনুচিত কথা বল ভাই।
রাজার নন্দিনী তারে বনে কে আনিতে পারে কেমন সাহসে তথা যাই,

ক্ষমা দে ভাই নিজ মনে, দিবসে আসিবে কেনে সাধ্যি নাই রাধা আনিবার।
ধাইয়ে সুবলের পায় গোবিন্দ ধরিতে যায় রাধা বিনে জীবন সংশয়।
ধেয়ে ধরি ছুটি হাতে বসালেন যদুনাথে যদুনাথ দাসে রস কয়॥ —ঐ

১২

প্রেম জলে ডুবু ডুবু লোচন তারা,
তারা ডুবয়ে রইল গো,
পতিপদের চাঁদের তারা ডুবে যে রইল গো।
না বুঝে তুই গেলি রসাতলে। —ঐ

১২

বঁধু তোমারই বদন যুগল শেখর শুনাইতে রাধা নাম,
বল বল তার রূপটি কেমন?
নাম সুমধুরও এখন শুনিতে বাসনা হয়েছে মনে।
বল বল তার রূপটি কেমন? —ঐ

খ

খণ্ডগীতি

সংক্ষিপ্ত ভাবমূলক সঙ্গীত মাত্রই খণ্ডগীতি বা lyric song বলিয়া পরিচিত। সুদীর্ঘ আখ্যানমূলক গীতির তুলনায় ইহারা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, একটি মাত্র ভাব এবং প্রধানতঃ প্রেমমূলক ভাব অবলম্বন করিয়াই ইহারা রচিত হইয়া থাকে। আধুনিক বাংলার গীতিকবিতা যে ইহাদেরই ধারায় বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, আধুনিক গীতি-কবিতা রচনার মূলে পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক গীতিকবিতার প্রভাবই সক্রিয় ছিল। তথাপি বাংলার প্রচলিত খণ্ডগীতির ধারা অনুসরণ করিয়া আধুনিক সাহিত্যের প্রথম যুগের কয়েকজন কবি বিশেষতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং এমন কি, মাইকেল মধুসূদন দত্তও তাঁহাদের কিছু কিছু গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন। পশ্চিম বাংলার ঝুমুর ও খেমটি, উত্তর বাংলার ভাওয়াইয়া এবং পূর্ব বাংলার ঘাটুগান খণ্ডগীতির অন্তর্গত। যথাস্থানে ইহাদের উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে।

খণ্ডিতা

বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুযায়ী এক শ্রেণীর নায়িকাকে খণ্ডিতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তাহার লক্ষণ এই —

'নায়কের অঙ্গে দেখি কামচিহ্ন যত।
অধর মলিন রাঙা নয়ন বেকত ॥
চিবুকে দশনচিহ্ন সিন্দূর মণ্ডিত।
নায়িকার কজ্জলে বদন বিভূষিত ॥
হৃদয়ে যাবক রঙ্গ হার অঙ্গ উরে।
পরিধান নীলশাড়ী আঁখির জাগরে ॥
জাগিয়া সঙ্কেত দেশে নায়িকা দুঃখিতা।
নায়কেত কোপ করে সেই সে খণ্ডিতা ॥' —রসকল্পবল্লী

পশ্চিম সীমান্তবর্তী বাংলার ঝুমুরগানে খণ্ডিতা নায়িকার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া অসংখ্য লোক-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। রসশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী

কিছু কিছু উপকরণের ইহাদের মধ্যে সন্ধান পাওয়া গেলেও অধিকাংশ লৌকিক উপাদানেই ইহাদের চিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে। এখানে কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখ করা যায়—

১

কি রীতি কুটিল কালিয়া তব
ও বঁধু. বল বল কেন সকালে হে ;
গত নিশি বধূ কারই আবাসে
জেগেছিলে, বঁধু, কাহার আশে হে !

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

কোন রমণী প্রণয় ফাঁদে,
ভুলাইয়েছে কালাচাঁদে,
বুঝি আমার প্রাণে দিয়ে অবহেলা গো,
এলো না লম্পট কালা। —ঐ

৩

ময়ূর ময়ূরী যথা নৃত্যগীত করে,
তারা ত তাদের রোদন শুনে মন কেমন করে গো ;
এলো না লম্পট কালা ! —ঐ

৪

হের লো সজনী ভেল প্রভাতী শীতল সমীরে শিহরে অতি
দোলে তরুপাত, ডাকিছে বিহঙ্গ জাগিয়া।
সুন্দর সিন্দূর রাশি লো যেমন শ্যামাঙ্গী বসুধা-সীমন্তে শোভন
তরুণ অরুণ কিরণ দিল ঢালিয়া,
এখনো না এলো কালিয়া লম্পট বনমালিয়া ॥
সরোবরে যায় কুলবালাগণ নিশা জাগরণ অলস নয়ন,
চঞ্চল চরণ ঘুমঘোর যায় টলিয়া।
ভ্রমর নিকর মধুপান তরে নলিনী কানন অন্বেষণ করে
গুন্ গুন্ স্বরে মনপ্রান লয় কাড়িয়া ॥
অস্তাচল গত রজনীরঞ্জন কুমুদিনী করে নীরবে রোদন,

যায় আঁখিনীরে নিশির শিশির ভাসিয়া।
চকোর-চকোরী বসি দুঃখমনে চক্রবাক সুখী পিয়ার মিলনে
পতি দরশনে জাগে কমলিনী হাসিয়া॥
যাও সহচরী থাক দ্বারদেশে যদি সে কপট আসে নিশাশেষে
বলিও সরোষে, 'যাও হেথা হতে চলিয়া।'
যায় ভাল তবু থাকে কিছু মান, নহে প্রতিশোধ করো অপমান
নহে সুবিধানে কহে ভবপ্রীতা ভাবিয়া। —পুরুলিয়া

৫

কত নিশি গেল বিফলে হে,
কোনখানেতে তুমি আছিলে হে॥
ও সুন্দর কালিয়া বঁধু
যদি তুমি আর রমণীর সনে
প্রেমেতে সদাই মজিলে হে॥
তবে কেন আর আমারে তুমি ঘরের বাহিরে করিলে হে।
ও সুন্দর কালিয়া বঁধু॥
—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৬

ও কালা রে কার সঙ্গেতে কাটাইলে এ রাতিয়া।
সারা নিশি আমি জাগি, ও বঁধু, তোমার লাগি,
তুমি কার সঙ্গেতে কাটাইলে রাতিয়া॥
অবলার কেন বুকে শেল দিলা,
অবলারে কেন কাঁদাইলে হে,
ও বাঁকা শ্যাম কার সঙ্গেতে কাটাইলে রাতিয়া॥ —ঐ

৭

হেসে হেসে বল্‌লে এসে কেবা ডেকেছে।
উঠে যেতে বল্‌গে তোদের মনের নাগরকে॥
উঠে যেতে বল্‌গে তোদের নিলাজ নাগরকে॥ —ঐ

খেউড়

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার সমাজ-জীবন যখন রাজ-সভা হইতে সাধারণ লোকের গৃহাঙ্গন পর্যন্ত নানা ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে বিকৃত রুচির পরিপোষক হইয়া উঠিয়াছিল, তখন কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর অঞ্চলের এক শ্রেণীর শ্লীলতাহীন লোক-সঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই খেউড় বা খেড়ু নামে পরিচিত। এই খেউড় গানকেই পরিশোধিত করিয়া পরবর্তী কালে আখড়াই ও টপ্পাগান রচিত হইয়াছিল। নদীয়া ও শান্তিপুরের খেউড় জনসাধারণের মধ্যে সে যুগে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ, ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে সুন্দরকে বিবাহের পর নিজের কাছে ধরিয়া রাখিবার জন্য বিদ্যা নদীয়া ও শান্তিপুরের খেউড়গান শুনাইবে বলিয়া প্রলোভন দেখাইতেছে—

নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥

আখড়াই, টপ্পা ও ক্রমে কবিওয়ালার গান প্রচারিত হইবার পর হইতে খেউড় গান অপ্রচলিত হইতে আরম্ভ করে; ইহার কিছু উপকরণ কবি ও তর্জাগানের মধ্য দিয়া কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করিয়াছে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংগ্রহ হইতে নিম্নে কয়েকটি খেউড় গান উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

১

মহড়া : কেন ওরে প্রাণ, প্রাণ রে, হয়েছ এমন।
কি ভাবেতে ঢল ঢল, কি রসেতে টল টল,
তায়, খল খল হাস কি আভাস,
ওরে প্রাণ, প্রাণরে, খল খল হাস, কি আভাস,
আবার ছল ছল দেখি দু'নয়ন।

চিতেন : এসেছি আশাতে পেয়ে দুখ।
সদয় হও, একবার কথা কও, প্রাণ রে, তুলে বিধুমুখ॥
হবে প্রেম-যাগ নবরাগ, অনুরাগ দেখি তার।
বল ধনি, কেন মুখের ধ্বনি হয় না গো প্রচার॥
ক্ষুধিত অতিথি আমি বঞ্চিত করো না।

ওরে প্রাণ রে প্রাণ আমার, বঞ্চিত করো না ॥
আমায় প্রেম-সুধা কর বিতরণ ॥ —২৪ পরগণা

২

মহড়া : মাগ বলে আমায়, একি দায়, সুপাদ গোছালে।
মস্তরাম বাবাজী হয়ে, আমারে চাও কর্তে বিয়ে,
তোমার সোহাগিনী বোন্ ফেলে ॥
চিতেন : ঢল ঢল টল টল খল খল হাস।
ছল ছল কেন চক্ষে জল শুন তার আভাস ॥
ধোরে অতিথ বেশ এলে শেষ কর্তে প্রেম-যাগ।
মাথায় জটা তার কপ্নি আঁটা তুলসী বনের বাঘ ॥
আমি মৌনবতী, নবীনে যুবতী, একি জ্বালা হোলো,
কথা কওয়ালে আজ কোন ছলে। —ঐ

৩

মহড়া : মৌনব্রত আজ প্রাণ রে ভেঙ্গে গেল প্রাণ।
মৌনবতী রসবতী, হাসিয়ে বলেছ পতি,
সাধের পীরিতি যুবতী, ওরে প্রাণ, প্রাণ রে সাধের পীরিতি,
যুবতী, আমায় বরমালা তবে কর দান।
চিতেন : বল না ছিল না কেন আর।
বচনে গেল এক্ষণে, প্রতিজ্ঞা তোমার ॥
ডাকো পুরোহিত, কর হিত, সুবিহিত হবে যশ।
রব বশে, তোমার নবরসে, করবো শত যশ ॥
যতনে রাখিব তোমায় হৃদয় নিবাসে।
ওরে প্রাণ রে প্রাণ আমার হৃদয়-নিবাসে।
যাবে প্রেম ক্ষুধা কো'রে-সুধা পান।

৪

মহড়া : তুম্বনাড়া রোগ, বিষম রোগ, স্বভাব গেল না।
তিলক কুতলি ঝুলি ধরে, তুলসীতলায় বেড়াও ঘুরে,
তোমার বোনমেগো নাম ঘুচোল্ না ॥
চিতেন : যা বল তা বল আমায় বেজার হব না।

এই আপ্‌শোষ, তোমার বোনের দোষ দেখেও দেখ্‌লে না।
পেট্‌কো মুলুক চাঁদ পেতে ফাঁদ, বোনকে কল্লে বশ।
জেলের হাঁড়ি সেই করে রাঁড়ি, জানে কত রস॥
বকা ধার্মিক হয়ে রয়েছে বসিয়ে ঘরে মজা মেরে।
তুমি ধর্ম পানে চাইলে না॥ —ঐ

খেম্‌টি

পশ্চিম সীমান্ত বাংলা বিশেষতঃ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অংশে পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলার কোন কোন অংশে খেম্‌টি নামে পরিচিত এক শ্রেণীর নৃত্যব্যবসায়িনী আছে। তাহারা নানা লৌকিক উৎসবে ও পার্বণে কিংবা গ্রাম্য মেলার বাৎসরিক অনুষ্ঠানে নৃত্যসংবলিত সঙ্গীত পরিবেষণ করিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। যৌবন উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তাহারা সাধারণতঃ তাহাদের কোন গুণমুগ্ধ সঙ্গীত-রসিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্বাভাবিক সংসার-যাত্রা নির্বাহ করে। নৃত্যের সঙ্গে ইহারা যে সঙ্গীত পরিবেষণ করে তাহা সাধারণতঃ খেম্‌টি গান বা খেম্‌টি নাচের গান বলিয়া পরিচিত। ইহাদের গানের ভিতর দিয়া প্রেম বিষয় ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না; এই প্রেম কখনও লৌকিক প্রেম, কখনও বা রাধাকৃষ্ণের দিব্য প্রেম। লৌকিক প্রেমও রাধাকৃষ্ণের দিব্য প্রেমের স্পর্শে পবিত্র হইয়া উঠে। ইহাদের ব্যবহারের মধ্যে যে কদর্যতা কিংবা দুর্নীতির স্থানই থাকুক না কেন, ইহাদের পরিবেষিত সঙ্গীতের ভাবে কোন কদর্যতা নাই; কারণ, প্রকৃত প্রেমের বিষয় সর্বদাই সাত্ত্বিক এবং সকল প্রকার ক্লেদ হইতে মুক্ত হয়। ইহাতেও তাহাই দেখা যায়।

খেম্‌টি যখন তাহার একক নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেষণ করে, তখন কোন কোন সময় একজন পুরুষ তাহার সঙ্গে সঙ্গীতে সহযোগিতা করে। সে 'রসিক' বলিয়া পরিচিত। নৃত্যের তালে সাধারণতঃ ধাম্‌সা ও শানাই বাজিতে থাকে; কখনও কখনও ঢোলের বাদ্যও শুনা যায়। আর কোন বাদ্যযন্ত্র থাকে না। খেম্‌টি নাচের গানগুলি ভাবমূলক খণ্ডগীতি, আখ্যায়িকাগীতি নহে। ভাবের গভীরতার দিক দিয়া ইহাদের সঙ্গে পূর্ববাংলার অন্যতম নৃত্যসম্বলিত গীত ঘাটু গানেরই তুলনা হইতে পারে।

এই অঞ্চলের খেমটি নাচ সংলগ্ন বিহার প্রদেশের লোক-নৃত্যের প্রভাবের ফল হইলেও খেমটি নাচের গান বাঙ্গালীর নিজস্ব লোক-সঙ্গীত; কারণ, বিহারী খেমটির নাচ থাকিলেও তাহার সঙ্গে যে গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা খেমটির নিজস্ব গীত বা নারীর সঙ্গীত নহে, বরং পুরুষের সঙ্গীত, তাহাকেও প্রকৃত সঙ্গীত বলা যায় না—ছড়ার ধর্মই তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু পশ্চিম সীমান্ত বাংলার খেমটি গানের যে বিশেষত্ব দেখা যায়, তাহা বাংলা লোক-সঙ্গীতেরই নিজস্ব বিশেষত্ব।

বিহারের কোন কোন অঞ্চলে বিশেষতঃ ছোটনাগপুর বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে নাচ্‌নী নামে পরিচিত এক নৃত্য ও গীত-ব্যবসায়িনীর সম্প্রদায় আছে, কিন্তু খেমটি হইতে তাহারা স্বতন্ত্র। নাচ্‌নীরা প্রথম হইতেই এক একজন গঞ্জু (ক্ষুদ্র ভূস্বামী)-র পারিবারিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, কিন্তু খেমটি যতদিন তাহার ব্যবসায় করে, ততদিন সকলের নিকট হইতেই অর্থের বিনিময়ে ব্যবসায় করিয়া থাকে, সে তখন কোন পরিবারের সম্পত্তি নহে, সাধারণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িনী মাত্র। তবে নাচ্‌নীরা সাধারণতঃ বাঙ্গালীই হইয়া থাকে।

পুরুলিয়া জিলার বাঙ্গালী নাচ্‌নীদিগের মধ্যস্থতায় বাংলা গান ছোটনাগপুরের রাঁচী ও পালামৌ জিলায়, উড়িষ্যার গাংপুর মধ্যপ্রদেশের যাশপুর প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত প্রচার লাভ করিয়াছে। এই সকল অঞ্চলের গঞ্জুগণ মানভূম জিলার প্রধানতঃ পশ্চিম অঞ্চল হইতে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী নর্তকী সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই বাঙ্গালী নর্তকীদিগের জীবনেতিহাস বড়ই বিচিত্র। পুরুলিয়া জিলার নিম্নশ্রেণীর কোন ব্যক্তির গৃহে যদি কোনও বালিকা দেখিতে একটু সুশ্রী ও সুকণ্ঠ হয়, তবে তাহার মাতাপিতা বাল্যকাল হইতে তাহাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দেয়। গীতের মধ্যে তাহারা পুরুলিয়া জিলার প্রচলিত বাংলা গানই শিখিয়া থাকে, সাধারণত অন্য কোনও গীত শিখে না। নৃত্যগীতে শিক্ষা শেষ করবার পর এই সকল বলিকা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদিগকে উক্ত অঞ্চলের গঞ্জুদিগের নিকট আজীবন ভরণ-পোষণ করিবার মৌখিক প্রতিশ্রুতি ও অর্থের বিনিময়ে জীবনের জন্য সমর্পণ করিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের বিবাহ হয় না, কিংবা তাহারা সন্তানও ধারণ করে না। যতদিন রূপ এবং যৌবন থাকে, ততদিন তাহাদের আশ্রয়দাতা গঞ্জুদিগকে তাহাদের নৃত্যগীতে পরিতুষ্ট করিতে হয়। শেষ জীবনে সেই গৃহেই তাহারা ভরণ পোষণ পায়। যদিও

অবাঙ্গালীদিগের মধ্যেই তাহাদের সকল জীবন ব্যয়িত হয়, তথাপি প্রথম জীবনে তাহারা যে বাংলা গান শিখিয়া থাকে, তাহাই তাহারা সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া গাহিয়া যায়। বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংমিশ্রণে আসিবার ফলে ক্রমে তাহাদের উচ্চারণ-রীতি পরিবর্তিত হয়, কেহ কেহ কালক্রমে বাংলা ভাষা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া স্থানীয় ভাষা গ্রহণ করে—তথাপি তাহারা যে বাংলা গানগুলি শিখিয়া আসে, তাহা কদাচ ভুলে না—অবাঙ্গালী উচ্চারণে তাহারা বাংলা গান গাহিয়া যায়, ইহাদের অর্থও অনেক সময় তাহারা বুঝিতে পারে না। নূতন পরিবেশের মধ্যে আসিয়া কিছু কিছু ওরাওঁ এবং ভোজপুরী হিন্দী গানও তাহারা শিখে। ক্রমে তাহাদের ব্যবহৃত গানগুলি বাংলা, হিন্দী, ওঁরাও প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা হইতে আগত শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া এক বিচিত্র রূপ ধারণ করে; কিন্তু ইহাদের সুরের মধ্যে কোনও ব্যতিক্রম শুনিতে পাওয়া যায় না। মধ্যভারতের যাশপুর অঞ্চল হইতে সংগৃহীত বাঙ্গালী নর্তকীদিগের কয়েকটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল; বাংলার লোক-সঙ্গীত অবাঙ্গালী অঞ্চলে গিয়া কি রূপ লাভ করিতেছে, ইহা হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

ঠাকুরজী যায় গঙ্গা নাহায় রে।
ভাই মোরা ভরিয়া যায় লা॥

ঠাকুরজী গঙ্গাস্নানে গেল, আমার ভাইকে বেগারীরূপে ধরিয়া লইয়া গেল।

চকোরা ফুলি গেলা হরিয়র মাই।
চকোরা ফুলা বড়া শোভয়॥

চকোর গাছ (লজ্জাবতীর মত একপ্রকার লতা) ফুলিয়া গেল, এখন ইহাকে দেখিতে বড় শোভা।

করম করম করলেহ রাজা।
করম ডোলইতে আওয়॥

সবাই মিলিয়া করম করম বলিত, কিন্তু আজ নিজে হইতেই করম রাজা ঘরে আসিতেছে, দেখ।

নহিয়ারা নহিয়ারা মতি করু সওরো।
নহিয়ারা দেখলি তোহার॥
কাঠিকের ঘর না হ মাটিকের ছাব না।
উপরে ত খেড়ক ডবনা॥

নাইয়র নাইয়র কর, কিন্তু তোমার বাপের বাড়ী গিয়া দেখিলাম, কিছুই ত নাই—কাঠের বেড়া, তাহাতে মাটির দেয়াল, উপরে খড়ের ছউনী।

দুইও সাইতিন চালা মাছের মারে,
কাশা নাদী বানা ভিতরে।
ছোটকী যে লেল ফাটন নাচুয়া
বড়কী যে ভোট মকরী॥

দুই সতীন বনের মধ্যে কাশ নদীতে মাছ ধরিবার জন্য যায়। ছোট সতীন জল সিঁচিবার সরঞ্জাম লইল, বড় সতীন লইল কোদাল (কারণ, তাহাদিগকে কাদা চাঁচিতে হইবে)।

উদ্ধৃত সঙ্গীতগুলির মধ্যে ওরাওঁ, ভোজপুরী (সাদ্‌রী) ও বাংলা তিন ভাষারই মিশ্রণ হইয়াছে; কিন্তু কেবলমাত্র গানের সুরের মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নাই বলিয়া সকলেই ইহার ভিতর হইতে রসোপলব্ধি করিতে পারিতেছে।

এ যাবৎ খেম্‌টি গানের সংগ্রহ কোথাও প্রকাশিত হয় নাই; সেইজন্য নিম্নে বিস্তৃত নিদর্শন দেওয়া গেল।

সকল গানেরই প্রথমে বন্দনা শুনিতে পাওয়া যায়।

১

বন্দি মাতা সরস্বতী,
রাঙা পদে এ মিনতি,
আমি মূঢ় মতি অসহায় গো।
ও দয়া কর আমারে
তুমি মা বিদ্যাদায়িনী, দাও জ্ঞান,
তোমায় বিনা নাহিক উপায় গো।
ও দয়া কর আমারে।
এস হংসবাহিনী সুভাষিণী কুমুদিনী
প্রস্ফুটিত কর এ হিয়ায় গো।
ও দয়া কর আমারে,
যুগে যুগে তুমি আসি দিয়াছ জ্ঞানের রাশি
বিপিন বসে আছে সে আশায় গো।
ও দয়া কর আমারে। —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

এসো এসো বিনোদবিহারী, নমঃ নমঃ মুকুন্দ মুরারি।
চারিকরে শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী
দ্বাপরের কুলনারী মন করে চুরি
এসো এসো বিনোদ বিহারী নমঃ নমঃ মুকুন্দ মুরারি॥ —ঐ

৩

প্রেম করা কি সহজ নয়, আর প্রেম কি শুধু হয় গো।
প্রেমে পাগল হয় গুরুজন, প্রেমে জাতি কুথা যার রে,
প্রেমে যায় জীবন এমনি প্রেমের ধারা ;
মন যে আমার ক্ষেপার পারা,
না বুঝে ডুব দিলে শেষে হারাবে জীবন।
ও প্রেম করো না রে মন,
প্রেমে জাতি কুল যায় রে প্রেমে যায় জীবন।
প্রেম-সরোবর মাঝে আর দুটি কমল ফুটে আছে,
হাত বাড়ালে কমল, নিশ্চয় মরণ,
প্রেমে জাতি কুল যায় রে, প্রেমে যায় জীবন।
রায় হরিদাসে বলে আর ভুলো না মায়াজালে,
এ কুল ও কুল দুকুল যাবে শেষে হারাবে জীবন। —ঐ

৪

না জানি সাধের প্রাণে, কোন প্রাণে প্রাণ পরাও ফাঁসি
আমি ত প্রাণ দেব না, প্রাণ নেব না,
আপন প্রাণে ভালবাসি॥
ওলো, ও সখি, যায় বুঝি প্রাণ কোকিল স্বরে।
ত্বরায় এনে দে লো মোর প্রাণপতিরে॥
একে তো যৌবন ভার, সহিতে না পারি আর
তাহে মদনের শর, দহে অবলারে॥
কোন গুণে বাউল সেজেছে।
লোক দেখানা তিলক মালা, টুকুনি ঝোলা,
মনের আমার সার করেছে॥

পৌঁছেতে কোপীন আঁটা, কপালে দীর্ঘ ফোঁটা।
মাথায় চৈতন্তের বোঁটা কোন্ গুণে ধরেছে।
কোন হালে পোরেছে বিহার, তুমি একতারাতে দিচ্ছরে তার,
দেখি তোরে একি নাকাল, চাঁদ মুখে দাড়ি রেখেছে।
পূর্বেতে মন কোথায় ছিলে, কে তোরে পাগল বানালে,
কার কথায় হেথায় এলে, তাল ধোরে তালে নাচতেছে॥

—মুর্শিদাবাদ

৫

মেলেনীর ফুলবাগানে মালী বিহনে
গোলাপ ফুল জল বিনে ফুল তো ফুটে না।
জল যদি দিত মালী, ফুটিত ফুলের কলি
আসিতো ভ্রমরালি ফিরে তো যেত না।
ঝাড় লণ্ঠন বাতি জ্বেলে বসে আছি দুয়ার খুলে
প্রাণ বন্ধু আসবে বলে পেতেছি কারখানা॥ —নদীয়া

৬

তোরে লয়ে জল আনিতে যায়রে পিতলের কলস,
কলস তোরে পুরে আনি উতলে উতলে পড় তুমি,
জল পড়ে শাড়ি ভিজে যায়।
যমুনার জল দেখতে কালো স্নান করিতে লাগে ভালো
জলের মধ্যে যৌবন দেখা যায়।
কলস রে তোর পায়ে ধরি নিয়ে চল মোর বন্ধুর বাড়ি
ঐ যে বন্ধুর বাড়ি দেখা যায়। —ঐ

৭

জ্বালায়ে আগুন পালায়ে গেলি,
পরে নিভায়ে গেলি নারে, কালা,
নদীর ধারে বাঁধে বাড়ি কোমর লয়ে আড়াআড়ি
বাঘের সঙ্গে বাঘ চাতুরি বৈদ্যের সঙ্গে বিবাদ করা,
তোমার প্রাণ কেড়ে নিব আপন মনকে বুঝায়ে নিব,
না হয় দুদিন কষ্ট পাবো প্রাণে মরব না রে, কালা। —ঐ

৮

দীর্ঘ দিবস পরে বন্ধু যদি এলে ফিরে
কেন বন্ধু এলে অবেলায়।
রাতিকে দিবস করি দিবসকে রাতি করি
প্রাণবন্ধু আসবার বেলায়।
আকাশ হইতে বাণ বুকে যেন হেনে রে
কি করিব বলে যাও, বন্ধু।
বল বন্ধু কোথায় যাবে এ ঘর বাড়ি কারে যাবে
আমি ঝাঁপ দিব দরিয়ায়। —নদীয়া

৯

হায় গো দারুণ বিধি শাশুড়ী হয়েছে বাদী।
ঘরে আছে ননদিনী বিচ্ছেদের পানা,
আমার প্রাণে সয় না দারুণ শাশুড়ীর গঞ্জনা।
শাশুড়ীর চার ব্যাটা ঘরে প'রে লাগায় ল্যাঠা,
হেন স্বামীর ঘরে কভু আমার সুখ তো হ'ল না,
দারুণ শাশুড়ীর গঞ্জনা॥ —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

১০

জ্বালিয়া মোমের বাতি অকারণে গেল রাতি,
গাঁথিয়া বাসবী ফুলের মালা, সখি, রহি ল বসি।
বন্ধু হে বাজে আসি, বন্ধু, তোমারই পীরিতি॥ —ঐ

১১

সোনার আংকা সোনার পাংখা বন্ধু সোনার বিছানা।
আমি সঙ্গে শুব না, গায়ে বাতাস লাগে না॥
ঘরে আছে গরম মুড়ি থাল ভরা, খাইয়ে লও হে চিকন কালা।
সারা মাঠে ঘুরি ঘুরি আমার হয় দিশেহারা,
বন্ধু, এনে দিবে হে আমায়, জিলিপি, ঝালবড়া॥ —ঐ

১২

সন্ধ্যে শালুকের ফুল ফুটে আঁধার রাতে,
যার সনে যার ভাব থাকে মরিলে কি ছুটে
বন্ধু, এত রাগ তোর কিসে॥

এস এস এস, বন্ধু, বস পালঙ্কিতে,
পা ধুয়াইব নয়ন জলে পুছাইব কেশে বন্ধু, এত রাগ কিসে ॥
যতি বড্ড হারাম জাত তার সঙ্গে করেছ ভাব গো ॥
শেষে ধনি তুই পুছিবি নয়ন জল গো ॥
তুই, ধনি, বড় দাগাবাজ ল ॥
খাওয়া দাওয়া দিয়ে বাদ করেছি তোর কাজ গো,
তুই, ধনি, বড় দাগাবাজ, তোর জন্য ছেড়েছি ঘরের কাজ লো।
তুই, ধনি, বড় দাগাবাজ ॥
তুই ধনি লোয়া জাঙ্গের মাছ গো।
সরল দেখে করলেম প্রেম আগে না ভাবি এত,
অবলাকে কাঁদায়ে সহে না অন্তরে, বন্ধু, কি বলিব তোরে।
তুই, ধনি, বড্ড দাগাবাজ ॥ —ঐ

১৩

যার অঙ্গের পবন পরশে,
হরষে আমার মন জুড়ায় ;
তারে কি পাসরা যায়।
দিবানিশি আমার জাগিছে হিয়া।
তারা রামকৃষ্ণ বনে যায়
দিবানিশি জাগিছে হিয়া,
আমার কলপে কলপে উঠে ছাতিয়া।
ওরে, পাখী, কেন ডাক নিশি ভোর রাতিয়া ॥ —ঐ

১৪

চৈত্র বৈশাখ মাসে বাঁ দিকে পলাশ ফুটে গো.
সে হতে দেখে আমার ছাতিও ফাটে।
বুড়া বলে আধা রাতে আমায় কি ফেরে ফেলালে,
ও বন্ধুয়া হে, একবার এসো ছুটে। —ঐ

১৫

বেল পাকিল, বধূ, না আইল অভাগিনীর কর্মদোষে গো.
বিনে নাগর শ্যাম ধনীর কথা নাই ও বদনে,

নিলজ হে ফিরিয়া যাও মানে মানে আইলি, ভাই, কিবা কাজে,
না বলিলে লোকলাজে গো মনের কথা রাখিলে গোপনে। —ঐ

১৬

উঠিতে বসিতে নারি জাক ধরে তুলব কি,
পিরীতি হৈল কাল ॥ —ঐ

১৭

লোকে বলে ছিঃ ছিঃ আমি করেছি কি,
হাতে শাঁখা নাকে নোলক পরেছি।
বিয়ালা পুরুষে ছাড়েছি, বিয়ালা পুরুষ ছাড় দিয়ে শাঙলাই মাজেছি।
শাল বনের শুয়া পোকা তুই-ই কি হে ছেলের কাকা,
পথের মাঝে দেখা পেলে বলে দিবে প্রিয়াকে,
কি দোষে ছাড়েছে আমাকে।
নিজের কুড়াই নিজেই মোরে নিয়েছে
কি দোষে ছেড়েছে আমাকে। —কাঁঠালিয়া (বাঁকুড়া)

১৮

চাপাইলে তরুডালে ছেদন করিলে মুলে
আমি তোমার তুমি আমার না হলে
বড় প্রাণে দাগা দিলে।
বল বল, বঁধু সেদিন কি বলেছিলে
বড় প্রাণে দাগা দিলে।
অকুল পাথারে আমায় ভাসালে ভাসালে কি ডুবালে
বড় প্রাণে দাগা দিলে। —ঐ

১৯

সবাকার গোরা বউ, আমার বেলায় কালো বউ,
বলে ঐ মাগিটা ঘর করে না পালাচ্ছে খালি, ওমা কালী
বনে বনে যাতে ছিলি, রাম লক্ষণ কুড়াই পালি,
ওমা, কালী, তুই যমকে কাঁদালি ওমা কালী। —ঐ

২০

পরাইলে নীল শাড়ি চাপাইলে রেল গাড়ী
আমাদিগকে নিয়ে যাবে আসাম কাছাড়ে,

আজ আমাদের কি আছে কপালে।

কপালে সিন্দুরের ফোঁটা　　　　মাথায় জোড়া টপং কাটা

আমার ভাগ্য দোষে মিলন হোল না,

তুমি আমার হলে না।　　　　　　—ঐ

২১

পারমেলার পকা কপাল বাধ কাত্তিরের রাণী।

নাম' বাঁধের আড়ে বসাই নাকছবি পরালি

বঁধু, এ তো জানাজানি!

মানবাজারের সরু চিঁড়া পুরুলিয়ার চিনি,

কলের জলে ভিজাই চিঁড়া, কি চিঁড়া খাওয়ালি,

বঁধু, এই তো জানাজানি।　　　　　　—ঐ

২২

যমুনাতে জলকে গিয়ে হলো দেখাশুনা,

পীরিতি চাঁদের মালা পরিব দুজনে বঁধু, আমায় ভুলো না।　　—ঐ

২৩

প্রথম পীরিতি ফলে স্বর্গের চন্দ্র হাতে দিলে,

বল বল, বঁধু, সেদিন কি বলেছিলে, আজ প্রাণে দাগা দিলে।　　—ঐ

২৪

হাতে রুমাল মুখে পাউডার করে ঝলমল,

এমনটা তোর কদিন যাবে বল।

না বুঝে তুই গেলি রসাতল,

এমনটা তোর ক'দিন যাবে বল।　　　　　　—ঐ

২৫

হাতে হাতে পান দিতে দেখেছে পাড়ার লোকে,

চুণ দিতে দেখেছে ভাসুরে,

সখীরে, আজ আমাদের কি আছে কপালে।　　　　—ঐ

২৬

আমি তোমায় ভালবাসি অন্তরে অন্তরে, বঁধু,

কানে দুটি যেন মাকড়ি,

কিনে দাও আমারে, ভালবাসবো তোমারে।
আমি তোমায় ভালবাসি অন্তরে অন্তরে, বঁধু।
হাতে শাঁখা নাকে নোলক আদুলী বহরে,
আরো যদি দিতে পারো স্বরা আমারে, বঁধু,
ভালবাসব তোমারে।
সিল্কের শাড়ী, বাংরী কাটা সায়া উঠেছে বাজারে,
রঙিন রঙিন ছিট উঠেছে বেলাউজের তরে।
আমি তোমায় ভালবাসি অন্তরে অন্তরে, বঁধু,
অতুল বলে দুটাকা দাম হিমানী পাউডারে,
সাধটুকু না রাখব, বঁধু. ফুলেম তেলের তরে।
যদি আমায় দিতে পার ভালবাসব তোমারে।
ভালবাসার প্রীতিফল পেয়েছি এবারে—
ভাল না বাসিব তোমারে। —ঐ

২৭

ছোটো দেওর তোর আঠলা কথা সই নারে।
ছোট দেওর তোর আঠলা কথা,
স্বামী গেছে ধান কাটিতে বাঘে ধরে খাক।
ছোট দেওর বেঁচে থাক।
ছোট দেওর তোর আঠলা কথা সই নারে। —ঐ

২৮

আমার কাজ কি কাশীধাম, বঁধু, থাকো বৃন্দাবনে।
কাশী গিয়ে কাশীনাথের ধরিবে চরণে।
বঁধু, থাকো বৃন্দাবনে।
আমার কাজ কি কাশীধামে। —ঐ

২৯

কচি কদমে, বঁধু, হাত দিও না,
পাকিলে কদম সবাই খাবে বারণ করিব না।
বারে বারে করি মানা কেন মানা শোন না,
কচি কদমে বঁধু হাত দিও না। —ঐ

৩০

পীরিতি তোফান বানে
তোমরা জেনে শুনে নামিবি জলেতে,
পীরিতি তোফান বানে। —ঐ

৩১

মন্না মাগে বলেরে, ভাই, যত সাগর হেলা,
আমাকে পড়িয়ে আস টানাটানির বেলা।
কানা মাগে বলে রে, ভাই, যত মাগের মালা,
আমাকে তুলিতে আসে গোটা গাঁয়ের স্থানা। —ঐ

৩২

শিঁয়াকুলের কাঁটা যেন বিঁধিল হিয়ায়,
বরং জাতি ছাড়া যায় পীরিতি ছাড়া দায়। —ঐ

৩৩

বলব বলব মনে করি খুলে কথা বলতে নারি গো,
ইসারাতে ভালাভালি আমরা দুজনে,
আমার মন কি মানে গো, ধনি, নব যৌবনে॥
কি হয়েছে বল গো মনে, খুলে কথা বল বদনে গো,
নবীন পীরিতি, ধনি, ভাঙল এত দিনে।
শুনগো, ধনি, বিনয় করি, আর কতদিন ভালাভালি গো,
আমার মনে আশা দিলি মিলব দুজনে,
আধা দিনে দাগা দিলি কি করে আর ধৈর্য ধরি গো,
প্রেমচাঁদ বলে দিবানিশি তুই রাখবি গো মনে। —ঐ

৩৪

তোমায় আমি ভালবাসি অন্তরে অন্তরে, বন্ধু,
আরো যদি দাও হে কিনে বিছা কোমরে,
ভালবাসিব তোমারে।

৩৫

কপালে সিন্দুরের ফোঁটা আর মাথাতে ঝড়া পিং কাঁটা গো,
আমার ভাগ্য দোষে মিলন হোল না হোল না, বন্ধু, আমায় ভুইল না। —ঐ

৩৬

পার গেলারে পাকা পান ধারকে দেয়ার বানে
নাম' বাধের আড়ে বসে পরালে নাকছবি,
মানবাজারে কিনে দিলাম নীল সিল্কের শাড়ী
বন্ধু, এতো জানাজানি। —ঐ

৩৭

জামাতোড়ের টিনের মিষ্টি বড় গেড়ের পানি,
মানবাজারে কিনে দিলেম নীল শিল্কের শাড়ী। —ঐ

৩৮

পীরিতি চাঁদের মালা পরিব দুজনা, বন্ধু,
আমারে ভুল না। —ঐ

৩৯

পরিবারে নীলশাড়ী আর পায়ে আলতা পর, ধনী,
কপালে সিন্দুর ফোঁটা,
আজ আমাদের কি আছে কপালে। —ঐ

৪০

মাগো, মাগো বাজার যাবো,
পেছা পেইড়া শাড়ী লিব,
আর লিব গলায় মাতুলী,
রূপে চমকি বিজলী।
আহা কে রং সাজালি॥
মাগো, মাগো বাজার যাব,
আর নাকের নাকছাবি লিব।
শ্বশুর ঘরের লোকে বলে,
ও তুই নাকছাবি পড়নি।
রূপে চমকে বিজুলী॥
কলিকালের বৌ বিটি
আর উল্টা বাঁধিল ঝুটি
আগুপিছু আয়না রেখে।

গুঁজে বেল কুড়ি।
রূপে চমকে বিজুলী। —ঐ

৪১

অতুলবনে ফিতা বাঁধা হিমানী পাউডারে,
সাধটুকু না রাখিও ফুলাম তেলের তরে। —ঐ

৪২

জলকে যাবার তরে
উঠিল ভীমেশ্বরী বাঁধের ঘাটে।
কলসী রাইখ্যা পালায় গো।
সুদাম যে আমার দহিছে।
পরাণ গো আমি সারাদিন।
খুঁজি খুঁজি হইল হায়রাণ গো।
আলে সরলে জামাই ভাল সরলে
বিটি বিদায় দিব না তরী মাঝে,
আমার বিটিকে সাঁতাও গো।
তরী মাঝে বিটি বিদায় দিব না।
ঠেঙ্গা ঘুর ঘুরানি দেখিয়া।
বিটি দিল বিদায় যে গো॥

৪৩

আনারকলি শাড়ী লিব, বেনারসী বেলাউজ লিব,
লাল রঙের শায়া লিব বরণ খুলে রইব না,
নতুন উঠেছে গয়না॥
আয়না লিব চিরুণ লিব, নারিকেলের তেল লিব,
বরণ খুলে রইব না
নতুন উঠেছে গয়না॥
চা দিলাম চিনি দিলাম দুধ তো দিলাম না,
জল দিতে ভুলে গেছি বন্ধু তিপ্ত হল না,
বন্ধু নূতন উঠেছে গয়না,
বরণ খুলে রইব না॥ —ঐ

৪৪

মুখের হাসি মুখে রাখিবি
আড় নয়ানে বলিবি হে কথা,
তুমার ছলনে কেঁদে মরি
বন্ধু, ধৈর্য ধরা দায়।
বন্ধু, নতুন গহনা লিব
লালরঙের শাড়ী লিব। —ঐ

৪৫

যে করিছে পীরিতি সে ছাইড়ো না পীরিতি।
পীরিতি করিলে দেখা পাবে না,
পীরিতি ভাই কেউ কইরোনা॥ —পচাপানি (মেদিনীপুর)

৪৬

লোকে বলে ভুল হলো, কেমনে ভুলিবে বলো,
হায় সে কি, বন্ধু, ভুলা যায়,
দিবানিশি আমার জাগিছে হিয়ায়॥ —ঐ

৪৭

লাল শালুকের ফুল, বঁধু, ফুটে আঁধার রাতে,
যার সাথে যার মন মজে মরিলে না ছুটে, বন্ধু,
এত রাত কিসে।
এত রাত কিসে, বন্ধু, এত রাত কিসে,
পা ধুয়াব নয়ন জলে মুছাইব কেশে,
এত রাত কিসে ?
এ সংকট গণিয়া তে আইল কি মতে
ভাবও না তোমারে বন্ধু কাজও নাই তোমারে,
এত রাত কিসে, বন্ধু, আইলে নিশির শেষে॥ —ঐ

৪৮

আয়না লিব চিরুণী লিব নারকোলোর তিলকা লিব,
পিং দিয়ে মাথা বাঁধব কারো বারণ শুনব না।
দেশে উঠেছে গয়না, আমি কুলেতে রইব না॥

আনারকলি শাড়ী লিব বেনারসী শাড়ী লিব,
লাল রংএর বেলাউজ লিব, লাল বই অন্য লিব না,
দেশে উঠেছে গয়না, আমি কুলেতে রইব না ॥ —ঐ

৪৯

লালে লালে সুন্দর আমার রতিয়ারে
জয় দেব গুণ পতিয়ারে,
সাজে বড় কি সুন্দর সাজে বড় মনোহর,
দুই হাতে যবে গজমতিয়ারে
জয় দেব গুণ মতিয়ারে ॥ —ঐ

৫০

দু'টাকা দিলে বন্ধু হিমানী পাই,
সাধটুকু না রাখিও ফুলান তেলের তরে।
ভালবাসিব তোমারে।
আরো যদি দেহ কিনে কোমরেতে বিছা মোরে
ভালবাসিব তোমারে ॥ —ঐ

৫১

পান চিরি চিরি সুপারিতে বলে আমি বাহাদুরী,
সোনার মুখে তুলে দিলে যায় না,
ছোট দেয়রা, তোমার আধলা কথা প্রাণে সয়নারে,
দেওর, আধলা কথা তোমার ॥ —ঐ

৫২

গোটা বন ঘুরি ফিরি নানাজাতি ফুল তুলি,
সেও ফুল গাঁথিব দুজনে ও নিলজ হে,
ঘুরি যাও মানে মানে ॥ —ঐ

৫৩

আমি একলাই কাটালাম সারারাত কদমতলে।
নন্দ গোয়ালার বেটা দাগাবাজ হইয়ে,
একলাই কাটালাম সারারাত কদমতলে। —ঐ

৫৪

দুধও মিছা গুঁড়ও মিছা পরের পুরুষ মিছা,
আপনার পুরুষ মহাভগবান ঐদিকে ভয়ংকর জুয়ান ॥ —ঐ

৫৫

একে নারী তায় অবলা দিয়েছে যৌবনের জ্বালা,
কেন নারী জন্ম দিলি, কান্দিতে ভাবিতে জনম গেলা ॥ —ঐ

৫৬

কাশী গিয়ে কাশীনাথে ধরিবে চরণে,
কাজ কি বঁধুর কাশীনাথে, বঁধু থাকে বৃন্দাবনে ॥ —ঐ

৫৭

কুলি কুলি চলে যাব আমার মন ত থাকে না,
বন্ধু, কুল রাখব না ॥ —ঐ

৫৮

ফুটিল মালতীর ফুল।
(আর) মধুলোভে অলিকুল
বারে বারে দিওনা যাতনা।
মরম জেন না ॥
এ পীরিতি কর না রে মন মরম জেন না ॥
ফুটিল ফুলের কলি।
আর দই ছেড়ে কাপাস খালি ॥
ও নয়ন থাকিতে হলি কানা।
মরম জেনো না ॥
পীরিতি ক'র না অধম বিনায় বলে,
আ ভুলাইলে কথাছলে
জেনে শুনে করি আমি মানা,
হে মরম জেনো না ॥

৫৯

যমুনার জল আনিবারে বড় ভয় লাগে, বন্ধু ॥
কি জানি কেউ আছে ঘাটে।

চমকি লাগলি আমার যইবুন বয়সে।
যইবুন বয়সে আমার·যইবুন বয়সে ॥
কি জানি তোর কুল গো যাবে।
আমি নাই জানি ও তোর অল্প বয়সে।
আমার অল্‌প বয়সে ॥
কি জানি তোর কুল গো যাবে।
আমি নাই জানি ও তোর লীলা অবসানে ॥ —ঐ

৬০

এস প্রিয় কামনা যে বিধিছে পাঁজরেতে
একবার ফিরে চাও না দুনয়নেতে।
একবার ফিরে রও না দুনয়নেতে
ভুলিব ভুলিব বলি ভুলিতে না পারি,
একবার ফিরে চাওনা ······।
কি করে ভুলেছো তুমি আমার মুখের হাসি,
তোমারই মুখের হাসি জাগে ক্ষণে ক্ষণে ॥ —ঐ

৬১

তুমি শ্যামার আদরিণী আউলায় মাথা বেণী
কেন দেখি দিদির দুনয়নে জল গো,
কেন দেখি দিদির বিরস বদন।
আর ধৈর্য ধর কিছুদিন, দিদি, না হইও কাতর,
আনিয়া মিলাব, দিদি, তোমার শ্যাম নটবর গো ॥ —ঐ

৬২

পলাশ বনে রইলাম পড়ে, বঁধু,
মুকতি দাওনা হে দুনয়নে বইছে বারি,
ও জল পুছায়ে দাও না হে তোরা—
একলা ঘরে রইলাম, বঁধু, মুকতি দাওনা হে তোরা।
দুনয়নে বইছে বারি ও জল পুছায়ে দাওনা হে ॥ —ঐ

৬৩

মাঝের ডালে কোকিল গো গায়,
আগ ডালে কালো কোকিল।

ও কোকিল বোবা হয়েছে।
ফুটালে পুষ্পলতার দেহ মলিন হয়েছে।
ইহার ফুটা লো পুষ্পলতা॥ —ঐ

৬৪

তোমার হাতের টাকা, বন্ধু, আমার হাতের শাঁখা,
চলেও গেলে একা, বন্ধু, করেও গেলে একা।
চারিদিকে চাহিয়ে দেখি, পাইনে তুমার দেখা,
বন্ধু, করে গেলে একা আমি পাইনা তোমার দেখা।
—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৬৫

জ্বালিয়া মোমের বাতি, অকারণে গেল রাতি,
গাঁথিয়া বাসকি ফুলের মালা,
সখী, আমার রহিল বাঁশী
তোমার ঐ পীরিতি আজি হইল বাজে।
হায় রে দারুণ বিধি, শাশুড়ী হয়েছে বাদী,
ঘরে আছে ননদিনী আমার বিচ্ছেদের পালা,
আমার প্রাণে সহে না দারুণ শাশুড়ীর গঞ্জনা।
শাশুড়ীর চার বেটা ঘরে ঘরে লাগায় ল্যাঠা,
হেন স্বামীর ঘরে সুখ তো হল না।
আমার প্রাণে সহে না॥ —ঐ

৬৬

শ্যামের বাঁশীটিকে আমি, কেড়ে নেব জনম্‌কে।
যখন, কানাই, বাজাও বাঁশী তখন গৃহে রান্দি বসি,
শাশুড়ী ননদের ঘরে আমি না সহিতে পারি ফাঁকে।
যখন আমি সহি গো জলে, শ্যামের দেখা কদমতলে,
কত ছলে ডাকে আমার নাম কে,
আমি কেড়ে নেব বাঁশীটাকে জনম্‌কে। —ঐ

৬৭

সাঝের ফুটা ঝিঙা ফুল, সকালে মলিন—
যৌবনের গরব কতদিন?

যৌবন রবে না চিরদিন ॥
স্বামী নিন্দা করে যারা ;
মহাপাপের পাপী তারা—
স্বামী সেবা করে যারা, তারাই তো নবীন গো।
যৌবনের গরব কতদিন ?
যৌবন রবে না চিরদিন ॥
সাধু নিন্দা করে যারা,
মহাপাপের পাপী তারা
সাধু সেবা করে যারা, তারাই নবীন গো। —ঐ

৬৮

রাধাকৃষ্ট বলো মুখে আর জনম কি যাবে সুখে গো।
জলে দেখ আঁধার হলো বেলা, শমন যন্ত্রণা বড় জ্বালা।
জলে দেখয়ে মন গো ॥ —ঐ

৬৯

গাঁয়ে এলো সরু শাঁখা।
বড় বৌয়ের মুখ বাঁকা ॥
হালের বলদ বিকিয়ে, দাদা।
বড় বৌকে দে শাঁখা ॥
পুয়া ঝাড় বাগানে।
বিন্দেরে এত রেতে ॥
মালা বদল করব লো কোনমতে ॥ —ঐ

৭০

ওলিপুরের এলি তোরা, ওলিপুরের কামিনী ॥
তোদের উদিক কাপড় আছে টেপে দিয়া রঙচোঙি ॥ —ঐ

৭১

একা ঘরে থাকি, বন্ধু, দেখি সপুনে।
চমকি উঠিয়া বন্ধু, প্রিয়, নাই মোর সনে।
এই নব যৌবনে। —ঐ

৭২

বাড়ীর আম গাছে বকুলে ঘেরেছে পানি।
কলি খুঁজে পাই নাই গো ॥ —ঐ

৭৩

মনের কথা বলব তোমারে।
বাজার হতে চেন মাকুড়ি এনে দেবে মোরে,
ভালবাসব তোমারে।
হাতে শাঁখা পায়ে তোড়া আধুলী মোহরী,
আরও যদি দাও হে মোরে বিছা কোমরে,
ভালবাসব তোমারে।
শিলিক শাড়ী, ফরিদ শাড়ী, উঠেছে বাজারে।
নতুন ছিট উঠেছে বেলাউজের তরে ॥
দু টাকা লাগবে মোরে হিমানী পাউডারে,
আরও যদি দাও হে ফুলান তেলের তরে,
পায়ে ছাতা মাথায় জটা উরয়ালের তরে।
দশ আনা লাগবে মোরে পিন কাঁটা ডোরে ॥ —ঐ

৭৪

চল সখি জলকে, জোড়া মহল তলকে
এড়েয় দাও দমকে মাটি দলকে, ফিরি যা শ্যাম মানে মানে,
মাধবপুরের পাকা আম লড়ি হব রাণী,
হায় সাগরের পারে বইস্যা পরালে নাকছাবি
বঁধু, এতো জানাজানি ॥
শাশুড়ী ননদী ঘরে যেতে হয় যমুনার জলে,
না জানি কেউ আছে যমুনার ঘাটে প্রেমলীলা ছলে ॥
আমার যৌবন বয়সে। —ঐ

৭৫

কি যুগের শাড়ি উঠেছে, উঠেছে বাজারে,
সায়া শাড়ী কিনে দাও, শ্যাম, পরিব পরবে
ভালবাসিব তোমারে।

রঙিন রঙিন ছিট ব্লাউজের তরে, হে শ্যাম, ব্লাউজের তরে,
আরো লিব পাঁচ টাকা, হে শ্যাম—
হিমানি পাউডারে, হে শ্যাম, হিমানী পাউডারে।
আরো লিব পাঁচ সিকা সানলাইট সাবানে। —ঐ

৭৬

বিয়ে হবো বিয়ে হবো পাত্র খুঁজেছি,
বিয়ে যদি করবে আমায় জাতের খবর কি।
আগে ছিল ময়রা মুচি এবার আমি বামুন হয়েছি,
বিয়ে হবো বিয়ে হবো পাত্র খুঁজেছি।
জমি জমার খবর কি॥
জমি জায়গা বিক্রি করে কেবল আছে মহিষ জোড়াটি,
বিয়ে হবো বিয়ে হবো
বিয়ে যদি করবি আমায় লেখাপড়ার খবর কি,
লেখা ভুলেছি আমি, কেবল আছে দোয়াত কলমটি,
বিয়ে হবো বিয়ে হবো খাবার দেবার কি,
ঢেকিশালের পাটরা কুড়া সিদ্ধ করেছি॥ —ঐ

৭৭

কলিকালের বহুবেটী উলটায়ে বাঁধালে ঝুঁটি,
সেরা কেমন সাজিলে চমকে বিজুলি, সেরা কেমনে সাজিলে।
ছোট মোট কুড়িয়া পুব দুয়ারিয়া
যেটা সে ভিজল নীল শাড়ীয়া।
এখনও না এল কালিয়া॥
লাল শালুকের ফুল ফুটে আধা রাইতে,
যার সঙ্গে যার ভাব থাকে মরিলে না ছুটে,
এত রাতে উঠে বস পালঙ্কেতে
নয়ন জলে পা ধুয়াইব মুছাইব কেশে। —ঐ

৭৮

বলি যাই যমুনার জলে
বলি শ্যাম দাঁড়িয়ে কদমতলে গো

ও যে রূপ মনে করি গুঙুরে গুঙুরে করি হে রোদন,
আশা ছিল যে মনে মন, কবে হবে যুগল মিলন ॥ —ঐ

৭৯

ওরে, প্রাণ-মাঝিরে, ভর দরিয়ায় নৌকা রাখা দায়,
পুরলো ঝরিল পরশে ঝরিয়ে, ভরসোংতো পরানি
আরে মাঝি ঘর ঘুরিয়া আয় তর সঙ্গে আর পারি না। —ঐ

৮০

খালের জলে লেউঠিল সরা গজমোতির হীরা
কপালে মাণিকের ফোঁটা দামনের পারা
মাথে সাজিল সাজিল রে দধির পসরা, মাথে সাজিল রে। —ঐ

৮১

যখন তুমি বাজাও বাঁশী কদমতলাতে,
কলসীর জল ফেইলা দিয়া যাই গো যমুনাতে। —ঐ

৮২

মথুরারি পথে যেতে কদম সারি সারি
আর খেমকা নয়কো বাঁকা কাঁথার ব্যথায় মরি
হেদে হাগো আমরা না দেখিলে মরি, ওগো গোপো নারী।
জলে যাইস্না যাইস্না বারণ করি। —ঐ

৮৩

আষাঢ়েতে গেলে বন্ধু শেরাবনে দেখা,
মাথায় বাঁধা ফিতার দাম সাড়ে বারো টাকা।
ওরে দধিলতা পিরিতির নাম লেখা। —ঐ

৮৪

আমারো পিরিতি দেখি সইতে নারে পাড়ার লোকে,
যে যা বলে বলুক লোকে, আমি ছাড়াবো না তোমারে।
তুমি ভুইলনা আমারে, আমি ভুলি না তোমারে।
তোমার ঐ অঙ্গ হেরি, আমার এই অঙ্গ ধরি
ঐ ভাবনায় আর কত দিন
তোমার ঐ ভাবনা বইবো কত দিন।

দেখ আধা দিনে হে না যাইও পাসরি।
তুমি ভুইলো না আমারে, আমি ভুলি না তোমারে। —ঐ

৮৫

খোল বাজা রে তালে তালে।
বড় বাঁধের ঢেকাই আম তলে॥
ও ধনি, ভাবিস না লো, ভাবিস না, ধনি, আমার কিরা
বাজারে গেলে আনি দেব, ধনি, চিনি আর চিড়া।
গলে দোলে গোল মাদুলী হাতে দোলে শাঁখা,
নাকে দোলে নাকের নোলক, ধনি, পায়ে ঝুমকা॥ —ঐ

৮৬

কি জানি কি আছে ঘাটে,
চমকি লাগিলা আমার যৌবন বয়সে॥ —ঐ

৮৭

চল সখী জলকে, আর জোড়া মহুল তলকে
এড়িহি দমকে মাটি দলকে, চল সখী জলকে॥ —ঐ

৮৮

কাঁদিছে রাই ভাবিছে রাই
গুণি গুণি বার মাসে রে। —ঐ

৮৯

যমুনাতে জলকে যেয়ে হল দেখাশোনা
পীরিতি বাঁদের মালা পরিব দুজন,
ও বন্ধু, পরিব দুজন। —ঐ

৯০

সরল দেখে প্রেম করিলে।
এত কেন নিঠুর হোলে॥
আমি মরি তোমার তরে।
বঁধু, আমায় ফিরে চাও না॥
অবলারে দুঃখ দিয়ে।
কখনই ভালো হয় না॥

অবলারে শেল দিয়া।
কখনই ভালো হয় না ॥
হেসে হেসে কইতে কথা।
বস্‌তে আস্তে আমার হেথা ॥
দিবানিশি করছে আনাগোনা।
আমার হতে কোন রমণী।
তোমায় ছেড়ে দেবে না ॥
সারদা সিংহেতে কয়।
যখন ফুলে মধু রয় ॥
মধু ছাড়া ভ্রমর কোথাও রয় না ॥
আজ ডাল ভ্যাঙ্গে ফুল শুকাই গেল।
ভ্রমর আর তো ফিরে চায় না ॥ —ঐ

৯১

চার কুনা পথেটি কত পাখীর বাসা ॥
উড়ে গেল পংখী রাজা পড়ে রইলো বাসা গো ॥
ও মন, আমার ই ভব সংসার ছেড়ে যাবে ॥ —ঐ

৯২

পাক্‌লে দেখায় লাল গো।
তার ভূঁয়ে লোটায় ছাল ॥
পাক্‌লে মধু পাবে না।
পিরীতি ফল কাঁচায় ভেঙ্গো না ॥ —ঐ

৯৩

এক পোয়া গুড় ঢাল্‌লাম আমি, গাছের গোড়াতে।
ফুল গো মিঠা ফল গো তিতা, স্বভাব দোষেতে ॥ —ঐ

৯৪

কলির রীতি নীতি বুঝা দায়।
নারীর দেখে পরাণ ফেটে যায় ॥
কলিকালের বৌ বিটি।
দিন সকাল পরিপাটি ॥

উল্টা ঝুঁটি চিমটি কাঁটা।
তারা ফুলাম তেল লাগায় ॥
কলির রীতি-নীতি বুঝা যায় ॥ —ঐ

৯৫

এই কথা বলি মাগো, বলি গো তুমারে।
সিলিক শাড়ী ফার্দি সায়া, কিনে দে আমারে ॥
ভালবাসব তুমারে।
আর একটুক সাদ ছিল, ফুলাম তেলের তরে।
ভালবাসব তুমারে ॥ —ঐ

৯৬

কঁচি কদমেরই কলি আর মিছে কর ভালাভালি হে,
কঁচি কদম ঝুলে পড়ে কিবা পাবে আশা ধন,
ও কঁচি কদম ছুঁয়োনা এখন।
ওহে নীলমোহন, কঁচি কদম ছুঁয়োনা এখন ॥
মনে মনে করি আশা আর কবে হবে কদম ডাঁসা,
পাকলে কদম সবাই খাবো কাকো বারণ করবো না।
ও কঁচি কদম ছুঁয়োনা এখন।
ওহে নীলমোহন, কঁচি কদম ছুঁয়োনা এখন ॥
কদমেরই রসিক যারা আর ছুঁবেনা ছুঁবেনা তারা
ও কঁচি কদম ছুঁয়োনা এখন,
ওহে নীলমোহন, কঁচি কদম ছুঁয়োনা এখন। —ঐ

৯৭

নাই খুঁজি জমি (আমি), বাবা, নাই খুঁজি বাড়ি হে,
আমি খুঁজি যে, বাবা, জনমেরই সহতি (সখী) হে।
ভাই যে কাছে, বাবা, দে দুধ ভাত হে আমার জনম বাবা
আছি তার তরে ঘরে হে,
নাই খুঁজি গইরা (পুকুর), বাবা, নাই খুঁজি বাড়ি হে,
(বাবা) আমি খুঁজি আগুহালের (গোয়াল) হালিয়া হে।

৯৮

কেন রে মেঘ গরজে কেন রে মেঘ বরষে,
আমাদের ধনির বউনা (বোনের বর) মোটর গাড়ী রিজার্ভ করে আসিছে।
ফুলের মালা গাঁথিছে,
ধনির লাগি আনি দেছে গো, ফুলের মালা গাঁথিয়ে,
ধনির মাগো, ধনি, কোথায় আছে গো,
ধনি, খুঁজে ফুলের মালা, ফুলের বড় জ্বালা গো। —ঐ

৯৯

হাত ফেল ধনি, পাও ফেল গো
মেলিতে মেলিতে লগন পাথর হৈল গো। —ঐ

১০০

আনছি গাছে চাঁদির ফল, মাগো, ধোপা ধইরেছে,
ধনিকে মোর সাজিছে ধনিকে সিন্দূরে সাজিছে। —ঐ

১০১

ক ধরিতে পালি ধনি, কালায় দিছে গালি গো,
ঝাল দিল জিরা দিল আর মশলা গো,
ভাল করে রাঁধবি, ধনি, কালায় খাবে ভাত গো ॥ —ঐ

১০২

কোন করকচি বাটিছে বৌর কুটা হইল যে,
শিলাই নদীর শিলে, মাগো, কাসাই নদীর নোড়া,
ছেচাইলে না ছেচা যায় গো বিষ্টুপুরের হলুদ। —ঐ

১০৩

মাঠে মাঠে গোঁসাই ঠাকুর আছে বরণ ভালো,
শ্বশুর বাড়ী হাঁড়ী মাইজ্যে গা হইল কাল।
কুলি কুলি আইচ ফুল মালা গইরে,
দেখি বন্ধুর কদ্দুর বিবেচনা, কার ঘরে সামায়। —ঐ

১০৪

কাল জলে কুচিলা তলে, ডুবলো মন আমার,
কালি সারাদিন আজি সারাদিন কোথা গেছিলে মনোহর।

দেশে উঠেছে ভাই নোতন গহনা
ও সখী, আমি আর কুলে রইব না। —ঐ

১০৫

কিসে রহব গো, ধনি, কিসে রহব গো,
এক লোককে শরীর বনে ভয় লাগে।
পীরিতি করিলে ভয় ভাঙ্গে। —ঐ

১০৬

জেগে রইলাম সারা নিশি
না আইল কালাশশী, শশী গো,
প্রকাশিলে পুর্বে দিশি বাঁশি তবে গুণ গো,
আমার প্রাণধন কেন এল না গো নিশি হল ভোর,
গাঁথিয়ে বনফুল শয্যা,
আর না আইল চিকন কালাগো,
আমার মন হইল উতলা শুনে বাঁশীর স্বর,
মনরে শুনে বাঁশীর স্বর। —ঐ

১০৭

শতদল কমল বিরাজ করলাম রসরাজে,
আছেন পদ্ম সরোবরের মাঝে,
বন্ধু নিবান আগুন
বন্ধু জ্বাইল্যা দিলে
বন্ধু, ঐ লব বুকে
বাড়াইও নবীন পিরিত আশা তাদিক প্রতিদিনে॥
তার আগে যদি জানতাম যমে প্রেম বাড়াতাম কেসে
অবলা দুঃখিনী নারী রাজ গুণে বঁধু,
নিতুই আগুন নবীন পিরিতি।
ওরে বন পুড়িলে সবাই দেখে,
মন পুড়িলে কেউ না ত্যাখে
ও-মন পুড়ে মনের আগুন
বঁধু, নিতুই আগুন। —ঐ

১০৮

প্রথম পিরীতির কালে মনে নাই হে কি বলেছিল,
ভুলিব না কোনকালে কিন্তু ভুলিলে হে আজ।
তোমার ভালবাসায় কাজ কি, ফিরে যাও হে, দাগাবাজ।
বাজে আমি এমন প্রেমে বাজে আমি এমন মনে গো
জোড়া যায়না ও তোর ভাঙ্গা মন।
কেন কর জ্বালাতন গো।
কিন্তু ভুলিব না কোনকালে ভুলিলে হে আজ॥ —ঐ

১০৯

সুন্দর রূপে সুন্দর ছিল, তারা ভাইয়ে ভাইয়ে বাদ সাধিল,
সামান্য নারীর লাইগ্যে বন্ধু হারাইল জীবন।
নারী না হইল আপন, কত করি নিবেদন॥
নারীর দুরন্ত মতি পেয়েছে না মোহন পতি
নারী না বুঝে নিলে নারায়ণ, কত করি নিবেদন নারী না হল আপন॥ —ঐ

১১০

চল সজনি সঙ্গে যাব, বিরলেতে প্রেম করিব।
গামছায় বেন্ধে এনে দিব চিনি আর চিঁড়া।
ও তুই কাঁদিস না, ভাবিস না, ধনি, আমার কিরা,
চলগো, রাই, বনে যাব,
ফুল তুলিয়ে ঘর খুঁড়িব
শিবরামের মালা গাঁথা রইল শিকার উপরে।
আমার গত নিশি এসে ফিরে গেছে গো, কপালের ফেরে।
লোকে বলে ভুলো ভুলো আমি কি ভুলিব বলো।
সে ভুলিলে ক্ষতি নাই আমার।
বলো তারে কি পাসরা যায়,
দিবানিশি এরূপ জাগিছে হিয়ায়॥ —ঐ

১১১

চোখে দিব চুণকালি ছাড়াব তোর নাগরালি।
বসিতে না দিব তরুমূলে,

ধনি লো, তুই ধৈরজ বাঁধ,
ও পীরিতির পাতার যদি ফাঁদলো
ধনি লো, তুই ধৈরজ বাঁধ।
ডাকি তোরে ভক্তি ভরে,
তবু না চাইলে ফিরে
আমি হলাম, সখি, কত অপমান গো ॥
আমি রাখিব না এ পরাণ
বেঁচে থাকা আমার মরণ সমান রে।
কেন বিধি নারী জনম দিয়েছে আমায়
আমার কাজও নাই জীবনে ছার
ঝাঁপ দিবে যমুনায়।
পরাণ ঝাঁঝর হোল রে বঁধুর জালায় ॥ —ঐ

১১২

যেমনি হলুদের রঙ্‌ তেমনি বিদেশীর সঙ্‌ গো,
পিঞ্জরার পোষা পাখী যেমন পালায় গো বনে,
ও বিদেশীর সনে।
বিদেশীর সঙ্‌ ছেড়ে যাবি ও তুই ভাববি গো মনে ॥
ও ভাব করিবে সাবধানে ও বিদেশীর সনে ॥

১১৩

লাল শালুকের ফুল, বন্ধু, ফুটে আঁধারেতে।
যার মনে যার ভাব থাকে মরিলে কি টুটে, বন্ধু।
এত রাত কিসের,
এত বাত কিসের, বন্ধু, এত রাত কিসের ॥
এস, এস, এস বন্ধু বস পালঙ্কেতে
পা ধোয়াব নয়ন জলে মুছাইব কেশে, বন্ধু,
এত রাত কিসের ॥

১১৪

যমুনার জল আনতে যাইয়ে
শ্যামের মনে দেখা, বন্ধু, শ্যামের সঙ্গে দেখা, বন্ধু,

আজ বলিব, কাল বলিব, পরশু দিব কথা, বন্ধু,
আজ কেন গোঁসা, বন্ধু, আজ কেন মন গোঁসা।
রাস্তার মাঝে দাঁড়াই একা, বলিব দুঃখের কথা, বন্ধু,
আজ কেন মন গোঁসা ॥
সরোবরের জল শুকাল পদ্মপাতের ছায়া, বন্ধু, পদ্মপাতের ছায়া
আজ কেন মন গোঁসা ॥
হেন জয়চাঁদ বাউলে বলে, কেন এমন দশা,
রাস্তার মাঝে দাঁড়াই একা বলিব দুঃখের কথা
বন্ধু, বলিব দুঃখের কথা ॥

১১৫

ওদিন পীরিতির নীতি, আমি কি জানি হে হরি,
অবলারে ভুলো না, শ্যাম, রেখো মনে করি,
দেখো আধা দিনে বঁধু, যায়ো না পাসরি ॥
আমি তোমায় ভুলব না হে, যতদিন না মরি,
দেখো আধা দিনে হে বন্ধু, যায়ো না পাসরি ॥
যে করিল পর পীরিতি, ভাবিয়া না পাইগো থিতি,
বরং জাতি ছাড়া যায় গো, পীরিতি ছাড়া দায়।
এমনি পীরিতির লেঠা, ছাড়িলে না ছাড়ে সেথা,
শেয়াকুলের কাঁটা যেমন আমার বিঁধিছে হিয়ায়,
বরং জাতি ছাড়া যায় গো, পীরিতি ছাড়া দায় ॥

—পচাপানি (মেদিনীপুর)

১১৬

ও, না জানে কাজ করেছিলুম।
ও ভাবিয়া আগে, হে শ্যাম, না ভাবিয়া আগে,
সরল জেনে প্রেম করিলাম, সহে না অন্তরে।
বঁধু, কি বলিব তোরে, আমি নারী কেঁদে মরি।
শ্যামের বিয়োগে শুনে।
বাঁশী মন উদাসী,
ভাবি তোমার লাগি, হে শ্যাম, কি বলিব তোরে।

যে জ্বালা দিয়েছে মোরে, আমার হিয়ায় জাগে ॥
মরলে গরল ঢালিবে হে শ্যাম, কেলি অনুরাগে,
কী বলিব তোরে ॥ —ঐ

১১৭

পড়িল আষাঢ় মাস, নানা রঙ্গা লিয়া,
ঝুমুর বাজনা শুনে ছুছকে ছাড়িয়া
হামকে নাচিতে না দিয়া ॥
শুন শুন শ্বশুর বাবু আমার বলিয়া,
সংগী মেরা নাচত আজিকাল রাতিয়া,
হামকে নাচিতে না দিয়া ॥
পাতিলাম প্রেম পীরিতি চিরদিনের লাগি,
মানুষ জনম, দুলভ জনম হাসি খোল লিয়া,
হামকে নাচিতে না দিয়া ॥ —ঐ

১১৮

পীরিতি করিলে, ধনি, সমানে সমানে,
তিলেক যদি কম হয়, অনা লাগে মনে
তবে কাজ কি তোর জেনে ঠাঁই,
তবে এমন কে আছে, ধনি, দুঃখ নিবারণে।
আছে আছে আছে, সখি, আছে পর দেশে,
কাজ কী তোর প্রেমে ॥
খাওয়া-দাওয়া দিয়ে বাদ করেছি তোর সঙ্গে।
তুই, ধনি, বড় দাগাবাজ লো।
তবু না পুরালি মনের সাধরে। —ঐ

১১৯

একলা নারীর কুঞ্জ মাঝে. দাঁড়িয়ে আছে কিবা কাজে
ছি-ছি, বন্ধু, লাজ নাই বদনে।
এসেছ, যাও মানে মানে নিলাজ হে,
নতুবা কেন্দে কেন্দে যাও অপমানে।
নইলে আমি ঝাঁপ দিব জ্বলন্ত আগুনে।

শুন গো ললিতা, কহেন ভবপিতা, ধরিয়া আন অবলা পরাণ,
পিরিতি মারে বাণ অলসে অবলা পরাণ ॥ —ঐ

১২০

জলসজ্জা সরোবর ফুলসজ্জা তরুবর,
লাল শিমূলের ফুলে গন্ধ না মিলে
ও সাধের মানব জনম, বন্ধু, বিফলে গেল।
চোখ থাকিতে হইলেম অন্ধ, মুখ থাকিতে হইলেম বোবা,
কর্ণ থাকিতে আমি কালা হইলেম,
ও সাধের মানব-জনম, বন্ধু, বিফলে গেল।
দেহে দু'জন বন্দী ছিল তারা না বাগে ফিরিল।
বন্ধুর মনে ছিল কথা যদি পাই নিরলে দেখা ॥ —ঐ

খেয়াল

খেয়াল হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত; কিন্তু পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীতও খেয়াল নামে প্রচলিত। বলা বাহুল্য, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে খেয়াল একান্ত সুর-নির্ভর সঙ্গীত, কিন্তু বাংলা লোক-সঙ্গীতের খেয়াল গানে কথা প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে, উচ্চাঙ্গ খেয়ালের সঙ্গে এই বিষয়ে কিংবা অন্যান্য কোন বিষয়েই ইহার কোন সম্পর্ক নাই। খেয়ালী রাখাল-মনের গানকেই পূর্ব মৈমনসিংহে খেয়াল গান বলা হইয়া থাকে। (রওশান ইজদানী 'মোসেনশাহীর লোক-সাহিত্য', ঢাকা, ১৩৬৪, পৃ, ৫৪—৫৬ দ্রষ্টব্য)। ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যায়—

১

দুঃখু কইও বন্ধের লাগ পাইলে, গো নিরলে ॥
আমার বন্ধু রঙ্গি চঙ্গি,
চলের উপর বান্‌ছে টঙ্গি গো,
দুই হাত উড়াইয়া বন্ধে ডাকে, গো নিরলে
দুঃখ কইও বন্ধের লাগ পাইলে।
আমার বন্ধু কালাচান,
তিল কুড়াইয়া বুন্‌ছে ধান গো,

সেই ধানও খাইলো রাজার আঁসে (হাঁসে), গো নিরলে,
দুঃখু কইও বন্ধের লাগ পাইলে ॥ —মৈমনসিংহ

ইহাদের সুর পুর্ববাংলার ভাটিয়ালী সুর, সুতরাং হিন্দুস্থানী খেয়ালের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

রাখালী গান বিচ্ছেদ ও খেয়াল এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বিচ্ছেদ গভীর ভাবের গান, খেয়াল সাধারণতঃ লঘু ভাবের গান। আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

২

কার ঘরের রঙিলা বিলাইরে।
বিলাইরে,
কাইল খাইছিলে ভাজা মাছ
আইজো আইছস লোভে,
দুই কান কাটিব তোর
কুড়ালেরি কুবে রে।
কার ঘরের রঙিলা বিলাইরে ॥
বিলাইরে,
পুবের পাড়ায় থাক রে বিলাই
পশ্চিম পাড়ায় থানা,
এই বিলাইর কারণে আমার
বাঁও চৌখটি কাণা রে ॥
বিলাইরে,
ফুটি ফুটি মেঘের মাঝে
বাইরে কেন ভিজ,
ঘরের পাছে ছাইত্যাণী গাছ
কাইট্যা ছাতি ধর রে ॥ —ঐ

বলা বাহুল্য, বিলাই অর্থাৎ বিড়াল এখানে রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গ

গড় খেম্‌টা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই কলিকাতা মহানগরীকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর ভারত হইতে আগত যে সকল গানের চর্চা হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে খেম্‌টা তালের গান অন্যতম। খেম্‌টার দুইটি প্রধান বিভাগ—আড় খেম্‌টা (পূর্বে দ্রষ্টব্য) ও গড় খেম্‌টা। খেম্‌টা ও আড় খেম্‌টা বারমাত্রার তাল, কিন্তু গড় খেম্‌টা ছয় মাত্রার তাল। নানা বিষয়ক সঙ্গীতই এই তালে রচিত হইতে পারে। তবে ইহার সুর তাল-প্রধান বলিয়া লঘু-বিষয়ক সঙ্গীতই ইহার উপযোগী।

১

হরিধন প্রাপ্ত হ'লে তা'হলে কি হয় লাভ,
স্বভাব দোষে, সকল নাশে, যদি না ঘোচে স্বভাব।
যদি স্বভাব ঘুচে যায়, অভাব নাহি রয়,
প্রেমে তনু ডগমগ হরি তার পানে চায়,
যেমন বৎসের পিছে গাভী বেড়ায়, সদায় করে হাম্বা রব ॥
স্বভাব দোষ এমনি অলক্ষ্মী, শুন তার সাক্ষী,
শ্রীরামলক্ষ্মণ পেয়েছিল মাছরাঙ্গা পাখী,
পাখী জান্‌ল না তার মাহাত্ম্য কি, নিল মাছধরা বর ত্যজে সব ॥
স্বভাব দোষ এমনি কুলক্ষণতা তার সাক্ষী কপিগণ,
বনে বসি শ্রীরাম শশী পেল সর্বজন,
শেষে রাবণ মারি লঙ্কাপুরী, হ'ল রাম ত্যজে নারী বল্লভ ॥
হনুমান স্বভাব ঘুচায়ে, পঞ্চজন ল'য়ে,
শ্রীরাম পদে মনকে বেঁধে থাক্‌ল ভাব লয়ে,
[illegible] রাম চরণে প্রাণ সঁপিয়ে, পেল রাম পদ বল্লভ ॥

গোঁসাই গুরুচাঁদ বলে, স্বভাব ঘুচিলে,
শঙ্করের হৃদিনিধি হরিধন মিলে,
অশ্বিনী তোর এই কপালে, ঘটবে কি সেই গোঁসাইর ভাব ॥

—মুর্শিদাবাদ

২

কামিনী কাল-নাগিনী, ফণিনীর বিশাল বিষ।
ও যার নিঃশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ড নাশে, না জেনে কেন হস্ত দিস্।
সে ফণীর ভঙ্গী বোঝা দায়, মুনির মন ভুলায়,
কত ওঝা বৈদ্য সাপুড়ে খেল, দেখতে লাগে ভয় ;
ও সে ইসারাতে মানুষ মজায়, নয়ন দেখে চিনে নিস্ ॥
সে ফণীর যুগল মণি রয়, বক্ষে শোভা পায়,
দেখলে পরে একেবারে মানুষ ভেক্ লোভায়,
ও সে আকর্ষণে আহার যোগায়, তাই দেখে কেউ দিস্‌নে হিস্ ॥
সে ফণীর বিলাস বনে বাস, মনে অভিলাষ,
কাম্য বনে আসা যাওয়া করে বার মাস,
কেন গুরুচাঁদের বাক্য ফেলে সেই বনে ভ্রমণ করিস্ ॥
সে ফণীর মন্ত্র শুন ভাই, শ্রীগুরুর দোহাই,
হরির নামটি মহামন্ত্র তা বিনে আর নাই,
গুরুর বাক্য ক'রে ঐক্য মা বলা ধূল পড়া দিস্ ॥
মহানন্দের ভারতী, তুই শুন্ রে দুর্মতি ;
গুরু কল্প ইসার মূলে থাক দিবারাতি,
অশ্বিনী তোর হয়না মতি, ঘরে বসে কি করিস্ ॥

—মুর্শিদাবাদ

৩

কেন নিশ্চিন্ত রইলি রে ভণ্ড মন।
এ যে সংসার প্রবাসে বন্দী রইলি বন্দী ফাঁসে
কিসে মুক্তি পাবি সে ভব-বন্ধন।
ও তুই মুক্তকেশীর দয়া বিনে মুক্তিলাভ করতে পাবিনে
মায়ের ঐ রূপ কর দরশন ॥

মুখে অট্ট অট্ট হাসি তাহে খটমট ভাসি
সত্য করা জিহ্বা অসি সুশোভন।
নীল নলিনী নিশান চিন্ময়ী শ্রীঅঙ্গে আভা
নীলকান্ত নির্বিচারী চন্দ্রানন॥
গোপাল বলে শোন মূঢ়মন হংস মন্ত্র কর গ্রহণ,
নিরান্তরে হংসি নীরে পাঠাও মন্ত্রে আকর্ষণ।
তুই নাশাছিদ্রের হাওয়া ধরে হংসবীজ,
উঠাও তার উপরে তবে পাবি ঐ রূপ দরশন। —মুর্শিদাবাদ

৪

তোরা কি প্রেম করিবি পাগল হবি ধ'রবি কি পাগলের বুলি।
গৃহে থাক্ আছিস ভাল, তোরাই ভাল কেন দিবি কুলে কালি॥
পাগলের পাগলা ধরণ, উল্টা করণ, রসের পাগল প্রাণ পুতুলী।
দেখলে পাগলের কর্ম ধর্মাধর্ম সকল দিবি জলাঞ্জলি॥
থাকবেনা দিক্ কি বিদিক্, কেবল নিরিখ, মন থাকবে এক মানুষ বলি।
পাগলের সঙ্গ নিবি পাগল হবি সারবে না তা বিষ্ণুতৈলে॥
থাকবে না তন্ত্রমন্ত্র, মূলমন্ত্র দীক্ষাশিক্ষা কপ্নী ঝুলি।
থাকবে না সাধ্য সাধন, বেদের কারণ, কাঁদবি শেষে গলি গলি॥
গোপীদের রাগের ভজন, মন্ত্র মাজন, কোন গোপীদের গ্রন্থে পালি।
গোপীর ভাব কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণে আর্তি প্রাণ বাঁচে সেই কৃষ্ণ পালি॥
গোপীর ভাব দেহ অর্পণ, জীবন মন, এ দেহ সেই কৃষ্ণের বলি ;
গোপীর ভাব সেই স্বরূপে, বিষয়-কূপে তারক কেন ডুবে রলি॥

—মুর্শিদাবাদ

গমীরা

উত্তর বাংলা প্রধানতঃ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চলের রাজবংশী এবং কোচ জাতির মধ্যে প্রচলিত এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীতের নাম গমীরা। মালদহ অঞ্চলে যে গম্ভীরা গান প্রচলিত, ইহার সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই, অথচ গমীরা নামটির সঙ্গে গম্ভীরা শব্দের যে কোন না কোন ভাবে যোগ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। উত্তর বাংলার লোক-সংস্কৃতির উপকরণ সাধারণতঃ

উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে প্রসার লাভ করিয়াছে। লৌকিক শৈব ধর্মের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিলে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং গমীরা শব্দটিই ক্রমে সংস্কৃত প্রভাবের বশবর্তী হইয়া গম্ভীরায় পরিণত হইয়া থাকিবে, গম্ভীরা শব্দ হইতে গমীরার উৎপত্তি হয় নাই, তাহা সত্য। যে কোন বিষয় লইয়াই গমীরা গান রচিত হইতে পারে। চৈত্র সংক্রান্তির সময় কয়েকদিন এই গান হয়। একটি শিবমূর্তি স্থাপন করিবারও রীতি আছে। তবে গানে তাহাকে উদ্দেশ্য করা হয় না। গানের বিষয়বস্তু অনুযায়ী কথনও ইহা চটকা, কথনও ইহা ভাওয়াইয়ার সুরে গাওয়া হয়। বাদ্য যন্ত্ররূপে দোতারার ব্যবহার হইয়া থাকে।

১

তোর টাকা খাইয়া তোর মুখত বাধিনি ডাংগাও তোর গে আই ॥
এমন বেসালেন জায়োই আর মুলকত বরগে পালেক নাই ॥
ও আই, টাকার লোভে বুড়াক দিলেন,
আর মুলুকত বর নাই পালেন
মোক কি সবাই যে গে বুড়ি, আই ॥
সগায় কহে জেঠাই খুড়াই
কাহো কাছ বুড়ি আই, বুড়ি আই,
নদারী কবার গে মানষি নাই ॥
ও আই, সাজি বুড়ি গুয়া পান,
বুড়া বরের কেদেলান গুয়া ডুমাইতে যাবে জান ॥ —জলপাইগুড়ি

২

ও ভদি, কি বা কহিন তোক থাকিয়া
কে বা খায়ায়া দিবে আসিয়া
ও লো ভদি, শুন আসি
শুন রে মোর কাথা আজি
নদারিটি মরিয়া কইর‍্যাছে বাউরা
· কি বা থাকিবক মুই চায়্যা
মনত আর বান্ধন মানে না। —ঐ

৩

ও মোর আবোগে,
হাউসের দিন মোর যাছে গো বয়া।
না খাও আবো দহি চুড়া
করেক আবো চাউলের গুড়া।
আবো বাড়িতে চেংগেরা আছে
যে লায় দেখে সে লায় হাসে
কুন দিন বা মোক ধরিয়া যাবে॥ —ঐ

৪

ও মন মোর কান্দেরে দেখিয়া পাথারে॥
বাপ মায়ে মোক বেচেয়া খালেক নাবালক ভাতারে॥
বাপ মরুক মাও মরুকরে মরুক পাড়ার লোক,
কাড়োয়া মরাক বাঘে খাউক নিধুয়া পাথারে॥
বাপ মাওক জানাও খবর রে কিনিয়া পেঠাউক গাই।
তাহার দুগ্ধ খায়া মানুষ হউক নাবালক জামাই॥ —ঐ

গানের বিষয়বস্তুটি লক্ষ্য করিবার যোগ্য। এক যুবতীর সঙ্গে এক বালকের (না-বালক) বিবাহ হইয়াছে। বালক কবে যুবক হইবে, যুবতী সেইদিনের প্রতীক্ষা করিয়া বিলাপ করিতেছে। বাপ মা যে তাহাকে নাবালক স্বামীর নিকট বিক্রয় করিয়াছে, সে'জন্য সে তাহাদিগকেও গানের ভিতর দিয়া অভিশাপ দিতেছে।

৫

হামরা হলাম চাষী মানষী, যে বুলাইছ সেই বুইল্যাছি।
আইয়াছে ভোটের পালে খ্যায়্যায়া দিমু কাচা কলা॥ —ঐ

গম্ভীরা গান

উত্তর বঙ্গের লোক-সঙ্গীতের মধ্যে প্রথমেই দেখা যায় যে, মালদহ অঞ্চলে এক বিশিষ্ট প্রকৃতির সঙ্গীত ব্যাপক প্রচলিত আছে; তাহা গম্ভীরা গান বলিয়া পরিচিত। ইহা মালদহ ব্যতীত আর কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না।

জলপাইগুড়ি জেলায় গমীরা নামে এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত আছে, তাহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র।

গম্ভীরা গান আঞ্চলিক সঙ্গীত হইলেও ইহা বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত। সেই অনুষ্ঠান শিবের গাজন, ইহা এই অঞ্চলে আদ্যের গম্ভীরা বলিয়া পরিচিত। আদ্য বা শিবের গম্ভীরা উপলক্ষে যে গান হয়, তাহাও গম্ভীরা গান। গম্ভীরার অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুখোস নৃত্যও হইয়া থাকে, তাহাও গম্ভীরা নৃত্য বলিয়া পরিচিত।

চৈত্র সংক্রান্তির অন্ততঃ পাঁচ দিন আগে হইতেই এই উৎসবের সূচনা হয় এবং এই পাঁচ দিন ধরিয়াই যে আচার পালন করা হইয়া থাকে, তাহাতে নানা আচার-মূলক সঙ্গীত গীত হয়। ইহার মধ্যেও মানত করিয়া সন্ন্যাসী হওয়ার রীতি প্রচলিত আছে এবং সন্ন্যাসীরাই আচার-সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই আচারানুষ্ঠানের বাহিরেও সাধারণ লোক সমবেত হইয়া এক লৌকিক সঙ্গীতানুষ্ঠান পালন করে। তাহাতে একটি গানের আসরে শিবের ঘট স্থাপন করিয়া শিবকে উদ্দেশ্য করিয়াই নানা গীত রচনা করা হইয়া থাকে। গানগুলি সকলই সাময়িক ঘটনামূলক। প্রধানতঃ সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ইহা বর্ষবিবরণী পর্যালোচনা মাত্র। চৈত্র সংক্রান্তির দিন বৎসরের ঘটনাবলীর একটা হিসাব নিকাশ লওয়া হয়, তাহাতে প্রধানতঃ সমাজের অভাব-অভিযোগের কথাই বিশেষ ভাবে শুনিতে পাওয়া যায়। গানগুলি কেবলমাত্র সাময়িক ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাদের সাহিত্যগুণ বিশেষ কিছুই থাকে না। ইহাদের মধ্যে কোন ভাব-গভীরতাও নাই; রচনার পরিপাট্য নাই; কোনদিক দিয়াই কোন কবিত্বেরও স্পর্শ নাই। আধুনিক কালে ইহাদের মধ্য সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তা গিয়াও প্রবেশ করিয়াছে।

এই গানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকটি গানই শিবঠাকুরকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত হইয়া থাকে। সংসারের সকল সুখদুঃখ অভাব-অভিযোগের কারণই শিব, তাঁহার নিকট এই সকল বিষয়ে অভিযোগ জানাইয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করাই গম্ভীরা গানের মূল উদ্দেশ্য। শিব ঘটে অধিষ্ঠান করিয়া নির্বিকারভাবে এই সকল অভিযোগ, এমন কি, অনেক সময় তিরস্কারও শুনিয়া যান। ইহাদের মধ্য দিয়া ভক্তের সঙ্গে ভগবানের কোন সুদূর পার্থক্য কল্পিত হয় না।

মালদহ ব্যতীত আর কোথাও গম্ভীরা গান শুনিতে পাওয়া যায় না বলিয়া প্রত্যেকটি গানের পার্শ্বে ইহার সংগ্রহ স্থলের উল্লেখ করা হইল না, শুধু সংগ্রহকাল নির্দেশ করা হইল। সকল গানই মালদহে সংগৃহীত বুঝিতে হইবে।

১

শিব, মনের কথা দু'টা বলিব
এনে জড় জগতে, ঘুরাও নানা পথে,
কোথা গেলে দেখা পাইব।
পড়ে শুনে শিখি শুধু তুমি বিশ্বেশ্বর,
বচন আওড়াতে আমরা হয়েছি খুব দড় ;
ভুলে গেছি তব পুজা, তাই আমরা পাচ্ছি সাজা,
দুঃখের কথা কারে কহিব।
ধরমের সার গেছে কাল-স্রোতে ভেসে
সংস্কার রয়েছে এ পোড়া দেশে।
বল পুনঃ কিসে ধর্ম ফিরে আসে,
সেই উপায় আমরা শিখিব।
নিজ নিজ স্বার্থ হ'ল ধর্ম কর্ম
এই কি, শিব, তোমার সনাতন ধর্ম,
বুঝে দশের মর্ম করিব যে কর্ম
খাঁটি কর্ম এবার হইব।
ত্যাগী বেশে তুমি এসে এই গম্ভীরায়,
মন সাধে পুজি মোরা ভাইবোনে সবায়,
হায়, একি হল দায়, নিজে ত্যাগী হ'তে নাহি চায়,
এ ছলনা আমরা ছাড়িব।
বৃথা নাহি পুজিব পত্র-পুষ্প-ফলে
বিবেক ফুল মাখিয়ে ভক্তি গঙ্গাজলে,
শরৎ দাসে বলে দিব পদে তুলে,
জনম সফল আমরা করিব। (১৯১৫)

নিম্নোদ্ধৃত গানও শিবকেই লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহা গম্ভীরা গানের বন্দনা-ভাগের একটি অংশ।

২

আমায় সঙ্গে করে, হাতে ধরে, ঘরে নিয়ে যাও হে।
তোমার আহ্বান ধ্বনি, শুনে না শুনি (আমায়) ঘেরিয়ে দাঁড়াও হে।
বাসনার আশাবাণী, মরীচিকার মত টানি আগুনে পোড়াও হে,
তুমি শীতল করে দগ্ধ মর্ম-যন্ত্রনা ঘুচাও হে॥
নাহি চিনি আত্মপরে, উচ্চ শির গর্বভরে, অমঙ্গলে ধায় হে ;—
আমার মাথাটি ধরে, নত করে, তোমার পায়ের তলে নাও হে॥
উদ্‌ভ্রান্ত নয়ন দুটী, করে মিছে ছুটাছুটি, দেখিতে না পায় হে ;—
আমায় ঘেরিয়াছে মোহ-আঁধারে আলো জেলে দাও হে॥
যতই তোমারে খুঁজি, ততই হারাই পুঁজি, সময় যে যায় হে ;
আমার সম্মুখে এসে, হেসে হেসে গন্তব্য দেখাও হে॥
বিশ্বময় হও তুমি, তোমারই ত ছেলে আমি, বলে দাও উপায় হে ;
গোপালেরে কোলে তুলে মুখ পানে চাও হে॥ (১৯১৫)

৩

বুড়াটা আস্ত বাগ্ধা মাথায় লাগ্ধা[১] আনছে গ্যাখ সাঁপহে।
(মাথায়) জটায় কুকরী, জুয়ান ছুকরী বস্থা উটা কে হে॥
(মাথাৎ) ছ'রঙ্গের সাঁপ দেখছি ছটা, কাম ক্রোধাদি রিপু কটা,
ত্যাগ জড়িত গুণে বুড়াটা, কেঁচার লাখান[২] কল্লে হে (সাঁপকে)।
গায়ে দেখছি গুদরী গুদরা[৩], পরনে এক বাঘের চামড়া,
মজা লুটছে ভূত প্যারত্‌রা হামরা কি কেও নই হে॥
চেহারাটা ঠিক পূর্ণিমার চাঁদ, ধরেছে দুনিয়া ভুলা ফাঁদ,
ভক্তি-মাটির বাঁধলে রে বাঁধ পারে যাওয়া যায় হে॥ (১৯১৪)

৪

ভোলা বেশ ভালত মজা
এ কেমন তোমার পূজা।
করলি ভ্যাকম এক রকম
ঠিক যেন ভ্যাক ভাকুম বাজা,
এ কেমন তোমার পূজা।

---

১ লাগ্ধা=বোঝাই করিয়া ; ২ লাখান=মত ; ৩ গুদরী গুদরা=ছেঁড়াকাপড়।

মুলুকাসানে আছ আসানে
শ্মশানে হয়্যা মশানের রাজা
এ কেমন তোমার পূজা ॥
(ভোলাহে) আবার পইর‍্যা কপ্‌নি
আছ আপ্‌নি
ঢুল্যা ঢুল্যা খাচ্ছ গাঁজা
এ কেমন তোমার পুজা।
(আবার) কুচনি পাড়ায় বেড়াও ঘুর‍্যা
কখনও বা দামড়ায় চড়্যা (শিব)
টানে টানে পর‍্যা দো-টানে
চটানে পর‍্যা ঢুলকাই জুজ্যা,
বসন বাঘছাল মড়ার খাপটা
ভূষণ অলোদ, গহমা ভ্যাপটা (শিব)।
দেখ্ দেখ্ বাইদার ব্যাটা,
গণশার বাপটা।
ঠিক যেন কোন গুণী রোঝা,
এ কেমন তোমার পুজা। —(১৯৪০)

অনাবৃষ্টিই কৃষক-জীবনে চরম দুর্ভাগ্য, অনাবৃষ্টির জন্য কৃষকেরা গম্ভীরা গানের মধ্য দিয়া এখানে শিবকেই দায়ী করিয়া থাকে। যদিও বৃষ্টির দেবতা, কোন কোন ক্ষেত্রে সূর্য, এখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়; শিবই এই অঞ্চলের সকল প্রকার সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের দুর্ভাগ্যের একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করা হয়।

৫

শিব, তোমার লীলাখেলা কর অবসান,
বুঝি বাঁচে না আর জান।
অনাবৃষ্টি কর‍্যা সৃষ্টি
মাটি করলা নষ্ট হে,
দৃষ্টি থাকতে কষ্টি কইর‍্যা
দেখছ না কি কষ্ট হে,

মিষ্ট কথায় তুষ্ট কইর‍্যা
শিষ্ট লোকের ইষ্ট মাইর‍্যা,
করিলা মোদের গুষ্টি ছাড়া।
শুন বলি পষ্ট কর‍্যা,
তারপরে ম্যালেরিয়ায়
হইলাম হালা কাণ,
বুঝি বাঁচে না আর জান।
অন্নদা মা ভিক্ষা তোমার
করবে না কি দান হে,
সময় কালে না হয়্যা জল
অসময়ে ফলল কুফল
(ও সব) মুশুরী কলাই গেল ডুব্যা
ক্ষেতের ফসল ম'ল,
আম গ্যাল আম ছালা গ্যাল
ক্যামনে ধরি গান
বুঝি বাঁচে না আর জান। —ঐ

৬

এবার কি খাবা, হে বাবা, পুয়াল চাবাও বইস্যা।
কোন মুলুকের বন্যা এলো মোর বাবা হে—
মোর বাব্বী হে।
কোন্ দোখ্না বাতাস আইস্যা হে পুয়াল চাবাও বইস্যা।
আমের গাছের ডান্টা খাড়ু ভাদই ধানের আশা ছাড়
ভাতিয়ার বিল হাতিয়ায় নিলে মোর বাবা হে
মোর বাব্বী হে।
কোন্ দোখ্না বাসাত আইস্যা হে পুয়াল চাবাও বইস্যা। —ঐ

৭

শিব কি করিব হে এবার বাঁচাবে না প্রাণ,
টাকা স্যারের চাউল হয়্যা লাইগ্যা গ্যাল টান।
বাঁচবে না আর প্রাণ॥

আমাদের দ্যাশের আম্র ফলটি সেও হ'ল মাটি
পলু-পুশা পাছি দিসা দর হল খাঁটি হে,
দর হল কুড়ি পঁচিশ পলু-পুসা লাগছে যে দিস,
এ ক্যামন হ'ল দ্যাশের ধারা, বল, বাঁচব ক্যামনে মোরা।
কৃষকেরা ভাবছে বইস্যা উপায় কিবা করিহে,
ধান কলাই হল না ভাই হল না জল ঝড়ি হে।
জল বিনা সব মইল গরু বকরী এ কি হোল বিষম জ্বালা।
ক্যামনে বাঁচবে ছেইলা পিলা।
গরীবেরা ভাবছে বইস্যা উপায় কিবা করি হে,
এক সের চাউল হয়্যা না খাইয়্যা সব মরি হে।
ভুট মোটর ঘোড়ার খানা দর হোল যে মাখন ছানা,
এ কষ্টে পয়দা গেল মরে রাজ্য চলবে ক্যামন করে,
দিনে দিনে হ'ল কঠিন ক্যামনে পাব ত্রাণ,
শিব, কি করিব হে এবার বাঁচবে না আর প্রাণ। (১৯৪২)

৮

আজ ভাল মানুষির দিন গিয়াছে, ওহে পশুপতি,
তিন চোখে কি দ্যাখতে পাওনা মোদের কি দুর্গতি।
জাল জালিয়াতি বিশ্ব জুড়্যা
ব্লাক মার্কেট বাজার ভইর্যা
গাড়ী চালায় বাড়ী হাঁকায় জ্বালায় বিজলী বাতি ॥
বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম সেবা রসাতলে গেল ডুব্যা,
হিংসা-বিবাদ দলাদলি হায়রে কি দুর্মতি ॥
ন্যাংটা হয়্যা প্যাংটো মুখে মরলো যে সব গরীব লোক,
তাইতো মোরা ন্যাংটা ভোলার কাছে জানাই নতি ॥ (১৯৪৬)

৯

শিব, সামলারে তোর বুড়ো এড়ে
তাড়িয়ে মারে ঢিসরে !
তোর কাঁধে ঝোলে ভিক্ষের ঝুলি,
গলায় ভরা বিষ রে !!

কোঁচেরা সব সল্লা করে,
(তোর) এঁড়ে দিবে খোঁয়াড়ে ওরে,
তখন বাড়ি বাড়ি মাগুন করে, জরিমানা দিস রে !!

১০

তুমি হ'য়ে চাষী কাশীবাসী কেন কাশীশ্বর,
কর্মক্ষেত্র এ ব্রহ্মাণ্ড ক্ষেত্র তব হর।
মন আত্মা দুই বলদে বেঁধে
কর্ম-জুয়াল চাপিয়ে কাঁধে
মায়ারজ্জু নাশায় ছেঁদে কতই বা আর তাড় ?
সুখ দুঃখ দুই শক্ত জোতা
সেই জুয়ালে আছে যোতা
আশা লাঠির দিচ্ছ গুঁতা, ওহে দিগম্বর ! —ঐ

১১

স্বরাজ যদি পাই হে ভোলা,
খাত্যে দিমু মানিকের কলা,
নইলে আইঠ্যার কলা বিচ্চি আলা। —ঐ

পূর্বেই বলিয়াছি, গানগুলি সম্পূর্ণই কবিত্ব বিবর্জিত ; সুতরাং সাহিত্যগুণ ইহাদের কিছু মাত্র নাই। তথাপি আঞ্চলিক সঙ্গীতের বিশেষ নিদর্শনরূপে আরও কয়েকটি গান উদ্ধৃত হইল।

১২

(তুমি) কেন উদাসী, কাশীবাসী, ওহে কাশীশ্বর।
দুনিয়াটা যায় রসাতল, রক্ষা কর, হর॥
কামার কুমার ছুতার চাষা
ছাড়লো তারা জাত-ব্যবসা
চাকরী লয়ে বাবু হয়ে ভাবছে কত বড়।
গাঁয়ের মাটিশিল্প হল মাটি,
বাংলার মাটি আছে খাঁটি
কৃষি-শিল্পে শিখাও মোদের
(তুমি) দেশকে তুলে ধর॥

চাষ উন্নতি করতে হলে
চলবে না পুরাণা চালে
দেশ বিদেশের নতুন নিয়ম
আমদানী সব কর ॥
রং তামাসা টুকীর গানে,
দেবতা পালায় উলুবনে,
শিখাও মোদের ভক্তিমন্ত্র
পুজা, গঙ্গাধর।
(দেখো) কনের বাপের ঘাড়ে ঝুলি
বরের বাপের লম্বা বুলি।
পণ প্রথাটা উঠিয়ে দিয়া সমাজ রক্ষা কর ॥
ডোম মেথর আর হাড়ি মুচি
তারাই বন্ধু তারই শুচি
মঠ মন্দিরের দুয়ার খুল্যা সবার সমান কর ॥ —ঐ

অনাবৃষ্টির জন্য মালদহের সুপ্রসিদ্ধ ফজ্‌লি আম প্রায়ই বিনষ্ট হয়, ইহা এই অঞ্চলের অধিবাসীর অর্থনৈতিক জীবনে দুর্ভাগ্যের সূচনা করে; সুতরাং তাহার কথা গম্ভীরা গানে কদাচ বাদ যায় না।

১৩

শিবহে, এবার জীবন বাঁচানো বুঝি হল ভার,
উনিশশো সাতান্ন সনে কি যে আছে তোমার মনে,
(সারা) ভারতব্যাপী পড়েছে আজ হাহাকার ॥
অনাবৃষ্টি হেতু আজ শস্যহীনা বসুধা,
কেমনে মিটাবে তুমি বিশ্বগ্রাসী এ ক্ষুধা,
দৈন্যতা উঠছে বেড়ে, নগ্নরূপে এ সংসারে
(তুমি) রক্ষা কর নইলে হবে সংহার ॥
মালদায় এবার হলোনা আম, অভাব আর অনটন,
লোকের মনে অশান্তির ছাপ জাগিতেছে অনুক্ষণ ॥
দিন যাবে কেমনে তবে আকাশ পাতাল ভাবছে সবে,
মান সম্মান রক্ষা করা যাবে না আর ॥

ওহে, শিব সুন্দর, করি তোমায় প্রণিপাত,
তোমার সৃষ্টি এ সংসারে কেন কর বজ্রাঘাত।
ছেড়ে দিয়ে রুদ্রনৃত্য, হও হে তুমি শান্ত চিত্ত,
সত্য পথে চালাও মোদের পুনর্বার ॥ (১৯৫৭)

১৪

তোমার এরূপ হতবুদ্ধি দেব মাথায় গজাল কেন,
বোধ হয় সিদ্ধির গুড়া ছেড়ে বিদেশী সুরা করেছ পান।
ইন্দ্র রাজার বজ্রকের সুর সাহেবের দিলা করে
তাই হে টেলিগ্রাফের তারে পাই মোরা প্রমাণ ॥
চন্দ্রদেব দেখি নাইটে, জব্দ হইল ইলেট্রিক লাইটে
বেঁধেছ বেশ আঠ-কাঠে, নাই পরিত্রাণ ॥
ত্রেতাযুগে পাই হে প্রমাণ,
বাল্মীকি দেয় কুশে প্রাণ।
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কলের কাজ, আমেরিকা প্রধান।
দেবদেবাদি শূন্য পথে চেপে বেড়াতেন হে রথে,
সেই বিদ্যাটি এরোপ্লেনেতে করেছো যোগদান ॥
পবন বাধ্য জাহাজের পালে, বরুণ বাধ্য ষ্টিমার রেলে,
বিলাতে টৈমন্ নদীর কূলে বিশ্বকর্মায় ধুন
ঋক, যজু, অথর্ব সাম এসব বেদের রাখলো নাম,
(এখন) শিক্ষা দিচ্ছো যুধ্যপিড় ড্যাম করে ইংলিসম্যান ॥
ভাবি বসে দিবা নিশি, লণ্ডনকে করেছ কাশী,
(ইওর) ইন্টিমেট ফ্রেণ্ড ইংলণ্ডবাসী, আর কি মোদের চেন ॥ (১৯৪৬)

একদিন মুসলমান সমাজও গম্ভীরা গানে যে অংশ গ্রহণ করিত, নিম্নোদ্ধৃত গানটি তাহার প্রমাণ। ইহাতে ভোলানাথকে ভোলানানা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে—

১৫

ধুয়া— কাম কাজ না করিলে মান রহে না, হে ভোলা নানা,
চি— দেখ দুই দিন যদি বসে থাকি কেউ তো খেতে কহে না হে,
ভোলা নানা

আর যদি শ্বশুর বাড়ী যায়,
দুই দিন আদরে খাওয়ায়
তিন দিনের বেলাতে শ্বশুর করে দিবে বিদায়,
নানা হে, করে দেবে বিদায়।
ঘরে নাইক খাবার কিছু যোগাড়
প্রাণেতে আর সহে না, হে ভোলা নানা।
আর যদি খাঁটি মজুরী মনে লজ্জা লাগে ভারি,
বাবু গিরি ছেড়ে দিয়ে সাজতে হইল ভিখারী,
নানা হে, সাজলাম ভিখারী।
তবু লজ্জা ত্যেজ গেলাম কাজে,
কেউ খাটাইতে চাহে না, হে ভোলা নানা।
আর এই শিরুয়ার মেলাতে, একজন কমলা বাড়ী হতে—
ঘুঘলা গোপের মিত্তিন এল মেলা দেখিতে
এই কাচারীতে নানা হে, কাচারী ঘরে,
মেলা করে, ধকম ধক্কা সহে না, হে ভোলা নানা ॥
(আর) শুনেন মোহন পাড়ার উক্তি, গাছ বাঁশ কাটিবার যুক্তি,
ভেঁড়া, ভেড়ি বকরা বকরী
করে দাও ইতি, নানা হে করে দিলাম ইতি। —ঐ

১৬

ধুয়া— শিব, এবার সোনার ভারতকে করিয়া কাগজ,
চিটালি— তুমি কাগজ দিয়ে সোনা নিছ সেকি কেহ করে খোঁজ।
অন্তরা— বহু করি, দাদা, যত চাষী ভাই
জমি জমা আবাদ করে যা ফসল উঠাই,
তাহে মোদের কি সত্ব নাই।
তুমি ওজন করিয়া কাগজ ধরাইয়া গাড়ী করলা বোঝা ॥
ভারতের অর্জিত জিনিস তুমি কর চালান।
আমরা ভারতের লোক খেটে মরি, বাঁচে কিনা প্রাণ।
ধন্য তুমি বুদ্ধিমান।
মোদের সেই জিনিস, অন্য দেশে দিবার কিসের গরজ ॥

দেশের জিনিস দেশে রইলে অভাব তো হত না
ঘরে খাওয়ার থাকলে ভোকেতে রইতো না,
বাঁচিবার ছিল সম্ভাবনা ॥
তুমি বাঁচাও মার হরি হর অন্তে দিও পদরজ ॥ —ঐ

১৭

ধুয়া— তুমি যুগে যুগে অবতরি, হে জটাধারী
চি— তুমি গঙ্গাধর নাম পেয়েছ জটাতে গঙ্গা ধরি, হে ত্রিপুরারি।
অ— ত্রেতাই ছিল রাবণ রাজা গুণে মানে মহা তাজা
দেবাসুরে নাগনরে থাকিতে সোজা
তার কাছে থাকিতে সোজা ॥
তুমি তাহাকে বিনাশ করিলে হনুমানের রূপধরি
হে জটাধারী ॥
গয়াসুর মহাভাগ্যবান, গয়াধামে তার প্রমাণ,
তাহার পিতা ত্রিপুরাসুর সুরের প্রধান,
জগতে সুরের প্রধান।
তুমি তাকে বিনাশ করিয়া নাম পেলে
ত্রিপুরারি, হে জটাধারী ॥
আর তুমি হেন বুদ্ধিমান ভারতকে করিলে হত জ্ঞান,
দিনের পর দিন চলে যায়, না হল বিধান ॥
সে কথার না হল বিধান ॥
তুমি ভারতকে বিনাশ করিলে ইংরাজের রূপধরি,
হে ত্রিপুরারি ॥ —ঐ

১৮

বলি, ও ফণিভূষণ, ভালে ত্রিনয়ন,
বাঘাম্বর পরিধান, আমাদের দুঃখ কর ত্রাণ,
পেটের জ্বালায় মোরা, হলাম দিশেহারা
হারালাম মান সম্মান আমাদের দুঃখ কর ত্রাণ ॥
ভারতবর্ষে সোনা চাঁদি ছিল যত,
একে একে দেখি সব গেল জলের মত ;

ভারতবাসী এবে হয়ে অবনত
(এখন) পেল চরম প্রতিদান।
আমাদের দুঃখ কর ত্রাণ ॥
সোয়া প্রহর সোনা বর্ষেছিল যে দেশে,
সেই দেশের লোক আজ ফিরে দীন বেশে
পরিণাম আর কিবা হবে অবশেষে
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ ॥
বি. এ. এম. এ. পাশ করে কত বঙ্গসন্তান
চাকুরী খুজে খুঁজে হয়ে গেল হয়রান।
করিতে পারে না তারা নিজের পেটের সংস্থান
(হল) হতাশে সদাই ম্রিয়মাণ ॥
দলে দলে দেখি দা-কুমড়া সম্বন্ধ,
সর্বত্রই গেলে আছে দ্বন্দ্ব।
গৃহ-বিবাদ, শিব, না করিলে বন্ধ
আমাদের জাতির হবে অবসান ॥
সিঁদুরিয়া মেঘ দেখি আকাশ যেমনে
ভারতের পাশে ঘাঁটি করে চীনে,
নিজের ঘর সামলাও, মোদের শিক্ষাদান
(হও তুমি) সময় থাকতে সাবধান ॥
মোদের দুঃখ কর ত্রাণ ॥
করজোড়ে তব পদে এই শেষ মিনতি,
যুদ্ধ বিদ্রোহ যেন না হয় সম্প্রতি
সৃষ্টি রক্ষা কর, ওহে গৌরীপতি,
অধীনের এই আকিঞ্চন ॥
মোদের দুঃখ কর ত্রাণ ॥

১৯০৮ সন হইতে   সন পর্যন্ত সংগৃহীত গম্ভীরা গানগুলির মধ্যে একটি সাধারণ বিষয় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যাইবে যে, ইহাদের মধ্য দিয়া কেবলমাত্র অভাব-অভিযোগের কথা, সামাজিক জীবনে নৈরাশ্যের কথা, কেবল কি করিয়া কি করিব, কি করিয়া কি হইবে ইহাই শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। ১৯০৮ সনে

সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত গানটির সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত কোন গানেরই ভাবগত কোন অসঙ্গতি নাই ; সুতরাং অভাব অভিযোগের কথাগুলি গতানুগতিক নিয়মেই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

১৯

বলব কি গান, ওহে শিব, বাগানে নাই আম।
গাছে গাছে বেড়িয়া দেখ্‌ছি নূতন পাতা সব সমান।
মনে মনে ভাবছি বস্যা কাজের কোন পায় না দিশা,
তেল ধান চাউলের দর খুব কশা ভুষার বেশি দাম,
আর এক শুন নূতন কাহিনী, ঠিক দু'প্রহরের শিল আর পানী,
মাঠে হয় কৃষাণ পেরশানি মারিলে গহম্। (১৯০৮)

২০

ধর ধর ধর দিস না ঝাড়্যা লিয়্যা চলেক সঙ্গে কর‍্যা।
এই বুঢ়াটা দিলে বড় দুখ হে, দিলে বড় দুখ ॥
ধান বুনিলে দ্যায় না পানি, এই বুঢ়াটা বড়ই শনি,
সদাই রহে মোদের প্যাটে ভুক হে ॥
দ্যামড়্যার উপর চড়্যা বেড়ায় কুচলী পাড়ায় ঘুর‍্যা
বুঢ়া ঠাটকুমুরা জানে কতই, কর‍্যা বেড়ায় তুক হে,
করে কতই তুক ॥ —(১৩৬৪)

২১

শিব তোমার একি সাজ, মাথায় বাঁইধ্যাছ কেনে জটা ;
ম্যালেরিয়ায় ভুগ্যা ভুগ্যা ভুঁড়ি কর‍্যাছ মোটা।
হাতি ঘোড়া ছাড়্যা দিয়্যা ষাঁড়ের উপর চড়্যা,
তোমার কপাল গিয়াছে পুড়্যা।
এবার নূতন সাজে না সাজলে পুজা করবে তোরে কেটা ? —ঐ

২২

ভোলা, হে ভোলা, এ কি কর‍্যাছ মোদের দশা,
ভাঙধুতুরা খ্যায়া শুধু ব্যোম ভোলা হয়্যা আছ বস্যা।
প্যাটেতে আজ ভাত নাই, পরনেতে ত্যানা,
হায়, বলদ সব বেচ্যা ফেল্যা দিতে হল খাজনা।

এখন করি কিহে, ভোলা নানা, তার উপরে রোগের জ্বালা,
হারিয়্যা ফেল্যাছি দিশ্যা ॥ —ঐ

২৩

শিব হে, সিদ্ধিতে বেশ দম দিয়ে গাঁজা টেনে আছ ভালই সুখে ;
(এদিকে) কারও লেংটি, আবার কেউ মটর গাড়ি হাঁকে ;
দুঃখ হয় তাই, জানাই তোমার লীলা দেখে ॥ —ঐ

২৪

প্যাটেতে ভাত নাই, ও শিব, গোলাতে নাই ধান,
কি দিয়া বাঁচাব, ও শিব, ছেল্যাপিল্যার জান।
ও বুঢ়া শিব, দয়া করো ॥
পরনে নেতা নাই, ও শিব, বরজে নাই পান।
কি দিয়া রাখিব, ও শিব, ম্যাইয়া লোকের মান।
ও বোকা, শিব, দয়া করো ॥ —ঐ

২৫

স্বরাজ যদি পাই, হে ভোলা,
খেতে দিব মাণিকের কলা, নইলে আঁঠ্যার কলা।
বানিয়া হল দেশপতি, কি বলব ভাই দ্যাশের গতি।
কাঁচ দিয়ে কাঞ্চনাদি নেয়, (যেন) হাতে দিয়ে মাটির খোলা। (১৯৪৪)

২৬

তুমি এসেছ এসেছ গম্ভীরায়, অনাদি হে বৃষভবাহন!
প্রণাম করি, পশুপতি, বামে শোভে হৈমবতী,
ক্রোড়ে দেব বিঘ্ন-বিনাশন।
ভাং ধুতুরার নেশার ঘোরে ঢুলু ঢুলু ত্রিনয়ন,
ধবল ধূর্জটী অঙ্গে ভস্ম করেছ লেপন,
জটা 'পরে সুরধুনী, রেখেছ হে শূলপানি,—
গর্জে ফণী, হে ফণিভূষণ ॥
দুই কর্ণে দুই ধুস্তুর, গলে দোলে হাড়মাল,
শিঙ্গা ডম্বুর বাজাও ভাল পরনেতে ব্যাঘ্রছাল,
শ্মশানে মশানে বেড়াও কি বুঝিবে শ্রীগুরুচরণ ॥ (১৩২৩)

গরু নাচানোর গান

কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতে পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের গ্রামগুলিতে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, ইহার নাম গরু নাচানো উৎসব। এই উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই গরু নাচানোর গান।

সেদিন অপরাহ্ন কালে গরুগুলিকে স্নান করাইয়া তৈল সিন্দুর মাখাইয়া সুন্দর করিয়া সাজান হয়। তারপর ইহাদিগকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া একটি খুঁটিতে লইয়া গিয়া শক্ত করিয়া বাঁধা হয়। একটি আস্ত গরুর ছাল গরুর মাথায় পরাইয়া দেওয়া হয়, তারপর সেই গরুটিকে ঘিরিয়া গ্রামবাসীর উদ্দাম নৃত্যগীত চলিতে থাকে।

১

আইরে কেহ বা চরে ভাল চমকি চমকি রে।
কেহ বা চরেরে, ভালা পাড়ার গুর রে॥
কেহ বা চরে ভালা গাছ গাছড় রে।
কেহ বা চরে বৃন্দাবনে রে॥ —বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

অহিরে—
কুলি কুলি যাতেছলি নাচিয়ে খেলিয়ে,
তোরি গিরি হায় ডাকিয়া ঘুরাল।
তোরি সে ঘরে আছে পাঁচ মুড় লছমন,
তাহাকে জাগাই মোরা যাব। —পুরুলিয়া

গরু জাগানোর গান

কার্তিকী অমাবস্যার তিথিতে পশ্চিম সীমান্ত বাংলার গো-পূজার একটি অনুষ্ঠান গরুকে জাগানো। সেই উপলক্ষে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া এই গান গাওয়া হয়—

১

কেহ যে দিল ধনি, পাটেরি শাড়ী,
কেহ যে দিল ধেনু গাই।
ওরে কেহ যে দিল ধনি,
দুই কানের সোনা, কেহ দিল সিঁদুর।

বাবা যে দেবত ধনি, পাটেরই শাড়ী।
ভাইয়েত দেবত ধেনু গাই, শ্বশুরে দেইত ধনি,
দুই কানে সোনা, পরের পুতা দেই তরে সিঁদুর।
পাটেরি সাড়ী, ধনি, ছিঁড়ি ফাটি যাবে,
ধেনু গাই মরি হারাই যাবে, আর দুই কানে সোনা ধনি,
ঝরে পড়ে যাবে, রহি যাই তোর সিঁথার সিন্দুর॥

—বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

কারি মইসিনা ভালা সোদেব সহিতি সইতানী,
আমার স্বামী লেগিল ভুলাই ওরে, প্রহর রাতি আর নহে।
আধারাতি লেগয়ে, বড়ি দুখে কাটিলাম রাত
বেচ যে বেচ সোঞা কারি না মইসিনী।
মইসি বিকে লিবে ধেনু গাই ওরে, বেলা উঠাই খুলবে,
বেলা ডুবাই খোকরাবে।
বড়ি সুখে পুহাইব রাত,
নেহি বিচব, ধনি, কারি না মইসিনী।
নেহি লিব ধেনু গাই, ওরে তোরে বেচয়ে ধনি···
মইসির জোড় লিব দেখবে ত নগরের লোক
আমাকে বিচয়ে সোঞা মইসিকা জোড় লিবে
কেহ তোকে দিবে সোঞা জলপানি আনিরে
কেহ তোকে দিবে সঙ্গ ভালা
মা বুড়ি দেই ধনি রাঁধি না বাটি
বহিনে ত আনে জলপানী
পাড়রিঙা ঠেঙা ধনি সঙ্গ ভালা দিবে।
বাঁশিয়ায় বলে ওহির গীত।

তোর যে মা সোঞা নরি হারাই যাবে।
বহিনে ত যাবে শ্বশুর ঘর—
পাড়রিঙা ঠেঙা সোঞা, ভাঙি চুরি যাবে।

বাঁশিয়ায় বলে ওহির গীত, মাবুড়ি জীয়াব ধনি।
অমৃত কুণ্ডের পানিয়ে, বহিনেকে আনিব পরবে রে।
পাড়রিঙা ঠেঞা ধনি ঘুরে ফিরে কাটাব।
বাঁশিয়ায় কে হিঙুলে বাঁধাই॥ —ঐ

৩

বিরল চাঁরে বাগলি কে আছ রত্তিরে
পথ চেয়ে মেঘ ধরিল রে।
পশ্চিমে রে বাগান মেঘ ওযে ধুরিল
পরবে ত লেগেল কড়ায়
তোর গোয়া কে বাগাল কি ও বলিবি রে
তোরই গোয়ালে গিল উড়াই। —ঐ
বিরলটারে বাগা॥

গরুর বিয়ার গান

কার্তিকী অমাবস্যায় পশ্চিম সীমান্ত বাংলার গো-পূজা উপলক্ষে গরুর বিবাহের একটি অনুষ্ঠান হয়। সেই উপলক্ষে গীত—

১

গেয়া চুমালে ধনি জোড় বিজোড়,
মইসে চুমালে মতি হার।
জামাই চুমারে ধনি চোখে বসায়ে
ও চালে লিয়ে ধুব ধান॥ —বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

গাছ জাগাইবার গীত

পূর্ব বাংলা বিশেষতঃ পূর্ব মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জিলায় বনদুর্গা নামে এক বৃক্ষদেবীর পুজা হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে যে মেয়েলী গীত গাহিয়া বৃক্ষের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করা হয়, তাহাকে 'গাছ জাগাইবার গীত' বলে। তাহা এই প্রকার,

১

আগেত ঝাপবা শেওড়া গুঁড়িতে মুরলী।
ঘুমের ঘুমুলী শেওড়া কে তোরে জাগাইল॥

খই চিড়ার বাসে গো আপনি জাগিলাম।
আগেত ঝাপবা শেওড়া গুঁড়িতে মুরলী।
ঘুমের ঘুমুলী শেওড়া কে তোরে জাগাইল॥
ভোগ-নৈবেদ্যের বাসে গো আপনি জাগিলাম।
আগেত ঝাপবা শেওড়া গুঁড়িতে মুরলী।
ঘুমের ঘুমুলী শেওড়া কে তোরে জাগাইল॥
ফুল-চন্দনের বাসে গো আপনি জাগিলাম॥ —মৈমনসিংহ

গাজনের গান

চৈত্র মাসে বাংলার পল্লীসমাজে গাজন নামে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পল্লী বাংলার বৃহত্তম জাতীয় উৎসব বলিয়া উল্লেখ করা যায়। শিবের গাজন, ধর্মের গাজন, নীলের গাজন, নীল পুজা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ইহা পরিচিত। কিন্তু ইহা মূলতঃ আদিম সমাজের প্রধানতম সূর্যোৎসব। ইহা বর্তমানে লৌকিক শিবোৎসবেরই রূপ ধারণ করিয়াছে, নানাভাবে শিবকাহিনী কীর্তন ইহাতে শুনিতে পাওয়া যায়—

১

প্রণাম গুরুদেব, অখিল ভুবনে সেব্য
গুরু চতুর্ভুজ সিংহ অপরূপ।
যাঁহার চরণ ধরি, এ ভব সংসার তরি
গুরু হন ব্রহ্মার স্বরূপ॥
আহা অন্ধের লোচন গুরু, ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু
ভক্তজনার প্রতি গুরুর দয়া।
শিবের সেবক নন্দী শিবের চরণ বন্দি
আর বন্দি মা মহামায়া॥
গুরু গোঁসাই কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
ও রাঙা চরণ বিনে গতি নাই।
অন্তিম কালে যমদূতে লয়ে যায়,
সেবক বলিয়া, প্রভু, রেখো রাঙা পায়। —নদীয়া

শিবের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে অনেক সময় বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের কথাও আসিয়া পড়ে—

২

শিবের বিবাহের গান

পড়ল কৈলাসেতে বিয়ার সাড়া বাজিল ঢোল ডগর কাঁড়া
শানাই শঙ্খ বাজে শত শত,
সেতারা চৌতারা বাজে জগঝম্প মাঝে মাঝে
মৃদঙ্গ তানপুরা শত শত।
সঙ্গে চলে যত জনা ঠিক যেন সব যুদ্ধের সেনা
ঢাল তলোয়ার ঘোরে উন্টা পাকে।
করে চলে তলোয়ারে কাটাকাটি কেহ মারে কারে লাঠি
কেহ জোর করিয়া পুরীর মধ্যে ঢোকে ॥ —বরিশাল

৩

আর, এ ভবে যারা করে বিয়া দুই
তার কপালে সুখ নাই কিছুই ॥
দেখ, শিবের ঘরে গঙ্গা-দুর্গা দুই রমণী
তারা বিবাদ করেন দিবারাতি।
একজনের থালে দুইজন বইসে,
প্যাট না ভরলে কান্দন আইসে।
আর অভিমানে রাগে কথা কয় না
গাল ফুলাইয়া রয় ॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে ব্যজস্তুতি অলঙ্কারের সুন্দর ব্যবহার দেখা যায়।

৪

একদিন অন্নপূর্ণা অন্নের ছলে বাহির হইল নগরে,
সকলের কুলবধূ জিজ্ঞাসা করে,
তুমি পঞ্চাননের গিন্নী হইয়া ভিক্ষা মাগ নগরে।
তখন কেন্দে কেন্দে মনের খেদে উমা কয় মধুর স্বরে
পতির গুণ বলব কত কপালে করে ;
আমি যে সুখে গিরস্তি করি মন জানে, বলব কারে ॥

সে যে বয়সেতে বাপের বড়, বেটা নিপুণ সিদ্ধিতে,
কুলীন দেখিয়া বিয়া দিয়াছিল পিতে,
অস্থিচর্মসার করিলাম ভাঙ ধুতুরা বাঁটিতে ॥
সে যে শ্মশানে মশানে ফিরে অঙ্গে মাখে চিতার ছাই,
লজ্জাতে দেবসমাজে মুখ না দেখাই,
তাঁর লীলাখেলা ভূতের মেলা দিবা নিশা ভেদ নাই ॥
তাঁরে সবে বলে পাগলা ভোলা, জাতিভেদ মানে না তায়,
চণ্ডালে দিলে অন্ন ইচ্ছা কইরা খায়,
তাঁর নাই কোন গুণ, কপালে আগুন, বাচ্চার মত সাপ খেলায় ॥
পাক্‌না চুল দাঁত লড়্‌বইডা আইজ মরে কি কাইল মরে,
পতির গুণ বলব কত কপালে করে। —ত্রিপুরা

৫

ভাঙ্গড় ভোলা, শিব, তোমার একি মোহন বেশ,
মাথাতে পরেছ মুকুট নেই কো জটার লেশ।
বাঘছাল কোথায় গেল, কোথায় গেল হাড়ের মালা,
মাথার সাপ কি বনে গেল, হইয়ে ঝালা পালা।
রাজার মেয়ে করলে বিয়ে হলে রাজার জামাই,
ঘরে আছে গঙ্গামাই তুলনা তার নাই,
কিন্তু, বাবা, বলি তোমা করি প্রণিপাত,
এই দুই সতীনে বিবাদ হলে না হয় বিসম্বাদ।
শুন বলি, ওগো ঠাকুর, পেন্নাম শ্রীচরণে,
গঙ্গামাই মাথায় রেখো গৌরী গো হৃদয়ে। —২৪ পরগণা (টাকী)

৬

শিব বলে, শুন ভাইগ্না, নারদ তপোধন,
তোমার মামীরে আন দেখিতে নাচন।
একে ত কোন্দলিয়া নারদ, আরো আজ্ঞা পাইলো,
কোন্দলের ঝুলিখান কান্ধে তুইল্যা নিলো ;
এমত শুনিয়া নারদ করিল গমন,
চণ্ডিকার নিকটে গিয়া দিল দরশন।

নারদ বলে, শুন মামী, হেমন্ত-নন্দিনী,
বাড়ীর আগে আনছে মামা কোথাকার রমণী !
নারদ মুনি বলিয়াছেন যে সব বিধানে,
চণ্ডিকা আসিয়া দেখে সবই বিদ্যমানে।
চণ্ডী বলে, ভাঙ্গুড়া শিব, তোর লাজ নাই,
তোরে যে দেবতা বলে তার মুখে ছাই !
শিব বলে, শুন চণ্ডী, রাগ কেন কর,
আপনার মনে আপনি বিচারিয়া দেখ,
নলের ছোবায় কভু নাহি জন্মে বাঁশ,
স্ত্রী হইয়া স্বতন্তর লোকে উপহাস।
দুই হালুয়ার বাড়ী তখন নারদ চলে যায়,
সারাদিন উবাসী নারদ ভ্রমিয়া বেড়ায়।
এই ক্ষেতের হাজাউড়া আর এক ক্ষেতে ফালায়,
দুই হালুয়ায় কিলাকিলি নারদ বইসে রঙ্গ চায়।
অষ্টমী হইল সাঙ্গ নবমী আসিল,
চান বদন ভরিয়া সবে দেবের দেবের বল ॥ —মৈমনসিংহ

৭

শিব-শঙ্কর, ভোলানাথ, কৈলাসের অধিকারী,
গৌরী যে যাইবো নাইয়র তারা বলো কি ?
গৌরী যে যাইবো নাইয়র শুনতে লাগে ধান্ধা,
কার্তিক গণেশ দুইটি পুত্র থইয়া মোর বান্ধা।
গঙ্গা উঠিয়া বলে, শিব বুদ্ধি নাই রে তোর,
এমন যৌবতী কন্যা কেবা দেয় নাইয়র।
গৌরী সে উঠিয়া বলে, তুই সে বড় সতী,
জ্যৈষ্ঠি আষাঢ় মাসে তোর উৎপত্তি।
না জানিয়া না শুনিয়া নরলোকে তোর জল খায়,
ষোল শ' গাবরে তোর বুকে বৈঠা যায়। —ঐ

হর-পার্বতীর দাম্পত্য জীবন-প্রসঙ্গ বর্ণনায় বাঙ্গালী গ্রাম্য কবি চিরকালই নিজের জীবন চিত্র আঁকিয়াছে—

৮

চালো নাইগো ছন, গৌরী বেড়াং নাই গো বন,
বৎসরে বৎসরে, গৌরী, নাইয়রে সাজন !
গেছিলাম গেছিলাম, গৌরী, তোর বাপের বাড়ী,
খাইতে না দিল্ ভাং ধুতুরা, বইতে না দিল্ পিঁড়ি ।
ভাং খাও ধুতুরা খাও বুইড়্যা, শিব গো, ভাঙ্গের মর্ম জান,
গাং পাইড়্যা যত ভাং বুড়্ বাইন্ধ্যা আন ।
বুড়্ বাইন্ধ্যা ভাং তুইল্যা থইল্যো চালে,
বৈকালে নামাইয়া ভাং ঢেঁকি দিয়া কুটে ।
বারখানা ঢেঁকি শিবের তেরখানা কুলা,
রাইতে দিনে কুইট্যা মরে জউটা ভাঙ্গের গুঁড়া ॥ —ঐ

৯

ধান লাড় ধান লাড়, গৌরী, আউলাইয়া মাথার কেশ,
জল চাইলে না দেও জল, এই বা কোন্ দেশ ?
নেও ঝাড়ি, নেও পানি, দিও পানি, দেশ কেন নিন্দ ?
এ ভব আলিয়ার মাঝে ঠমক্ কেন মার ?
ঠমক নয় ঠমক নয় ঠমক তোমার হিয়া,
একটি কথা জিজ্ঞাস করি খাট কোনখান দিয়া ?
হস্তী না হয়, ঘোড়া না হয়, গেরা না হয় তল,
তুমি নি খাইতে পার শুক্না সাপলার জল ? —ঐ

১০

শিব মন্দিরে শিবের নিদ্রাভঙ্গ প্রসঙ্গে গাজনের সন্ন্যাসীরা এই গান গাহিয়া থাকে—

প্রভু, যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ,
সেবকের দেখ রঙ্গ, পরিহর তোমার চরণে ।
কার্তিক গণেশ কোলে, শয়ন আছে নিদ্রাভোলে,
আমরা তোমায় প্রণাম করিব কেমনে ।
নিদ্রা ত্যেজ দেবরাজ, রহ মা খট্টার মাঝ,
নিরন্তর গৌরী রাখহ বাম ভাগে ।

প্রভু, তুমি দেব অধিপতি, হরি ব্রহ্ম করে স্তুতি,
অন্য দেব কোনখানে লাগে।
প্রভু, ত্যজই নিদ্রার মায়া, সেবকের কর দয়া
পুরা অর্থ দেব ত্রিপুরারি।
শিঙ্গা ডম্বুর হাতে, বৃষভ রাখহ বামভাগে,
বাসুকি রহুক ফণা, শিরে ধরি স্নিগ্ধ গঙ্গা,
কপালে চন্দন চাঁদ বেড়ি,
তথি মধ্যে শোভে ফোঁটা, হাড় মালা যোগপাটা
গায়ে শোভে বিভূতি ভূষণ।
প্রভু, দেব ত্রিলোচন, বিঘ্ন কর বিমোচন,
নরের শকতি, আমরা তোমার আস্তা করি,
শাল খুলে ভর করি।
আগমে নিগমে কয়, প্রভুদেব গঙ্গাধর, দেবতার ঈশ্বর,
অপরাধ ক্ষমহ, মৃত্যুঞ্জয়।
বৃষভ বাহনে শিব, ত্যেজহে কৈলাসগিরি,
পুরা অর্থ দেব ত্রিপুরারি।
গম্ভীরে করহ অধিষ্ঠান। তোমার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম। —বর্ধমান

১১

দিক্ বন্দনা : দেউল বন্ধম, দেহারা বন্ধম, শাঠ পাঠ লাঠি বন্ধম,
আন্তের তুলসী বন্ধম, আর বন্দম সরস্বতীর গান,
ডাইনে বন্দ রামলক্ষ্মণ, সীতা বামে বীর হনুমান।
পুর্বে আছেন ভানু ভাস্কর, তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥
উত্তরে আছেন ভীম কেদার, তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম।
পশ্চিমে আছেন আরুর বৈদ্যনাথ।
তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম। —বর্ধমান

১২

তাঁহার পুজার আয়োজন হয়, ফুল তুলিবার ধুম পড়ে—
হেমন্ত বসন্তকালে বিকশিত ডালে ডালে হে,
ও কি ভাই রে, হরের মালঞ্চে নানা ফুল।

দুর্ব্বা তুলি আঁটি আঁটি ফুলেতে ভরিল সাজি হে,
ও কি ভাই রে, হরের মালঞ্চে নানা ফুল ॥
অশোক অপরাজিতা স্বুবর্ণ মালতী লতা হে,
ওকি ভাই রে, হরের মালঞ্চে এত ফুল।
পৃথিবীতে যত পুষ্প তাহা বা কহিব কত হে,
স্থলপদ্ম দেখিতে সুন্দর ॥
ফুলেতে ভরিল সাজি চল ঘরে যাই আজি হে,
ফিরায়ে মনে লয়, আনি ও আর বার ;
ত্রাণ কাশীনাথ মনে ত্রাণ ভোলানাথ মনে
মনে লয় আমিও আর বার ॥ —ঢাকা

১৩

ভারত ভুবনে এলেন দেব পঞ্চানন।
লাউসেনের বাড়ি ঠাকুর দিলেন দরশন ॥
দরশন দিলেন ঠাকুর লাউসেনের বাড়ি।
বসিতে দিলেন রাজা কুশাসনখানি ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে রাজা কহে স্তববাণী।
কি কারণে আগমন আজ্ঞা হোক শুনি ॥
শিব বলেন স্নান করেন উপোস খেরাতি।
সিংহাসন আনি দেহ পুজার অনুমতি ॥ —ঐ

১৪

পুর্বে পূর্ণমণি সুখতারা হায়,
তিন বরুণ রাজা, ভানু ভাস্কর,
তাঁর চরণ সেবি, কোন পদ পাই,
নাই যাব যমপুরী ধর্মপুরী ঠাঁই।
ধর্ম অধিকারী, কর্ম অধিকারী, সাধুলিরে ভাই
পুর্ব দুয়ার খাটুনী হ'ল পুষ্পজল পাই ॥ —ঐ

১৫

আমার জাতের কথা শিব তুই কলু ভাঙ্গিয়া।
তোমার জাতের কথা কইলে লাগিবে ঝগড়া ॥

ভাসুর আইসে শ্বশুর আইসে রন-পরশুম তাকে।
হাতে শাঙ্কা নাই ছ্যান গোঁসাই লজ্জা পাছু তাতে॥
শাঙ্কা না পাইলে তবে যাব বাপের বাড়ী।
বাপের বাড়ী যাব, দুর্গা, ভাইয়ের বাড়ী যাব॥
কাটনি কাটিয়া তবে তুই ছেইলাক পালিব॥ —রংপুর

১৬

ভাঙ্গব চারি দুয়ারের কবাট,
দেখব এবার শিবের পাদচরণ॥
দশেতে করিল পূজা দশগিরি রাবণ।
লোহার গুণে সেবা করে সেই পঞ্চানন॥
দেবদেবন মহাদেবন গলার উর্ধ্বে পৈতা কাঁধে।
পূর্ব দুয়ার মুক্ত হ'ল দেখ পঞ্চানন॥ —মালদহ

গাজনের বিভিন্ন আচার পালন উপলক্ষে নানাপ্রকার গান শুনিতে পাওয়া যায়—

১৭

মন করি ধুতি মোরা, পবন করি কাছা,
সেই কাছা পরে পুজি সন্ন্যাস দেবতা॥
সেই কাছা পরে করি শিবের স্মরণ।
যত কিছু পাপ মোদের হরে ততক্ষণ॥
কহেন তো সদ্‌গুরু মহেশের বরে।
উত্তরী শুদ্ধ করেন শ্রীভোলা মহেশ্বরে॥ —ঐ

১৮

শিবের মাথায় জল ঢালিবার সময়ে এই গীত গাওয়া হয়—

ব্রহ্মার কৌমণ্ডলে আছেন গঙ্গানারায়ণী রূপ হয়ে।
ধ্যান করিলেন মুনিগণে শিব দিলেন তা কয়ে॥
ধ্যান করিয়া দেখিলেন যত মুনিগণে।
সূর্যবংশে জন্মিবে ভগীরথ গঙ্গা আনিবে সেই জনে॥

* * *

ব্রহ্মার আদেশে করিয়া গমন আইলেন শিবের পাশ।

শিবের নিকটে করিলেন স্তব বৎসর হাজার দশ ॥
তুমি হরিহর সকলের আর তোমা বিনা আর কে।
তুমি না সহিলে সকলি মজিবে বাসুকি হইবে শেষ ॥
আসন করিয়া বসিলেন শিব যোড় করি দুই হাত।
শিবের মস্তকে ঢালিলেন গঙ্গা মূর্ছিত হলেন ভোলানাথ ॥ —ঐ

১৯

ঘাটশিলা বহিল পুরুলিয়ার দালান ডুবিল রে।
ছাদের উপরে কেনে রাণী কেনে কাঁদিছ রে।
অগম জলে ঝাঁপ দিতে, কারে বলিব রে।
কা'র বলিব রে ॥

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২০

উপ্‌ ডালে কারি কুড়ি লে, ওলো সই, নাম এ জলে বাসা ;
উড়ে গেল রাজন সাথী লো, ওলো সই, পড়ে রইলো বাসা।
একই দিনে হলুদ বাঁটা, ও লো, তিনই দিনের বাসি,
কোন ঘাটে শিব নামে, সই ও লো সই,
বাবুকে ভুলাই দিবার তরে ॥ —ঐ

২১

নাম জলে জলি লো সই, ও লো, অথই জল খালে খালে।
অথকে খুঁদা বরদে বিঁদে দিলে অতই মোরবি জলনে ॥

২২

ভাং ধুতুরা খাইয়া শিব নাচে,
নাচে নাচেরে গনাইর বাপ ;
ভাং ধুতুরা খাইয়া শিব নাচে ॥
শিবরে তুই যে গনাইর বাপ।
ও তোর গায়ে দেখি তাপ ;
ও তোর গলায় দেখি সাপ ;
ও তোর মাথায় দেখি জটা ;
এমনই ভাঙ্গড়ার ঘরে বন্‌বো কোন জনা। —মৈমনসিংহ

২৩

আশ্বিন কার্তিক মাসে ভুঁয়ে ছিলাম চাষ,
সেই ভুঁয়ে জন্মিয়েছিল কাপাসেরও গাছ,
মান বড় পাতা, তার ধবল বরণ ফুল
বিধেতা কাটনী কাটে, মাল কাটে শূল
হাঁড়ি মুচির ভাত মাছ, লেগেছে তাহার
অশুদ্ধ পাটা তোমরা কেন দিয়েছ গলায় ?

উত্তর—

আশ্বিন কার্তিক মাসে ভুঁয়ে দিলাম চাষ,
সেই ভুঁয়ে জন্মিয়ে ছিল কাপাসেরও গাছ
মান বড় পাতা তার ধবল বরণ ফুল,
মঁইয়ের চাপনে তার ছিঁড়ে গেল ঘাস।
বিধেতা কাটনী কাটে মাল কাটে শূল।
হাঁড়ি মুচীর ভাত মাছ লেগেছে তাহার
গঙ্গা জলে ধুয়ে আমরা পাটা দিয়েছি গলায়। —নদীয়া (১৯৬০)

২৪

ছোট ছোট সন্ন্যাসীর সব বড় বড় পেট,
ছোলা কলা খেয়ে সন্ন্যাসী উড়াইলেন দেশ,
ছোলা কলা খেয়ে সন্ন্যাসী গাছ করিলেন নেড়া,
এক এক সন্ন্যাসী তোমরা কোন সাহেবের ঘোড়া ?

উত্তর—

ছোট ছোট সন্ন্যাসীর সব বড় বড় পেট,
ছোলা কলা খেয়ে সন্ন্যাসী উড়াইলেন দেশ,
ছোলা কলা খেয়ে সন্ন্যাসী গাছ করিলেন নেড়া,
এক এক সন্ন্যাসী আমরা শিব সাহেবের ঘোড়া। —ঐ

২৫

লম্ফে ঝম্ফে আসছ-তোমরা যতেক সন্ন্যাসী,
রাজপথের পাড়ে আছে দেবদারুর কাঁটা,
সেই কাঁটা পায়ে ফুটলে রক্ত বেরোয় ছুটে,
পা ধুতে যাবে কোন পুকুরের ঘাটে।

উত্তর—

লম্ফে ঝম্ফে আসছি আমরা যতেক সন্ন্যাসী,
রাজপথের পারে আছে দেবদারুর কাঁটা।
সেই কাঁটা পায়ে ফুটলে রক্ত বেরোয় ছুটে,
পা ধুতে যাব আমরা তার পুকুরের ঘাটে। —ঐ

২৬

কোথা থেকে আসছ তোমরা কোথা চলে যাও,
কাহার হুকুমে তোমরা ভিক মেগে খাও।
কাহার হুকুমে তোমরা শশা আর কলা খাও,
কাহার হুকুমে তোমরা হাঁট পঞ্চগ্রাম
শুকনো কাটে ফুল ফুটেছে কহ দেখি তার নাম?

উত্তর—

উত্তর থেকে আসছি আমরা দক্ষিণে চলে যাই,
শিবের হুকুমে আমরা ভিক্ মেগে খাই।
শিবের হুকুমে আমরা শশা আর কলা খাই,
শিবের হুকুমে আমরা হাঁটি পঞ্চগ্রাম
শুক্নো কাঠে ফুল ফুটেছে শোলা তাহার নাম।

২৭

কোথা হ'তে আসছ তোমরা কোথা চলে যাও,
কাহার দুয়ারে তোমরা ভিক্ মেগে খাও।
কাহার দুয়ারে তোমরা হাঁট পঞ্চগ্রাম
কোথা তোমাদের উৎপত্তি কোথা তোমাদের বাসা?

উত্তর—

উত্তর থেকে আসছি আমরা দক্ষিণ চলে যাই,
শিবের দুয়ারে আমরা ভিক্ মেগে খাই
শিবের দুয়ারে আমরা শশা আর কলা খাই
শিবের দুয়ারে আমরা হাঁটি পঞ্চগ্রাম
বাঘনা বাড়ায় উৎপত্তি হিজুলীতে বাসা।

২৬

শিব চলেছে বিয়ার বেশে নারদ বাজায় বীণা,
পাড়া পড়শী সাইজ্যা আইল বিয়ার কথা শুইন্যা।
শুন, লো মেনকা, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই,
কপাল গুণে মিল্‌ছে জামাই জগতের গোঁসাই।
সাজিয়া আইল মেনকা সুন্দরী।
ডাইন হাতে তার বরণ কুলা বাম হাতে বারি।
সাজিয়া আইল তার নাম সন্ত,
ঘরের থিকা বাইর হইতে চালে ঠেকে দন্ত।
সাজিয়া আইল তার নাম নীতি।
সারা মাথায় নাই চুল খেটির গোড়ায় সিঁথি।
তারপর সাজিয়া আইল তার নাম লোশি
বারো হাত তার কাপড়খানা তেরো হাত তার দশি। —বরিশাল

২৭

ও মামী, মামী লো, গিরিরাজার ঝি,
মামায় গেছে পদ্মবনে খবর রাখ কি ?
পদ্মবনে যাইয়া মামায় ক'রছে এক থান বিয়া
তোমার যদি ভাইগ্যে থাকে আসিবে ফিরিয়া। —ঐ

২৮

রক্তমাংস ভক্ষণ করি শঙ্খ থুইয়া ডালে,
পবন বাতাসে শঙ্খ শিব শিব বলে। —ঐ

২৯

শরৎ ও বসন্তকালে বিকশিত ডালে ডালে রে,
ওকি বলে রে,
মধুলোভে গুঞ্জরে ভ্রমর। —ঐ

৩০

সোজা কাঁটা বাঁকা ক'রে দিল রে পিঠ ফুঁড়ে।
লোক-লজ্জায় কান্‌তে নারি ঘুরাও ঘুরাও বলে॥
—২৪ পরগণা (আধুনিক)

গাজীর গান

মুসলমান ধর্মপ্রচারককে গাজী বলে। তাঁহাদের মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া যে সকল সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহা পল্লীর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত আছে। এখানে তাহার দুই একটি নিদর্শন উল্লেখ করা গেল—

১

পেথ্থমে বন্দনা করি গাজী পীরের পায়,
যাহার লা'গে পয়দা হইলাম এই দুনিয়ায়।
জীবের দুঃখ দেইখা খোদার আর সয়না তর,
কলির শ্যাষে জন্ম নিল গাজী পীর পয়গম্বর।
তারপরে বন্দনা করি কালু ফকির ঠাঁই,
এক ডালেতে দু'টি পক্ষী যেন যমজ ভাই। —ঢাকা

গোয়ালা জাতির সঙ্গে গাজি সাহেবের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে; কারণ, গাজী সাহেবের মাহাত্ম্য গোয়ালা জাতির নিকটই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া সর্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়—

২

হারে দোম্ দোম্ বলিয়া গাজী ছাড়িল জীগির।
নন্দ ঘোষের মায় বলে, এই আইল ফকির॥
নন্দ ঘোষের মায় বলে কালু ঘোষের ঝি।
বাড়ী আইল গাজীর ফকির ভিক্ষা দেব কি॥
ভিক্ষা করতে আইছি আমি ভিক্ষা লইয়া ফিরি।
বাটায় করিয়া আন চাউল পয়সা কড়ি॥
দধি দুগ্ধ থাকে যদি গাজীর থানে দেব।
সিন্নী দিয়া গাজীর নামে দোয়া কইরা যাব॥
তখন, সুবুদ্ধি গোয়াইলার মাইয়ার কুবুদ্ধি জাগিল।
ছিকার উপর দৈ থুইয়া মিথ্যা কথা কইল॥
ফকির বলে, মিথ্যা কথা কইলি গাজীর থানে।
ইহার সাজা দিব আমি গোয়াইলার বাতানে॥
ঘরে মইল গোয়ালিনী, বাতানে মইল গাই।
হাইলা গরু মইল কত ল্যাকা জোকা নাই॥

গোয়াইলা তখন কাইন্দা কাইট্টা গেল গাজীর কাছে।
গাজীর নামে হাজত দেব গরু যদি বাঁচে॥
তখন দোম্ দোম্ বলিয়া গাজী, পিঠে দিল বাড়ি।
সাত দিনের মরা গরু হাইটা ওঠল বাড়ী॥　　　　—ঐ

৩

দেওয়ান্, কোন্ গুণে তরাইয়া লও, ভাই, গাজীর নামে।
গাজী কালু দুই ভাই আড়াঙ্গি উড়াইলো।
জঙ্গলার যত বাঘ দৌড়িয়া পলাইলো।
একী বাঘ, নেকী বাঘ চোখ পাকাইয়া চায়।
সুন্দর-বন্যা বাঘটায় বৈরাগী লইয়া যায়।
গোয়ালার মায় বুলে হায়রে হায়।
কাল গাইয়ের ধলা বাছুর বাঘে লইয়া যায়।
গোয়ালার মায় বুলে কোমর-ভাঙ্গা বুড়ী।
বাঘ মারিতে লইয়া যায় দোয়ার-বান্ধা লরী।　　　　—মৈমনসিংহ

গাড়োয়ানী গান

উত্তর বাংলার এক শ্রেণীর প্রেম-মূলক লোক-সঙ্গীতের নাম গাড়োয়ানী গান ; কারণ, গো কিংবা মহিষের গাড়ীর চালকগণ মন্থরগতি গো কিংবা মহিষ যান চালাইয়া যাইবার সুদীর্ঘ অবসরে এই গান গাহিয়া থাকে। উত্তর বাংলার প্রচলিত ভাওয়াইয়া গানের সুরেই প্রধানতঃ এই গান গাওয়া হয়। দিনাজপুর, রংপুর, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলেই এই গানের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়।

১

ও কি, চ্যাংড়া বন্ধু, মায়া লাগাইয়া গেলেন রে।
দেখা দিয়া পরাণ রাখ আমার॥
খাইবার চাইলেন চিড়া দই,
তখন থাইকা আইলান কই,
ডাকিতে ভাঙ্গিল রসের গলা।
মাখিয়া চিড়া দই পন্থের পানে চাহিয়া রই,
কোন্ দিকে আইসেন সোনা বন্ধু রে॥

একলা ঘরে শুইয়া থাকি, শয়নে স্বপনে দেখি
গাওখানা মোর করে ঝিকিমিকি।
মনটা আমার উড়াম বাইরাম করে।
উড়ানী কবুতর হইয়া উড়ি উড়ি যাম মুইরে,
যেইখানে শ্যাম চিকন কালা॥ —দিনাজপুর

২

ওরে গাড়িয়াল, ভাই।
উজান উজান করে গাড়িয়াল, উজানে বাঘের ভয়।
গাড়ি ধরিয়া গাড়িয়াল বাড়ী ফির‍্যা যায়।
ভাতো, মাগো, খাইয়া গাড়োয়াল মুখে না দেয় পানি।
চালের বাতায় ধর‍্যা কন্যা জুড়িছে কান্দনি।
না কান্দ না কান্দ, কন্যা, ভাঙ্গিবে রসের গোড়া,
আর একদিন ফিরিয়া আইলে সোনা দিয়া বান্ধাইব গলা।
—কুচবিহার

৩

ও কি, গাড়িয়াল ভাই, হাঁকাও গাড়ী তুই।
চিল মারিব মারিব বন্দরে।
যখন গাড়ী উইজান রে ধায়,
নারীর মন মোর জুইড়া রয়রে—
হাঁকাও গাড়ি তুই,
ওকি গাড়িয়াল রে। —দিনাজপুর

গারাম ঠাকুরের গান

জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জিলায় যে সকল গ্রামদেবতা আছেন, তাহাদের উৎসব উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে গারাম ঠাকুরের গান বলে। কিন্তু তাহাতে গ্রাম দেবতার মাহাত্ম্যের পরিবর্তে সাধারণ গৃহস্থ জীবনের সুখ দুঃখের কথাই শুনিতে পাওয়া যায়।

১

গারাম ঠাকুরের ঘরোৎ কিসের বাজনা বাজে।
বাপর ভাইর আজি গারাম ঠাকুরের পূজে॥ —জলপাইগুড়ি

২

চান্দের মতন ছাটা উপার মত জ্বলে গে।
হামার মাইটা সোনার মতন ॥
ওরে আগ উঠেছে আগ উঠেছে
কালা মুটাখাম দেখিয়া গে।
ওরে আগ উঠেছে আগ উঠেছে
ভোটরা চোখাটা দেখিয়া গে ॥
উয়ার পিঠিখান দেখিয়া
ছ্যাঁকা পাড়িবার মনাছে গে ॥ —ঐ

গুণাই যাত্রার গান

বরিশাল জিলার এক শ্রেণীর লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের নাম গুণাই যাত্রার গান, বা গুণাই বিবির গান। ইহা গুণাই বিবির পালা বলিয়াও পরিচিত। ইহাতে একটি ক্ষীণ কাহিনীর সূত্র আছে। তাহাতে দেখা যায়, ইহার নায়িকার নাম গুণাই এবং নায়কের নাম তোতা। ইহাদের বিচ্ছেদই গানের মূল বিষয়। বরিশাল জিলার বাহিরেও প্রধানতঃ মুসলমান সমাজের মধ্যে এই গান ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। অনেক সময় সঙ্গীত-সংলাপের মধ্য দিয়া ইহার কাহিনীর ধারা অগ্রসর হইয়াছে।

১

দ্বার খোল, দ্বার খোল, প্রিয়ে, আমি তোমার স্বামী গো।
গুণাই :— দ্বার খুলব না, দ্বার খুলব না, তুমি যেন কেবা গো।
তুমি যদি হওগো স্বামী যাও পিতার আদেশে গো ॥
পিতা আমার পাষাণ, প্রিয়ে, তাও কি তুমি জান না।
তোতা :— দ্বার খোল দ্বার খোল, প্রিয়ে, আমি তোমার স্বামী গো ॥
তুমি যদি হয়গো স্বামী যাও ভগ্নীর আদেশে গো।
দ্বার খুল্‌বনা, দ্বার খুল্‌বনা, তুমি যেন কেবা গো ॥
তোতা :— ভগ্নী আমার কাল সাপিনী তাওকি জান না,
দ্বার খোল·························স্বামী গো ॥
চলিলাম চলিলাম, প্রিয়ে, তোমারে ছাড়িয়া গো,
পিতার আদেশ করবো পালন যাইব সিংহলে গো।

মা ছাড়িলাম, বাপ ছাড়িলাম, ছাড়িলাম নিজদেশ,
ভাগ্য দোষে সব হারালাম দেখা হ'লো শেষ ॥

জের — মা জননী গর্ভধারিণী, বিদায় কর, মা, মোরে গো।
পিতার আদেশ করিতে পালন যাইব সিংহলে গো ॥
টাকা নয়, পয়সা নয়, মা, সিন্ধুকে রাখিবে গো।
চাবি নয়, ছোড়ানী নয়, মা, অঞ্চলে বাঁধিবে গো ॥

মা :— আমি কেমনে বিদায় দেব রে, ও বাবারে,
বাবা, তুই আমার একা ছেলে, যাবিরে ছাড়িয়া।
আমি কেমনে বিদায়············ও বাবারে ॥

গুণায়ের খেদ : কোকিল ডেকোনা, ডেকোনা, ঐ কদম ডালে,
শীত বসন্ত সুখের দিনে পতি নাই ঘরে।
এই তো বসন্তকালে, হায়, তাতে ফাগুন মাসে,
বনের কোকিল ডাকছ তোমরা ঘরের আশেপাশে।
দূর দেশে স্বামী আমার গিয়েছেরে গিয়েছে বিদেশে ॥

—মুর্শিদাবাদ

২

আরে ও — কোকিল, ডেক না ডেক না ঐ কদম ডালে
শীত গেল বসন্ত এল পতি নাই ঘরে—

আরে ও — পতি নাই ঘরে, নাই ঘরে, পতি গিয়াছেন বৈদেশে,
আমি কার সনে খেলব পাশা নিরালায় বসে।

আরে ও — আমি দুঃখিনী তাপিনী বিবি—সখিনার মত
কাসেম গেল রণ করিতে ফিরে এল কই। —ঐ

৩

আমি কুস্বপ্ন হেরিলাম নিশিকালে গো,
স্বপ্নের কথা মনে হোল দুপুরে, মস্তক উঠে যায় ঘুরে
নাবালক তোতা রইলো দুলুরে, দেখে শুনে রেখ
স্বপ্নের কথা কিছু মিথ্যা নয় সব সত্য—
স্বপ্নের কথা যদি মিথ্যা হবে দুলুরে,
কেন মৃত্যু মালা গলে ॥ —ঐ

৪

আমার কালেজা ধরিল দারুণ বিষে, কালেজা ধরিল দারুণ বিষে।
ভায়ে ভায়ে বিবাদ করে খালেক রে, বিষ খাওয়ালি মোরে।
কোথায় আছ ছোট ভগ্নি গোনাইরে, এসে দেখা কর মোরে।
কোথায় আছ ছোট ভাই খালেক রে, একবার দেখা কর মোরে॥ —ঐ

৫

ফুলে ফুলে সখী বন ফুলে নাচ,
গাঁথিব মালা পরাব গলে।
বনফুলে নাচলো, সখী, বনফুলে নাচ॥ —ঐ

৬

নর হয়ে বিচার করি কেমনে,
করি কেমনে গো বল করি কেমনে॥

৭

ধীরে ধীরে যাই গো, তোতা, চাচাজীর বাড়ী,
চাচাজীর বাড়ী যাইগো চাচাজীর বাড়ী॥
সত্যি করে বলছি, চাচা দিবেন পাঁচশো টাকা গো।
হাতে ধরি পায়ে ধরি, চাচা দিবেন পাঁচশো টাকা। —ঐ

৮

কে যাবে কে যাবে ভাইজান কে যাবে জানি।
জানির জন্যে লোক ভাইজান আমায় কর না অপমানি॥
আরে ও ভাইজান মেরেছে মেরেছে।
ভাইজান আমায় মেরেছে
ছোট ভগ্নী বলে ভাইয়ের দয়া নাই দেহে॥

৯

আমি ছালাম জানায় মাষ্টারের চরণে গো॥
ছালাম ছালাম ছালাম জানায় মাষ্টার গো
ও-না-আপনার ও চরণে॥
শাহজানের কন্যা আমি মাষ্টার গো
ও না জেলা বরিশালে॥ —বরিশাল

১০

আমি আর যাব না হাইস্কুলে পড়তে গো ॥
হাইস্কুলে—পড়তে গেলে ভাইজান গো—
ও আমার সম্মান রাখে না গো ॥
পড়াবার যদি ইচ্ছা থাকে ভাইজান গো
ওনা—মাষ্টার রাখেন বাড়ী ॥ —ঐ

১১

চরণ ধরে বলছি, চাচা, দেবেন পাঁচশ টাকা ॥
দেবেন পাঁচশ টাকা, চাচা, দেবেন পাঁচশ টাকা গো—
ও দেবেন পাঁচশ টাকা ॥ —ঐ

১২

ও আমার কালেজা ধরিল দারুণ বিষে গো ॥
ভাইএ ভাইএ বিচ্ছেদ করে খালেক রে—
ওনা বিষ খাওয়ালি শেষে ॥
নাইকো মাতা, নাইকো পিতা, খালেক রে—
ও না—কেহ নাই সংসারে ॥
আরে ও ভাইজান মরেছে মরেছে
গুনোর কপাল ভেঙ্গেছে ।
অভাগিনী গুনাই রে ডাকে, ও ভাই সঙ্গে করে নে ॥
খালেক রে খালেক রে, ও বিষ আমার হস্তে দে,
নাইকো মাতা নাইকো পিতা এবার আমিও যাই চলে ॥ —ঐ

১৩

আরে ও সখি, চল যাই চল যাই আমরা ফুল বাগানে যাই—
ফুল বাগানে গিয়া রে, সখি, পরাণ জুড়াই ॥
আরেও ও ফুল তুলিব তুলিব আমরা ডালা সাজাব ।
বিনা সূতের হার গাঁথিয়া আমরা গলায় পরিব ॥ —ঐ

১৪

আরেও কে তোমরা কে আছ কে আছ তোমরা কে আছ বনে,
আরে সরল মনে দাও পরিচয় তোমরা দুজনে ॥

আরে ও তোমরা কথা কও কথা কও—তোমরা একটি কথা কও।
এখনি ছাড়িব গুলি রক্ষা নাই পাও॥ —ঐ

১৫

ফলে ফুলে, সখি, বন ফুলে নাচ
বন ফুলে নাচ, লো সই!
বন ফুলে নাচ।
আমরা গাঁথিব মালা আমরা সাজাব ডালা
পরাব তোমার গলে॥ —ঐ

গুরুবাদী সঙ্গীত

বাংলার আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের একটি প্রধান অংশ গুরুবাদী সঙ্গীত। গুরুর মহিমা, গুরুর উপর নির্ভরশীলতা, সদ্‌গুরুর সন্ধান ইত্যাদি বিষয় ইহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়া থাকে। মুসলমান সমাজে এই শ্রেণীর গানই মুর্শীদ্যা (পরে দ্রষ্টব্য) গান বলিয়া পরিচিত।

বাংলা দেশে যে সকল ধর্মমত সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহাদের মধ্যে নাথধর্ম এবং তান্ত্রিক ধর্ম প্রবল গুরুবাদী ধর্ম। মধ্যযুগে মুসলমান ধর্মের মাধ্যমে যে সূফী মতবাদের এই দেশে আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহাও প্রবল গুরুবাদী ধর্মমত ছিল। এই সকল নানা সূত্র হইতে বাংলার সমাজে গুরুবাদী ধর্মমতের ব্যাপক প্রচার হইয়াছিল। নানা ধর্মীয় লোক-সঙ্গীতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১

মন পঅলা, গুরু কি ধন চিন্‌লি না,
নৌকা খুলি দেশত চল না।
আইলাম ভবর মাঝত, দিন গেল মিছা কামত
সাধন ভজন অইল না, উন্মত্ত পঅলার মত,
অবিরত সন্‌সারের কামত, মিছা কামত ডুবি মরি,
কন্‌ আছে আমার আপন আপনা?
মন পঅলা, গুরু কি ধন চিন্‌লী না। —চট্টগ্রাম

২

আত্মতত্ত্ব না জানিলে পরতত্ত্ব বুঝা বিষম দায়।
গুরুর কৃপায় সুফল ফলে প্রকৃত গুরু নিতে হয়॥
চব্বিশ তত্ত্বে দেহখানা, আঠার মোকাম আছে ঠিকানা,
ছয় চক্রে দেহ ষোল আনা, তিন ধারা বাড়া কমা বয়॥
দেহের মাঝে দশ দিক আছে, সে খবর যে জন জেনেছে,
নব গ্রহ নয় স্থানে আছে, বুঝতে হয় ভাব সমুদয়॥
দুই দ্বারেতে বায়ু চলে, ভিতরে পাঁচ প্রাণে খেলে,
ঐ পাঁচে পঞ্চধারা চলে, সেটা বুঝা বিষম দায়॥
হরানন্দ ভাবছে বসে, সব হারালাম কর্মদোষে,
দিবানিশি কুসঙ্গীরসে, ঐ দেখ হাসে মৃত্যুঞ্জয়॥ —মুর্শিদাবাদ

৩

বিশ্বমাঝে নাইরে গুরু, গুরুবস্তু আছে ঘরে।
জ্ঞানের অভাব হয়ে রে কেবল পড়ে মায়া অন্ধকারে॥
শান্ত ভাবখান লক্ষ্য করে, দাস্যভাব দাও তার ভিতরে,
সখ্য ভাব খুব হুঁসিয়ারে, বাৎসল্য ভাব পাবি অন্তরে॥
বঁধুর ভাবের কি মাধুরী, যায় রে ভাবের বলিহারি,
সেদিন গুরু শিষ্য এক প্রকারি, মিলন হবে আনন্দ পুরে॥
ভ্রমে জীবগণ বেড়ায় ঘুরে, চিন্‌তে নারে আপন ঘরে,
ভাগ্যগুণে যার লক্ষ্য পড়ে, সেই ত চেতন এ-সংসারে॥
হরানন্দ ভাবছে বসে, বদ্ধ হলাম অষ্টপাশে,
গেল জনম কর্মদোষে, প'ড়ে মায়া অন্ধকারে॥ —ঐ

৪

ঐ পারেতে আছে গুরু এই পারেতে থাক্‌লি বসে।
নেমে পড়, মন, নদীর মাঝে যাস্‌নে যেন স্রোতে ভেসে॥
ঐ দেখ বেলা গেল চলে, রইলি বসে অবহেলে,
সময়মত না পৌছিলে, কি হবে বল অবশেষে॥
বদ্ধ হ'লি অষ্টপাশে, গুরুর দেখা পাবি কিসে,
যত যোগী ন্যাসী উর্দ্ধশ্বাসে, ধরার পথে আছে বসে॥

হরানন্দ ভাবে মনে, দেখা দাও হে নিজগুণে,
কেউ নাই, প্রভু, তোমা বিনে,
রইলাম আমি তোমার আশে ॥ —ঐ

৫

মরা গুরু জিয়ান্ত গুরু দুই জনা দুই পারে আছে।
আসা যাওয়ায় মধ্যে যারা তাদের, ভাই, ভরসা মিছে ॥
গুরু গুরু সবাই বলে তার দেখা, ভাই, কোথায় মিলে।
যেই থাকে সহস্রদলে রূপে মিশেছে ॥
ভাব্‌তে হয় চিত্তানন্দ তখন ভক্ত সদানন্দ।
মৃত্যুহরণ যেই করেছে ॥
জন্মে যারা মৃত্যুহারা তাদের ভাব বেদবিধি ছাড়া।
নয়নেতে রেখে পারা সকল দেখেছে ॥
পিতার যোনি মায়ের লিঙ্গ এ নিয়ে ভাই কর রঙ্গ,
গুরুশিষ্যের একই অঙ্গ—অঙ্গভাব সঙ্গে রয়েছে ॥
দেখ দেখি অন্তরের ভাব বস্তু ছেড়ে বস্তু হয় লাভ।
সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিভাব স্বদেহে রয়েছে ॥
আপন যোনি পুত্রে দিয়ে মাতৃযোনি আপনি নিয়ে
সেই রঙ্গে এক রং মিশায়ে মৃত্যুহরণ মৃত্যুর কাছে ॥
যেই কথাটি হাড়রে কহে বাবার সঙ্গে মায়ের বিয়ে।
আমি তখন নয় বছরের ছেলে বসে দেখি কাছে ॥ —ঐ

৬

তুমি কোথায় কি ভাবে থাক গুরু দেহ পরিচয়।
আমি ভাব না জেনে ভজি কেমনে, ওহে, গুরু, দয়াময় ॥
কোন ধামে কি ভাবে প্রাপ্তি না জান্‌লে কি হবে গতি গো।
গুরু মতি কি সে শুদ্ধ হয় ॥
গুরু, তোমার অপার লীলা নানা ধামে নানা খেলা গো।
এ তত্ত্ব শুন্‌লে গলয়ে শিলা ভব জ্বালা আদি দূরে যায় ॥
বৃন্দাবন কয় আমি হত, না বুঝিলাম গুরুতত্ত্ব।
আমি হলাম রিপুর অনুগত পরতত্ত্ব প্রাপ্তি কিসে হয় ॥ —ঐ

৭

আগে দেহ আচমন কর প্রবর্তন ধর অঙ্গন্যাস করে পুর কর পাপাচরণ।
মনের কুটিনাটি ছাড়ি ধরবি সে অধর আসে আত্মতত্ত্বসার যাবি ভব পার॥
দেহের মধ্যে দেহ করহে গঠন আরোপেতে রূপ পাবি দরশন।
ও তোর কেটে যাবে কর্মফাঁস হবে রে প্রেমোল্লাস
তখন মধুর মুরতি দেখ্‌বি নিরন্তর॥
পাপাচার দেহে না হয় কৃষ্ণ ভজন বিচারিয়ে দেখ, ওরে আমার মন।
যে জন, হা কৃষ্ণ, বলে কাঁদে—তার অশ্রুধারা বহি
নিষ্পাপ দেহে ধারা অনিবার॥
গুরু কৃষ্ণ বলে করয়ে গণ্ডুষ, অজপা নামেতে হয় রে সন্তোষ।
ও সে ষোলতে পুরিয়ে চৌষট্টি ধরিয়ে
বত্রিশেতে ঐ নাম ছাড় বারংবার॥
সধীর মনে হয়ে হর্ষচিতে মালা চন্দনাদি লয়ে দুই হাতে।
মালা দুই জনের গলে পরাও কৌতুহলে
গোঁসাই নবীন চাঁদের কৃপায় এ দীন রাধার॥
—গবরাচর (মুর্শিদাবাদ)

৮

ধর্ ধর্ মন্ ঠিক্ করে ধর।
ওরে—চেতন গুরুর সঙ্গ কর॥
চেতন গুরু, কল্পতরু চেতন থাক্‌তে স্মরণ কর,—
রাধার নামে বাদাম দিয়ে কিনারা ভিড়াইয়া ধর।
কাম নদীতে তুফান ভারি দেইখে আমার করে ডর,
গুরুর নাম্‌টি স্মরণ করে ঝট্ করে মন-বৈঠা ধর॥ —মৈমনসিংহ

৯

ভবে কি ধন পাইয়া ভুইলাছ রে মন!
গুরুর চরণ অমূল্য ধন, তাই কেনে কল্লে না স্মরণ,
কি ধন পাইয়া ভুইলাছরে মন!
ধনী হবার ইচ্ছা কর, মনকে মহাজন কর,
প্রেমধন লইয়া ব্যাপার কর ঠিক্ রাখ্যা ওজন!

অন্তুদিগে মন দিয়োনারে, তোমার হৃদে রাখ গুরুর চরণ!
কি ধন পাইয়া ভুইলাছ রে মন!
ঢাকা গিয়া সন্দেশ খাইলে, বাবুগিরি নাম জানাইলে,
ঘির্‌তের মধ্যে ছাই মাখাইলে, পান্তাভাতে মাখ্‌লে মাখন!
কি ধন পাইয়া ভুইলাছ রে মন! —ঐ (১৩২৬)

১০

আমার মন ভাল না,
আমার স্বভাব ভাল না;
গুরু কি ধন চিন্‌লাম না—চোক থাকৃতে
হইলাম রে কাণা।
স্ত্রীপুত্র, রে পাষাণ মন, স্ত্রীপুত্র তোর
কেউ ত সঙ্গে যাবে না।
মন, তোরে করি রে মানা, কুপথে যাইও না,
সাধন কর, বস্তু চিন, কষ্ট রবে না;
ভাইবন্ধু রে পাষাণমন, ভাইবন্ধু তোর
কেউ ত সঙ্গে যাবে না।
মন রে একে তনুক্ষীণ, শমনে গণে দিন,
মিছে মায়ায় বন্দী হইয়ে রইলেম চিরদিন;
নদীর কূলে বইসারে, পাষাণ মন, গাঙ্গের কূলে,
বইসা জল-পিপাসা গেল না! —ঢাকা (১৩২২)

১১

মন পাগেলারে, আরে হরদমে গুরুজির নাম লইও।
(ওরে লইও নামটী পরম যতনে)
ওরে দিবানিশি লইও নাম,
কামাই নাহি দিও।
ওরে ভাই বল, বন্ধু বল, সম্পদের সাথী,
ওরে অসময় নিদানকালে গুরুর নাম সারথি।
ওরে টাকা বল, কড়ি রে বল, সব পুরাণ হয়ে যায়;
আমার গুরুজির নাম সদা নতুন রয়। —ঐ (১৩২০)

১২

চল গুরু, তুজন যাই পারে,
আমার একা যেতে ভয় করে।
পার ঘাটেতে মাল্লা ছয় জনা,
সঙ্গী বিনে তারা আমায়
পার করে দেয় না,
মাঝি বলে দেই পার করে,
মাল্লায় যে নিষেধ করে ॥
আমার দেহ ছিল যে শ্মশানের সমান,
গুরু, তুমি মন্ত্র দিয়ে করলা ফুল বাগান,
আমার সে বাগানে ফুল ফুটেছে,
গোঁসাই অধরচাঁদ বিরাজ করে ॥ —ঐ (১৩২১)

১৩

তরী বেয়ে যারে, সুজন নাইয়া,
বাইয়া যা তোর গুরুর কাছে।
মনরে, একটি বৃক্ষের তিনটি ডাল,
কোন্ ডালে তোর খোয়াইলা কাল;
কোন্ ডালে তোর গুরু আছে,
তুই বা রলি কার কাছে ॥
গুরু হল সার পদার্থ,
আমি হইলেম অপদার্থ,
কোন্ দিনে তোর গুরুর জন্ম,
তোর জন্ম আগে না পাছে। —ঐ (১৩২৪)

১৪

আমার মন, (তুমি) ফান্দে পড়েছ।
আমার আমার আমার বলে, মিছা মায়ায় ঘুরতেছ ॥
আম গাছে আম নাই, পাতায় পাতায় বাইতেছ।
আপন গুরুর ঠিকানা নাই, পরের গুরু হইতেছ ॥
দুগ্ধের মধ্যে সর নাই, মাখন ছানা খাইতেছ,

আপ্‌নে মরিয়া সাইধা পরের জন্য কান্তেছ ॥
ঘরখানা ভাঙ্গা ভাই রে, দুয়ার কেন বান্তেছ,
দুই ডালে দুই পাও দিয়া প্রাণের দায়ে কান্তেছ ॥ —ঐ (১৩২৬)

১৫

পাগলা, তোরে মার খাওয়াব (রে)
দয়াল গুরুজির কাছে কইয়া, দয়াল মুর্শিদের কাছে কইয়া (রে) !
আগায় যেন বস্‌ছ মাঝি পাছের দিকে চাইও,
লাভ করিবে যেমন তেমন, মুল নি হারাও চাইও !
ফকিরি যে কর, ফকির, গাছের তলে বইয়া
গাছের ফলটি গাছে রইল, বোঁটা গেল খইসা। —ঢাকা (১৩২৬)

১৬

গুরুপদ ব্রহ্মার দুর্লভ ধন,
তাঁরে কি সাধনে পাবি মন ॥
ঐ চরণ ভরসা করা,
যেমন বামন হইয়ে চানকে ধরা ;
অধর চানকে না যায় ধরা,
সে বড় কঠিন ধন ॥
ওই চরণের অভিলাষী,
শিব হয়েছেন শ্মশানবাসী,
গয়া গঙ্গা বারাণসী,
সর্বতীর্থ শ্রীচরণ ॥
দাঁড়াও গুরু বাঁকা হইয়ে,
সঙ্গে ভক্তবৃন্দ লইয়ে,
সারচন্দন তুলসী দিয়ে
পুজব তোমার শ্রীচরণ ॥ —ঢাকা (১৩২৬)

১৭

গুরু ! তোমার চরণ পাব বলে বড় আশা ছিল।
আশা পানীর কুলে বসে আমার আশায় জনম গেল ॥
(অ) আশা না পুরিল ॥

আমার মনের আশা, মনে রইল, (অ) আশ না পুরিল ॥
আশা বৃক্ষ রোপণ কইরে,
আমি বইসে রইলাম বৃক্ষতলে,
(অ) ফল ফল্‌বে বইলে ;
এল না ফলিতে বৃক্ষে, বৃক্ষের ডাল ভাইঙ্গা গেল।
(অ) আশা না পুরিল ॥
চাতক রইল মেঘের আশে,
মেঘ বইয়ে যায় অন্য দেশে,
(অ) চাতক বাঁচে কিসে ?
জল বিনে চাতকী মইল,
আমার তেমনি দশা হইল। —ঐ (১৩২১)

১৮

আমার গোলমালে দিন গেল।
যার জন্য হইলাম পাগল,
আমার সে নিগমে রইল ॥
মনের মানুষ বলিয়া রে,
ঘর থুইয়ে বাইর তালাস করে, মন রে,—
গুরুর তত্ত্ব জেনে মত্ত হইয়ে
রসিক জনা ডুইবে রইল ॥
ডুব দিয়ে চুপ করে থাক,
মনের কথা মনে রাখ, মন রে—
এবার গোপনেতে সাধন সিদ্ধি
গুরু গোঁসাই বইলাছিল ॥ —ঐ (১৩২২)

১৯

গুরু বন্ধু গো, তুমি বিনে ভবপারে আমার কেহ নাই।
সংসার সাগর মাঝে
কত বিপদ পদে পদে গো,—
গুরু বন্ধু গো, তুমি বিনে ভবপারে,
পারের সম্বল নাই ॥

আশা পথ চেয়ে থাকি, আমি চাতক তুমি বারি গো,—
গুরুবন্ধু গো, আমার হৃদয় মাঝে বিরাজ সদাই ॥
সঁপিয়ে তোমায় হিয়ে, কলঙ্কিনী জগৎ ভইরে গো,—
গুরু বন্ধু গো, সেও ভাল তোমায় যদি পাই ॥ —ঐ (১৩২২)

২০

জীবন নিয়া জুড়াব রে মন, এল কাল-রজনী।
উজান বইলে যাও বইয়ে, ভাবের ঘাটে ডর পানি ॥
নদীর নাহিক পারাবার, তার জানিস না সাঁতার।
হয় না যেন ভরাডুবি সাবধানে ফেল দাঁড় ॥
শুধু গুরুর নামে বইয়ে যাও তনু-তরণী।
গুরু বলে, যদি পারে যাবি, সার কর চরণ দু'খানি ॥ —রাজসাহী

২১

মিছে হাল বৈয়ে কাল গেল রে
আমার কৃষি হৈল না।
বাবার ছিল লাখরাজ জমি
ত্রিশ বিঘার নাইরে জমি
ধনাই মণ্ডল কিরষাণ ছিল
জমির আইল ত খুঁজিয়া পাইল না।
যখন জমির লাঙ্গল জুড়ি
বলদ দুইটা ধরে আড়ি
হাল ছেড়ে সবাই পালায়
আপন চিনে না, সে ত ঘুরে দেখে না।
বুদ্ধি আর মঙ্গল এড়ে
পরের জমি খায়রে কেড়ে
খেয়ে দেয়ে হুঙ্কার মারে
সে যে আপন চিনে না।
অমাবস্যার যোগ এল, সে যোগ আমার যায় রে ঠেলে
গুরুর ভাগ্যের ফল না পেয়ে
অঙ্কুর হইল না, প্রেমের অঙ্কুর হইল না। —ঐ

২২

ভবনদীর কোথায় কেমন সহজে কি জানা যায়।
কোথায় গড়ে হাঁটুপানি কোথাও হাতী তলিয়ে যায়॥
নামিলে পরে বাঁধা ঘাটে আছে কত মহা তায়।
কত সাধু শাস্ত হৈয়ে ভ্রান্ত আঁধারে মারা যায়॥
গুরু বলে, ঘোলা জলে ঘাট কি আঘাটা চেনা দায়।
জেনে শুনে নামিলে পরে নাহিক ক্ষতি তায়॥ —ঐ

২৩

যাইয়া মনের মানুষ তলাস কর রে,
মন আপন গুরু না ভজিলে রে
ও তোর মক্কা যাওয়া অকারণ।
ও তোর তীর্থ যাওয়া অকারণ॥
বার মাসে তের ফুল ফুটে
অম্যাবস্যা পুর্ণিমা তার মধ্যে আছে।
ফুলের বোঁটা কাটা মাকড়ি আঁটা
তার মধ্যে আছে মহাজন॥ —ঐ

২৪

সাধনের সাধ থাকে যদি
ভজনের সাধ থাকে যদি।
গুরুর বস্তু ঠিক রাখ মন
কর গা সাধনের গতি॥
এখনও তোর সময় আছে
গুরুর কাছে কর গা মিনতি।
দয়াল গুরু আইসা হৃদ-মাঝারে
জ্বালিয়া দেয় জ্ঞানের এক বাতি॥ —ঐ

২৫

তোর মন যদি তুই, না চিনিস
পরকে চিন্‌বে বল কেমনে।

পরকে চিনার বাঞ্ছা কর
আত্মতত্ত্ব ধর শিরে।
গাছ নাই জমিনে পাতা
ফলে ফুলে এক সাথে গাঁথা।
গুরুর চরণে শিষ্যের মাথা
ভবে এমনি মত রয়েছে বাঁধা॥ —ঐ

২৬

ও গুরু, আমার পূর্বের কথা মনে নাই
জানিতে চাই তাই।
পূর্বের কথা মনে হৈলে ভাসি দু নয়নের জলে,
আর কি আছে কপালে দিবানিশি ভাবি তাই॥
নাক থাকিতে নিঃশ্বাস বন্ধ,
মুখ থাকিতে বাক্য বন্ধ,
ও গুরু, চক্ষু থাকিতে হৈলাম অন্ধ
শেষে কি হৈয়ে থাকিব ভবে জন্ম অন্ধ॥ —ঐ

২৭

এ ভবের, হায়, কি কারখানা।
মনের মত কেউ ত হবে না॥
এত কৈরে সাধলে গুরুর সাধনা।
গুরু হয় আপন জন, যায় যাতনা। —ঐ

২৮

পাগল, তোর পাগলামি গেল না।
মিছা প্রেম রসেতে মত্ত হৈয়ে
গুরু নাম নিলে না॥
যখন শমন এসে ধরিবে কেশে
কি করিবে তা বল না॥
তোর পিতা মাতা ভাই বন্ধু
কেউ রাখিতে নারিবে না॥

নারীর কুহকে মত্ত হৈয়ে নিত্য ধন হেরিলে না।
যারে চক্ষুর আড়াল করতে নারিস
সে মৃত্যুকালে ছোঁবে না ॥
তোরে এত বুঝাই, আমার কথা শুন্‌লি না।
যদি পাবি চরণ কর রে সাধন
কর দয়াল গুরুর সাধনা ॥ —ঐ

২৯

হয়েছি দিশেহারা মনের মানুষ খুঁজতে এসে।
ও ভোলা মন, প্রাণে মারা যাইরে শেষে ॥
যে যাহা যতন করে সে মরে তার তরে।
পালাম না তবু তারে এ জনমভরে ॥
বলি, মন, জানিও এই সার
গুরু বিনা নাই গতি আর।
দারা সুত পরিবার ফেলে যেতে হবে শেষে,
গুরু নামে নিশান তুলে যাই নিজ দেশে। —ঐ

৩০

ধন পেয়ে মন মত্ত হৈয়ে থেক না।
ও মন, গুরু নাম আর ভুল না ॥
ধনে বাড়ে বাসনা হয় না গুরুর সাধনা
অতুল ঐশ্বর্য ভোগে আশা মিটে না।
রিপু ছয়টা বাড়ায় ঘটা
কাহারও কথা মানে না ॥ —ঐ

৩১

ভোমরা, যাওরে তুমি তফাতে।
কি হেতু ভাব্‌ছ বৈসে মায়াতে ॥
কাঁটা পুরা কেয়া বনে কভু যাইও না।
ও যে তাহাতে মধু পাবে না ॥
সার কর গুরুর কমল কানন।
মজিও তুমি তাহাতে, ও ভোলা মন ॥ —ঐ

৩২

আসব না আর ভবের বাজারে।
আমার বেসাতি হয় না যাই ফিরে॥
এমন আশী লক্ষ বার এসেছি
প্রাণ গেল এই কৈরে।
ভাণ্ডারেতে রতন আছে কেউ নিবে তা যতন কৈরে॥
থাকি তার কাছে, আমার চক্ষু থাকিতে পাই না দেখিতে
বেড়াই খালি ঘুরে ঘুরে।
হাটের যত জহুরে আত্মসারে, তারা সব গেল মরে।
আমার গরীব বৈলে কেউ দিলে না, লুটে নিল ভাণ্ডারে।
গুরুর কৃপা হৈলে রতন পেলে চৈতন্য হৈবে সংসারে॥ —ঐ

৩৩

গুরু বৈলে ডাক রে জনম সফল কৈরে রাখ রে,
কর্মফলে যা হয় হৈবে মিছে কেন মর ভেবে
মনের আনন্দে গুরু বৈলে স্বচ্ছন্দে থাক রে॥
মুখে ডাক গুরু বলি কর্ণে শুন গুরুর গুণাবলী
গুরু ভক্তের পদধূলি ও মন অঙ্গেতে অঙ্গেতে মাখ রে
দিন গেল রে দেখতে দেখতে
উপায় দেখ দিন থাকতে থাকতে
গুরু বৈলে ডাকতে ডাকতে, প্রাণ যদি যায় তবে থাকবে॥ —ঐ

৩৪

মন, তুমি কারে ভাবছ বৈসে।
কর গুরু সাধন এখনও রিপু আছে বশে॥
দেহেতে ছয় কুজনা দেয় তোরে মন্ত্রণা
ভুলেও গুরু বল না হৈয়ে তাদের বশে।
সাধ আগে গুরুজনারে
তার কৃপা হৈলে ভয় আছে আর কি সে॥
সে ধন সহজে কি মিলে কখন
দেখ বাঞ্ছা কল্পতরু সে জন

এক মনে ভাবে যে জন, লভ্য হয় তার অনায়াসে।
গুরু হয় অন্ধের দর্পণ, তারে যতনে ডাকিলে মিলে অবশেষে॥ —ঐ

৩৫

ইন্দ্রিয় দমন কর আগে, মন,
না হৈলে সাধন হৈবে না।
পরের কথা শুনে গুরু বৈলে নাচ,
গুরু কোথা আছে তারে কি চিনেছ,
কেবল শুনেছ, শুনা কৈ কৈরেছ
নিশ্চিন্ত রহেছ পরিণাম ভাবনা॥
ইষ্টমন্ত্র শুধু করিয়ে গ্রহণ
জপিছ ভজিছ হতেছে সাধন।
জ্ঞান আঁখি যার ফোটে, অষ্টপাশ কাটে।
শুনা কথা মোটে শুন না শুন না॥ —ঐ

৩৬

আমি হৈলাম নিজে অসার,
গুরুর ভাব কিসে পাইব আর,
পারিজাতে কি মধুর ভাণ্ডার
নরক কীটে কি জানিবে তাই।
চকোর জানে সুধার মরম,
জহুরা জানে রতনের ভরম,
আমি হৈলাম গোষ্পদ সম অধম
সিন্ধুর সংবাদ কেমনে লই॥
গুরুকে ডাকার মত যেবা ডাকে
সে ডাক তাঁর মনে লাগে
প্রেমপাশে বাঁধ তাকে
গুরু প্রেমের টানে আসে তখনি॥ —ঐ

৩৭

শিশু যেমন সরল মনে মাকে ডাকে খনে খনে
তুমি তেমন একমনে ডাকিতে না দিও ফাঁক।

ডাকার মত ডাকিলে পরে অম্‌নি আসে ত্বরা কৈরে,
গাভী যেমন আসে দৌড়ে শুনি নিজ বৎসের ডাক ॥
শুদ্ধ প্রেমভক্তি ডোরে গুরু বাঁধা সদাই ভক্তের দ্বারে,
তাই বলি নিরন্তরে ভক্তি চন্দন হৃদয়ে মাখ।
কামিনী কাঞ্চন মাটি অঙ্গে না মাখিও সেটি
ছেড়ে মনের খুঁটিনাটি, ও মন, গুরুর ভাবে মৈজে থাকে ॥

—ঐ

৩৮

গুরুর সঙ্গে প্রেমভক্তি কৈ হৈল মোর হবার কালে।
তোর সাধন ভজন সব ফুরাবে অনুরাগের সময় গেলে।
কমল ফুলে থাকৃত মধুরে, ভ্রমর আসত দলে দলে।
আর কি ভ্রমর আস্‌বে বল কমল-কলি শুখাইলে ॥
আগ বাজারে সওদা কল্লেরে কত মাণিক মুক্তা মিলে।
আর কি মাণিক পাব বল বেচাকেনার সময় গেলে ॥ —ঐ

৩৯

গুরু, সুভাব দাও আমার মনে
যুগল চরণ আর যেন ভুলি না,
আমার জন্ম-অন্ধ দুই নয়ন।
গুরু, তুমি বৈদ্য সচেতন ॥
গুরু, সুভাব দাও আমার মনে,
জ্ঞান-অঞ্জন দাও দুই নয়নে ॥
গুরু, তুমি নিদয় যার প্রতি,
গুরু, সদাই ধরে তাঁর কুমতি ॥
তুমি মনোরথের সারথি,
তুমি না চালালে চল্‌বে কেমনে।
গুরু, সুভাব দাও আমার মনে ॥ —ঐ

৪০

আমায় দাও, গুরু, তোমার ঐ চরণ।
পারি না যে এ পাপ দেহ করিতে বহন ॥

প্রেমামৃত হারে লৈয়ে হৃদয় দ্বারে দাঁড়ায়ে
ডাকি প্রতি সময়ে তুমি কর না শ্রবণ।
চরণতলে পড়ে থাকি পদধূলি গায়ে মাখি
পাপ তাপ দূরে রাখি জুড়ায় যেন জীবন ॥ —ঐ

৪১

মুসাফির, হঙ্গী তালাশ কর,
ডাক দিলে চলি যাবি কঅরের ভিতর।
ষোল হাত্যা বাশর ঘর, ন কুলাইল জনম ভর।
পাঁচ পাহাত্যা মাটীর ঘর, যাইবি এগেশ্বর।
মুসাফির, হঙ্গী তালাশ গর। —চট্টগ্রাম

৪২

দয়াল, গুরুজী, বৈসে বৈসে ভাবছ কি,
গুরু দিয়াছেন হোঁকা কল্‌কী তামাক টিকা বাতি।
গুরুদত্তা বাতি ভিজায়ে কর্‌লে ডাকাতি
খোঁচাতে খোঁচাতে মশল্লা গেল উধে,
শেষ রাত্রে জ্বালাবে কি,
হোঁকা কল্‌কী রাধাকৃষ্ণ লইচা হয় জগন্নাথজী।
তার উপরে ব্রহ্মা বিষ্ণু নীচে আছেন গঙ্গাজী।
শিঙ্গা গুরু কল্পতরু ঘরে আছেন শ্রীমতী,
তাহার কাছে জিজ্ঞাসা কর
তামাক খাওয়ার সন্ধান কি ॥ —রাজসাহী

গুয়া-পানের গান

উত্তর বাংলা বিশেষতঃ জলপাইগুড়ি জিলার রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিষহরী পুজার সময় এক শ্রেণীর গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে গুয়া পানের গান বলা হয়। ইহাতে পান এবং সুপারির মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়।

১

গুয়া খ্যায়া যা প্রাণের আলো সই,
কে দিন ভারা আরে কে দিন ভারটি নারে হে।

গুয়া উঠিয়া বলে মুই বঙ্গের খেতি,
আষাঢ় শায়ন মাসে এ ঘোর যুবতি।
পান উঠিয়া কহে মুই মেঘ বরণ,
বারুই ডাকুয়া জানে হামার যতন।
বারুই ডাকুয়া জানে হামার হিত,
নল খাগর দিয়া বাড়ায় নিত নিত।
ঝিনাই উঠিয়া বলে মুই সাগরত্‌ বন্‌চু।
পুরিয়া পছিয়া করে কাঞ্চরে পাচাপু।
আজন যুগিয়া বেটা আনিল ধরিয়া,
জাবেরা ঘুম্বরা দিয়া মারিল পুড়িয়া।
ছুরিয়া পুড়িয়া মোক কল্লে রসি,
হামেরা উঠিয়া পানের বুকোৎ বসি।
কাঠারি উঠিয়া কহে মুই নসর পসর,
হামেরা কাটিলে গুয়া খায় সব্ব নর।
সাজি উঠিয়া কহে হামেরা ভাণ্ডারী,
মোরা না হইলে গুয়া যায় অধোগতি।
আবাল ছাওয়াল লোক গুয়া ভানা খায়,
হিগাল হুগাল করি গিলিয়া ফ্যালায়।
এ ঘোর যুবতি কৈ না গুয়া ভানা খায়,
কলসিত মুখ দিয়া ঊপ নেহলায়।
বুড়ি বুড়া লোক গুয়া ভানা খায়,
হিগাল হুগাল করি থবরা ফ্যালায়।
থিরল উঠিয়া কহে হামরা পাঁচ ভাই,
দাঁতের গোড়ে হামারও আছে ঠাঁই।
রামের গছে কুহু দাড়িম্বের গছে গুয়া,
দিবে পানে ত্যালে সিন্দূর গিতালে পায় গুয়া।

—জলপাইগুড়ি

গোপিনী কীর্ত্তন, গোপিনী খেলা

পূর্ব্ব মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট অঞ্চলে এক শ্রেণীর নৃত্য সম্বলিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহাকে গোপিনী কীর্ত্তন বা গোপিনী খেলা বলে। ইহা নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীসমাজের মধ্যেই এখন সীমাবদ্ধ।

১

গৌর বরণ রূপের কিরণ লাগ্‌ল নয়নে।
(লাগ্‌ল নয়নে, সজনি, লাগ্‌ল নয়নে)॥
আমার গৌর অপরূপ, কোটি মন্মথ-স্বরূপ,
সজনী, কখন চক্ষে দেখি না এরূপ,
গোরা আড়-নয়নের চাউনি দিয়ে পরাণ ধরিয়া টানে।
যদি গৌরকুল পাই, আমার এই কুলের কাজ নাই,
সজনী, তিন কড়ার মুল কুলে দিলাম ছাই।
আমি গৌরকুলে কুল মিশায়ে, সজনি, মজে রব তার চরণে।
ভেবে জয়মঙ্গলে কয়, আমার গৌর রসময়;
সজনি, রসে মাখা তনুখানি হয়,
গোরার রসে ডুবুডুবু আঁখি, একদিন চেয়েছিল আমার পানে।

—মৈমনসিংহ

২

আজ কেন রে যৈবন তুই, মিছে পাগল করিস রে হায়!
ধোপ্ কাপড়ে কালির ফোঁটা,
মাধব! যাবে যৈবন, রবে খোঁটা॥
আড়ায় যেমন ময়না রে পোষে,
ও মাধব, ছুটে গেলি আর না আসে॥
আড়ায় যেমন ময়না রে পাখী,
ও মাধব, তাই দেখে প্রাণ বেঁধে রাখি॥ —ফরিদপুর

৩

গৌররূপ লাগিল নয়নে,
আমি কুক্ষণে চাহিয়াছিলাম গো,
গৌরচন্দ্রের পানে।

কলসীতে নাই রে পানি, আমি গিয়েছিলাম সুরধুনী ;
গৌর কে বা না শুনি শ্রবণে।
একদিন জলের ঘাটে দেখে তারে মজেছি পরাণে ॥
গৌর থাকে রাজপথে,—
তোমরা কেউ যাইও না জল আনিতে গো,
দেখলে তারে মরিবে পরাণে ;
শেষে আমার মত ঠেকবি তোরা গোপালচান্দে ভণে ॥ —মৈমনসিংহ

এই গানটি কৃষ্ণধামালী বলিয়াও পরিচিত। ইহা নৃত্যসম্বলিত নারীনৃত্য। উত্তর এবং পূর্ব বাংলার প্রায় সর্বত্রই নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সমাজের মধ্যে ধামালী গান প্রচলিত থাকিলেও শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলার সর্বত্র সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী পরিবারের স্ত্রীসমাজেও ধামালী গান প্রচলিত আছে। নবান্ন উৎসবের সময় কিংবা নববধূকে বরণ করিবার সময়, বৌ নাচের সময় সম্ভ্রান্তবংশের মহিলারাও নৃত্যসহযোগে ধামালী গাহিয়া থাকেন।

গো-পূজার গান

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার প্রধান গো-উৎসরের নাম অহীরা উৎসব। সেই উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা অহীরা গান (পূর্ব দ্রষ্টব্য) বলিয়া পরিচিত। কাতিকী অনাবস্যাতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে আনুষ্ঠানিকভাবে গো-পূজা হয়। পূজার বিভিন্ন আচার পালন কালীন গোজাতি সম্পর্কেই সঙ্গীতের মধ্য দিয়া নানা বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। অহীরা গান, গরু জাগাইবার গান ইত্যাদিও গো-পূজারই অন্তর্ভুক্ত। এখানে আরও কিছু অতিরিক্ত গানের সংগ্রহ প্রকাশিত হইল।

১

এতদিন যে দেখি কালার কানে জাম ফুল রে,
আজ কেনে কালার বদন মলিন রে আজ কেনে।
নন্দ গোয়ালার বেটা বড় ভাগ্যিমান রে,
দুধে ভাতে চলিল সমান।
কপিলা গাই চলি গেল শ্রীবৃন্দাবনেরে
আধা পথে বাঘে চেঁকিল। বাঁশ পাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

গাই— দেখ দেখ দেখ, বাঘা, বাট ছাড়ি দিয়রে,

বাঘ— বার বার বছর কপিলা আমি ভখে আছিরে
আজ তো খাব উষ্ণ পুরি রে।

গাই— আড়াই দিনের বাছুর, বাঘা, ঘরে বাঁধা আছে রে,
কাল ত আসি তব বন রে,
তখন যে কপিলা ভালা বাঘের সঙ্গে
সত্যবাদী করিল রে।
ডহর ধরিল রে, কাঁদি কাঁদি কপিলা তো,
ঘর পৌচিল রে।

বাছুর— এতদিন যে আস, মাগ, হাঁসিয়ে খেলিয়ে
আজ, মাগো, কেন কাঁদিয়ে আইস গো।

গাই— আজ যে খাও, বাবা, উষ্ণ পুরি দুধ রে,
কাল ত না ঘুরিব ঘর রে।
ভোরেই যে বাছুরি ত ডহর ধরিল রে
চলে গেল মহাদেবের ঘর রে।

বাছুর— দেহ দেহ, মহাদেব, অমরিয় বর রে,
আর দেহ খুরকেরি শিঙ রে,
মহাদেবের বরে বাছুর ঘর যে ঘুরিল রে।

বাছুর— দেহ দেহ দেহ, মাগো, উষ্ণ পুরি দুধ রে,
আর দেহ অমরিয় বর রে।
দুধ খাইয়ে বাছুর বাথান ধরিল রে,
চলে গেল শ্রীবৃন্দাবন রে।
শ্রীবৃন্দাবনে বাছুর টিলা ধুঁমি ছেরে
টিলা ধুঁমি হুঁকার মারিল রে,
বনের বাঘা তখন শুনতে পাইল রে
তখন কপিলার বাছুর বলিতে লাগিল রে।
"শুন, বাঘা, আমারি বচন রে,
তকে যে মারিলে, বাঘা, আমি খড় খাব রে,

আমাকে মারিলে, বাঘা, তুই যে খাবি রে”
তথন যে বাঘা বইলদায় যুদ্ধ লাগিল রে।
যুদ্ধ যে লাগে ভালা সাতদিন সাত রাত রে
মহাদেব তো জানিতে পারিল রে,
বাঘা বইল দায় যুদ্ধ করিল রে
মহাদেব তো দেখিতে গেইল রে।

মহাদেব— তুঁই যে বইলদা এখন রাখেছিরে,
বাঁ পায়ে জঁাকিবে ডান শিঁঙ ফেঁকিবে
বাঘাকে তো আঘাড়ে মারিবে রে।
মহাদেবের বরে বাছুর বাঘা মরিল রে।
বাঘা মারে হুঁকার তুলিল রে।
বনের বাঘিন কাঁপিতে লাগিল রে
তথন বনের বাঘিন কাঁপিতে লাগিল রে।

বাঘিন— শুন শুন শুন, কপিলা, আমার বচন রে,
আমাকে মারিলে কপিলা চুঁশি ফুঁরাই যাবে রে,
তর যে মায়ের সঙ্গে যে সত্যার বন্দী করিব রে
তথন যে বাছুরি ঘর ফিরিল রে।

বাছুর— দেহ দেহ দেহ, মাগো, উষ্ণ পুরি দুধ রে,
ইয়ার পর ত চর নিরভয়ে রে
কপিলার বাছুর চলে যে মহাদেবের ঘরে রে।
লেহ লেহ লেহ মহাদেব অমরি বর রে
আর লেহ খুরকেরি শিঙরে। —ঐ

৩

ও হিরে মাগো মরি, বাবা মরি
ভালো মরিলে ভালো
বাবা মরিলে কাঁচা রে কুমোর
মা মরিলে রে টুকে যে
ভাই মরিলে দুই বাঁহি (বাহু) টুকরো রে॥ —ঐ

৪

ওরে টুটুস্টু ধলাব
গাইখে বাগর আস্মুদ্দুর রাকার পানি
আনে লেখ লমা দহড়ি বাকুলা
স্মুদ্দুর রাকার পানি
গাইকে রাগবরা সমুদরাকার পানি। —ঐ

৫

গরুকে গোয়ালে নিয়ে যাবার আগে তাহার বন্দনা করা হয়।

বাগাল রে বাগাল গাই বরদিল কুথায়
খুরে না লাগে কাদাজল কুথায়। —ঐ

৬

অহিরে চন্দ মোর, ডুবিল সূর্য মোর, উঠিল মহিষ তো ধুঁকিল কাধড়ি।

পিতা— ওঠরে পুতা জাগোরে পুতা
শূর মহিষী খুলরে ময়দান।
পুত্র— আমি নাহি উঠব আমি নাহি জাগব
জাড়ে শীতে আধা অঙ্গ ভিজয়ে রে।
পিতা— পায়ে হি দিব রুচুমুচু জুতা
অঙ্গেতে দিব রে চাদর
মাথাহিঁ দিব পুতা মাথা বেড়ি পাগ রে,
হাতেতে দিব মোহন বাঁশী রে॥
পুত্র— কোথায় হিঁ পাবে, বাবা, রুচুমুচু জুতা রে,
কোথায় হিঁ পারে রে চাদর।
কোথায় হিঁ পাবে, বাবা, মাথা বেড়ি পাগ রে,
কোথায় হি পাবে মোহন বাঁশী।
পিতা— মুচি ঘরে লিব জুতা রুচুমুচু জুতা রে,
মাওড়ারি দোকানে লিব চাদর,
কাবুল ডেরায় লিব, বাবা, মাথা বেড়ি পাগ রে,
ডেমা ঘরে লিব মোহন বাঁশী।

পুত্র— কি সে হিঁ লিবে, বাবা, রুচুমুচু জুতারে
কই সে তো লিবে রে চাদর,
কই সে হিঁ লিবে, বাবা, মাথা বেড়ি পাগ রে
কই সে ত লিবে মোহন বাঁশী রে।

পিতা— দুধ বিকে লিব, পুতা, রুচুমুচু জুতারে
ছুনি বিকে লিব রে চাদর
দেয় বিকে লিব, বাবা, মাথা বেড়ি পাগ রে
ঘোল বিকে লিব মোহন বাঁশীরে ॥

পুত্র— নাহি আমি লিব, বাবা, রুচুমুচু জুতারে
নাহি তো লিব রে চাদর,
নহি তো লিব রে, বাবা, মাথা বেড়ি পাগ রে
নাহি তো লিব মোহন বাঁশী।

পিতা— ঘর নাহি রাখব
এমন পুতার মুখ নাহি দেখব,
ছদিনে কাঁদব, দশদিনে পালব, ছমাসে নামত পাই সারব।

পুত্র— আমি যে লিব, বাবা, গুঁড়ুর জনম রে
কিয়া করে বধিব পরাণ।

পিতা— তুঁই যে লিবি, পতা, গুড়ুর জনম রে
আমি লিব শিকিরা জনম।

পুত্র— তুঁই হয়ে লিবি, বাবা, শিকিরা জনম রে
আমি লিব মশা জনম রে

পিতা— তুঁই যে লিবি, পুতা, মশা জনম রে
আমি লিব কুকুরা জনম রে।
ধারে ধারে খুজব, উঁচু পিঁড়ায় ইচ্ছা,
দেখা পেলে রগদাঁই মারব।

পুত্র— তুই যে লিবি, বাবা, কুকুর জনমরে
আমি লিব, বাবা, ফুল জনম রে
ফুল জনম নিয়ে দহের মাঝে ফুড়ব
কিয়া করে বধিবে পরাণ।

পিতা— তুই যে লিবি, পুতা, ফুল জনম রে
আমি যে লিব ভ্রমর জনম।
ধারে খুঁজব দহের মাঝে বসব
চুষি চুষি বধিব পরাণ॥

পুত্র— তুই যে লিবি, বাবা, ভমর জনম রে
আমি লিব মাছ জনম রে
ধারে ধারে করব দহের মাঝে থাকিব,
কিয়া করে বাধিবে পরাণ।

পিতা— তুঁই হয়ে লিবি, পুতা, মাছ জনম রে
আমি লিব জহলা (জেলে) জনম রে,
ধারে ধারে খুঁজব, দহের মাঝে ফেকব
ডাঙ্গায় আমি খসড়াই (আছাড়িয়া) মারব। —ঐ

৭

আর ভালা, অহিরে, বাছুরি বাছুরি ভালা
দুধনারে খাওয়ালি।
বাছা মোরা হেলি বলীয়ান
আজিকার দিনে যদি জিতবে রে বাছুরী
চারিপায়ে বাঁধব নেপুর রে॥ —বেলপাহাড়ী, মেদিনীপুর

৮

ধূলায় চিনবে বরদা চৈত বৈশাখ রে,
কাদায় চিনবে আষাঢ় মাস।
ধান ফুলে চিনবে এই কাতিক মাস গো,
পহুঁছে আওল ঋতুকেরি দিন রে॥ —ঐ

গোপীচন্দ্রের গান

উত্তর বাংলার মুসলমান কৃষকদিগের নিকট হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে স্যর জর্জ গ্রীয়ারসন একটি লোক-গীতিকা (folk-ballad) সংগ্রহ করেন, তিনি ইহার 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' এই নাম দিয়া প্রকাশিত করেন। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ইহার আর একটি পাঠ সংগৃহীত হইয়া

'গোপীচন্দ্রের গান' নামে প্রকাশিত হয়। ইহাতে গোপীচন্দ্র নামে এক রাজপুত্রের সন্ন্যাসের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা গীতিকা বা ballad, একটি সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা ভিত্তি করিয়া সঙ্গীতের মাধ্যমে ইহা পরিবেষণ করা হয়। ইহার আখ্যায়িকাটি এই :

বিলাসী রাজা মাণিকচন্দ্র বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় পাঁচটি দারপরিগ্রহ করিলেন, পাঁচটি পত্নীই যুবতী ও পরমা সুন্দরী ; ইঁহাদের সঙ্গে তাঁহার প্রধানা মহিষী প্রৌঢ়া ময়নামতীর কিছুতেই সদ্ভাব সৃষ্টি হইতেছিল না। সেইজন্য রাজা ময়নামতীকে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। রাজধানী হইতে দূরবর্তী ফেরুসা নামক স্থানে ময়নামতী একাকিনী বাস করিতে লাগিলেন। মাণিকচন্দ্রের আসন্নকাল উপস্থিত হইল, ময়নামতী প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া নানা অলৌকিক উপায়ে রাজার প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তাহাতে ব্যর্থকাম হইলেন ; মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পর ময়নামতীর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল, তাঁহার নাম গোপীচন্দ্র। শিশু গোপীচন্দ্রকে নামে মাত্র সিংহাসনে বসাইয়া রাণী ময়নামতী নিজেই রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। গোপীচন্দ্র যৌবনে পদার্পণ করিলে অদুনা ও পদুনা নাম্নী দুই সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যের শাসনভার নিজ হাতে লইলেন ; পত্নীর প্রেম ও প্রজার শ্রদ্ধা লাভ করিয়া তিনি পরম আনন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এমন সময় বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। রাজমাতা ময়নামতী আদেশ করিলেন, গোপীচন্দ্রকে বার বৎসরের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। গোপীচন্দ্র জননীর আদেশ অমান্য করিতে চাহিলেন, মাতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিন্দা করিলেন। দুইজন রাণী রাজমাতাকে তাঁহার আদশ প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আদেশ শুনিয়া প্রজাগণ পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু সকলই বিফল হইল। মুণ্ডিত মস্তকে কৌপীন পরিধান করিয়া কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া সেই তরুণ বয়সেই রাজপুত্রকে যৌবনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইল। হাড়িসিদ্ধা তাঁহার সন্ন্যাসের সঙ্গী হইলেন। দুই রাণীর কাতর ক্রন্দনে রাজপুরী শ্মশানে পরিণত হইল ; সন্ন্যাসের পথে দাঁড়াইয়াও বার বার পরিত্যক্ত প্রাসাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইতে লাগিলেন—রাণীদের অশ্রুস্নাত মুখ দুইটি বার বার তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। রাজপ্রাসাদ বহুদূরে পিছনে

রহিল, রাজপুত্রের চরম দুঃখের দিন আরম্ভ হইল। হাড়িসিদ্ধা তাঁহাকে হীরা নাম্নী এক পতিতার গৃহে বার বৎসরের জন্য বাঁধা রাখিয়া চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার আর এক পরীক্ষা আরম্ভ হইল। হীরা তরুণ রাজপুত্রের পায়ে নিজের যৌবন অঞ্জলি দিল, কিন্তু পত্নীর প্রেমে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। এই কলুষিত প্রেমের অভিনয়ের দিকে তিনি মুখ ফিরাইয়াও তাকাইলেন না। হীরা প্রতি-হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহাকে কঠিন দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে চাহিল। কিন্তু একমাত্র পত্নীপ্রেমের দুর্জয় শক্তিতেই রাজপুত্র সকল দুঃখ জয় করিলেন—হাড়িসিদ্ধার পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীর্ণ হইলেন। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল, তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। দুঃখের অগ্নিতে জ্বলিয়া প্রেমের সোনা আরও উজ্জ্বল হইল।

গোপীচন্দ্র এই কাহিনীর সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তাহার ভোগের লালসাই কাহিনীটিকে বাস্তবধর্মী করিয়া তুলিয়াছে। এখানেই ইহার আধুনিক কথাসাহিত্যের গুণও প্রকাশ পাইয়াছে। পরিপূর্ণ লালসার মধ্যে সন্ন্যাস-জীবনের বিচ্ছেদ পড়িয়া গেল, এক দুর্দমনীয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাঁহাকে কৌপীন ধারণ করিতে হইল; অন্তরের মধ্যে এই দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাত, তাঁহার আচরণের মধ্য দিয়া সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ভোগের প্রতি সুগভীর আকর্ষণের জন্যই জননীর সন্ন্যাসের আদেশে তাঁহার উপর তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন; এমন কি, তাঁহার চরিত্রে তিনি অপবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। সংসারের প্রতি ইহা তাঁহার অন্ধ আসক্তিরই পরিচায়ক। মাতার সম্পর্কে তাঁহার কোন আদর্শবোধ নাই। কিন্তু জননীর শাসনই যখন শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিল, তখন সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের উপরই তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু সে অবস্থায়ও জননীর উপর তাঁহার অভিমান দূর হইল না। সোনার থালায় যখন জননী তাঁহাকে ভিক্ষা পরিবেষণ করিবার জন্য আসিলেন,—

যেন মনে থালত অন্ন দেখিল।
কপালত মারিয়া চড় কান্দিবার লাগিল॥
'যখন আছিলাম মা রাজ্যের ঈশ্বর।
স্বর্ণর থালত অন্ন খাইনু বিস্তর॥
এখন হইনু কপীনপিন্দা কড়াকর ভিখারী।
স্বর্ণর থালত অন্ন খাইতে না পারি॥'

একখানা কলার পাত আনিল কাটিয়া।
তাহাত অন্নগুটিক লইল ঢালিয়া॥

ইহার মধ্যে কেবলমাত্র যে সন্ন্যাসের আদর্শই রক্ষা পাইয়াছে, তাহা নহে, ইহার প্রতিটি ছত্রে জননীর প্রতি সন্ন্যাসী সন্তানের অভিমানের ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হীরা নটীর গৃহে গোপীচন্দ্রের চরম পরীক্ষার আয়োজন হইয়াছিল। হীরা সুন্দরী যুবতী, অতুল ঐশ্বর্যশালিনী। যে ঐশ্বর্য গোপীচন্দ্র তাঁহার পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদে ফেলিয়া আসিয়াছেন, হীরা তাঁহাকে সেই ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার প্রণয়-ভিক্ষা করিল; কিন্তু গোপীচন্দ্র তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। সন্ন্যাসজীবনের কোন অবাস্তব আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রেরণাতে যে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, তাহা নহে, একান্ত বাস্তব একটি প্রেরণায়ই সেদিন তিনি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার পত্নীপ্রেম। পত্নীপ্রেম যেখানে সত্য, গণিকার প্রলোভন সেখানে কি করিয়া কার্যকর হইতে পারে? অতএব গোপীচন্দ্র তাহার দিক হইতে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইলেন; দুঃসহ দুঃখের মধ্যেও তাঁহার সেই প্রেমের প্রদীপ অনির্বাণ রহিল।

গোপীচন্দ্রের দুই মহিষী অদুনা এবং পদুনার চরিত্রও নিতান্ত বাস্তবধর্মী। তাঁহাদের হৃদয় পবিত্র প্রেমের সৌরভে আকুল, কিন্তু বহির্জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা বিষয়ে তাঁহারা শিশুমাত্র। চারিদিকে প্রেমের জাল বিস্তার করিয়া তাঁহারা 'শীতল মন্দির ঘরে' তাঁহাদের হৃদয়ের রাজাকে ধরিয়া রাখিতে চাহেন—নিয়তির নির্মমতার কথা তাঁহাদের সুকোমল হৃদয়ে স্থানও পায় না। এই গীতিকায় ইঁহাদের এই বেদনার অনুভূতি মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। রাজাকে ধরিয়া রাখিবার সকল কৌশলই যখন তাঁহাদের ব্যর্থ হইল, তখন অন্তরের একান্ত মিনতি দিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহিলেন,—

না যাইও না যাইও, রাজা, দূর দেশান্তর।
কার লাগিয়া বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর॥
বান্ধিলাম বাঙ্গালা ঘর নাহি পড়ে কালি।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও, আমার বৃথা গাভুরালি॥
নিদের স্বপনে, রাজা, হব দরশন।
পালঙ্কে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥

সন্ন্যাসীর জীবনে নারী যে সঙ্গিনী হইতে পারে না, এ'কথা তাঁহারা বুঝিলেন না। ময়নামতী কোন উচ্চ নীতিগত আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া যে পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা নহে—সাধারণ মানুষের যেমন কুসংস্কার থাকে, তিনি তাহারই বশবর্তী হইয়া কিংবা কাহারও অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি বিশ্বাস করিয়া রাজপুত্রকে বার বৎসরের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অদেশ দিয়াছিলেন, ইহাতে সন্তানের প্রতি তাঁহার মাতৃস্নেহের কোন অভাব ছিল, তাহা মনে হইতে পারে না। তিনি সাধারণ মানবী ছিলেন, সমাজ তাঁহাকে ব্যাভিচারিণী বলিয়া সন্দেহ করিত, পল্লীকবিও তাঁহার ব্যভিচার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশটুকু রক্ষা করিয়াছেন। মুখের উপরই পুত্র জননীর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহার চরিত্র অলৌকিক বলিয়া কল্পনা করিলে তাঁহার সম্পর্কে এই প্রকার পার্থিব ধারণা কিছুতেই স্থান পাইত না। পূর্বেই বলিয়াছি, সন্ন্যাসের আদেশ দুর্বাসার অভিশাপের মতই কাব্যের প্রয়োজনে আসিয়াছে, জননীর কোন অলৌকিক শক্তির প্রভাবে আসে নাই ; বরং ইহাতে জননীর মানবিক পরিচয়টি মধ্যে মধ্যে অপুর্ব সার্থক হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। পুত্র যখন হাড়ি সিদ্ধার সঙ্গে সন্ন্যাসী সাজিয়া পথে বাহির হইয়া যাইতেছে, তখন পথের সম্বলস্বরূপ গোপনে তাঁহার ঝুলির মধ্যে বার কাহন কড়ি গুঁজিয়া দিয়া তিনি বলিতেছেন—

বার কাহন কড়ি থাওঁ তোর ঝোলার ভিতর।
কড়ির কথা না বলিস্ তোর গুরুর বরাবর॥
একথা বলিয়া ময়না কোন কাম করিল।
পুত্রের গলা ধরি ময়না কান্দিতে লাগিল॥ (পৃঃ ১৪৫)

কুসংস্কারচ্ছন্না জননী শিশুপুত্রকে জলে পর্যন্ত বিসর্জন দেয় ; কিন্তু তাহার মধ্যে যে সন্তানবাৎসল্য থাকে না, তাহা নহে। ময়নামতী বিন্দুমাত্রও অলৌকিকতায় সিদ্ধ নহেন—তাঁহার মধ্যে এক স্নেহ-সতর্ক মাতৃ-হৃদয়েরই সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইতে পারেন, তথাপি তাঁহার মধ্যে সন্তানস্নেহের অভাব ছিল না, তাহা হইলে 'গোপীচন্দ্রের গানে'র কাব্যগুণ কিছুই থাকিত না।

অদুনা ও পদুনার চরিত্র এই কাহিনীর মধ্যে দুইটি অপূর্ব-সৃষ্ট নারীচরিত্র। বয়সে ইহারা বালিকা, জীবন-অভিজ্ঞতা ইহাদের কিছুমাত্র নাই। রাজপুত্রকে ঘিরিয়া তাহাদের যে মধুর জীবন-রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার বাহিরেও

যে এক নিষ্ঠুর জগৎ আছে, তাহা তাহাদেরও কল্পনার বাহিরে ছিল। বিনা মেঘে তাহাদের উপর যে আকস্মিক বজ্রাঘাত হইল, তাহা তাহাদের সহ্য করিবার শক্তি ছিল না। তাহারা ছিল শিশুর মত সরল। তাহারা মনে করিয়াছিল, লোভী পণ্ডিতকে উৎকোচ দিয়া, দরিদ্র নাপিতকে অর্থদ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া রাজার সন্ন্যাস গ্রহণের দিন বিলম্বিত করিবে ; তাহারা মনে করিয়াছিল, নাপিতকে উৎকোচ দিলেই রাজার মস্তক মুণ্ডন হইবে না, তবেই তাঁহার সন্ন্যাসের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। শিশুসুলভ এই সরলতাই ছিল তাহাদের চরিত্রের সৌন্দর্য। তাহারা যখন সন্ন্যাসী রাজার সঙ্গী হইতে চাহিল, তখন রাজা তাহাদিগকে বনের বাঘের ভয় দেখাইলেন ; তাহারা ইহার জবাব বলিল,

> খাক না কেনে বনের বাঘে তাকে না করি ডর।
> নিষ্কলঙ্কে মরণ হউক সোয়ামীর পদতল॥ (পৃঃ ১৫১)

শিশুর মত সরল প্রাণেও স্বামীর প্রতি তাহাদের প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি লাভ করিয়াছিল। নারীহৃদয়ের তাহাদের এই আর্তি কাহিনীকে করুণ রসঘন করিয়া তুলিয়াছে—

> কান্দে অদুনা রাণী ধরিয়া রাজার পাও।
> এ হেন বয়সের বেলা ছাড়িয়া না যাও॥
> ছড়িয়া না যাইও, রাজা, দূর দেশান্তর।
> কার জন্য বান্ধিলেন শয়ন-মন্দির ঘর॥
> শয়ন-মন্দির ঘর বান্ধিছ নাই পড়ে কালি।
> এমত বয়সে ছাড়ি যাও বৃথায় গাভুরালি॥ (পৃঃ ১৪৯)

পার্থিব বেদনায় কাতর নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক করুণ রসের অভিব্যক্তিতে এই রচনাংশটি অপূর্ব সার্থক হইয়াছে।

হাড়িসিদ্ধার চরিত্র সম্পর্কে এইবার দুই একটি কথা বলিতে হয়। হাড়িসিদ্ধা সন্ন্যাসী চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আধুনিক উপন্যাসেও সন্ন্যাসী চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তাহা সত্ত্বেও উপন্যাসই হইয়াছে। সুতরাং সন্ন্যাসী চরিত্র থাকিলেই তাহা আদর্শবাদী এবং তাহা দ্বারা কাব্যগুণ ক্ষুণ্ণ হইবে, তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসীর বহির্মুখী একটি পরিচয় ব্যতীতও অন্তর্মুখী আর একটি পরিচয় আছে, সেখানে তাহা যদি মানবিক গুণ সম্পন্ন করিয়া পরিকল্পিত হয়, তবে সন্ন্যাসীও কাব্যের, নাটক-উপন্যাসের চরিত্র

হইতে কোন বাধা হয় না। অবশ্য তাহাতে সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস ধর্ম্ম রক্ষা পায় না এ'কথা সত্য, কিন্তু তাহার মানব-ধর্ম যে রক্ষা পায়, কেবলমাত্র তাহাতেই কাব্যের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। হাড়িসিদ্ধা সন্ন্যাসী চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও তাহার আর একটি পরিচয় ছিল, সেখানে সে স্বাভাবিক মানুষ। পল্লীকবিগণ তাহার অন্তর্মুখী মনুষ্যত্বটুকুকে তাহার বহির্মুখী সন্ন্যাসাচরণের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন নাই। সেইজন্যই কাব্যের চরিত্র রূপেও তাহার একটি বিশেষ মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে।

হাড়িপা সিদ্ধপুরুষ হইলেও সাধারণ মানুষের মতই নিতান্ত স্নেহের বশীভূত এবং ভয়-কাতর। রাজপুত্রকে কঠিন সন্ন্যাস-জীবনের পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াও তাহার দুঃখকষ্টের অনভ্যস্ততার জন্য তাহার প্রতি মধ্যে মধ্যে তিনি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। অরণ্য-পথে চলিতে গিয়া একদিন রাজার দেহ যখন কণ্টক-বিদ্ধ হইল, তখন তাহার কাতর অবস্থা দেখিয়া তাহার দয়া হইল।

রাজার কান্দন দেখিয়া গুরুর দয়া হৈল।
বুক্‌থে পাও দিয়া কাঁটা টানিয়া তুলিল॥ (পৃ. ১৭৭)

তারপর তপ্ত বালির পথে চলিতে গিয়া রাজার সর্বাঙ্গ যখন পুড়িয়া যাইতে লাগিল, তখনও

ভক্তের কান্দন দেখি গুরুর দয়া হৈল।
মায়া করি পন্থের মধ্যে নিম বিরিখের গাছ সিজ্জাইল॥ (পৃ. ১৮০)

তারপর অবোধ শিশুর মত রাজপুত্র যখন হাড়ির নিকট মিনতি জানাইল,

তোমার হাটুয়া দাও মোক শিওরে লাগিয়া।
এক দণ্ড ঘুম পাড়ি ন্যাওঁ বিরিখের তলে শুতিয়া॥ (পৃ. ১৮১)

অর্থাৎ তোমার হাঁটুটি পাতিয়া দাও, তাহার উপর মাথা রাখিয়া আমি এক দণ্ড ঘুমাইয়া লই, তখনও

ভক্তের কান্দন দেখি গুরুর দয়া হৈল।
বাম হাঁটুয়া হাড়িসিদ্ধা শিওরে লাগি দিল॥
গুরুর হাঁটুয়া শিথান দিয়া রাজা নিদ্রাত পড়িল॥ (পৃ. ঐ)

হাড়িসিদ্ধা কেবল দয়ারই পরবশ নহেন, তিনি সাধারণ মানুষের মতই ভয়-কাতর। তিনি মৃত্যুরও ভয় করেন। দুর্গম পথে চলিতে গিয়া একদিন

সহসা পিছন ফিরিয়া রাজপুত্রকে দেখিতে না পাইয়াই ভয়ে চমকিয়া উঠিলেন,

ছয় ক্রোশ অন্তরে হাড়ি সিদ্ধা ফিরিয়া দেখিল।
রাজাক না দেখি হাড়ি সিদ্ধা চমকিয়া উঠিল ॥
আইজ যদি রাজপুত্র জঙ্গলে যায় আরো মরিয়া।
কাইল ডাকিনী ময়না মারিবে আমাক লোহার ছুরি দিয়া ॥ (পৃ.১৭৭)

সুতরাং পল্লীকবিগণ সাধারণ রক্তমাংসের উপাদানেই হাড়ি সিদ্ধাকে গড়িয়াছেন; তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ কল্পনা করিয়া স্বাভাবিক মানুষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রূপায়িত করেন নাই; সেইজন্য সন্ন্যাসী চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও কাব্যের মধ্যে তাঁহার প্রবেশাধিকার কোন দিক হইতে ক্ষুণ্ন হয় নাই।

হীরা নটীর চরিত্রটিও তাহার পরিচয় অনুযায়ী নিতান্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, সে যেন অবিমিশ্র নিষ্ঠুরতার উপাদানেই গঠিত হইয়াছে। সে দেহ-বিলাসিনী, হৃদয়ের সাধনার সঙ্গে তাহার কিছু মাত্র যোগ নাই। তাহার প্রণয় প্রত্যাখ্যাত হইবার ফলে তাহার মধ্যে যে ক্রুদ্ধ আক্রোশ জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা সহজেই দুর্বার হইয়া উঠিল, হৃদয়ের কোন অনুভূতিই তাহার গতি রোধ করিতে পারিল না। তাহার মধ্যে নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা এই প্রকার নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ না করিলে গোপীচন্দ্রের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইতে পারিত না।

সাধারণ নারী-প্রকৃতি হইতে তাহার প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র, তাহা পল্লীকবিগণও উপলব্ধি করিয়াছিলেন; সে বার-বিলাসিনী, সেইজন্য হৃদয়-হীনা; তাহার হৃদয়হীনতার মধ্যেই গোপীচন্দ্রের প্রায়শ্চিত্তের সার্থকতা। এক দিক দিয়া অদুনা-পদুনার প্রেম এবং জননীর জাগ্রত স্নেহ-সার্থকতা, অন্যদিকে হৃদয়হীনা বার-বিলাসিনীর নিষ্ঠুর আচরণ, এই উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হইবার ফলে গোপীচন্দ্রের গানের কাহিনীর মধ্যে একটি নাটকীয় গুণ বিকাশ লাভ করিয়াছে।

'গোপীচন্দ্রের গানে'র কাহিনীর মধ্যে একটি অসাধারণ কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই যে নারীপ্রেমও সন্ন্যাসধর্ম রক্ষার সহায়ক হইতে পারে। এখানে গোপীচন্দ্রের পত্নীপ্রেম তাহার সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা করিয়াছে, তাহার অন্তরে অদুনা-পদুনার প্রতি যে প্রেমের প্রদীপ-শিখা একদিন প্রজ্জ্বলিত

হইয়াছিল, তাহা তাহার সন্ন্যাস-জীবনের সকল দুঃখকষ্ট এবং প্রলোভনের মধ্যেও অনির্বাণ থাকিয়া সকল দুর্গতির মধ্যেই তাহাকে রক্ষা করিবার শক্তি দিয়াছিল। পত্নীর প্রেম সন্ন্যাস-জীবনের অন্তরায় এ'কথাই আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছি। তাই দেখিতে পাইয়াছি, পত্নী এবং সংসার ত্যাগ করিয়াই সাধকগণ সন্ন্যাসী হইয়াছেন, মানুষের প্রেমকে অস্বীকার করিয়া তাঁহারা হয়ত ভগবানের ধ্যান করিয়া তাঁহাদের সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু গোপীচন্দ্র অন্তরের মধ্যে কেবল মাত্র পত্নীপ্রেম ধ্যান করিয়া সন্ন্যাস-জীবনের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। ইহা যে কেন কবির পক্ষেই কোন সাধারণ কথা নহে, বাংলার পল্লীকবিগণ তাঁহাদের এই কাব্যে এই একটি অসাধারণ কথা প্রচার করিয়া মানুষের চরিত্র-মহিমার আর একটি সম্পূর্ণ নূতন রহস্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন।

গোষ্ঠের গান

বাংলার কৃষ্ণ বিষয়ক লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান অংশ গোষ্ঠ-বিষয়ক সঙ্গীত। ইহাদের মধ্য দিয়া বাৎসল্য রসের যে অনুশীলন হইয়াছে, তাহা মানবিক রসের স্পর্শে সজীব। কৃষিপ্রধান বাংলা দেশে গোষ্ঠের বিষয় অতি সহজেই বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিয়াছিল।

১

বৃন্দাবন চন্দ্র নন্দ নন্দন কানু জাগো রে।
ঐ দেখ পূরব গগনে উঠিল যে ভানু এখনো কি ঘুম ভাঙ্গেনি রে॥
আমরা যত ব্রজ রাখালগণে, তব সনে যাবো
গোষ্ঠ গোচারণে; সাজায়ে দে, মাগো, তোর নীলরতনে যাইবে
গোষ্ঠ-বিহারে॥

২

গোপাল যেও না রে কাননে, ও বাপ গোপাল রে,
তোরে বিদায় দিয়ে ঘরে রহিব কেমনে।
ওরে প্রাণের গোপাল, আমার কথা শোন
তুই কেন যাবি, বাছা, করতে গো-চারণ
ধেনুগণ লয়ে যাক, যত রাখালগণে,
বেদনা দিস্‌না তুই জননীর প্রাণে।

গহন বনে যখন সঙ্কটে পড়িবে
তখন শিশুকে মোর কেই বা দেখিবে।
প্রাণ মোর কেঁদে উঠে মরি সদা ভেবে,
হায় কি হবে তাই ভাবি মনে মনে।
সাত পাঁচ নয়, অকালে নীলমণি
দিনে দশবার খেতে দিই ননী
ওরে রাখালগণ, শোন আমার বাণী,
হানি হলে আমার কি হবে ভাগ্যেতে।
এমনি অবোধ গোপাল প্রবোধ নাই মানে,
তাইতো বড় আমার সন্দেহ হয় মনে,
ধেনু লয়ে যাও রাখালগণে
আজকার মত গোপাল যাবে না বিপিনে ॥ —মুর্শিদাবাদ

৩

গোষ্ঠে যাবার সময় হলো, ভাই, রাখালগণ।
গগনে উঠিল ভানু দেখ দিয়ে মন ॥
চমকিত যশোমতী কাঁদিয়া উঠিল।
কেন কাঁদ বলে কৃষ্ণ কোলেতে উঠিল ॥
নিশিতে দেখেছি স্বপন নীলরতন ধন।
নিকটে চরাবে ধেনু না যাবে দূর বন ॥
শ্রীদাম ডাকিছে কোথায় আয়রে কানাই।
শিঙ্গা রবে কৃষ্ণ বলে ডাকিছে বলাই ॥
শ্রদ্ধাভরে দিলেন কৃষ্ণরে যশোমতী
আনন্দে রাখালগণ যাহ দ্রুতগতি ॥
ধড় রেখে প্রাণ তোরে দিলাম বলরাম।
যতনে রাখিস বনে নবঘন শ্যাম ॥
দুরন্ত কংসের ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণ।
দেখিস যেন হারাস নারে কৃষ্ণ বলরাম ॥
শুন শুন ওগো মা ও যশোদা রাণী।
হারাবার ধন নয় গো তোর নীলমণি ॥

এত বলি মায়ের কাছে বিদায় হইল।
বালক সনেতে প্রভু খেলিতে লাগিল ॥
তৃষ্ণায় আকুল হলো যত রাখালগণ।
ছটফট করে সবাই শুকালো বদন ॥
চলো, ভাই, যাই সবে কালিদহের তীরে।
জল পান করে আমরা আসি গো অচিরে ॥
এত বলে সবে মিলে কালীদহে গেল।
বিষ জল পানে সবাই অচৈতন্য হলো ॥
যত রাখাল বালকগণ গরল ভুকিয়ে।
কালীদহের তীরে সব পড়িল ঢলিয়ে ॥
ঘোর বিপদে কালশশী বাজাইল বাঁশী ॥
বাঁশী শুনে শ্রীরাধার মন হইল উদাসী ॥
বাঁশী শুনে শ্রীরাধার মন উচাটন।
কি জানি কোন বিপদে পড়েছেন নারায়ণ ॥
শ্যামলী ধবলী গাভী উর্ধ্বমুখে ছোটে।
কোথায় প্রভু, নারায়ণ, দেখা দাও এসে ॥
কি বিপদ ঘটিল ভাই কালীদহে এসে।
বিষ জল পানে বুঝি প্রাণ যায় শেষে ॥
হা রাখালগণ, বলে কৃষ্ণ করিছে রোদন।
কুশদ্বীপে গরুড় বীরের টলিল আসন ॥
মহাভক্ত গরুড় বীর ধ্যানেতে জানিল।
পক্ষীভর করে গরুড় কালীদহে এল ॥
কালীদহে এসে দেখে প্রভু নারায়ণ।
মরেছে রাখালগণ কাঁদিছে ধেনুগণ ॥
পাকশাটে ছেঁচে ফেলে কালীদহের জল।
সাপ নাথে ধরে গরুড় খাই নাগগণ ॥
কালীদহের জল গরুড় অমিয় করিয়ে।
সবাকার বিষ গরুড় লইল কাড়িয়ে ॥
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে বিষ যাবে রসাতল।

গরুড় শরণে বিষ হয়ে যারে জল।
নাই বিষ বিষহরির অঙ্গে, নাই বিষ আর॥ —ঐ

৪

যশোদা উক্তি: কাননে কানাই যাবে না, কাননে কানাই যাবে না।
কাননে কাল রতনের খাওয়া হবে না॥
স্ব-কাতরে বলি, ওরে হলধর,
গোপাল মধ্যে তুই যে কলেবর
তোদের সনে বনে দিতে, হলধর, মন আমার সরে না॥
বনে বনে ভ্রমণ অতি কষ্টকর,
কষ্ট সইতে কেন পারবে বেণুকর,
সে যে বনভূমি অতি ভয়ঙ্কর তাতে পথ অজানা।
কুশাংকুর যুক্ত সুকঠিন মাটিতে,
কুসুম শিশু পারে কি হাঁটিতে,
তোদের সনে আমার কৃষ্ণ হাঁটিতে দিব নারে দিব না॥
পরিতে জানে না, খুলে গেলে বসন,
সে জানে না মুখে তুলে খেতে মাখন,
সে কানুকে কি ধেনু করতে পারে শাসন,
দিব নারে বনে যেতে দিব না॥

বলরাম উক্তি: মা তোর গোপাল ধনে দে মা গোচরণে।
গোপাল বিনে ধেনুগণ যেতে চায় না বনে॥
নিশি প্রভাত হইল ক্রমে ভানু উদয় হইল,
অধিক বেলা হয়ে গেল চেয়ে দেখ, মা, নয়নে॥
ও রাখালগণের মুখের বাণী শুন গো মা নন্দরাণী।
হাতে লয়ে ক্ষীর নবনী গোপালকে খাওয়ায় যতনে॥
ধেনুগণ সব হাম্বা রবে ঘন ঘন ডাকিছে সবে।
মনে মনে দেখ, মা, ভেবে উপায় কি হবে এক্ষণে॥
কানুর বেণু না বাজিলে কাজ কি, মাগো, ধেনু খুলে।
ধেনুর স্বরে ধেনু চলে নইলে চলবে না গো বনে॥
মা, বদন কেন মলিন হলো সমস্ত সব খুলে বল।

মানুষ নয়, মা, তোর চিকন কালো কি বলবো,
মা, তোর সদনে ॥
গোপাল যখন যায়, মা, বনে সঙ্গে লয়ে রাখালগণে।
কত মজা সে বিপিনে দেখতে পায় মা স্ব-নয়নে ॥
কৃষ্ণ উক্তি : ওরে বলাই দাদা, তুমি ডাকিছ কেনে অকারণে।
মায়ে বিদায় না করিলে গোষ্ঠে যাব কেমনে ॥
আমার কাছে, ভাই, শুন যুক্তি
যে যুক্তিতে পাবে মুক্তি করগা আমায় মায়ের ভক্তি,
আয়রে আমার যুক্তি সদনে ॥
আমি একা মায়ের একা ছেলে,
মায়ে বিদায় না করিলে
কেমন করে যাব তোদের গোচরণে ॥
যদি বলছ আমার কাছে, আমাদেরও মা রয়েছে
এমন মাতা কার বা আছে খুঁজে দেখ তুই ত্রিভুবনে ॥
আর মায়ের কথা জানি জানি জগৎমাতা সুরধনী,
অষ্ট সন্তান প্রসবিনী, হলে ফেলে দিল কেনে ॥
ত্রেতাতে এক মায়ের দোষে
রাম গিয়েছে বনবাসে,
বনে বনে পাগল বেশে ঘুরে বেড়াই রামলক্ষ্মণে ॥
আর মায়ের বড়াই কেও করো না,
এমন মা আর কারও হবে না,
যুগে যুগে যার উপাসনা করে গেল এই সন্তানে ॥
তাই বলিব, ভাই, বলাই দাদা,
আমি মায়ের গৌরী সাধা
মায়ের কাছে আছি বাঁধা সদা থাকি হৃদাসনে ॥
আজ নন্দরাণীর নয়ন জলে গোকুল ভেসে যায়।
ধন্য রাণী পুণ্যবতী কৃষ্ণ লয়ে কোলে।
চাঁদ মুখ মুছাইল নেতেরি আঁচলে ॥
আর অলকা তিলকা দিল নাসিকা কপালে

চন্দনে বিন্দু মাখা কি শোভে ভালে।
নয়নে অঞ্জন মন সাধে পরাইয়া।
ঈষৎ হেলিয়া চূড়া বাঁধে মাথে দিয়া॥
চূড়া পরে শিখিপুচ্ছ গুচ্ছ তাই দিয়া।
এক চিত্ত হয়ে রাণী হেরেন নিখিয়া।
কটিতে কিংকিনী সহ ধড়া আনি দিল,
অপূর্ব বসন আনি পৃষ্ঠেতে বাঁধিল।
চরণে আনিয়া দিল সোনার নূপুর,
হাতেতে স্থবর্ণের আর বল কেউড়॥
গলেতে স্থবর্ণের হার কর্ণেতে কুণ্ডল,
মেঘের বিজলী যেমন করে ঝলমল॥
এইরূপে সাজাইয়া নন্দের ঘরণী,
হাতেতে আনিয়া শেষে দিলেন পাঁচনী।
পরে ক্ষীর সর নবনী লইয়া
ধড়ার অঞ্চলে কিছু দিলেন বাঁধিয়া॥
তারপর কৃষ্ণ মাথে বাঁধেন রক্ষণ।
রাম আদি দশানন করেন উচ্চারণ॥
গোষ্ঠেতে চলিলেন মোহন বংশীধারী
ওস্তাদ বলরাম সরকার বলে সর্বজনে বলুন একবার হরি হরি॥

—মুর্শিদাবাদ

৫

আজকের মত তোরা, ভাই, আমায় যেন ডাকিস না,
আমি মনে মনে ভাবি সদা সর্বক্ষণ,
গোষ্ঠে যাব বলে করি আকিঞ্চন
মা জননী মোরে করতেছে বারণ, গোপাল গোষ্ঠে যেও না।
কোকিলের ধ্বনি শুনি শ্রবণ মূলে,
গোষ্ঠে যাব বলে, উঠিলাম সকলে,
যত রাখাল মিলে ডাকে ভাই সকলে,
বলে গো চরণ তো আর চলে না॥

মা মনে মনে বড় করেছিলাম আশা,
ভাই তোদের সনে বনে যাওয়া হইল রে নিরাশা।
এমনি মন্দ পাশা ঘটিল দুর্দশা,
আমার মনের আশা বুঝি মিটল না।
যত রাখাল সনে লয়ে সঙ্গে করি,
গোধন লয়ে যাও, ভাই, আনন্দ লহরী,
নিরানন্দ যেন হয়না অন্তরী,
ও তোর পুরবে মনের বাসনা।
বলাই দাদা, শুন আমার বচন,
আজকের মত সঙ্গে লয়ে যাও গো গোধন,
মায়ের বাক্য আমি করব না লঙ্ঘন,
আর প্রবঞ্চনা কর না॥
ভাই, তোমার মায়ে যদি তোমায় নিষেধ করে,
ওরে মায়ের বাক্য ঠেলে যাবে কেমন করে,
তেমনি মত নিষেধ করছে বারে বারে,
মায়ের বাক্য ঠেলব না॥
আমার উপর কেমন তোমাদের আশা,
আমার বেণুর উপর ধেনুগণেরও ভরসা,
যদি ঠিক থাকে গো আশা ঘুচিবে দুর্দশা।
তোমাদের পিপাসা থাকবে না॥
অধিক বেলা নাকি হইল গগনে,
আমার লাগি বসে রইলে অকারণে,
ও দুলাল চন্দ্র ভণে যাবে কৃষ্ণ বনে,
ওই চরণ করি সাধনা॥ —মুর্শিদাবাদ

৬

মা গো গোপাল ধনে দে বনে ওমা যশদে।
আমরা রাখালগণে মা তোর ধরি চরণে,
গোপাল গোষ্ঠে গেলে বড় পাই মা সুখ;
ধেনু রবে ধেনু ফিরে গো কৌতুক॥

ছায়াতে বসায়ে দেখি চাঁদ মুখ,
সকল দুঃখ সহি গো মুখ দরশনে ॥
ওরে সে বনেতে নাই দৈত্য দস্যুর ভয়,
সেই বনে, মা, তোমার গোপাল রাজা হয়।
রাজা হয়ে গোপাল বস্‌লে সিংহাসনে,
কত মূর্তি আসে, মা, তোমার গোপাল দরশনে,
কি ঘটে আকার দেখিলে নয়নে,
জানিনে গো তারা থাকে সে কোনখানে ॥
বীণা করে করি আসে একজন,
চমকে উঠি তার দেখে আচরণ।
চঞ্চল হ'য়ে ধরে গোপালের চরণ,
বলে রেখো, প্রভু, চরণের কোণে ॥
হংস-বাহনে আসে একজন, তারপরে আসে বৃষভবাহন।
ঢুলু ঢুলু তার করে দুটি নয়ন
আর কি বলরাম কে আছে বৃন্দাবনে ॥
চার কন্যা একজন হেম-বরণী, দশভুজা তিনি সেজে ত্রিনয়নী।
দশকরে গোপালে খাওয়াই গো নবনী,
আসে সে রমণী সিংহবাহনে ॥
রাখাল বেশে সাজিয়ে দিল নন্দরাণী,
কৃষ্ণ লয়ে গোষ্ঠে গেল তখন রাখালসনে।
গোষ্ঠের মাধুরী সতীশচন্দ্র ভণে,
হরি ধনী সবে দেন গো বদনে ॥ —মুর্শিদাবাদ

৭

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্ল মনেতে।
লইয়ে ধেনুর পাল যায় গোচারণে ॥
রঙ্গেতে রাখাল বসে সঙ্গেতে সাজিল।
নক্ষত্রের সহিত যেন শশাঙ্ক চলিল ॥
ধেনু বৎস লয়ে সবে প্রবেশিল বন।
আনন্দ অন্তরে সবে করে গোচারণ ॥

গাভীগণ ছেড়ে দিয়ে অরণ্য ভিতরে,
সকল রাখালগণ কৃষ্ণ সেবা করে।
সকল পরিবারে কেউ যায় দূর বনে,
কেহ বনমালা গেঁথে সাজায় মোহনে।
ফল ফুল আনি সবে যতন পূর্বকে,
খাওরে কানাই বলে তুলে দেয় মুখে।
কোন শিশু খেতে খেতে সুফল সুমিষ্ট,
কৃষ্ণের বদনে তুলে দেয় সে উচ্ছিষ্ট।
সখ্যভাবে ভক্তগণে পুরাইতে সাধ,
স্বচ্ছন্দে উচ্ছিষ্ট ফল খান কালাচাঁদ।
কৃষ্ণ সনে হৃষ্ট মনে মত গোপ সুত,
নৃত্য গীত করে সবে হয়ে সুখ যুত।
আপনি লইয়া হরি রাখাল ভূপাল,
কোন শিশু মন্ত্রী হয় কেউবা কোটাল।
হেনকালে দিনমণি হয় অবসান,
ধেনুলয়ে বৃন্দালয়ে এলো ভগবান। —ঐ

৮

এসো রে, কানাই, কোথা আছ ভাই
তোমা বিনা ধেনু চরে না।
আয়রে, গোপাল, ব্রজের রাখাল
তোমার কিছু সাজে না।
এসো বিনা রে কানাই······
হাম্বা রবে ধেনু ডাকিছে সদাই
সকাতরে জলে যায় যমুনায়
তৃণ না পরশে আঁখি জলে ভাসে।
ওরে কানু তাকি জানো না,
চারিদিকে ঘেরি দিয়ে করতালি
গোষ্ঠ গিয়ে খেলি এসে বনমালী
লয়ে বনফল চক্ষে ঝরে জল,

ওরে, কানু, তাকি জান না,
মনে মনে আশা কর নাকো হেলা,
চল বনে খেলি বিনোদ খেলা। —বাঁশপাহাড়ী

৯

আয় রে, ভাই, জীবন কানাই, যাই গোচারণে।
ও তোরা চোরা ধেনু ভাই শ্যামলী ধবলী গেল দূর বনে।
কানাই তুই না গেলে ও তোর ধেনুগণে
চঞ্চল হতেছে মোহন বেণু না শুনিলে
ওরে তুই চরা তো তোর ধেনু চরা ভাই তুই,
হাঁক মানে না তুই বিনে।
কানাই মায়ের কোল পেয়ে আছ নিশ্চিন্ত হয়ে
গোষ্ঠে যাবার কথা কি, ভাই, গেছ রে ভুলিয়ে
ও তোর বলাই দাদা আদি করে ডাকছে রে রাখালগণে
আয়রে, ভাই, জীবন কানাই যাই গোচারণে। —ঐ

১০

সেজে আয়, কানাই, গোষ্ঠের সময় হল।
ভাই কানাইরে, চেয়ে দেখ দেখি রে কত বেলা হল॥
আমরা তো সকালে এসেছি সকলে, ডাকি নাই সকালে
কানাই কানাই বলে নিশি প্রভাত হলে কালে, ঘুমাবি কোলে,
আর তো মায়ের কোলে থাকা নয়ক ভাল॥
বেরিয়ে কেশব, চেয়ে দেখরে সব, ধেনু বৎস হল নিরুৎসব ;
আমরা রাখাল সব, তেমনি এলাম সব কেন উৎসব, ভঙ্গ করো বল॥
তুই না গেলে ভাই, চরাইতে গাই, রাখালগণ সবাই
কেমন করে যায়, মনে ভাবি তায়, শান্তি নাহি পাই
আর কেহ নাই আমাদের সম্বল॥
গেঁথে ফুলের মালা, সাজাইব কালা, ও ভাই নন্দলালা,
কেন দিস্ রে জ্বালা, ভেবে আকুল বালা, সেই কারণে বেলা
আর করিস্ নে বেলা যা হবার তা হলো॥
তোরে লয়ে হরি, সুখেতে কাল হরি, আনন্দে শিহরি।

বনেতে বিহরি, তোর কাছে প্রহরী দেখা রে বল হরি,
সে সুখের প্রহরী কে জুটাবে বল ॥
আমরা রাখাল যত, তোর অনুগত, চেয়ে আশা পথ
থাকিতে নিয়ত, তুই হলে সংযত খেলি মনোমত,
হেরে অবিরত ঐ বদন কমল ॥
হেরি চন্দ্র মুখ, পাই বড় সুখ, ঘটে রে অসুখ, তুই হলে বিমুখ।
শুকায় মোদের মুখ, পাই বড় দুখ, প্রাণ করে ধুক ধুক ভয়েতে দুর্বল ॥
তুমি ভয়ে অভয় দাও, মরণে বাঁচাও, যখন ফিরে চাও, তখনি নাচাও
যার প্রতি না চাও তার গুটি কাঁচাও
ভয়ে জল জল সেঁচাও তাহারে বিফল ॥
রাখালগণের মাঝে, তুই তো হলধর, সেই কারণে তোরে বলে
হলধর, ও ভাই গিরিধর, মোদের বাক্য ধর, নইলে সৃষ্টিধর ভয়ে অধর হল ॥

—মুর্শিদাবাদ

১১

ও বাপ, বলরামরে, কি কি দিয়ে বুঝাব তোমারে।
কানাই আমার নয়নমণি কেমন করে দিব তোরে ॥
কানাই যদি দিই বাপ তোরে,
কেমন করে থাকব ঘরে,
প্রাণে আমি বাঁচব নারে মরব কানাই বিহনেরে ॥
দুঃখিনীর জীবন রে কানাই, কানাই বিহনে আর কেহ নাই,
তাই তোমারে জানাই আমি যেতে দিব নারে ॥
কানাই আমার ছোট ছেলে, থাকবে বসে আমার কোলে
কেমন করে দিব বনে বলে জানাই তাই তোমারে ॥
গোপাল আমার হৃদয়ের ধন, না দেখিলে বাঁচবে না জীবন
ওরে বলাই, বলি এখন প্রাণ গোপালে দিব না রে ॥
গোপাল আমার নয়ন তারা, বনে গেলে যাবে মারা,
আর থাকতে কি পারে মা ছাড়া, মা বিনে চিনে না কারে ॥
তোরা যত রাখালগণে, আজকের মত যারে বনে।
দিব না জীবন ধনে যেতে গোচারণে ওরে ॥

কানাই যদি করি কোল ছাড়া, জিন্দাতে যাইব মারা।
হব আমি নয়ন হারা কে রাখিবে এ সংসারে ॥
ওরে বলাই, বলি তোরে, সাজবে না আজ নীলমণিরে
ভ্রান্ত হয়ে ক্ষান্ত করে আজকের মত ঘরে ফিরে ॥
সুরমুজ আলী ভেবে বলে, গোলাপ আলীর চরণতলে।

—মুর্শিদাবাদ

১২

গগনে উঠিল ভানু উঠরে বাপ কানুরে।
ডাকিছে তোর দাদা বলাই যত রাখালগণে রে ॥
ছিদাম সুদাম, দামু সুদাম আনন্দিত মনে
তোমায় নিয়ে গোচারণে যাবে যত রাখালগণে রে ॥
ডাক শুনে নন্দের নন্দন উঠে ততক্ষণে,
কি কারণে ডাকলে বলো গো, ভাই, আমারে ॥
শুনে সতী যশোমতী
চেয়ে প্রাণ ও ধনে যেতে হবে গোচারণে,
যত রাখালগণে রে ॥
আজ্ঞা যদি হয় গো মাতা যেতে আমি পারি,
বিদায় করে দাও গো, মাতা, আমায় তাড়াতাড়ি রে ॥
শুনে সতী যশোমতী সাজায় যাদুধনে
মাথায় চুড়া দিল এনে অতি সযতনে রে ॥
হাতে মোহন বাঁশী সতী দিল কৃষ্ণধনেরে।
পৃষ্ঠ পরে উড়নি-চাদর দিল ততক্ষণে রে ॥
আর গলে মালা গোপাল ধনের দেখে লাগে জল।
কোমরেতে কোমর পাঁটা করে কিবা আলোরে ॥
সোনার নূপুর পায়ের উপর কিবা শোভা পায়,
কৃষ্ণচন্দ্র মায়ের কাছে বিদায় ও যে চায়রে ॥
বলে তখন যশোমতী যত রাখালগণে।
যতনে রাখিস তোরা আমার প্রাণধনে রে ॥
তখন সতী তাড়াতাড়ি ঘর ও মধ্যে গেল।

ক্ষীর ও সর লবনি এনে চাঁদবদনে দিলরে ॥
লবনি খাইয়া গোপাল রাখালেরি সনে।
গোষ্ঠেতে চলিল তখন আনন্দিত মনেরে ॥
কৃষ্ণ পেয়ে রাখালগণে আনন্দিত মন
আগে পিছে সারি সারি করিল গমনরে ॥ —ঐ

১৩

আয়রে, প্রাণ-কানাই কাননে
আয়রে আয় প্রাণের ভাই বেলা যে চলে যায়।
বনখেলা খেলব গিয়ে বাসনা জানাই কেমনে ॥
প্রভাতকালে আমরা নিতে এলাম সব,
বেলা হল বড়
শ্যামলী ধবলী তারা
আমরা এলাম তাই কাননে ॥
লবনি বাঁধিয়া লইয়াছি ধড়ারি অঞ্চলে।
মনের সাধে বনে খাইব চঞ্চলে।
চল রে চঞ্চল চাঁদ গোচারণে চল
দুঃখ দিসনে ভাই কানাইরে ॥
প্রেমানন্দে আমরা যাব নদীর কূল
তোকে সঙ্গে করে তুলব বনফুল।
গাঁথব রে মালা পাব অতুল সুখ
পরাব তোর গলায় কাননে ॥
আমরা প্রজা, রাজা তুই রে কেলে সোনা
তোকে সঙ্গে করে পুরাব বাসনা।
তোর গানে মাতব সবাই কাননে ॥ —ঐ

১৪

গোপালকে সাজিয়ে দে মা,
গোচরণে লয়ে যাই,
গগনে অধিক বেলা বাড়িতে লাগিল,
পীত ধড়া কটি শিরে চূড়া বেঁধে দিতে গেল।

তোর গোপালের বেণু শুনে,
সব ধেনু মা আপনি ফিরে।
সব রাখালে করি খেলা,
তোর গোপালে বানাই রাজা॥
গগনে অধিক বেলা বাড়িতে লাগিল,
ব্রজের বালক সবাই গোষ্ঠেতে সাজিল,
ধড়া বাঁধে, চূড়া পরে পুচ্ছ দিয়া
অলকা তিলক দিল বদন দিয়া।
গোপালে সাজায়ে রাণী বদন পানে চায়,
কি বলে বিদায় দিবে মুখে নাহি বেরয়,
বলে তোরা যারে—
আমার হৃদয় দিতে প্রাণ কাঁদে
আজকের মত তোরা যারে॥ —নদীয়া

১৫

আমার ভাগ্যে বুঝি এই ছিল
বলরাম রে বাপ! দেখিতে দেখিতে
আমার নীলমণির কি হল?
কৃষ্ণধনকে যেবা ভাল করিতে পারে,
অর্ধেক মত বিষয় সঁপিব তাহারে
পাগলিনীর মত আর, অঞ্চলের ধন
আমার কটাক্ষে হারাল॥ —ঐ

১৬

দ্বাদশ রাখাল লয়ে বনে,
চরাতে গরু গোপাল ভালবাসে;
বৃক্ষ-লতা তরু মূলে গো মণি!
বেণু রবে ধেনু ঘুরায়ত কানু
এই যে সোনার রঙ ছিল
কাল রঙ হলো॥

১৭

হাসিতে হাসিতে এলো করিয়া কৌতুক,
কি জানি, আমার বিধাতা বৈমুখ ;
আমার কপালে নাই গো সুখ
হায় মরি বিনা মেঘে কেন বজ্রাঘাত হলো ? —ঐ

১৮

বিষ পান করে কালীদহের কুলে
মরেছিল শুনি, যত রাখালগণে
আমার চৈতন্য গোপাল
হায় মরি ! যাওয়া মাত্র পরে
চৈতন্য ফিরিল ॥ —ঐ

১৯

গোপাল ম'লে পরে আমি যে মরিব
এ পোড়া মুখ আর ব্রজে না দেখাব
আমি কতই বা ডাকিব ক্ষীর লয়ে,
গোপাল না উত্তরিল ॥ —ঐ

২০

শোক করে বাপ, প্রাণে সহ্য হয়,
যার যখন হয়, প্রাণে ব্যথা পায় ;
এই তো যেমন, দেনা অযোধ্যায় বেটার শোকে,
রাজা দশরথ মলো ॥ —ঐ

২১

প্রভাতকালে গোপালেরে সাজায় নন্দরাণী,
বলরামের করে সঁইপে দিল নীলমণি ।
তখন নন্দরাণী বলে বলাইর নিকটে,
তোমরা সবে খেলা কর কালিন্দীর তটে,
দূরদেশে গেলে ভয় থাকে মায়ের মনে,
মা বিনে সন্তানের দুঃখ অন্যে কিরে জানে ॥
যখন রে, বাপ, কেইন্দে বলিব খেইতে দে মা ননী,

তখন রে, বাপ, কোথায় পাবি এ ক্ষীর লবনী ॥
কাত্যায়নী পুজি রে, বাপ, পাইলাম নীলমণি,
মা হইয়ে ভাণ্ড ভাণ্ড খাওয়াই ক্ষীর লনী ॥ —ত্রিপুরা

২২

গোপাল আন্যা দেরে নন্দ, গোপাল আন্যা দে,
গোপাল বিনা অভাগিনীর প্রাণ তো বাঁচে না (রে নন্দ) ।
আগে যে কইছিলাম নন্দরে, আরে বেচ্যা ফালাও ধেনু,
নগরে মাগিয়া খাইতাম রে কোলে লইয়া কানু ॥
ভাত হইল করকরা, বেঞ্জন হইল বাসি ;
তবু ত না আইল গোপাল দিনের উপবাসী ॥
বেহানে খুঁইজাছে কত, না দিলাম রান্ধিয়া ।
ধেনুর সঙ্গে গেল হরি, কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
বেলা গেল, সন্ধ্যা হইল, রবি গেল গইয়া ।
তব ত না আইল হরি দিনান্তের উপাসী ॥
কবলী ধবলী গাভী পুরীর প্রধান ।
হেই গাভী হারাইয়া (হরির) উইড়াছে পরাণ ॥
বন যাক বনের পশু, দেখ বহুত দূর ।
তোমরা নি দেইখাছ যাইতে শ্রীদামের বাছুর ॥
বারে বারে করলাম মানা বেচ্যা ফালাও ধেনু ।
নগরে মাগিয়া খাব, কোলে লইয়া কানু ।
বারে বারে করলাম মানা না যাইও গোয়াল পাড়া ।
কাইড়া রাখে হাতের বাঁশী ছিঁড়ে গলার মালা ॥ —ঐ

২৩

আরে নন্দ আর ত না যাব তোমার মাঠে,
নন্দ রে, ধেনু রাখতে যত তাপ, তাহা নাহি জান ভাব,
অরণ্য ভ্রমিতে লাগে ক্ষিধা, বাড়ী আইলে শুধা ভাত,
মিষ্ট জবান নাহি তাত, পরের মায় কি পরের বেদন
জানে রে, নন্দ ঘোষ ।
নন্দ রে, ষোল শত গাভীর দড়ি, ইহারে দিয়া মার হে বাড়ি,

সোনা গায়ে চড়াইয়া দাগ রে নন্দ ঘোষ।
নন্দ রে, আর কার ধেনু রাখলে পাঁচ বিয়া করাইত মোরে,
দাসী দিত জনা চারি-পাঁচ।
সোনার ছত্র মাথে দিয়ে গোধেনু চরাতাম গিয়ে,
অরে নন্দ দিনে দিত তিন সন্ধ্যা ভাত।
নন্দ রে যমুনা পার হৈয়া যামু, ভিন্ন দেশে যাইগা খামু,
অরে নন্দ পুত্র পুত্র বৈলে মরবি কাইন্দারে নন্দ ঘোষ। —ঐ

২৪

মনটা কেমন করে আমার বাড়ীত ফিইরা যাইত চায়।
বন্দের পাই চাইয়া রইছে আমার কাঙ্গালিনী মায় গো—
আমার দুক্কিনী মায়।
ক্ষেণে যায়, মা, রান্ধা ঘরে
ক্ষেণে যায় মা দীঘির পাড়ে উঁকি মাইরা চাইয়া দেখে,
দেখা যায় কি না যায়—আমারে দেখা যায় কি না যায় গো।
বাইগুণ পোড়া ভাত খাইয়া যায় ঘরের মাইঝে শুইতে যায়;
ক্ষেণে আইসা পীড়ার উপর উঁকি মাইরা চায়।
এরই লাইগা পানি খাইতে আইজ আমার 'বিষম' খায়॥

—মৈমনসিংহ (১৩২১)

২৫

গাই বাছুরের পেট ভইরাছে বেলাও ত আর নাই,
মায়ে জ্বালাইছে বাতি চল গৃহে যাই।
গোয়াইল ঘরে ধোঁয়া দিয়া, তপ্তা ভাত গিয়া খাই।
মায়ের বুকে মাথা রাইখা—শুইয়া নিদ্রা যাই রে। —ঐ (১৩২১)

২৬

আরে শোন রাখাল ভাই, ও রে, তোর মায়ে কইছে রে,
গাঙ্গের জলে হাত মুখ ধুইয়া গাছের তলাত্ বৈতে রে।
খিদা লাগলে টোপলা খুইল্লা, মুড়ি চিড়া খাইতে রে।
মায়ের বুকের দুধ খাই কইয়া, হাতের আজলায় পানি লইয়া,
আড়াই চুমুক খাইও রে।

ছেঁওয়ার মধ্যে লেংটি পাইত্যা পুব শিওরে শুইও রে।
সন্ধ্যার আগে গরু লইয়া—বাড়ীত্ ফিইরা যাইও রে। —ঐ

২৭

গাই বাছুরের পেট ভইরাছে বেলাও ত আর নাই।
মায়ে জ্বালাইছে বাতি চল গৃহে যাই॥
গোয়াইল ঘরে ধোঁয়া দিয়া তপ্তা ভাত গিয়া খাই।
মায়ের বুকে মাথা রাইখ্যা শুইয়া নিদ্রা যাই রে। —ঐ

২৮

দিবা গেল সন্ধ্যা হইল রবি গেল দূর ;
কানাইয়া ডাক দিয়া বোলে হারাইলাম বাছুর।
বে-ওর বন্দ আন্ধার রাইত উরাত উচা ঘাস—
কৈ পাইবাম বাছুর আমার লাগবো বার মাস।
খাড়াও তোমরা রাখাল ভাইরে—বাছুর দেইখা লই। —ঐ

২৯

উচা আইল উইঠা ডাকি হাঁরৈ হাঁরৈ।
মা যশোদে কত বলব কানাইর বিবরণ
সে যে মাঠে গেলে বসে থাকে দেবগণে চরায় গোধন।
একজন আসলো ঐরাবতে স্বর্ণছত্র দিয়া মাতে
বসলো আসি কানাইর বামেতে
সে যে ওঁ, রাং, খ্যং বলে কয়গো কথা বেদশাস্ত্র করায় শ্রবণ।
কত বলব কানাইর বিবরণ॥
একটি সর্প যে দুরন্ত, ফণা গুইজা পাইনা অন্ত—
কানাইর ডাকে বসে অনন্ত—মা যশোদে, মা যশোদে !
মাথার উপর ধরেছে ফণা—রৌদ্র-মেঘ করে বারণ।
কত বলব কানাইর বিবরণ॥
স্বর্ণ বর্ণ একটি নারী কানাই ভাইকে কোলে করি—
মা যশোদে, মা যশোদে, তুমি কি খাওয়াও গো—
সে যে দশহস্তে খাওয়াইলো ধইর‍্যা কানাইর চাঁদবদন।
কত বলব কানাইর বিবরণ॥ —ঐ

৩০

গা তোল, ভাই, প্রাণের নীলরতন আর তো নিশি নাই।
উদয় হ'ল দিনমণি চলরে ভাই গোষ্ঠে যাই ॥
এত বেলা চিকন কালা শুয়ে কেন বিছানায়,
তোমা বিনে যায় না বনে ধেনু বৎস গাই ॥
এসে দেখা দিয়ে যাও।
তোমার পায়ে ধরি মোর মাথা খাও,
দিয়ে চরণ তরী মোর জীবন বাঁচাও,
চোখের দেখা দিয়ে, সখা, তুমি যাতনা নিভাও,
আশাধারী বংশীধারী সদা ফিরি তোর আশায় ॥
আদর করে নন্দরাণী নাম রেখেছে চিন্তামণি,
কাল শশী কালাচাঁদ তোমায় (আরে)
ক্ষীর সরো নবনীতে তুষ্ট না হও অবনীতে
রুষ্ট হলে পদে মেলা দায় (আরে)!
তোমার অপার মহিমা, (মোরা) দিতে নারি তুলনা,
তাতে অদর্শনো সহে না, এসে জুড়াও যাতনা,
ওহে, শ্যাম, কেলে সোনা,
অশ্রুজলে বক্ষ ভাসে বিনে দয়াময় ॥
ওরে প্রাণ গোপালকে ফিরাবে গোপাল বিজন বিপিনে কানু,
কে শুনাবে আর মধুর ঝঙ্কার বাজায়ে মোহন বেণু,
ফিরি তোর ভরসায় কেন এত নিঠুর দয়ামায়া নাই।
বিফলে দিন কেটে গেল হায় সুসময়ে হল অসময়।
(যেন) অন্তিমে ঐ শ্রীচরণ পায়
(কাছে) এস কানাই জীবন জুড়ায়
গগন চাঁদ কয় দাও পদাশ্রয় প্রাণ রাখি তোর ভরসায় ॥

—মুর্শিদাবাদ

৩১

উঠরে ভাই, কানাই, কেন এত বেলা শুয়ে বিছানায়।
তোমা বিনে যায় না বনে রাখাল সহ ধেনু বৎস গাই ॥

তোমার মত এত বেলা, কেউ শুয়ে নাই চিকুন কালা,
ঐ শিঙ্গার স্বরে দাদা বলাই ঘন ঘন ডাকে তোমায় ॥
তুলে দাও, মা নন্দরাণী, গোষ্ঠে যাবে চক্রপাণি।
শ্রীমুখে দাও ক্ষীর নবনী, না খেয়ে চাঁদ মুখ শুকায় ॥
রেখে তোরে বৃন্দাবনে, যায় না গোঠে রাখালগণে।
ভ্রান্তিহারা হয়ে বনে শ্যামলী ধবলী বেড়ায় ॥
গগনচাঁদ কয় বংশীধারী, সদা তব আশাধারী।
ত্বরাও তবে ত্বরাতে পারি, নইলে জীবন বিফলে যায় ॥ —মুর্শিদাবাদ

৩২

একবার আয়রে গোপাল কোলে আয়,
(ও বাপ গোপাল রে) ও তোর জননী হয়ে, কত দুঃখ সই।
শত বৎসর বাছা ডাক নাই মা বোলে,
আশার আশে আমি এসেছি চ'লে,
বাঁধিয়া নবনী এসেছি অঞ্চলে, ও তোর বদন কমলে দিবরে—
প্রভাত কালে উঠি ওরে বংশীধারী, ধূলায় পড়ে আমি
যাইরে গড়াগড়ি কাঁদিতে কাঁদিতে দধি মন্থন করি ;
ও কার বদনেতে হরি দিবার কেও নাই ॥
কপালেতে আমার আরও কত আছে, তোমার পিতা নন্দ
অন্ধ হয়ে গেছে সে দুঃখেতে বাছা, জীবন কি আর
বাঁচে, একবার আয়রে কাছে জীবন জুড়াই ॥
দেখে যারে গোপাল তোর মায়ের সম্মান,
তোর দ্বারের দ্বারী আমার করে অপমান।
রাজা হলি ভাল ওরে বংশীবয়ান, নাহি পরিত্রাণ বুঝি প্রাণ যায় ॥
দুঃখের কথা কারে কইরে কমল-লোচন,
তোর দ্বারের দ্বারী আমায় বলে রে কুবচন।
লাল করে আসে তারা দুটি লোচন,
এ দুঃখেতে মোচন কররে বাপ ত্বরাই ॥
শ্রীদাম, সুদাম, দাম যত রাখালগণে,
প্রভাতকালে আসি আমারি অঙ্গনে,

কানাই কানাই বলে ধারা বয় নয়নে,
তোমা বিনে আমার সবই অন্ধময় ॥
তোমার সাধের বৃন্দাবন বন হয়ে গেছে।
মনোলোভা শোভা সকলই গিয়েছে।
ময়ুরা ময়ুরী নাচে না আর গাছে,
শুকশারী তারা অসুখেতে রয় ॥
রাজা হলি ভাল প্রজা পালন কর,
মায়ের বিচার বাছা করিবারে নার,
দুঃখের কথা কারে বলবো বেণুকর,
এ সকলি আমার, কপালেতে হয় ॥
এ দীন কুমারেশ বলে, ওগো নন্দরাণী,
কৃষ্ণশোকে যারা হয় গো পাগলিনী।
এমনি দশা তাদের হয় গো জননী,
কেঁদে কেঁদে তাদের জন্ম কেটে যায় ॥ —মুর্শিদাবাদ

৩৩

নাচিয়ে নাচিয়ে গোপাল ওরে আয়রে ছলিয়া,
কতদিন বেড়াবি গোপাল হামাগুড়ি দিয়া।
মায়েরই বচন শুনি গোপাল দাঁড়াইলো
পুর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় হইল।
এক পা বাড়িয়ে গোপাল আর এক পা বাড়ায়,
চলে যেতে ঢলে পড়ে কোলে তুলে মায়,
মাগো, তুমি বলেছিলে, ও মা, বলেছিলে রেতে।
দধি সনে নবনী কৃষ্ণ তোরে দিব খেতে।
তখন কি বলেছি কি বলেছি, ওগো বলে নন্দরাণী।
ওগো যা বলেছি—তা দিব বাপ নাচ রে নীলমণি।
কটি বেড়া বটে দিব রতন ঘুঙ্গুর,
নাচিতে পারিলে দিব তোয় সোনার বাধা ঘুঙ্গুর,
নাচ নাচ নাচ গোপাল নাচ তো আর বার,
নাচিতে পারিলে দিব তোয় মণিময় হার। —ঐ

বাপধন, বাপেরই দুলাল ওরে শ্বশুরের নাতি
খেলিতে গাড়ি দিব তোয় মদমত্ত হাতি ॥
সাত জন্ম সাগরেতে ঢেলেছিলেম গা
তাইতো হয়েছি গোপাল তোমা ধনের মা ॥
ক্ষীর সর নবনী ছানা দিলাম রে বিছানে
সে সব ছাড়িয়ে গোপাল মাটি খেলি কেনে।
মাটি তো, মা, খাইনে গো মিছে বল তুমি,
সম্মুখে দাঁড়িয়ে দেখ, মা, বদন মেলি আঁখি ॥
হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ মায়ের আগে গেল
মুখ মেলি চৌদ্দ ভুবন মাকে দেখাইল ॥
মেল মেল মেল গোপাল, ওরে মেলরে আর বার
মুখের ভিতর চোদ্দ ব্রহ্মাণ্ড তবে দেখিবারে পাই।
ঝোড় জঙ্গল কত গোপাল ওরে নদী যায়রে বয়ে
নারদ করিছে গান ওই দেখ বীণা বাজাইয়ে
আরেক রূপ কৃষ্ণ ওরে দেখলাম বৃন্দাবন
আমার মত মা যশোদা তোর কাছে কত জন।
কত অপরাধ কৃষ্ণ ও বাপ আমি যে করেছি,
খেতে খেতে তোর বদনে কত উচ্ছিষ্ট দিয়েছি ॥
আমি তো জগৎ গুরুমা আমার গুরু তুমি
মনোবাঞ্ছা পুরাইতে ওগো তাই পেয়েছ তুমি
একপদ ভূমি দানে স্বর্গ মর্ত্য গিলে।
অবশে বলি রাজায় পাতালে আনিলে
গায় যে গাওয়ার যে সে করিবে শ্রবণ।
ধনে পুত্রে হোক লক্ষ্মী তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥ —ঐ

৩৪

প্রভাতকালে মায়ের কোলে আছে রে নীলমণি।
নিশামণি অস্ত গেল উদয় দিনমণি ॥
একবার, এস ভাই, এস ভাই, ধেনুগণ লয়ে যায়।
ওরে, গোষ্ঠে গিয়ে করব খেলা এই বাসনা মনে।

ওরে, তাই তোরে নিতে সেই জন্যেতে এলাম সর্বজনে ॥
সদা বাঞ্ছা মনে,
খেলবো, কানাই, তোমার সনে।
গগনে হইল বেলা সেজে আর রে নানা।
ঐ দেখ বলাই করে শিঙার ধ্বনি আমরা শুনি রে ॥ —বীরভূম

৩৫

মাকে বল সাজাইতে ধড়া চূড়া দিয়ে।
আলতা তিলকা ভালে পদে নূপুর লয়ে ॥
একবার নেচে নেচে আয় রে।
দেখ গোষ্ঠের সময় যায় রে ॥
ওরে মায়ের কোলে থাকলে কেনে তেমন সুখ পাই না।
আমরা কাকে করব রাখাল রাজা তুমি বাদ যাবে না।
ও ভাই, বল রে কানু।
কে বাজাবে মোহন বেণু ॥
তোরে লয়ে গোষ্ঠে গেলে।
বড় সুখে থাকি কেলে ॥
বনফুল সদাই হারে।
গাঁথিয়ে পরাই তোরে ॥ —ঐ

৩৬

ঊর্ধমুখে গাভীগণে, ভাই, হাম্বা হাম্বা রবে।
অঙ্গনে দাঁড়ায়ে ডাকে কোথায় প্রাণ কেশবে ॥
তাদের চক্ষে ধারা বয় রে।
এ দুঃখ কি প্রাণে সয় রে ॥
গোপাল, তোমা বিনে গোপালগণে কাননে না চলে।
তাদের মন নাই ঘাসে, তোমার আশে ভাসে নয়ন জলে ॥
একবার দেখ রে, কানাই।
দাঁড়ায়ে তোর নব লক্ষ গাই ॥
তুই বিনে চলে না হরি।
দাঁড়ায়ে সবে সারি সারি ॥

বংশীধারী তার উপায় কি করি।
মরি, ভেবে মরি ॥ —ঐ

৩৭

আপনি শিঙার ধ্বনি করে হল সারা,
কেন আর বিলম্ব কর, ও ভাই, মাখনচোরা।
ডাকিছে ডাকিছে দাদা।
শিঙার স্বরে বলাই দাদা ॥
ও তুই কেমনে রইলি ঘরে ওরে কেলে সোনা।
ওরে নির্দয় কেন রাখাল প্রতি বল না, বল না ॥
কেন নিদয় হলি ভাই, কি দোষ করিলাম সবাই ॥
যদি দোষ করে থাকি।
ক্ষমা এখন পাব না কি ॥
সৃষ্টিধরের ঐ ভাবনা।
ভেবে সেরে কেলে সোনা ॥ —ঐ

৩৮

তোমা বিনা সে বিপিনে মনে শঙ্কা নাই রে।
সাধে কি, ভাই, আমরা তোমায় সঙ্গে নিতে চাই রে ॥
আমরা একলা যেতে পারি না!
তুই না গেলে কেলে সোনা ॥
ওরে, ক্ষুধার সময়, ও রসময়, কে দিবে ভাই খেতে,
ওরে, তুই যদি, ভাই, সরে রবি, না যাই গোষ্ঠেতে,
আর কে দেবে খেতে।
ক্ষুধার সময় সেই বনেতে ॥
তুই গেলে খেতে পাই অন্ন।
তোমা বিনে জীবন শূন্য ॥
তুমিই ধন্য অন্য কে তা পারে।
ও ভাই, কানাই রে ॥ —ঐ

পরিণত বয়স্কের রচনা বলিয়া কোন কোন গোষ্ঠের গানে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বালকোচিত ধারণার পরিবর্তে বিজ্ঞজনোচিত ধারণা প্রকাশ পায়।

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে শ্রীকৃষ্ণকে সেইজন্যই 'জীবনদাতা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে ইহা একটি ব্যতিক্রম মাত্র। লৌকিক গোষ্ঠ-গীতি সর্বত্রই নিতান্ত সহজ ও সরল।

৩৯

জলে কিবা অনলে, ভাই, তুই রে জীবনদাতা।
তুই জানিস আর আমরা জানি আর কে জানে তা।
ও ভাই অন্যে কেউ তা
জানে না, তোর আমার মরমের কথা।
ও ভাই বনবিহারী ॥
বনে যেতে কেন রে দেরী ॥
তবে আর কেন ভাই, চরাতে গাই, যেতে করছ দেরী।
মায়ের কাছে বল বল।
গোষ্ঠসাজে সেজে চল।
এলো এলো ঐ দেখ বলাই।
হেথা দিস না ব্যথা ভাই। —ঐ

৪০

হাসি হাসি, কালশশী, আমরা আসি ভাই রে।
তোর আশাতে আশা মোদের অন্য আশা নাই রে ॥
একবার এস ভাই, এস ভাই,
আমরা নেচে নেচে গোষ্ঠে যাই ॥
ও ভাই, গিরিধরা পড়বে ধরা ধৈর্য ধরতে নারি।
ও তুই, রাখাল মাঝে এলি সেজে আনন্দে বিহারী ॥
দুঃখ দিও না, হরি।
আয়রে, ভাই, তোর পায়ে ধরি।
যদি, ভাই, তোর পায়ে বাজে।
কাঁধে করব বনমাঝে,
এখন মা যে নাচন দেখতে চায় রে,
নেচে নেচে আয় রে ॥ —ঐ

নিরক্ষর পল্লী কবির রচনা বলিয়া ইহারা বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর মধ্যে

স্থান পাইতে পারে নাই। কিন্তু এ'কথা অস্বীকার কবিবার উপায় নাই যে, বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী রচয়িতাদিগের রচনার তুলনায় ইহারা অধিকতর আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। এমন কি, রচনার মধ্যেও কোন গ্রাম্যতা অনুভব করা যায় না।

৪১

রাখালের বিনয়বাণী নীলমণি শুনিয়ে।
প্রণমিয়ে দাঁড়াইল মায়ের কাছে গিয়ে॥
বলে, সাজাইয়ে দাও, মা।
বিলম্বে কাজ নাই জননী॥

গোর্খের গান

বাংলার কোন কোন অঞ্চলে ভিখারীরা গরুর মূর্তি লইয়া প্রতি গৃহের প্রতি গোয়াল ঘরে গোজাতির কল্যাণে এই গান সুর করিয়া গাহিয়া থাকে,

১

মায়ের পদে রমণী বিফলে দিন যায় গো—
অনুদায় কালে যে গোয়ালকেরে যায়—
গঙ্গার স্নানের ফল সে গোয়ালে বসে পায়।
সন্ধ্যা কালে সন্ধ্যা দিবেন সকালে ছড়া ঝাটি,
ধনে পুতে লক্ষ্মী বাড়বে—গোয়ালে ভগবতী
শনি মঙ্গল বারে যে জন হলুদ বিলায়—
উকুন এঁঠেলি তার গরুর গায়ে হয়॥
ভাদ্র মাসে পাকা তাল গোয়ালে ব'সে খায়—
বৎসরে বৎসরে পাল তার মাটি হ'য়ে যায়।
পান খেয়ে যে জন মা গোয়াল কাবৃতে যায়;
রক্ত পিনাস হ'য়ে তার বাছুর মারা যায়।
রম্ভা খেয়ে রম্ভার চোকা গরুকে যে দেয়
চামদল বসন্ত তার গরুর গায়ে হয়॥
চাল ভাজা কলায় ভাজা গোয়ালে বসে খায়।
বড় বড় গুটি তার গরুর গায়ে হয়॥

দিনে দুই প্রহরে যে জন ঢেঁকি জাতা পাড়ে,
তার বাড়ী ছেড়ে লক্ষ্মী চমকি উঠে ডরে।
একদিন সাত বৌকে ডেকে গিন্নি পালা করে দিল,
প্রথমে গোয়াল কারা, বড় বৌয়ের হ'ল।
বড় বৌ, বলে মাগো গায়ে এল জ্বর—
গোয়াল কারতে নারি মাগো নিকাইব ঘর।
মেজ বৌ বলে মাগো জ্বালার উপর জ্বালা
বুঝে সুজে দেখুন কিন্তু 'ন' বৌয়ের পালা
'ন' বৌ থাকে মাগো কপাটের আড়ে
লাফ দি'য়ে চড়িল সে ভাসুরের ঘাড়ে॥
সেজো বৌটি মেজো বৌটি চাল্ ধুতে যায়।
চারি পানে চেয়ে বৌটি খাবল কতক খাই॥
আর একটি বৌ ছিল তার নাম খেকর মণি।
ঘাড়ের মাঝে চুল যায় তার গুটি জরায় দড়ি॥
দুই, দুগ্ধ বেচে পথে গিন্নির আগমন।
রাস্তার মাঝে হ'ল কপিলার সনে দরশন॥
বলেন কোথায় যাচ্ছ মা কপিলা
কোথায় গো গমন—
এই অপরাধ করে বাসা ছেড়েছি ভবন।
তোমাদের বউটি মাগো আনিব নগর
মারিল 'ঝাঁটা,' বারি ভাঙ্গিল পাঁজর॥
গিন্নি বলে চল গো মা কপিলা ফিরে—ঘরে চল।
তোমার সাক্ষাতে বৌকে নরবলি দিব
হাতের পাঁচটি আঙ্গুল কেটে পঞ্চ প্রদীপ বানাব॥
মাথার মস্তিষ্ক নিয়ে ঘৃত বানাব।
হেঁটোর মালুই চাকি কেটে প্রদীপ সাজাব॥
হোঁটোয় কাঁটা উপরে কাঁটা বৌকে গাড়িল
ছোট বৌকে ডেকে বলে মাগো তুমি হ'লে কুলের নন্দন
তোমা হ'তে হবে আমার গরুর পালন॥

এসো গো মা, ভগবতী, তুমি দাও বর।
তোমার বরে লক্ষ্মী আসুক ভোলা মহেশ্বর ॥ —মুর্শিদাবাদ

২

ভিজে কাপড় আগলা চুলে গোয়ালেতে যায়,
ধুক-ধুকি ও মিনা রোগে গরু মারা যায় ॥
গোয়াল কাড়িয়া যে বা জাবরে মুছে হাত,
তার পালের প্রধান গাভী করে গর্ভপাত ॥
পা দিয়া গরুর গোবর ঠেলিয়া ফেলায়,
দূর দূর নানা রোগে গোধেনু হারায় ॥
চালভাজা খেয়ে যে বা গোয়ালেতে যায়,
আগে হালের গরু তাহার শুকাইয়া যায় ॥
পান গুবাক খেয়ে যে বা গোয়ালেতে যায়
রক্ত শূল ঝিমা রোগে গরু মারা যায় ॥
গোয়াল কাড়িয়া যে বা ঝেড়ে বাঁধে চুল।
তার পালের গরু করে ঢোলাঢুল ॥
মামা ভাগ্নে গরু যে বা বেচিয়া খায়,
দিনে দিনে পালের গরু হা ভাতিয়া হয় ॥
আপনার ঘড়ঘড়ি আগুন বিলায়,
আপনার ঘরের লক্ষ্মী ছাড়িয়া পলায় ॥
শনি মঙ্গল বারে যে বা হলুদ বিলায়,
তার ঘরের লক্ষ্মী ছাড়িয়া পালায় ॥
এই পর্যন্ত এসব কথা করি সমর্পণ।
গোর্ক্ষনাথের চরণে ভক্তি রাখেন সর্বজনে ॥ —ঐ

গোরক্ষনাথের গান

নাথ সম্প্রদায়ের সিদ্ধগুরু গোরক্ষনাথের মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া মধ্যযুগে যে সুদীর্ঘ কাহিনীমূলক গীতি রচিত হইয়াছিল, তাহা গোরক্ষনাথের গান, গোরক্ষ বিজয় বা গোর্খের গান নামে পরিচিত। বাংলার জনশ্রুতিতে আর একজন গোর্খের নাম পাওয়া যায়, তিনি গোরক্ষক দেবতা, তাঁহার সঙ্গে উপরি-উক্ত

গোরক্ষনাথের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহার মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া যাহা রচিত হইয়াছে, তাহা গান নহে—ছড়া। সুতরাং গোর্খের গান বলিতে নাথগুরু গোরক্ষনাথেরই মাহাত্ম্যসূচক গান বুঝায়। গোর্খের বা গোরক্ষনাথের গান সুদীর্ঘ কাহিনীমূলক কাব্য। সামান্য একটু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যায় মাত্র।

১

একদিন হর-গৌরী একত্রে বসিল।
সৃষ্টি স্থাপন হেতু কহিতে লাগিল ॥
ভবানী বলিল, দেব, শুন সাবধানে।
তোমার শিষ্যগণে স্ত্রী না করে কি কারণে ॥
সর্ব মুখ্য দেব তুমি সৃষ্টির কারণ।
গঙ্গা আদি দুই নারী করহ গ্রহণ ॥
ধ্যায়ানে সাধিবা যোগ কিবা পাইবা ফল।
আজ্ঞা কর গৃহবাস করুক সকল ॥
মহাদেব বোলে, শুন, কহি তোমার স্থানে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ নাহি তার মনে ॥
ভবানী বলেন, তবে না বোল বচন।
কাম ক্রোধ ত্যেজ হেন আছে কোন জন ॥
আজ্ঞা যদি কর তুমি স্বরূপ বচন।
কটাক্ষে ছলিতে পারি সে সবের মন ॥

গৌর পদাবলী

চৈতন্য ধর্মের প্রভাববশতঃ বাংলার সমাজে ক্রমে কৃষ্ণলীলার পরিবর্তে গৌরাঙ্গলীলা জনপ্রিয়তা লাভ করিতে থাকে। ক্রমে রাধাকৃষ্ণের পরিবর্তে গৌরনিতাই সমাজ-জীবনের আদর্শ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাংলার বিপুল সংখ্যক গৌর পদালীতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যে সকল গৌরবিষয়ক পদ বৈষ্ণব মহাজন পদ-রচয়িতৃগণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা 'গৌরপদ তরঙ্গিণী' নামে জগবন্ধু ভদ্র কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল গৌরবিষয়ক পদ লোক-মুখে প্রচার লাভ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে

গৌর-জীবনের জনপ্রিয়তা নির্দেশ করিয়াছে, তাহাদের কোন সঙ্কলন ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। এখানে তাহারই কিছু নিদর্শন দেখা যাইবে।

১

এস হে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ সঙ্গে করি,
মনের আনন্দেতে তোমার সঙ্গে সংকীর্তন ও নৃত্য করি॥
নদের চাঁদ নদে ছেড়ে, উদয় হও হৃদয় মন্দিরে,
তোমার চাঁদ গৌরাঙ্গকে বক্ষে হেরে,
মানব জনম সফল করি॥
মদনমোহন গোরা ত্রিজগতে মনোহারা
হয়ে রাধার প্রেমে মাতোয়ারা
ধূলায় দিচ্ছেন গড়াগড়ি॥
যে ডাকে হে বারে বারে, ভয় কি হে তার ভবপারে,
গুরুচরণ বলে অন্তিমকালে পায় যেন রাঙা চরণতরী॥ —মুর্শিদাবাদ

২

ঐ খানে দাঁড়ায়ে কেন রয়েছে গৌর-নিতাই,
কাঙালি কি কেও নয়, হে গৌরাঙ্গ, মনে কি ভেবেছ তাই।
এস, গৌরাঙ্গ, দয়া করে, আমার হৃদয়-মন্দিরে,
নৃত্য কর ঘুরে ফিরে, গৌর-নিতাই দু'টি ভাই॥
তুমি হরি শ্রীচৈতন্য, আমি অতি দীন দৈন্য,
ভজন বিহীন সাধন শূন্য, কি হবে দীনের উপায়।
তুমি হরি জগন্নাথ, তুমি ত্রিজগতের নাথ,
জগাই আর মাধাই এর মত, উদ্ধার কর আমায়॥
কাঙাল গিরির এই মিনতি, চাই না ধন, জন, মন ও যুক্তি,
পদে যেন থাকে মতি, অন্তে রাঙা চরণ পায়॥ —ঐ

৩

আর বেলা নাই, এই বেলা ভাই, হরি বলে প্রাণ জুড়ায়,
নিতাই চাঁদের পারের ঘাটে অবিলম্বে চলে যাই॥
নিতাই তোমার হলাম বলে, যে ডাকে দুই বাহু তুলে,
হৃদয় খুলে, লয়ে কোলে পার কয় দয়ার নিতাই॥

নিতাই আমার প্রেমের গুরু, গদাধর হয় প্রেমের গুরু,
নিতাই গৌর কল্পতরু, সোনার চাঁদের চেতন নাই ॥ —ঐ

৪

জয় প্রভু শ্রীচৈতন্য কলির জীব করিতে ধন্য
অবতীর্ণ হলে নদীয়ায়।
ভক্তগণ সঙ্গে মাতিয়ে রসরঙ্গে
প্রেম তরঙ্গে হরিনাম বিলায়।
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে যে ধন ছিল গোলোকে,
কলিতে আনিল গৌর রায়।
পাপি-তাপী সে ধন পাইয়া আনন্দে বাহু তুলিয়া
প্রেম-তরঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়।
দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ মাথে নিয়ে প্রেমভাণ্ড
নগরেতে ঘুরিয়া বেড়ায়।
অমূল্য ধন বিনা মুল্যে কে নিবি, কে নিবি বলে
যারে তারে যাচিয়া বেড়ায়।
রসপ্রেমে রস আস্বাদনে, উন্মত্ত হইয়া প্রেমে
হরিদাস, রামানন্দ রায় শ্রীনিবাস গদাধরে।
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম বাজারে বিকিকিনি করিত সদায়,
সেই প্রেম নামিয় রসে, রসিক যে জন সে জন জানে,
কর্মদোষে নবীনেরা না পায়। —ঐ

৫

সাধের তরী লইয়া রসিক নাইয়া এসেছে রে নদীয়ায়,
শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
ভাঙ্গা দেশে হাট মিলাইয়া পসারী বসাইয়া,
যত খরিদ্দার আনে ডাকিয়া, কে নিবিরে আয় ॥
হাটে হাটে গল্লি দিগা কতই রং তামাসা,
তাতে দুই ধারেতে দোকান বসা মাল বিকায়।
রসিক বেচে মাল মাপিয়া মন কাঁটায় উঠাইয়া,
যত অরসিকে পায় না, কাঁদিয়া ফিরে যায় ॥

যারা হয়েছে নির্বিকার, তারা পায় অধিকার,
তারা ভাব শিখিয়ে বেচা কেনায় রং লাগায়।
তোরা কে যাবি, আয় গো, আয়, হাটের তো সময় যায়,
বাজার ভেঙ্গে গেলে মিলে না আর পুনরায়।
ধন্য সে মানুষ রমণী জীবের পরশমণি
ও তারে ধরলে পরে চিন্তা অভাব দূরে যায়। —ঐ

৬

এল রে চৈতন্যের গাড়ী, সোনার নদীয়ায়।
রায় কোম্পানীর জংশন হল শ্রীবাস আঙ্গিনায়॥
শ্রীঅদ্বৈত ইঞ্জিনিয়ার, নিত্যানন্দ টিকেট মাস্টার,
শ্রীগৌরাঙ্গ হয়ে গো ড্রাইভার সেই গাড়ী চালায়॥
গরীব লোকের কি সুবিধা, কারও যেতে নাইকো মানা।
লব ভক্তি-টিকিট, নেব গো বিদায়, গাড়ীর টিকিট পাওয়া দায়॥
ধনী মানী ঘুরিফিরি, টিকিট ছাড়া যাইতে নারি
চেক করে তাই ঠিকমত, হায়, রামানন্দ রায়॥
বৃন্দাবন বলে তাহার কাছে, রাধারাণীর হাট বসেছে।
ফার্ষ্ট ক্লাশে বসে গো তাই নিত্যধামে যায়॥ —ঐ

৭

সই গো, গৌর নামে নদীয়ায়,
কি গো দেখবি যদি চলি আয়—
কেশ মুড়ায়ে ডোর কৌপীন নামাবলী দিয়ে গায়—
রাধারাণী ঋণের দায় (তাই) গৌর নামিছে নদীয়ায়॥
—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৮

গৌর আমার সুন্দর নয়নের তারা।
রাত্রি নিশাকালে গৌর হইয়াছি হারা॥
যে অবধি গৌর গেল সোনার নইদা অন্ধাইর হৈল
(বিপদ ঘটিল)
সেই অবধি শচী রাণী জীয়ন্তে মরা। —মৈমনসিংহ

৯

মা বোল মা বোল শুনলাম না রে নইদা চান্দের মুখে,
জন্মাবধি রইল শেল অভাগিনীর বুকে।
যখনে জন্মিলা, রে নিমাই, নিমতরুর তলে,
হইয়া কেন না মরিলা, না লইতাম কোলে (রে) ॥
নিমতরুর তলে থাক, নিমাই, নিমের মালা গলে,
মা বলিয়ে কে ডাকিবে, সকালে বিকালে ॥
নিমতরুর তলে থাক, নিমাই, নিমফল খাইও।
আগে তোমার মা মরিলে পাছে সন্ন্যাস যাইও ॥
সন্ধ্যাকালে আইল অতিথ্ রইতে দিলাম ঠাঁই।
প্রভাতে জাগিয়া দেখি, নিমাই ঘরে নাই (রে) ॥
বাছিয়া করাইলাম বিয়া কুলীনের ঝি,
নিমাই চান্দ সন্ন্যাসে যায়, বধূর উপায় কি ॥
ঘরের বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া জলন্ত আগুনি।
কতকাল রাখিব মায় দিয়া মুখের পানি (রে) ॥
এমন মগধের দেশে বঞ্চে কেমন জনা,
নিমাই চান্দ সন্ন্যাসে যায় কেউ না করে মানা ॥
বিদেশে বিরাত্রে যার পুত্র মইরে যায়,
অন্য কেহ না জানিতে আগে জানে মায় (রে) ॥ —ত্রিপুরা (১৩৩৬)

১০

কি লাগিয়া আউলাইয়া দিল রে তোর মন,
কি মতে সংসার চলে, বল যাদুধন।
সর্বদা পাগলের মতন ইতি উতি যাও,
ঘরে বইস্যা পড়ুয়া না পড়াইতে চাও।
বিচার না কর তুমি দিগ্বিজয়ী লইয়া,
মুখে না বচন সরে তোমারে দেখিয়া। —মৈমনসিংহ (১৩৩৯

১১

যুগে যুগে মায়ের প্রতি যেই ব্যবহার, তুমি কর্ল্লে বারম্বার,
এত নিত্য ধর্ম, নতুন কর্ম নয়, হে গৌর, তোমার।

কর না, গৌর, এমন ব্যবহার।
হয়ে বামন অবতার, গেলে বলির যজ্ঞাগার
আসবে বলে ব'লে গেলে আসলে নারে আর।
তার কারণ অদিতি করে ঘরে বইস্যা হাহাকার,
কর না, গৌর, এমন ব্যবহার।
হয়ে পরশুরাম অবতার, মাথা কাটলে রেণুকার
যেই মাতা সেই পিতা আছে শাস্ত্রেতে প্রচার,
এমন কাজ কি পুত্রে করে শুইন্যা লাগে চমৎকার,
কর না, গৌর, এমন ব্যবহার।
সেই রাম রূপে ত্রেতা, কাঁদলো কৌশল্যা মাতা
সে সময়ে আমি সঙ্গী ছিলাম রে তথা,
মায়ের চক্ষের জলে বক্ষ ভিজে হয়েছিল শত ধার,
কর না, গৌর, এমন ব্যবহার।
তুমি দ্বাপরে আবার, হ'য়ে পুত্র যশোদার
আমারে লইয়া গেলে কংসের যজ্ঞাগার
মায়ের কাইন্দ্যা নয়ন অন্ধ হৈল সেই গেলে এলে না আর,
কর না, গৌর, এমন ব্যবহার। —ঐ (১৩৩৯)

১২

ব্রজ থেকে আইলেরে তুই হলুদ মে'খে।
ও তুই চাচর চুল মুড়াইলে কপিন পরিলে কার দায় ঠেকে।
ও তুই রাখাল সনে বনে বনে, ধেনু রাখলে বৃন্দাবনে
ও তুই দণ্ড কমণ্ডলু লইলে ছাই মাখিলে কার দায় ঠেকে ?
তোরে চিনেছি রে নয়ন বাঁকা ভঙ্গী দেখে। —ঐ

১৩

তুমি কার ভাবে নদে এসে, হরি হয়ে বস্‌ছ হরি,
তোমার কার অভাবে এমন স্বভাব ধরেছ তাই বুঝতে নারি,
তোমার মা যশোদা রইল কোথা
কোথায় সেই সখীসখা সেই বিশাখা
কোথায় নবীন-গমন জুরী দয়াময় হে।

তোমার গুঞ্জামালা শিকায় তুলা ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম মুরারি
কাঙ্গাল টলে বলে শ্রীরূপচাঁদের যুগল চরণ সাধন করি।
আর ভাবে ধরেছ ভাব, এমন স্বভাব
তাও তো কিছু বুঝতে নারি।
মা যশোদা রইল কোথা কোথায় নবীন রাই কিশোরী॥
—বাঁকুড়া

১৪

নিতাই যদি এই দেশ্তে এল্য
জয় রাধে জয় রাধে বলে নয়ন জলে ভাসিল,
দেশে এইল্য নিতাই,
হরিনামের মালা নিতাইর ঝুলতেছে গলায়।
গৌর নিতাই তারা দুটি ভাই,
পতিত পাবন নিতাই আমার জেতের বিচার নাই।
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ, সবকে হরিনাম দিল।
নিতাই যদি এই দেশেতে এল্য
গোঁসাই পাগলিনী বলে, ওহে শুন দয়াময়,
আমায় অন্তিম কারণে দিও চরণে আশ্রয়।
বুঝি এতদিনে জীবের ভাগ্যে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হল্য।
শ্যামল বরণ স্বপনে আছিল কিবা কিগো পুরুষ রতন
চাঁচর চিকুর কিবা বাঁকা দুনয়ন গো,
বসিয়া শয্যার পাশে দাঁড়াইল মৃদু হেসে
সুচারু গঠন (ও তার),
আমার বসিয়া শয্যার পাশে করি আচমন
মুখে মুখ, বুকে বুক কিবা মধুর মিলন॥
কহিতেছে পাগলিনী শুন, রাধা বিনোদিনী, মোর নিবেদন,
অন্তিম কালে পাই যেন যুগল চরণ॥ —তিলুড়ি (বাঁকুড়া)

১৫

যখন জন্মিলে নিমাই নিমতরুতলে,
হয়ে কেন না মরিলি, না করিতাম কোলে।

না করিতাম কোলে কাঁখে না তুলিতাম বুকে,
অভাগী মায়ের দুগ্ধ না দিতাম চাঁদ মুখে ;
কোথাকার সন্ন্যাসী এসে নভ্যায় করল থান,
সে অবধি নিমাই আমার করতেন আশ যোশ।
বার বৎসরের নিমাই তেরয় না পড়িল,
চৌদ্দ বৎসরের নিমাই সন্ন্যাস সাজিল।
দেখ হে নগরের লোক দেখ বার হই,
নিমাই চাঁদ সন্ন্যাসে যান রাখ বলি কাই।
পাঁজি পুঁথি পড়, নিমাই, পণ্ডিত হবে দড়,
সকলে বুঝাতে পার মায়ে কেন ছাড়। —মেদিনীপুর

১৬

এস অপার গুণের নিধি গৌরাঙ্গ হে।
এস গৌরাঙ্গ হে এস নিতাই হে॥
এস্ অপার গুণনিধি গৌরাঙ্গ হে।
নিজ গুণে দয়া করে গৌর একবার এস হে,
আমরা ভজন সাধন জানিনা গৌর এস এস হে।
গৌর ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নিয়ে একবার এস এস হে
এস অপার গুণনিধি, গৌরাঙ্গ হে। —মুর্শিদাবাদ

১৭

নাম জানি না গৌর বরণ নবীন সন্ন্যাসী।
মুখে রাধা রাধা রাধা বলে, রাধাকুণ্ড তীরে বসি।
নাম জানিনা গৌর বরণ নবীন সন্ন্যাসী॥
মাথাতে তার মোহন চূড়া হাতেতে তার মোহন বাঁশী।
নাম জানিনা গৌর বরণ নবীন সন্ন্যাসী।
দেখলাম দাঁড়ায়ে আছে গো,
তার নাম জানিনা গৌর বরণ দাঁড়ায়ে আছে গো।
আর তো কাউরি নাম জানিনা
মুখে রাধা, রাধা, রাধা বলে
আর তো কাউরি নাম জানে না। —ঐ

১৮

আই দেখি ভাই সবে মিলে হরি গুণ গাই।
এই হরি নামে তরে গেল জগায় মাধায়।
আই দেখি ভাই সবে মিলে হরি গুণ গাই।
এই হরিনাম দুই অক্ষরে ষোল নম্বর দাওনা ছেড়ে
হরে কৃষ্ণ হরে হরে এ নাম বল না কেন ভাই। —ঐ

১৯

হরি বলে আমার গৌর নাচে,
নাচেরে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে ॥
রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর রুনু ঝুনু বাজে।
হরি বলে আমার গৌর নাচে,
রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর দিয়ে গৌর নাচতে লাগলো।
হরি বলে বাহু তুলে গৌর নাচতে লাগলো। —ঐ

২০

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,
এ নাম একবার বল রসনা,
শমনের ভয় আর রবে না,
এ নাম একবার বল রসনা।
এ নাম বললে ভব পারে যাবি,
তোর শমনের ভয় দূরে যাবে।
এ নাম নিতে কেউ ভুলো না।

২১

ভুবন মঙ্গল গাওরে হরি নাম।
এ নাম গাওরে গাওরে গাওরে হরি নাম।
এ নামের সার কেবল ব্রজের গোপাল।
গাওরে হরি নাম।
এ নাম যতই বলো ততই ভাল, গাওরে হরি নাম।

এ নাম গাইতে গাইতে ব্রজে চলো

গাওরে হরি নাম।

ভুবন মঙ্গল গাওরে হরি নাম। —ঐ

২২

নিমাই কেন্দে বলে,

বিদায় হইলাম, মা জননি, তোমার চরণ কমলে।

একবিন্দু দুধের ধার, মাগো, শোধিতে না পারি,

মায়ের বুকে হেনে ছুরি হইলাম দণ্ডধারী।

কাল ঘুমে রয়েছ, মাগো, ডাকি শুন না,

এ জনমের মত দেখা আর ত হবে না।

বনে থাক, পশুপাখী, শুন মোর বাণী.

তোমরা সবে প্রবোধ দিও কান্দিলে জননী।

মা মা বলিয়ে আমি, চলিলাম বৃন্দাবন,

নিমাই বিনে অভাগী মার অসার জীবন।

—মৈমনসিংহ (১৩৩৭)

২৩

ও দিন গেল রে, মন গৌর বলে ডাক।

ওরে তুই গৌরনামে করলি হেলা,

(হেলায় হেলায় দিন ফুরাল)

ওরে তোর দাঁড়াবার স্থান নাই গাছের তলা।

ওরে তোর ভবের বাসা দিন দুই চারি,

(চিরদিন হেথায় রবে না)

এখনও তোর ঠিক হ'ল না আপন বাড়ী।

ওরে তুই আর কি এমন জনম পাবি,

(দুর্লভ জন্ম বৃথা গেল)

ওরে তুই মইলে কি আর মানুষ হবি।

ওরে একবার গৌর বল মন-রসনা

(ভক্তিভরে উচ্চ স্বরে)

এ ভবে মানব জনম আর হবে না। —ঐ (১৩২২)

২৪

গৌর প্রেমসাগরে, প্রেমসাগরে সাঁতার খেলে,
ওগো আমি মরমে মজিয়ে থাকি সই।
ও সে যে গৌর-প্রেমতরঙ্গ নদী,
(ও গো ওগো প্রাণসখী গো)
সে নদীর ধারা বহে নিরবধি সই।
ও সেই গৌরপ্রেম কলঙ্কের ডালি,
সে ডালি সদায় রাখি মাথায় তুলি সই। —ঢাকা (১৩২২)

২৫

কোথা ছিলা ওহে গৌর (তোমায়) চিনতে পারি না।
তুমি যে ভাবেতে ব্রজে ছিলে তোমার সে ভাব দেখি না॥
ছিলা হে রাখালের সখা,
অনেক দিনের পরে দেখা, দুনয়ন বাঁকা,
তোমার চিহ্ন আছে নয়ন দুটী তোমায় ভুল্‌তে পারি না॥
শিরে নাই মোহন চূড়া,
গলে নাই বনফুলের মালা, করে নাই বাঁশী,
তুমি কটিতে কৌপীন পরিলা, তোমার ভঙ্গী বুঝি না॥
তুমি ছিলা মূল বিবাদী,
রাই হইল দরখাস্তের বাদী,
এই মোকদ্দমা,
আমি গরমিয়াদী হইয়া থাকি রাইয়ের প্রেমের জেলখানা॥
কোথা ছিলা, ওহে গৌর, চিন্‌তে পারি না॥ —ঢাকা (১৩২১)

২৬

বলয়ে গৌরাঙ্গ রসময়, অ তোর হাতের সম্বল,
পথের বেসাত রে, এরে কিছু নিতে হয়॥
তোরে পারের মাঝি ডাক্‌বেরে নিশ্চয়,
অধর ঘাটে সদর খেওয়া খাজনা বাদে বয়;
পারে যেতে হবে একা পথে রে, টাকা কড়ির কার্য নয়॥
ভবনদীর তিনটি ধারা হয়,

লাল নীল শ্বেত ধারা তিন ধারে বয় ;
ঘাটে মাঝি আছে নিত্যানন্দ রে, নামের কড়ি পেলে লয় ॥
ভবনদী পাড়ি দেওয়া মুখের কথা নয়,
মূলাধারে হরিদাস মানব জ্যোতির্ময় ;
যদি পাড়ি ধর ভবসাগরে, নিস্‌বিকারী হইতে হয় ॥ —ঐ (১৩২৬)

২৭

মইলাম গো সই গৌর অনুরাগে।
মনোহর রূপ আমার হিয়ার মাঝে জাগে ॥
একদিন আমি ঘুমের ঘোরে, গৌর গৌর বল্লাম মুখে গো—
গুরুজনা দাঁড়াইল সম্মুখে ;
ওগো, আমি ছল করে কই জ্বর হইয়াছে,
গুরুজনার আগে ॥
ঘরে পরে দেয় যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণায় প্রাণ বাঁচে না,
গৌর কথা কইতে, পড়ে মনে ;
ওগো আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ,
আমার তাই ভাল লাগে ॥
ওগো, আমি একদিন গিয়েছিলাম সুরধনী,
দংশিল গৌরাঙ্গ ফণী,
সে হতে মোর পুলকিত অঙ্গ;
তারে শুইলে স্বপনে দেখি, জাগিলে সে জাগে ॥ —ঐ

২৮

ব্রজের মনচোরা শ্যাম গৌর হইল নদীয়ায়।
সে যে রাই রূপে ছাপাইয়া অঙ্গ, হরি বলে (সবার) মন ভুলায়।
তা না হইলে এমন কার্য কে করিতে পারে,
নদীয়াবাসী সব পাগল করে ;
গোরারে যে দেখে সে গৃহ ছাড়ে
হরি বলে সঙ্গে যায় ॥
করে মোহন বাঁশী ধরি, ভুলাইতে কত ব্রজনারী,
এবে নিতাইচাঁদকে সঙ্গে করে যারে তারে হরিনাম বিলায় ॥

চাঁচর কেশ মুড়ায়ে ক্ষীণ কটীতে কপ্নি পরে,
ভিক্ষার ঝুলি কান্ধে করে, হরিবল, হরিবল বলহরি বলে,
নামাবলী দিছে গায় ॥ —ঐ

২৯

শুধু মুখের কথায় গৌরচাঁদ কি মিলে,—
দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, না ভাবিলে ॥
গৌর প্রেমের প্রেমিক যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা,
তারা জানে গৌরচান্দের লীলে ;
গউর কথা বিনে কথা কয় না এ প্রাণ গেলে ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে, সাধন দিল বহু মতে,
কত মতে কত না সাধিলে ;
কত মুনিঋষি রূপ ভাবিয়ে প্রাণ ত্যজিলে ॥
যে দেখেছে একবার জীতে না পাশরে আর,
তারাই জানে গৌর লীলে ;
তারা গউর গউর গউর বলে, ভাসে নয়ন জলে ॥ —ঐ

৩০

গউর রূপে যে ভুইলাছে প্রবোধ না মানে।
রূপ বিহনে ধৈরয ধইরে, গৃহে রয় সে কেমনে।
গউর-রূপ কাল ভুজঙ্গে দংশন করে যার অঙ্গে তার প্রাণ জানে ;
ওগো, বিষের জ্বালায় হইয়ে জ্বালাতন, বারিধারা নয়নে ॥
জ্ঞান চৈতন্য হইয়ে হারা, সদাই দেয় রূপের পাহাড়া নয়নের কোণে ;
তারা জীবন যৌবন ধর্মকর্ম অর্পণ করে চরণে ॥
অধীনের নাই সে রতি,
কিসে গউর হয় প্রাণপতি, ঐকান্তি বিনে ;
আমি মায়া ধান্ধায় লেগে ধান্ধা
ফির্‌তেছি বনে বনে ॥ —ঐ (১৯২৭)

৩১

পাষাণ মন, তুমি রইয়াছ ভুলিয়ে ;
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বলে যাও না বাহির হইয়ে রে ॥

সোনা কিন্‌তে আস্‌লাম ভবে, সোনা হইল সীসা ;
যখন দেহ হবে হত, কেউ না পাবে দিশা রে ॥
বাজারে নাই মানুষ, খড় চালে চালে ;
অন্ধেতে পেতেছে দোকান খরিদ করে কালে রে ॥
ডাইনে গঙ্গা, বামে যমুনা ঠেক্‌লাম বালুচরে ;
এমন বান্ধব নাই গো কেহ, ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে ॥
জলে কান্দে পানি কাউর, গাছে কান্দে টীয়া ;
বৃন্দাবনে গোপী কান্দে রাধাকৃষ্ণ বৈলা রে ॥ —ঐ (১৩২৬)

৩২

মন, মানুষের সঙ্গ ধর, বরণ কর, বরণ হবে কাঁচা সোনা।
ঘটে ঘটে আছে রে মানুষ কেহ নয় রে একা,
কোন ঘটে বিকশিত কোন ঘটে কল্লি ঢালা ॥
আছে রে এক বেহাল মানুষ নবদ্বীপে কর্‌ছে খেলা ;
তারে ব্রহ্মায় না পায় ধ্যান করিয়ে
জীবে কি বুঝিবে লীলা ॥ —ঐ (১৩২২)

৩৩

গৌর কল্প বৃক্ষমূলে বৈস গা যা, রে মন,
সেই না বৃক্ষের ডালে ডালে নানাবিধ ফল ফলে।
খায় ভক্তজন কোকিলে অভক্তে না পায়।
সেবারে তুই কি করিলি, সুধা ঠেলে গরল খাইলি।
বিষে অঙ্গ জ্বালাইলে লইলি না বৃক্ষের হেলন।
সেই না বৃক্ষের লাগলে ছায়া
শ্রীগৌরাঙ্গের হবে দয়া
ঘুচে যাবে নিত্য মায়া তত্ত্বজ্ঞানেতে।
পাপ তনু হবে নষ্ট ঘুচে যাবে মনঃকষ্ট
নয়ন ভরে দেখ্‌ছি স্পষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল চরণ ॥ —রাজসাহী

৩৪

গৌর সুন্দর নটবর ভুলিব কেমনে।
ভুলি ভুলি মনে করি জাগে শয়নে স্বপনে ॥

যে দিকেতে চাই গৌর দয়াময় হেরি গো নয়নে।
গৌরাঙ্গেরি গুণ সদা সর্বক্ষণ পড়ে গো মনে ॥
বিজলী ছাঁটিয়ে কত রস দিয়ে
ও তোর মুখে মৃদু হাসি
কত সুধারাশি ঐ চাঁদ বদনে ॥
গোঁসাই ভগবানে কয়, গৌর দয়াময়
নিদয় হয়েছ কেন হে। —ঐ

৩৫

যা কর, গৌরাঙ্গ হরি, আমি তোমায় ছাড়িব না।
কার কাছে যাব, গৌর, আমারে কেউ লবে না ॥
কত পাপী উদ্ধারিলে কত লীলা প্রকাশিলে
আচণ্ডালে প্রেম বিলালে আমারে শুধালে না।
অনন্ত কয় আমার মতন জগতে নাই পাপী এমন
পতিত-পাবন তুমি কেমন এইবারে যাবে জানা ॥ —নদীয়া

৩৬

চরণ তরী দাও, হে গৌর হরি।
আমি পড়েছি ভব-সাগরে উপায় না হেরি ॥
কামাদি ছয় রিপুদলে সঙ্গে সঙ্গে সদাই ঘুরে
আমায় কখন কি বিপদে ফেলে ভেবে ভেবে মরি।
অধর্মেতে সদা মতি তোমাতে না হৈল রতি
আমি হাতে তুলে গরল খাই সুধা পরিহরি ॥
অধম পতি কী জনে দয়া কর নিজ গুণে
আমি তাইত ডাকি কাতর প্রাণে কৈর না আর দেরী।
মহাপাপী তরাইতে গৌর হৈলে নদীয়াতে
দীন বিষ্ণুরে না তরাইলে কলঙ্ক তোমারি ॥ —ঐ

৩৭

চাঁদ দুলাল সস্তায় হাটে বিকায় প্রেম রতন।
ও হাটে মিলে অনুরাগী দুই একজন ॥

এই প্রেমের হাটে চাঁদ দুলাল এসে খুলেছে কপাট।
দুঃখী তাপিত যত ছিল দেখে নিল প্রেমের হাট ॥
হাটে ঘাটে গোঠে মাঠে বাজে প্রেমের জয় ঢোল।
হাটে বিকায় প্রেম রতন নাম যে তার চাঁদ দুলাল ॥ —ঐ

৩৮

ওরে সোনার যাদুধন,
মায়ের প্রাণে দিস্‌না বেদন।
ওরে নিমাই, ত্যাজি নিবাস,
তুই বুঝি হবি সন্ন্যাস রে !
নয়নতারা হইলে হারা
থাকবে কি আমার দেহেতে জীবন ॥
নব যোগী রূপ ধরেছে
কটিতে কৌপীন পরেছে রে
আর গায়ে ছেঁড়া কাঁথা নাড়া মাথা,
দণ্ড কমণ্ডুল করেছে ধারণ ॥
গৌর অঙ্গ তপন জিনি
তাতে ধূলা সাজবে কেন রে,
তোর বেশ দেখে হায়, বুক ফেটে যায়,
কোন্ পাষাণে করেছে এমন।
আমি রে তোর মা জননী
হয়ে রব চিরদুখিনী রে,
আমার ঐ মনস্তাপ ক্ষীর ননী, বাপ,
বল রে কবে করাব ভোজন।
প্রতিদিন সকাল হলে ডাকবে আর কে মা, মা বলে
দীন নরোত্তম ভণে, বাছা তোর বিনে
দিবসে আঁধার হবে যে ভবন। —ঐ

ঘ

ঘটনামূলক সঙ্গীত

অনেক সময় সমসাময়িক বহু ঘটনা অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত রচিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে যেমন উচ্চ কাব্যগুণ প্রকাশ পাইতে পারে না, তেমনই সমসাময়িক কালের সীমা অতিক্রম করিয়া ইহারা বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারে না। লোক-সঙ্গীতের যে আর একটি প্রধান বিশেষত্ব, অর্থাৎ ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া চলা, তাহাও ইহার মধ্যে সম্ভব হয় না। কারণ, প্রত্যক্ষ ঘটনার কোন ক্রমবিকাশ নাই। ঘটনার স্মৃতি লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উপর হইতে ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া রচিত সঙ্গীতের প্রভাবও স্বাভাবিক ভাবেই লুপ্ত হইয়া যায়।

ঘটনামূলক সঙ্গীতকে প্রধানতঃ চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত ঐতিহাসিক ঘটনামূলক, দ্বিতীয়ত সামাজিক ঘটনামূলক, তৃতীয়ত ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনামূলক এবং নৈসর্গিক ঘটনামূলক। যে সকল বৃহত্তর রাজনৈতিক ঘটনা ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইয়া থাকে, যেমন, পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহী যুদ্ধ, ছিয়াত্তরের ও পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশবিভাগ ইত্যাদি বিষয় অবলম্বন করিয়া সমসাময়িককালে বহু লোক-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। অনেক সময় রচয়িতার মুখ হইতেই তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কচিৎ কোন সঙ্গীত যদি কোন বিশেষ কারণে জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তবে তাহা কিছুদিন পর্যন্ত প্রচারিত থাকিবার পর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে একটি কথা এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত বৃহত্তর রাজনৈতিক কোন ঘটনার সঙ্গে সমাজ-মানসের খুব নিবিড় যোগ ছিল না। সেই জন্য বাংলাদেশে রাজা-বাদ্‌শাদিগের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার লইয়া যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হইয়াছে, তাহার কোন প্রেরণা লোক-মানসে সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। সেইজন্যই ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া বাংলা দেশ বিশেষ কোন সঙ্গীত রচিত হয় নাই।

সামাজিক ঘটনার প্রভাব বরং সমাজ-জীবনের উপর এককালে রাজনৈতিক ঘটনা অপেক্ষা অধিক ছিল। সেইজন্য রামমোহনের সতীদাহ প্রথা নিবারণ

বিষয়; কিংবা বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত সঙ্গীতের সংখ্যা অধিক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাহাও হয় নাই; কারণ, এখানেও একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। যে সাধারণ মানুষের সমাজ লোক-সঙ্গীত রচয়িতা কিংবা লোক-সঙ্গীতের পরিপোষক, সেই সমাজের মধ্যে সতীদাহও যেমন নাই, বিধবা-বিবাহেও তেমনই কোন নূতনত্ব নাই। সেইজন্য এই সকল সামাজিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত সঙ্গীতের সংখ্যা যে খুব বেশি, তাহাও নহে।

সমাজের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়া কোন কোন সময় যে সঙ্গীত রচিত হইয়া থাকে, তাহাকে ব্যক্তিগত ঘটনামূলক সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করা যায়। কিন্তু সেই ব্যক্তির স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এই শ্রেণীর সঙ্গীতও লুপ্ত হইয়া যায়। কিছুদিন পুর্বে পুর্ববাংলায় বিশেষত ঢাকার ভাওয়াল পরগণা ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চল-সমূহে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর ঘটনা অবলম্বন করিয়া বহু গীত রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে তাহা আর শুনিতে পাওয়া যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'নীল-দর্পণ' নাটকের জন্য যে মানহানির মোকদ্দমায় রেভাঃ লঙ্‌ সাহেবের কারাদণ্ড হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়াও সমসাময়িককালে কিছু সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই ইহাদের আবেদন একান্ত সমসাময়িক এবং ইহাদের মধ্যে কোন চিরন্তন সাহিত্যিক আবেদন প্রকাশ পায় নাই বলিয়া ইহারা কোন দিক দিয়াই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেমন ভূমিকম্প এবং বন্যা ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত রচিত হইয়া থাকে। তাহা প্রধানত আঞ্চলিক। কারণ, বন্যাই হোক, কিংবা ভূমিকম্পই হোক, ইহাদের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বাংলার সর্বত্র এক এবং অভিন্ন নহে। এক অঞ্চল যখন বন্যায় ভাসিয়া যায়, অন্য অঞ্চল তখন অনাবৃষ্টির জ্বালা ভোগ করিতে থাকে। সুতরাং ইহাদের আবেদন কেবল সমসাময়িকই নহে, আঞ্চলিকও বটে; তথাপি বাংলার লোক-সঙ্গীতের নিদর্শনরূপে ইহাদের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যায়।

ঐতিহাসিক ঘটনামূলক বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে এক শ্রেণীর সঙ্গীতের মধ্যে একটু মানবিক অনুভূতির স্পর্শ অনুভব করা যায়; তাহা নারীহরণের গান বলিয়া উল্লেখ করা যায়। কতকগুলি নারীহরণের গানে মধ্যযুগে আরাকানের

জলদস্যুরা নৌকাপথে আসিয়া যে প্রধানতঃ নদীতীরবর্তী গ্রামগুলি আক্রমণ ও লুঠতরাজ করিত এবং যুবতী নারীদিগকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইত, তাহার বেদনা একটি বিলীয়মান স্মৃতিরেখার মত আজও অস্পষ্ট হইয়া আছে। বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহার কথা লিখিত আছে। বহু সম্ভ্রান্ত বংশের কুলপঞ্জীতে 'মঘেন নীতা দুষ্টা কৃতা' বলিয়া ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকগণও তাঁহাদের ইতিহাসের পাতায় বাঙ্গালীর এই বেদনা ও লজ্জার কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে ইহার প্রতিধ্বনি বাজিয়াছে—

১

আগে নায়ে রিমি ঝিমি,
আমার পাছা নায়ে পানি,
ও—আমি ক্যান্ বা আইলাম নাইতে।
আস্তে আস্তে মা—রো বইঠা,
ওই যে আমার পতির কান্দন শুনি।
ও—আমি ক্যান্ বা আইলাম নাইতে!
একো ডুবে দু'য়ো ডুবে তিনো ডুবের কালে,
কোনঠিকার এক ময়ফুল রাজা আস্থা তুল্যা লিলো নায়ে।
ও—আমি ক্যান্ বা আইলাম নাইতে।
কান্দো না কান্দো না, পতি, চিত্তে লেও ক্ষেমা,
বাক্সে ভরা রইলো রে গয়না ফির‍্যা কইরো শাদি!
ও—আমি ক্যান্ বা আইলাম নাইতে! —রাজসাহী

২

পিঁড়ির উপর বস্যা কি লাল তোতা
শীষের যত্ন করে না রে কে।
শীষের যত্ন কর‍্যা কি লাল তোতা
যায় যমুনার ঘাটে না রে কে।
মরো মরো মরো কি রাজার ছেলে
গোছল কর‍্যা উঠি না রে কে।

অমন সুন্দর কন্যা দেখি
শীষ ক্যান খালি না রে কে !
আমার নৌকায় আইলে কন্যা,
শীষের মানান দিব না রে কে !
ওই না কথা বুল্লে রাজার ছেলে
দ'য়ে ঝাঁপো দিব না রে কে।
জাল্যার জলে ছাঁক্যা কি কন্যা,
ত্যাশে লয়্যা যাব না রে কে।
ত্যাশে লয়্যা গেলে কি রাজার ছেলে,
বাপ-মা হারা হ'ব না রে কে।
মরো মরো মরো কি রাজার ছেলে,
গোছল কর্যা উঠি না রে কে।
মরো মরো মরো কি রাজার ছেলে,
কলস ভর্যা উঠি না রে কে। —ঐ

৩

কাঁখে কলস কৈরা গো রমণী
যায় যমুনার ঘাটে না রে কে।
যমুনার ঘাটে যায়্যা গো রমণীর
সদাগরের সোঁতে দেখা না রে কে।
সরিয়্যা নোকা বান্ধো গো সদাগোর,
কলসী-ভরিয়্যা উঠি না রে কে।
এত সুন্দরী রমণী গো তুমি,
সিঁথ্যা লাগেরে খালি না রে কে।
একটি জবাব কর গো রমণী,
সেন্দুর পর্যাইয়া দিই না রে কে।
আমার সেন্দূর আছে গো সদাগোর,
বাপো-মায়ের ঘরে না কে।
সরিয়্যা নোকা বান্ধো গো সদাগোর,
কলসী ভরিয়্যা উঠি না রে কে॥ —ঐ

৪

সাহান-বান্ধা ঘাটে বরণী গোসল করিতে
ছাড়িয়্যা দিলে কেশের খোঁপা গো,
সোনার বরণী আমার রে! ধুয়া।
কোথা থাইক্যা আইস্যা রাখাল ভাই
ধরিয়্যা লিলে কেশের খোঁপা গো,
সোনার বরণী—আমার রে!
তাড়াতাড়ি যায় বরণী কামার ভায়ার বাড়ি গো,
সোনার বরণী আমার রে!
কিও কাইজ্জো কর, কামার ভাই, লিচেন্দে[1] বসিয়্যা গো,
সোনার বরণী আমার রে!
তাড়াতাড়ি দাও কামার ভাই, ইসোপাতের ছোরা গো,
সোনার বরণী আমার রে!
সেই ছোরা লিয়্যা বরণী সাঁন্ধায় ভিটার ঘরে[2] গো,
সোনার বরণী আমার রে!
শ্বশুর আইস্যা বলে, বরণী, কিবা ঘটনা ঘট্যাচ্ছে গো,
সোনার বরণী আমার রে!
ভাশুর আইস্যা বলে, বরণী, চিঠি ক্যানে ল্যাখে নি গো,
সোনার বরণী আমার রে!
স্বামী আইস্যা বলে, বরণী, টেলিগ্রাম ক্যানে কর নি গো,
সোনার বরণী আমার রে!
আমার বরণীকে গোসল করায় চল্লিশ কল্‌সীর পানিতে গো,
সোনার বরণী আমার রে!
আমার বরণীর নামাজ পড়ে ফুল বাগিচ্যার মাঝে গো,
সোনার বরণী আমার রে!
আমার বরণীর গোর হয় জালি বাগানের কান্দায়[3] গো,
সোনার বরণী আমার রে! —ঐ

১। নিশ্চিন্তে ২। প্রধান ঘর; শয়ন-ঘর
৩। কাঁধে; এখানে পার্শ্বে।

৫

গাড়ু গামছা তৈলের বাটি রে খৈলের বাটি রে সাথে।
স্নান করিতে আইলাম একা, পদ্মা নদীর ঘাটে॥
আগে যদি জানিগো আমি, মাখম রাজা গো ঘাটে।
আগে পিছে দাসী লইয়া চল্‌তেম স্নানের ঘাটে।
আমি কি করি?

এক ডুব দুইয় ডুবরে তিন ডুবের গো কালে।
কোথা থেইকা মাখম রাজা কেশে ধইরা তোলে॥
আমি কি করি?

খাটখুট মাখম রাজা গো মুখে চম্পা গো দাড়ী।
কমলায় ধইরা নদী দিল পাড়ি॥
আমি কি করি?

জাল বাও জালুয়া, ভাইরে, জালের কোনারে ব্যাকা।
তোমার জালে নি উইঠাছে রে, নারীর হাতের শাঁখা॥
আমি কি করি?

হাল বাও হালুয়া, ভাইরে, হাতে সোনার রে লড়ী।
এইপথে নি দেখছ যাইতে আমার কমলা সুন্দরী॥
আমি কি করি?

আগের নায় ঝামুর ঝুমুর রে পাছের নায় রে বাত্তি।
ধীরে সুস্থে বাইও নৌকা আমি পতির কান্দন শুনি॥
আমি কি করি?

কেইন্দো না কেইন্দো না পতি রে, আমার মায়ারে ছাড়,
বাক্স ভইরা থুইছি টাকা আরেক বিয়া কর॥
আমি কি করি?

আম ধরে থোবা থোবা রে তেতুল রে ব্যাকা।
আপনি পতি বৈদেশ হইল, আর না হইল দেখা॥
আমি কি করি? —ঢাকা

এখানে বামনায় বলিতে বেঁটে আকৃতির মগদস্যুকেই মনে করা হইয়াছে

৬

বামনায় লইয়া যায় বৈদেশী বন্ধুয়ার নায়।
আরে, কইও কইও কইও গো খপর গো শ্বশুরের আগে,—
আমারে যেন তালাস করে গাঙ্গের কুলে কুলে রে।
আরে, কইও কইও কইও গো খপর শাশুড়ীর আগে ;
কোলের ছাওয়াল শুইয়া রইছে মশৈরের তলে রে।
আরে, কইও কইও কইও গো খপর ননদীর আগে,—
অখন যেমুন কাইজা করে জলের কল্সীর লগে রে।
আরে, কইও কইও কইও গো খপর সোয়ামীর আগে,
হালের বলদ বেইচা যেন আরেক বিয়া করে রে। —ঢাকা

সর্বক্ষেত্রেই অপহৃতা পত্নীরা তাহাদের পুনরুদ্ধারের সকল আশা বিসর্জন দিয়া স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিবার পরামর্শ দিয়া যাইতেছে দেখা যায়। ইহাতে স্ত্রীচরিত্রের একটি সম্পূর্ণ নূতন দিক প্রকাশ পাইয়াছে।

দেশে যখন মগ দস্যুর উৎপাত চলিতেছিল, তখনও নারীরা কেন যে একাকিনী নদীর ঘাটে স্নান করিতে আসিত, বুঝা যায় না।

৭

বাড়ীর মধ্যে পুকুর ছিলো চান করিতাম ভালো,
ও ভালো, গাঙের ঘাটে চান করিতাম আমায় মগে ধরে নিলো।
আমি কেনে বা আইলাম চান করিতে॥
এক ডুব দুই ডুব্ তিনো ডুবুর কালে,
মাছরাঙা, কয়ো খবর আমায় তুল্লো নায়ের পরে।
আগা নৌকা ঝামুর ঝুমুর পাছা নৌকা হাসি,
ও আমি কেন বা আইলাম চান করিতে॥
সাক্ষী থাকুক গাড়ু গামছা আরো তেলের বাটি,
প্রাণপতিরে কইও খবর গাঙে দিইলো ভাটি।
আমি কেন বা আইলাম চান করিতে॥

হালো শশো, হালো ভাইরে, হাতে সোনার নড়ি,
প্রাণপতিরে কয়ো খবর ঘাটে রইল চুলের দড়ি।
জালো বাওরা জালো ভাইরা জালে বাঁধা পোনা,
প্রাণপতিরে বিয়ার কথায় কেউ করো না মানা।
গরু রাখো রাখাল ভাইরা হলদি বনের মাঠে,
প্রাণপতিরে কয়ো খবর যেন আরেক বিয়া করে। —খুলনা

৮

এক ডুব দুই ডুব তিন ডুবের কালে,
কোথাকার এক মাথম রাজা পান্সী বান্‌ল ঘাটে রে,
আমি কি করি।
এক ডুব দুই ডুব তিন ডুবের কালে,
চুলে মুইঠ্যা ধইরা রাজা উঠায় লৌকার পরে রে,
আমি কি করি।
আগা লৌকায় ঝামুর ঝুমুর পাছা লৌকায় ছায়া,
ধীরে সুস্থে বাইও লৌকা আমি পতির ক্রন্দন শুনিরে,
আমি কি করি!
কাইন্দনা কাইন্দনা, পতিরে, না কান্দিও আর,
ঘরে আছে অষ্ট অলঙ্কার তুমি আরেক বিয়া কইর রে,
আমি কি করি। —ফরিদপুর

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে পলাশীর যুদ্ধের কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে। ইহাতে নবাব সিরাজুদ্দৌল্লাকে লম্পট বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

৯

কি হলো রে, জান।
পলাশী ময়দানে নবাব হারাল পরাণ॥
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে র'য়ে,
একলা মীরমদন বল কত নেবে স'য়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি, লাল কুর্তি গায়,
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীরমদনের পায়॥

কি হলো রে, জান।
পলাশী-ময়দানে নবাব হারাল পরাণ॥
নবাব কাঁদে, সিপুই কাঁদে, আর কাঁদে হাতী,
কল্‌কাতায় বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী॥
কি হলো রে জান।
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী-নিশান॥
মীর্জাফরের দাগাবাজী নবাব বুঝলে মনে,
সৈন্য সমেত মারা গেল পলাশী ময়দানে॥
নবাব বড় সোহদা ছিল, আর লম্পটে,
ইতিমধ্যে গালেব এসে পৌছিল সে ঘাটে॥
কি হলো রে জান।
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী-নিশান॥
ফুলবাগে নবাব ম'ল, খোসবাগে মাটি,
চাঁদোয়া টাঙ্গায়ে কান্দে মোহনলালের বেটি॥
কি হলো রে জান।
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী-নিশান॥ —মুর্শিদাবাদ

মহারাজ নন্দকুমার রায়ের ফাঁসির কথা এখানে শুনিতে পাওয়া যাইবে—

১০

নন্দকুমার রায় ছিল বাঙ্গালার অধিকারী।
হেষ্টিংস সাহেব এল জান করিবারে বারি॥
নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ গাঙ্গের পানে চেয়ে।
আর না আসিবে বাছা জোড়া ডিঙ্গি বেয়ে॥
খোপেতে কৌতর কাঁদে, কাঁদে ফোয়ারায় হাঁস।
যোড়া বাঙ্গালায় কাঁদে সোনার গুল্‌তি বাঁশ॥ —ঐ

১৯০৫ সনের লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গবিভাগ এবং তৎকালীন বিদেশী বর্জন লইয়া নিম্নোদ্ধৃত গানটি রচিত হইয়াছে—

১২

হুন ছিলিম চাচা, আইজ এ্যাক তুক্কুর হইয়া কৈবার চাই—আই-আই।
ত্থাশে এ্যাক বাও যে আইছে, যিবা চন্‌কা হিবা বইছে
বিলাইতি আর বোলে কিনন নাহি নাই—আঁই-আহাঁ আই॥

কৎজুনা[1] নাট বাহাদুর দিছে পরাণা
বেবাক্ পরজা মুনীর কৈল্ল তালকানা
এহন কুম্পুনীর মল্লুক গ্যাল্ কুঠ্ ঠাইকার কুন্ আসামো নিয়া
করবো খাজনা—আয়-আহা-আ ॥

বাংলা মল্লুক বোর জবর,
এহানো বাপ দাদার হইছে কবর,
খবরাখবর কত বাতশা করছে আজিত্বি-ই-ই—
এহন কুম্পুনী যাব কাবু অইয়া
খাজনা করবো ছত্রান অইয়া[2]
মোহারাণীর আজিত্বে বাই ইকি বিকিত্তি[3]—ইয়-ইহী-ইঃ ॥

জগন্নাথ্ গুঞ্জ জাহাজ গাট আছে,
হেই জাহাজো যাওন সহরে,—
ছিলট পিছ্ছিল হিলং মিল—অং-অং
কুন্ঠাই নিবো আমাগরে-এয়-এহে-এ।
হে যে সহর অইলে গো জর
প্যাটে অগ্টানা দরে,—এ, এ—
দিক্কে, অইল বালা ও নাজির বাই, গো—ও—
এ্যাহন নামানী[4] হাইল্লো ফিলাই লইয়া
আইওগো গরে—এয়-এহে-এ ॥

য্যাত মুন্সী মৌলায় করছে কুমুটি
হুনাহুন্ হুনলাইম এঠাইতি
আরাম য্যাত নিমক চিনি কাপইর বিলাইতি—ইহী-ঈ।

ধুয়া : তোবা তোবা, ইকি করছি,
না জাইনা কি জক্মারি এহান কওছেন কি করি—ই-ই ;
কিরিস্তানে জাইত মাইরা ন্যায়, মরণ নাই, কইলজা হয় বারি
ইয়-ইহী-ঈ ॥

১। বর্জন? অথবা কতজন? ২। ঠাঁই ঠাঁই, বা বিচ্ছিন্নভাবে। ৩। বিকৃতি অথবা বৈচিত্র্য কিংবা বিকীর্তি। ৪। ওলাওঠা।

কেয়ামতে কি দিমু জোবাব,—আহায়—আব,—
হ্যাশে বোলে কল অইতাছে,
হে হান থনে কাপইর চিনি আইবো হবাকার—আর-আহা-আর ॥
নোয়ার হান্‌কী মোরা আছে য্যাত,
বাইঙ্গা চুইরা ফালাও পথত,
মাও বহিন বিরাদার সজন
বাৎথাও উইন্টা পাতাতো—ওহো—ও।
আমিরুল্লা চইক্ষু খাইছ তেরশ ও বার সমেতে—বোর দুক্ষু মোনেতে।
ই সন বোর অইল গো রানি,
গেরাম গেরাম বোরই নামানী—ই—হীঃ।
পানীর তলে উইন্টা গাল গো কুম্পুনীর মুল্লুক—উয়—উহু—উক্‌।
আমীরুল্লার হোলান দুক্‌
দিনে দিনে কি ব্যান্‌ আইল্‌,
জাইত জমিন জাহান গেল,
এ্যাদ্দিন বুইন্দার আগুন দিয়া নিজে পুড়ছি নিজের মুক্‌—উক্‌—উক্‌—
এ্যাহন ছেত্তুর পুইরা নিমক খাইও, জিন্দিগীৎ না অইব চুক।

—টাঙ্গাইল (মৈমনসিংহ)

ইহা ১৯০৭ সনে (১৩১৩ বঙ্গাব্দে) সংগৃহীত হইয়াছিল (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৩, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ১৪৩-৪৪)। ১৯৪৭ সনের দেশবিভাগের ফলে বাস্তুত্যাগের যে সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়াও বহু লোক-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। একটির নিদর্শন এই।

১৩

আঁরে বাড়ীঘর কারে দিতাম ?
আঁরে ক্যান ভুতে পাইয়ে হিন্দুস্থান যাইতাম।
অ্যাডে আছে দুয়া ধেওন গাই,
উগ্যার দুধে খরচ চলে,
আর উগ্যার দুধ খাই।
লোকের কথা শুন্যি হিন্দুস্থান যাই,
হ্যাডে গেলে কি খাইতাম ?

অ্যাডে আছে, খেতে তরকারী,
ফইর ভরা মাছ আছে।
ভাই, সুখে খাইত্ পারি।
আটা রুটি, জাউ খেচুরী,
কিইল্যাই জান হারাইতাম।
যারা হেন্দুস্থান গিইয়ে,
স্বরাজের আলোনদোলনে, জায়ন হারাইয়ে।
লোকের কথার ভাব না বুঝি,
কিই ল্যাই দুখের বারমাইস্যা গাইতাম। —চট্টগ্রাম (১৯৫৬)

ঘরের গান

পল্লী-সঙ্গীতকে সাধারণতঃ দুইটি স্থূল ভাগে ভাগ করা যায়, ঘরের গান ও বাইরের গান। ঘরের গান বলিতে ইংরেজিতে indoor song বুঝাইতে পারে এবং বাহিরের গান বুঝাইতে সাধারণত outdoor song বুঝায়। গৃহের মধ্যে কিংবা গৃহের আঙ্গিনায় একসঙ্গে যে গান গাওয়া হয়, তাহাই ঘরের গান এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে কিংবা জনশূন্য নদীর বুকে নিঃসঙ্গ গায়ক যে গান গাহে, তাহাই বাহিরের গান। ঘরের গান সাধারণতঃ সমবেত মেয়েলী সঙ্গীত, তবে কোন কোন সময় তাহা পুরুষেরও সঙ্গীত হইতে পারে। উৎসবে পার্বণে সাধারণতঃ গৃহাঙ্গিনায় সমবেত ভাবে এই গান গাওয়া হয়। তবে বিবাহের জল ভরিবার মেয়েলী গীত নদী কিংবা পুকুরের পথে সমবেতভাবে গীত হয়, তাহা হইলেও গৃহেরই প্রয়োজনে তাহা গীত হয় বলিয়া তাহাকেও ঘরের গান বলিয়াই উল্লেখ করা যায়।

ঘরোয়া গীত

গার্হস্থ্য জীবন-বিষয়ক বাস্তবধর্মী লোক-সঙ্গীতকে কোন কোন সময় ঘরোয়া গীত বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে মনে হয় কোন অপহৃতা সন্তানবতী নারীর নিজের গৃহ-সংসারের জন্য বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে।

১

না খাওয়াইলাম ছাওয়ালে দুধ,
না দেখিলাম তার চন্দ্রমুখ,
না কহিলাম স্নেহরসের কথা রে।
যখন শিশু ক্ষুধায় জ্বলে কাঁদিবে মা-মা বলে
দেবতার প্রাণে নিশ্চয় বাজিবে রে।
সঙ্গের সাথীরা ভাই, কইও তার ঠাঁই
দুধের শিশু রাখিতে যতন রে। —ত্রিপুরা

ঘাটু গান

বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্রই বালিকাবেশী বালকের নৃত্য সম্বলিত গীত প্রচলিত আছে। পুর্বে ইহা বালিকারই নৃত্যগীত ছিল, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রেই তাহার প্রচলন দূর হইয়া তাহার পরিবর্তে বালিকার বেশ ধারণ করিয়া বালকের নৃত্য প্রবর্তিত হইয়াছে। উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত নাটু-পীলার নাচ ও গান ইহারই অনুরূপ। বিহার ও পশ্চিম সীমান্ত বাংলার নাচ্‌নী নাচের মধ্যে কেবল মাত্র এখনও বালিকা বা যুবতীরাই নৃত্যগীত করিয়া থাকে।

পুর্ব বাংলা বিশেষতঃ মৈমনসিংহ জিলার পুর্বাঞ্চল, ত্রিপুরা জিলার উত্তরাঞ্চল এবং শ্রীহট্ট জিলার পশ্চিমাঞ্চলে এক শ্রেণীর গীত প্রচলিত আছে, তাহা একটি বালিকাবেশী বালককে কেন্দ্র করিয়াই সাধারণতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই ঘাটু গান নামে পরিচিত। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার নাচ্‌নীর সঙ্গে ইহার কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও মৌলিক উদ্দেশ্যের দিক দিয়া যে কোন পার্থক্য নাই, তাহা সত্য। নাচ্‌নী নাচে নাচনী ব্যতীত একজন মাত্র পুরুষ গায়ক থাকে, তাহাকে রসিক বলে। ইহার কোন দোহার থাকে না। সুতরাং ইহা প্রধানতঃ একক সঙ্গীত। কিন্তু পুর্ব বাংলার ঘাটু গানের দুইটি অংশ—একটিতে ঘাটু বালক নৃত্যসহযোগে একক সঙ্গীত পরিবেষণ করিলেও, ইহার আর একটি যে অংশ আছে, তাহাতে প্রায় সমবেত ভাবে সমগ্র জনতাই সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। লোক-সঙ্গীতের প্রধান একটি লক্ষণ এইভাবে ইহার মধ্য দিয়া সার্থকভাবে প্রকাশ পায়। উভয় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ নাচ্‌নীর গানেও যেমন, ঘাটু গানেরও তেমনই, বিষয়বস্তু এক এবং অভিন্ন, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়-প্রসঙ্গ।

তবে ঘাটুগানে কেবল মাত্র বিচ্ছেদ এবং নৈরাশ্যের কথা যেমন প্রাধান্য লাভ করে, নাচনীর গানে তাহার পরিবর্তে প্রেমের নানা দিকই উপজীব্য হইয়া থাকে, কেবল মাত্র বিরহই তাহার লক্ষ্য থাকে না।

ঘাটু শব্দটির উদ্ভবের ইতিহাস খুব স্পষ্ট নহে। বর্ষাকালে নৌকার পাটাতনের উপরই প্রধানতঃ ঘাটু গানের আসর বসে; তারপর ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া এই গান গাওয়া হয় বলিয়া কেহ ইহাকে ঘাটু গান বলিতে চাহেন। ইহাকে প্রধানতঃ একদিক দিয়া ঘাটের গান বলা যায়, তাহা হইতেও ইহা ঘাটু গান বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিতে পারে। ঘাটের গান শব্দের অর্থ এই যে, এই গানের ক্ষেত্র প্রধানতঃ যমুনার ঘাট; নদীমাতৃক পুর্ববাংলার নদীর ঘাটের ছবিই ইহার প্রধান অবলম্বন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া যমুনার ঘাটে জল লইবার জন্য গিয়াছেন, সেখানে কদম্ব শাখা হইতে যমুনার জলে তাহার ছায়ামূর্তি প্রতিবিম্বিত হইতেছে, অপলক দৃষ্টিতে সে দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার কলসী কখন স্রোতের জলে ভাসিয়া গিয়াছে, ইহাই সাধারণত ঘাটু গানের বিষয়; সেইজন্য ঘাটের গান হিসাবে ইহাকে ঘাটু গান বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কেহ মনে করেন, শব্দটির উচ্চারণ গাঁড়ু এবং গুজরাটি গাণ্টু শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু চন্দ্রবিন্দু যুক্ত উচ্চারণ পুর্ব বাংলায় নাই, সুতরাং গাঁড়ু উচ্চারণ হইতে পারে না। তারপর গুজরাটের সঙ্গেও ইহার সম্পর্ক কল্পনা করা কঠিন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছিতে পারা যাইতেছে না।

বিশেষ এই অঞ্চলেই এই শ্রেণীর গান উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করিবার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এই অঞ্চলে যে কোন কারণেই হোক, মধ্যযুগ হইতেই বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ প্রভাব স্থাপিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বিথলঙ্গের আখড়া, কিশোরগঞ্জের শ্যামসুন্দরের আখড়া, বাজিতপুরের হরিবোলের আখড়া, আচমিতার গোপীনাথের আখড়া এই অঞ্চলেই অবস্থিত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করিতে আসিয়া এই অঞ্চলেরই মঠখলা গ্রামে যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে। সেইজন্য চৈতন্যদেবের জীবন এবং আদর্শ দ্বারা এই অঞ্চলের সমাজ তখন হইতেই বিশেষভাবে প্রভাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বালিকাবেশী ঘাটুর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক নৃত্যগীতের মধ্য দিয়া গোপীভাবে কৃষ্ণোপাসনারই ইঙ্গিত প্রকাশ করে। সেইজন্য রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীতই ঘাটু গানের উপজীব্য। তবে তাহা এখন প্রায় সর্বক্ষেত্রেই লৌকিক স্তরে নামিয়া আসিয়াছে।

১

আরে বংশী বাজে কোন্ বনে।
শুনিয়া বন্‌শী তান, উদাস হৈয়াছে প্রাণ
চিতে আমার ধৈরয না মানে॥
আরে সখীরে—
দাঁড়ায়ে কদম তলা, বাঁশী বাজায় চিকন কালা,
গলায় শোভে বনমালা।
বাজায় বন্‌শী সুতানে, ধৈর্য নাহি মানে॥ —মৈমনসিংহ

২

সোনার গাগরী লৈয়া রাধা যায় জলে।
যায় গো রাধা জলে একা যায় গো রাধা জলে,
যমুনাতে জল ভরিতে, দেখে রাধা আচম্বিতে,
জলের মাঝে চিকন কালা দোলে।
কলসী লইয়া কাঁখে, রাধা নেহালিয়া দেখে,
কানাই বৈসা কদম্বেরি ডালে॥ —ঐ

৩

শোন গো, পরাণ সই, তোমাকে মরণ কই,
বাঁশী মোরে করল উদাসী, সখী রে॥
কি ধ্বনি পশিল কানে,
সে অবধি পরাণ আমার
কেন লয় মোর মনে, বাঁশী কি যাদু জানে
গৃহ কর্ম না লয় আমার মনে, সখী রে॥ —ঐ

৪

তমাল ডালে বইসে, কোকিল, ডাক হে ঘন ঘন।
তোম্‌রা কি কেউ দেখছ আমার প্রাণ বন্ধু সুজন রে॥

ভেরন কাডের নাওখানিরে মধ্যে তাহার ছইয়া।
আগা হইতে পাছায় গেলে গলই পড়ে নইয়া রে॥ —ঐ

ব্রজবুলি ভাষার অনুকরণেই হউক, কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, ঘাটুগানে অনেক হিন্দী শব্দ ব্যবহৃত হয়। হিন্দী শব্দযুক্ত ঘাটুগানকে সাধারণতঃ তেলেনা গানও বলে। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীত তাহার নিদর্শন—

৫

শোন কোয়িলারে হাম দুঃখিনীর ফাটে রে ছাতিয়া।
কোনে বিরাজে পিউয়া মেরা হাম নারী ছাড়িয়া॥
এয়ছে মধু না মাসে, রে কোকিলা, না হেরি কালিয়া।
গাও মেরা পিউয়া নাম জুড়াইতে হিয়া॥ —ঐ

৬

ললিতে গো কুঞ্জ সাজাও,
মনের বাঞ্ছা পুরাইতে আসবেন গোলকবিহারী॥
ফুলের রত্ন সিংহাসনে,
বইসে রইলাম রাই একা কুঞ্জে,
আসবে বলে আশায় আশায়, পোহাইলাম নিশি,
প্রাণ সখীরে, আইল না পোড়া বিদেশী॥
কোন না কামিনী সনে কাটায় দিন রাতিয়া।
পিউয়া আরে দহে মেরা ছাতিয়া॥ —ঐ

৭

কাল বসন্তকাল, কোকিলা হইয়াছে কাল,
বসিয়া তমাল ডালে কুহু রবে প্রাণ জ্বালায়॥
আইজ নিশীথে এই যে প্রাণনাথ,
মম সনে শুইয়ে এক সাথ,
হাসি হাসি নাথ, মুখে দিয়া হাত,
কোকিল ধ্বনি পোহাইল রাত।
শোন গো, সখী, স্বপনকি বাত॥
এয়ছা সময় গিয়ে, কাছে নাই পিউ মেরা
তুষানলে তনু জরা, ভাসি আঁখিনীরে॥ —ঐ

৮

ক্যা রূপ হেইরে আইলাম যমুনায়, সখী গো, আইলাম যমুনায় ॥
ও সখী, আচানৌকা রূপ হেরিলাম তরুয়া মূলে।
ওরে মেরা মন হৈরে নিল—নিলরে ঐ কাল বরণে ॥
একেত আচানৌকা রূপ হেরি—হেরিত যমুনায়।
সেইত অবোলা বামা ধৈরয না মানে হামারি।
মনেরি মন হৈরে নিল—নিল ঐ কাল বরণে ॥ —ঐ

৯

কি রূপ দেখলাম রে, হারে যমুনার জলে,
দেইখ্যা রূপ জিউরায় না মানে!
জিউরায় না মানে, গো সখী, জিউরায় না মানে ॥
যাইতে যমুনার জলে,
সেই কালা কদম্ব মূলে,
আঁখি ধারে প্রাণ লইয়া যায়!
প্রাণ লইয়া যায়, রে সখী, মন লইয়া যায় ॥
কলসী বুড়াইয়া, সই গো, চাইয়া রইলাম রূপ গো পানে ॥
কলসী ভাসাইয়া নিল সোতে, রে সখী, জিউরায় না মানে। —ঐ

১০

প্রিয়, নিজ নাম শুনাইলে আমারে ঐ নিদান কালে।
আমার প্রাণ জ্বলে গো, প্রাণ সজনী; বিরহানলে ॥
যে দিকে পওন হও রে,
কইও রে শ্যাম বন্ধুর আগে কুঞ্জে আসিতে,
তব নামে মইল পিয়ারী বান্ধা রইল তমালে। —ঐ

১১

ফুলের শেজ্‌ জুয়া বিছাও, রামা, লইয়া চল মালঞ্চি,
কুঞ্জে আসবে বাঁকা শ্রীহরি ॥
জাঁতি জুঁতি, কৃষ্ণ, বেলী,
গন্ধরাজ কুসুম কলি,
ফুলেরি শেজ্‌ জুয়া বিছাও ওরে ॥

জ্বালাইয়া কাঞ্চনের বাতি, জাগব আমি সারা রাতি,
ভোরের কোয়িল কণ্ঠে আমি শুনব বন্ধুর গীতি ॥ —ঐ

১২

বিরহ বিচ্ছেদের জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না—ইকি যন্ত্রণা।
প্রেম কইরে দুই দিন গো আমার সুখে গেল না ॥
লোকে মোরে করছিল গো মানা,
কঠিনের প্রেমে মইজ্য না ;
যয়বন কালে না পুরাইল মনের বাসনা ॥
আমারে বানাইয়া দোষী,
বন্ধু হইবে পরবাসী, আগে জানি না ॥
জানিলে আগে প্রেম কৈরে ফান্দে পড়তাম না ॥ —ঐ

১৩

আছমানের চান উদয়, রে সখী, যমুনার তীরে।
রইতে নারী ঘরে, রে সখী, রইতে নারি ঘরে ॥
যমুনার জল টানে রে সখী, আমার মনেরি জল টানে।
হৃদয়ে তার গরল ভরা নয়নে বাণ হানে রে সখী,
নয়নে বাণ হানে ॥ —ঐ

১৪

বইলা দে গো তোরা, প্রাণ সজনী—
এগো আমি জনম-দুঃখিনী।
পিউ বিনে মেরা জিউ কান্দে দিবা-রজনী ॥
আমারি কপালে চিঠি কি লেখখ্যাছে না জানি।
এগো আমি জনম-দুঃখিনী ॥ —ঐ

১৫

আমার বিরহ না জ্বালায় গো চিত্ত দহে।
কোথায় রইলা প্রাণের পিউ আইস্যা মিলাও হে ॥
যয়বন জোয়ারের পানি,
ধাইয়া ধাইয়া উড়ে গো নিষেধ মানে না।
নিষেধ মানে না গো প্রাণে সমুজ মানে না ॥ —ঐ

১৬

কুঞ্জ সাজাও, রাইকিশোরী, আসিবেন শ্রীহরি।
বিনা সূতে গাঁথ মালা,
শোন, ও গো রাই অবোলা,
মনের সুখে আজু নিশি বঞ্চিবেন হরি ॥ —ঐ

১৭

কোন রসিয়ায় বংশী ফুঁকারে ও রামা,
ধুন শুনিয়া চিত্ত সমুজ না মানে।
আরে সমুজ না মানে ॥
মনে করি, ও সজনী,
নিধুবনে যাই গো আমি, দুরন্ত মন-বন মে।
বংশী ধুন নে প্রাণ নিল, ও রামা ॥ —ঐ

১৮

কি হইল প্রাণ সই গো, বিফলে গেল রজনী।
আশা পন্থে রইলাম চাইয়া আমি দুঃখিনী ॥
চুনী চুনী কালি আনি,
শেজুয়া সাজাও সখীয়া,
পিউয়া বিনে মেরা জিউ আগুন দহে।
আসিবার আশে রইলাম বৈসে আমু দুঃখিনী ॥ —ঐ

১৯

আজুকা স্বপনে গো সখী দেখলাম পিয়াকো,
জাগিয়া না পেখনু তাহারে।
স্বপনে পেখনু, সই গো, পিউয়া হামারি শিউরে ॥
উঠ গো, উঠ গো, বইলে ডাকে হামারে,
শিয়রে বসিয়া পিউয়া হাত ধৈরা টানে,
জাগিয়া নেহারি পিউয়া নাই হামারি ॥ —ঐ

২০

আরে আরে মধুমাসে—এদিন আর কবে হবে।
পিউয়া নাই মহল মে—সখী সখী রে।

বিফলে দিন যায় শুইয়ে, দিম যায় রে শুইয়ে।

সখী, সখী রে ॥

দুই একটি ঘাটু গানে গৌরাঙ্গের বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়, তবে সেখানে গৌরাঙ্গ কৃষ্ণরূপের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছেন—

২১

(গৌর) সোনার গৌরাচান্দ উদয় হৈল নদীয়ায়।

শচীমায়ের কোমল কোলে সোনার গৌরা হরিবলে

মধুর গানে নদে ভেসে যায়।

(গৌর) গৌর আমার ঐ সুন্দরিয়া—নয়নেরি তারা

রাত্র নিশাকালেরে—গৌরে হয়েছি হারা।

যে অবধি গৌর গেল, সোনার নদে আঁধার হৈল,

বিপদ ঘটিল।

সেই অবধি শচীরাণী জীয়ন্তে মরা ॥

(ছম) নদীর কিনারে নাচে সই গো একি শোভা

গৌর কিশোরা।

ভক্তগণে সঙ্গে করি নাচে গৌর বাহু তুলি

রাধার ভাবে মগ্ন হয়ে—দুনয়নে বহে ধারা ;

গৌর কিশোরা ॥ —মৈমনসিংহ, ১৩২৫

২২

বিরহ জ্বালায় মরি, প্রিয় গেল আমায় ছাড়ি

দুখের কথা বলরে শুনি।

(ও সজনী) আমি অভাগিনী জনম দুখিনী

কার কুঞ্জে রইল প্রাণনাথ।

সজনি, বিচারিলাম নগরে না পাইলাম প্রিয়রে

প্রিয়রে বিচারি মাথার কেশে।

আমি বিরহিণী, একাকিনী, ঝাঁপ দিব যমুনার জলে।

কার কুঞ্জে রইল প্রাণনাথ।

(ছম্) বিরহ আগুনে জ্বলি, আরে সখি আনরে কাটারী।

দেখ বুক বিদারী,

কেয়া লেখা করবে হামারি।
বিরহ আগুনে জারি, জলে হিয়া ধিরি ধিরি
দু'নয়নে বহে মোর বারি।
আয়ে সখি—আনরে কাটারি। (সখিরে)। —ঐ, ১৩২৫

২৩

কি হেরিলেম অপরূপ যাইতে জলে।
ভুবনমোহন কালোরূপ দাঁড়ায়েছে ঐ কদমতলে॥
গলে মণিমুক্তা দোলে পদচিহ্ন বক্ষঃস্থলে
যমুনার দুই কুলে আলো কইরে,
মোহনচূড়া হেলেছে বামে রে, মন মোহিয়ে।
দাঁড়ায়েছে ঐ কদমতলে॥ —ঐ

২৪

(বংশী) মুরলী বাজাইয়া রামা যায়রে গহন বনে
(শুনে) ধৈর্য না মানে।
ধৈর্য না মানে, ধৈর্য না মানে--গো প্রাণে
বাঁশরী শুনে।
বাঁশরী বাজাইয়া কালা ভুলায় যত কুল বালা
আকুল করে মোহন বাঁশীর গানে, ধৈর্য না মানে।
(বংশী) মধুর আওয়াজ শুনি, জিউ মোর উদাসিনী
কোন্ বন্‌মে বাজে (হায় রে) মোহন বন্‌শী,
কোন্ বন্‌মে গিয়ে বন্‌শী নাগিনী
আওয়াজে দংশিল যেমন শোন লো সজনি,
বিষে আমি জর জর—সহিতে না পারি।
মধুর আওয়াজ—
(ছুম) এয়সা বন্‌শী বাজিল, সই, মধুর সুতানে
শুনিয়া অভাগিনী ঘটিছে নিদান।
চল সখি বন মাঝে কোন্ বনে বন্‌শী বাজে,
(আরে সখিরে) ও সেই বংশীরবে যোগী ছাড়ে যোগধ্যান,
কুলবালা ক্যায়সে রাখে কুল মান॥ —ঐ, ১৩২৫

২৫

বইসে তামাল ডালে কোকিলায় কি বলে গো, রাই ?
কি আর নিশি নাই !
আর নিশি নাই, আর নিশি নাই গো
আমার আশাতে কে দিল গো ছাই।
কি আর নিশি নাই ॥
কোকিলারি কুহু রবে ধৈর্য নাহি মানে গো প্রাণে
অধৈর্য প্রাণ কিসেতে জুড়াই !
যার লাগিয়া কলঙ্কী অইলাম গো
সেই বন্ধেরে কোথায় গো পাই।
কি আর নিশি নাই ॥　　　　　　—ঐ

২৬

বাজায় বাঁশী কালশশী ঐ যমুনার কূলে ঐ যমুনার কূলে
নীল যমুনার দুকুল ভেঙ্গে সহসা ডাকে বায়,
(আরে) মন সুখে অধীর হয়ে যাক্ বয়ে উজান যমুনায় ॥
ব্রজের যত কুলবালা গাঁথিয়া ফুলেরি মালা,
পরুক বালা, ঘুচুক জ্বালা
কালা যেনো ভুলে ঐ যমুনার কূলে ॥　　　　　　—ঐ

২৭

কি রূপ দেখলাম, রে আরে, ও যমুনার জলে।
দেখে রূপ জীউ রয় না মনে ॥
গাগরী ভাসায়ে রহিলাম চাইয়ে,
কলসী ভাসায়ে নিলো সোতে রে যমুনার জলে ॥
(রূপ দেখে জীউ রয় না মনে ॥)　　　　　　—ঐ

২৮

মন রে পিয়ারী দানা জিউ রয় না মনে।
জিউ রয় না মনে গো আমার মনো রয় না মনে ॥
পিও পিও পিও মাথায় গুঁজে নিও,
যে দিকে মন চলে গো আমার মন মানে তো মানে না ॥　　　—ঐ

ঘেঁটুর গান

পশ্চিম বাংলায় খোস পাঁচড়ার এক দেবতা আছেন, তাহার নাম ঘেঁটু, নামটিকে সংস্কৃত করিয়া ঘণ্টাকর্ণও বলা হয়। ঘেঁটু হরিবিদ্বেষী দেবতা। ফাল্গুন সংক্রান্তিতে তাঁহার মাহাত্ম্যসূচক যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা ঘেঁটুর গান নামে পরিচিত। হাটের মাঝখানে 'কেলে হাঁড়ী' রাখিয়া সর্বজন সমক্ষে পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া হরিবিদ্বেষী ঘেঁটু দেবতাকে অপমানিত করাই এই পূজার উদ্দেশ্য। সাধারণত পল্লীর রাখাল বালকেরা সারা ফাল্গুন মাস ধরিয়া প্রতি সন্ধ্যায় গৃহস্থদিগের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া ঘেঁটুর গান গাহিয়া বেড়ায়। একজন ঘেঁটু সাজে, হরিবিদ্বেষী বলিয়া তাহাকে অন্য বালকেরা গানের ভিতর দিয়া গালাগালি করে।

১

ভাগ্যমানে কাটায় পুকুর চণ্ডালে কাটে মাটি।
কুমোরের কলসী, কাঁসারির ঘটি।
জল শুদ্ধ, স্থল শুদ্ধ, শুদ্ধ মহামায়া
হরিনাম করিলে পরে শুদ্ধ হয় আপন কায়া॥
(বল হরি হরি, হরি হরি বল রে)

—২৪ পরগণা

২

ঐ ডাবর বাজা, ঐ কাঁসর বাজা।
এলো এলো দ্বারে ঘেঁটু রাজা।
ধামা বাজা তোরা কুলো বাজা।
এলো এলো দ্বারে ঘেঁটু রাজা॥
এই-ই ঘণ্টাকর্ণ, ওগো এই-ই ঘণ্টাকর্ণ।
যেন ছেঁড়া ছাতা বর্ণ॥
কানের ঘণ্টা তোরা বাজা বাজা।
কানে ঘণ্টা বাঁধা আমাদের এই ঘেঁটু রাজা॥ —ঐ

৩

কৃষকের ঘরের বালিকারাও এই উপলক্ষে ঘরের মধ্যে বসিয়াই চাপান ও উতোরের মধ্য দিয়া এইভাবে গান গাহে—

বেশ তো, ভাই, বল না সই, সমিস্যা এই
তোমার কেমন ভাই,
দিদিশাশুড়ী ভাওবে তোমার হোক না সমিস্যা যেমন ॥

অপর দল চাপান দিল—

বলি লো, বাঁশ গাছেতে ফলছে কাঁঠাল
ও তার বড় বড় কোয়া।

ঘেটুর দল জবাব দিল—

হ্যা ভাই বর—এই ফাগুন মাসে,
কাঁঠাল ফলে বুঝি বাঁশের গাছে ?

অপর দল আবার প্রশ্ন করিল—

বাঁশ গাছেতে কাঁঠাল ও তার বড় বড় কোয়া।
মুড়ির সনে খেতে গেলেই ভাল, নয় তো সব ভোঁয়া।
কাঁচায় না খায় ঝোলে ঝালে, পাকায় না খায় খুলে,
স্বর্গ দ্বারে পৌঁছে যায় ও সে খেলে পায়ে দলে ॥
(সবাই এক সঙ্গে) ও দিদি খেলে পায়ে দলে ?

ঘেঁটুর দল এবার নিজেরাই সমস্যার সমাধান করিল—

ওগো দিদি, ও দিদির সই—এর ভাঙ্গানিটা হচ্ছে মই—
বোঝো গো শুয়ে খেয়ো দই—না বোঝো তো করবে হৈ চৈ ॥ —ঐ

৪

আজ হবে গো ঘেঁটুর বিয়ে চল সব শাঁখ বাজিয়ে,
চল সবে পরে শাড়ি জল ভরিতে যাই তাড়াতাড়ি,
নিয়ে আয় মঙ্গলা হাড়ি যায় সব কুলো মাথায় লয়ে।
নিয়ে তখন বরণ-ডালা, আনন্দে সব কুলবালা,
আনন্দে হয়ে উতলা, জল সহিতে চলিল ধেয়ে ॥
আজ হবে গো ঘেঁটুর বিয়ে, যাব আমরা উলু দিয়ে,
শাঁখ বাজিয়ে বরণ-ডালা ঘরে যাব আমরা আনন্দেতে ॥ —ঐ

ঘোষা

সুদীর্ঘ আখ্যানমূলক গীতি গাহিবার মধ্যে মধ্যে যেখানে বিরামের অবকাশ সৃষ্টি হয়, সেখানে এক একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রবিষয়ক খণ্ডগীতি গাহিয়া কাহিনীর একঘেয়েমি দোষ দূর করিবার প্রয়াস করা হয়। সেই সকল খণ্ডগীতিকে ঘোষা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহাতে যেমন রামায়ণ, রাধাকৃষ্ণ কিংবা নিমাইয়ের প্রসঙ্গ থাকিতে পারে, তেমনই ধর্ম কিংবা ভক্তিভাব নিরপেক্ষ সাধারণ বাস্তব গার্হস্থ্যজীবন-বিষয়ক নানা কৌতুককর কথাও থাকিতে পারে। এই শ্রেণীর আরও দুই প্রকার গীত আছে, তাহা দিশা এবং ধুয়া নামে পরিচিত (পরে দ্রষ্টব্য)। কিন্তু দিশা কিংবা ধুয়া হইতে ঘোষা দীর্ঘতর রচনা, তবে তাহা কদাচ খণ্ডগীতির সীমানা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে না। কচিৎ কোন কোন সময় দীর্ঘ ঘোষাও একটি দুইটি শুনিতে যে না পাওয়া যায়, তাহা নহে—তাহাকে লম্বা ঘোষা বলে। বৈষ্ণব প্রভাবিত অঞ্চলে ঘোষাগুলি সাধারণতঃ বৈষ্ণব বিষয়কই হইয়া থাকে, ইহারাই ক্রমে বিষ্ণুপদ (পরে দ্রষ্টব্য) রূপে পরিবর্তিত হইয়া মধ্যযুগের কোন কোন মঙ্গলকাব্যেও স্থান লাভ করিয়াছে। তাহাদের কথা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। মুসলমান প্রণয়াখ্যানমূলক গীতিতে যে ঘোষা ব্যবহৃত হয়, তাহাতেই প্রধানতঃ মানবিক কৌতুকরসের স্পর্শ অনুভব করা যায়।

১

শুন গো একখান রঙয়েরই ছলনা[১]
সবে মিইল্যা যুক্তি করে
মুর্খ গণ্ড আর থাকব না॥
ওরে— ধুড়া একটি সর্প ছিল
পাহাড়ে ইস্কল জমাইল
কুনী বেঙ হইল তার ছাত্র গো হে—
ওরে— নিত্যই একটা নাস্তা খায়
কেউ বেশীটার (সন্ধান) না পায়।
ঘাওয়্যা বেঙয়ে উইঠ্যা কয়
তুমি সরহার[২] মুহাশয়

১। ঘটনা। ২। সরকার।

স্বভাব দোষও গেল না।
শুন গো একখান রঙয়েরই ছল না। —মৈমনসিংহ

২

হায় গো-শিয়াল অইল রে পাগল
ছেডেলমেণ্টের[৩] জরিপ আইয়া
কাইট্যা নিল সব জঙ্গল॥
ওরে— কাডাসের (বন্ত-জীব) উমী (উমী দৌড়াদৌড়ি)
বাঘাল্যার (খটাস) দৌড়াদৌড়ি
লিঙুয়ায় (বানরের ন্যায় জীব) বলে—
আমার কি উপাই গো হে—
মুখ পোড়া বান্দরে বলে
আয় তোরা সগলে (সকলে) মিলে
লঙ্কা যাইগা চলরে চল।
শিয়াল অইলরে পাগল॥

৩

বৌনেয় কান্দে নাইয়র দিল না,
আম কাঁডল ফুরাইয়া গেল
বাপের বাড়ী গেল না॥
ওরে— উলুঙ্গাডার (বোকা) ঘর করি
ঘুমের মাইঝে বড় ভারি,
ধাক্কা ঠেলায় লড়ে না—, গো হে
ওরে— পিইল্যা মাইন্যা (সোহাগ মিশ্র গালি) পাঁডা
তর বুকে পড়ত ঠাডা
মাইর‍্যা যাইতাম তরে কাঁডা
খাটকী (কবর) দিতাম পাঁইড়া বাসনা॥

৪

বন্ধে (বন্ধু) শইল্লের (শরীরের) পায় না সুগ,
লিছুড় (লম্বা) দিয়া পইড়া থাকে
গেল না আর কপালের দুঃখ।

৩। সেটেলমেণ্টের।

ওরে— বন্ধু আমার আলাভুলা (বুঝিয়াও না বুঝা)
খাইত চায় ভোমা মুলা
ভাজা মাছ আর চীনা গো হে—

ওরে— খাইয়্যা বইছে কুত্তা ঘাঁডা (একজাতীয় বনেলা মুলা)
নাহে মুহে (নাকে ও মুখে) লাগছে কাঁডা
এহন করব পেটের অসুখ
বন্ধে কান্দে শইলের পায়না সুখ।

৫

পুতের বৌয়ের ছভাব (স্বভাব) ভালা না,
হউরী (শ্বাশুড়ী) বৌয়ে কইজা (ঝগড়া) করে,
বৌয়ের রাইস (রাশি) ভালা না।

ওরে— বড় বড় গুডা (বীজ) দিলাম
নিজের আতে (হোত) কিছু রুইলাম
তেও ত গাছে উড়ি (সীম) ধরেনা গো হে—

ওরে— ক্ষেতে অয়না (হয় না) ধান খামা
ছেঁড়ায় করে উদ্দা জিমা
পেডের অসুখ ছাড়ে না
পুতের বৌয়ের ছভাব ভালা না॥

৬

উঁছা (মাছ ধরিবার যন্ত্র বিশেষ) ভইরা পনা (মাছ) মারে না,
গাছের লিমু পাইক্যা রইছে
পনা দিয়্যাত খাইলাম না।

ওরে— গুইন্যা নাগর উঁছা লইয়া
পনা মারত বিরছায় (খোঁজ করে) গিয়া
মারে পনা আগারে-পাগারে গো হে—

ওরে— পনা আনল বেঙ চাক্কুয়া (বেঙ্গাচি)
বৌয়ে করলে ওরে ভাক্কুয়া (বোকা)

পনা বুঝি চিনছ না।
উছা থইয়া পনা মারে না ॥

৭

হায় গো বাড়াবানা (ধান বানা) অইল যন্ত্রণা,
বারে বারে করি মানা
নীলগইঙ্গা ধান আইন্য না (আনিও না)।

ওরে— ধাপ্পুর ধুপ্পুর পাড়াই ধান
বাইরাম বাইরাম (বাহির হইতে চায়) করে জান,
লাভ অইবো যাউক আসল মিলে না।

ওরে— আটসের ধানে সাত সের চাইল
বেইচ্যা (বিক্রয় করিয়া) কিইন্যা আনছ ডাইল
বোয়াল মাছ কেন আনলানা ॥
বাড়া বানা ভারি যন্ত্রণা ॥

৮

হায় গো, বৌয়ে তাল খায় না ডরে,
ভাদ্দর মাসে আন্ত গেলে (আনিতে গেলে)
নাইয়র যাইত না করে ॥

ওরে— একটা তালের তিনডা আলি (বীজ)
রস বাইর (বাহির) অইল দুই থালি
রস নিয়া বয়াইল (বসাইল) চুলার উপরে।

ওরে— রস পড়ে উত্‌লীয়া
বৌ পড়ে কাইত্যাইয়া (কাত হইয়া)
হউরী (শাশুড়ী) কান্দে ধাপ্পুইরে,
বৌয়ে তাল খায় না ডরে ॥

চকচন্নী

জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রচলিত একটি সংক্ষিপ্ত পালা গানের নাম চকচন্নী। ইহার কাহিনী এই—এক চোর, সে চুরি করিয়া জেলে গিয়াছে, জেল হইতে ফিরিয়া স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। তাহাদের সুখদুঃখের মিলন-বিরহের কথা কাহিনীর মধ্য দিয়া গীত হয়। ইহার একটু অংশ,

চুন্নী খালি জুড়ি কম্বল
জেহেলখানার সম্বল।
শালা ছাড়া গালি নাই
হালি ছাড়া বেড়ান নাই।

চটকা গান

উত্তর বাংলার বিশেষতঃ জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও রংপুর জিলায় প্রচলিত প্রেমসঙ্গীত বা ভাওয়াইয়া গানেরই একটি অধঃপতিত রূপের নাম চট্‌কা। ইহা তাল-প্রধান সুরে রচিত। দৈনন্দিন জীবনের নিতান্ত লঘু বিষয় ইহার অবলম্বন। ইহাদের গীতিগুণ যাহাই থাকুক, কোন সাহিত্যগুণ নাই। ইহার কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখ করা যায়।

১

আমার বাড়ী ছাড়িয়া কোথা যান,
দোহাই আল্লাটে মোর মাথা খান।
কাল মুরগীটা ওসন বইস্যাছে।
কন্যা, আশা দিলি ভরসা দিলি,
কলার মোথাত মোক বসাইয়্যা থুলি,
সারা রাইত মোক মশা কামড়াইছে।
কন্যা আগুন নিগুমটা না বুঝিয়া,
ভাতের উতালটা দিমু ঢালিয়া,
সোনার অঙ্গে ফোসা পইড়্যাছে। —কোচবিহার

২

ও শাশুড়ী মাই, না পারি মুই ভাত আন্ধিবার,
মুই ত' মোড়লের বিটি
ভাত আন্ধিবার না জানি
ভাত খাও ত ধর আন্ধুনী।
ও শাশুড়ী মাই, না পারি মুই গোবর ফ্যালাইবার।
গোবর ফ্যালাইলে হাত গোন্ধাই
খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয়,
ঝাঁটা মারি মুই গরুর কপালে। —ঐ

৩

আমার বাঙ্‌লায় করে মন ফাঁপর,
চল যাই কইলকাত্তা শহর।
শহরে ভাড়া করলাম ঘর দোতালার উপর।
দিনে দিনে গিন্নীর মন করে ফাঁপর।
গিন্নীর ভ্যানিটিব্যাগ, সোনার গয়না গায়,
ও গিন্নী, বাইন্‌তে বলে লোকে ঘর।
ও গিন্নীর ডুরে শারী, রেশমী চুড়ি,
তবু তার মন না রয় ঘর। —জলপাইগুড়ি

৪

আমার শ্বশুর করে খুশুর খুশুর ভাশুর করে গোঁসা,
নিদয় হেন স্বামী আস্যা ধরল চুলের খোঁপা।
আমার শাশুড়ী আছে ননদী আছে আছে ভাইগ্‌না বউ,
(হারে) এমন কইর‍্যা মাইর মারিল আউগাইল না কেউ। —ঐ

৫

আগা নাও যে ডুবুডুবু পাছা নাও যে বইস,
ঢোঙায় ঢোঙায় ছেকো জল রে—
জল ছেকিতে জল ছেকিতে সেঁউতির ছিড়িল দড়ি,
গলার হার খুলিয়া কন্যা রে—
ও কন্যা সেঁউতির লাগাইস দড়ি।

ভাঙ্গা নাওয়ে খেওয়া দিতে কেমন মজা পাও।
ভাঙ্গাও নোয়ায় চুড়াও নোয়ায় সোনা রূপায় গড়া,
আজার হাতিক পার করিছো ভরে, ও কন্যা, তোর বা কত ভাড়া।
সব সুন্দরীরে পার করিতে নিছঙ আনা, আনা,
তোক সুন্দরীকে পার করিতে নেগাইম কানের সোনা॥ —ঐ

৬

হাওয়া গাড়ী চলিয়া গেল, বন্ধু আইল কৈ,
জলপাইগুড়ির চিড়ামুড়ি গৌরীর হাটের দৈ,
খাবার বেলা মনে পড়ে গো আমার চেংরা বন্ধু কৈ।
জলপাইগুড়ির রেশমী চুড়ি পয়সা পয়সা দাম,
তারই মধ্যে লেখা আছে আমার চেংরা বন্ধুর নাম।
ওকি হাওয়ার গাড়ী চলিয়া গেল, আমার বন্ধু আইল কৈ! —ঐ

৭

ও মদনের মাও,
আগুন জ্বালাও মশা মারি পোন্ পোন্ করে।
মাছের মধ্যে মাছ সেনে ইলিসা সেনে মাছ
ও তোর রুইওক পোচে কে?
চান্দা ধুতুরা মাচে সংসার রাইখাছে।
ও মদনের মাও,
আগুন জ্বালাও মশা মারি পোন্ পোন্ করে।
নারীর মধ্যে নারী সেনে ধওলা সেনে নারী,
ও তোর কালকে পোচে কে?
ঘ্যাগা আর কুজা নারী সংসার রাইখাছে।
ও মদনের মাও,
আগুন জ্বালাও মশা মারি পোন্ পোন্ করে। —ঐ

৮

চ্যাং মাছে বলে, মাঝি ভাই, আমাক না মারিও।
ওরে দারিকের হবে বিয়াও রে আমি ঘটক হয়া যাইম্॥
ও মোর কেকৈ মাসী, মেনকা দিদি, জটা বগিলা, খেমজ্ ঢিলা

শালুক শালুক শালুক ননদীয়া—কি মাঐ না মোর কে,
কাইল্ হবে দারিকের বিয়াও রে আইজও চাঙ্গা না আইল রে ॥
ট্যাপা মাছে বলে, মাঝি ভাই, আমাক্ না মারিও।
ওরে কাইল হবে দারিকের বিয়াও রে আমি শারিংদা বাজাইম্।
পুঁটি মাছে বলে, মাঝি ভাই, আমাক না মারিও,
কাইল হবে দারিকের বিয়াও রে আমি হাউস করাই থাইস্ ॥

চড়ক পরবের গান

চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে যে চড়কোৎসব হয়, তাহাতে নানা প্রকার গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে আচার-সঙ্গীতই (ritual song) একটি প্রধান অংশ অধিকার করিয়া আছে। আনুষ্ঠানিক আচারের বাহিরেও নানা লৌকিক বিষয়ক সঙ্গীতও শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কয়েকটির নিদর্শন নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

১

ঐ দূরের কুটুম ঘরে আইলো
ই ঘরে নাই কিচ্ছু—খেতি কি দিব গো।
এঁ ষোলটি পান খিলি
ষোলটি গুয়া গো,
হাতে হাতে—
ই হাতে হাতে ধরাই দিব গো ॥ —বাঁশপাহাড়ী

২

স্বরগেতো জল নাই
পিথিমির ধূলা উড়িল গো।
এ পাঁজিরে দেখ ভীরবন
কতদূরেরি আছে, গো।
স্বরগেতো জল নাই……॥ —ঐ

৩

বাও নাই বাতাসো নাই রে মোর খিরকি ক্যানে নড়ে।
ছোট দেওরা সন্ধাইল ঘরে মোনা তামকুর বাদে ॥

উঠো উঠো পান সোয়ামী চ্যাতন কর গাও।
ঘরে আছে জলের ঘটি মুখ আখো নাও।
সোগ্ গেতে উল্লি মন্চে জ-জকার। —জলপাইগুড়ি

ইহার অর্থ: বাও বাতাস নাই, তবু আমার জানালা কেন নড়িতেছে? তামাক খাইবার জন্য আমার ছোট দেওর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। হে স্বামী, বিছানা ছাড়িয়া উঠ, ঘটিতে যে জল আছে, তাহাতে মুখ ধোও, স্বর্গে যে গান হইতেছে, তাহা মর্ত্য হইতে শুনা যাইতেছে, তাহা তুমি শোন।

৪

অস্ত্র শূন্য রণস্থলে অভিমুন্য কেন্দে বলে,
কোথায় মাতুল ধনুক-ধারি,
দেখা দাও হে তরায়, হরি।
অন্যায় যুদ্ধে আমার জীবন গেল ॥
গুহক চক্রে অভিমুন্য, অর্জুনের নন্দন।
চতুর্দিকের বাণাঘাতে জর্জরিত হলো ॥ —নদীয়া

৫

তোমায় যেন ভুলি না মা,
যতদিন আছি এ সংসারে।
যত ইচ্ছা হয় দাও, মা, সাজা—
তুমি আমার দেহের রাজা ॥
তুমি, মা দয়াবতী, লোকের মুখে আমি শুনি।
অবোধ সন্তানে নাও, মা, কোলে তুলি।
আমি তোমার খাসের প্রজা
ভুলো না, মা, আমারে।
যতদিন আছি এ সংসারে ॥
যেথায় ইচ্ছা সেথায় থাক, মা,
অন্তিমকালে পাই যেন, মা,
তোমার ঐ রাঙা চরণ।
তোমায় যেন……এ সংসারে ॥ —ঐ

৬

আপন দোষে আপনি মলি, দোষ ধরবি কার।
সেখানে কি বলে এলি, কি কার্য করিলি তার॥
মহাজনের অমূল্য ধন দিয়েছিল,
তোমার হাতে করিতে যতন।
ঐ অল্প পুঁজি হারিয়ে বুঝি
বদনামি করিলি তার॥
অমাবস্যা পূর্ণিমার তিথি সেইদিন হয় যার
যুগল মিলন পুরুষের হয় ক্ষতি।
অমাবস্যা চিনলি না মন, নদীর ঢেউ উঠে ও জলে,
বৃন্দাবন কয় থেকে হুঁসিয়ার
গাঁটির ধন জুয়াচোরে নিল রে আমার।
সাধুর চাঁদের চরণ বিনে
আমার আসা যাওয়া হল সার॥ —ঐ

৭

আমি আর যে পারি না সহিতে।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ বাহির হয়,
কেহ তো ডাকে না খাইতে॥
ঘুরিলাম কত নগরে নগরে
সবাই দেখি হাঁ অন্ন ফুকারে
এমন বান্ধব নাই রে জগতে
মম দুঃখ পারে ঘুচাইতে॥
থাকিত যদি আপনার জন
বুঝিত সে যে প্রাণেরি বেদন
এমন বান্ধব নাইরে জগতে
মম দুঃখ পারে ঘুচাইতে॥ —মুর্শিদাবাদ

চরকার গান

চরকা চালাইবার সময় কখনও কখনও যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে অনেক সময় চরকা কিংবা সুতা কাটিবার কোন সম্পর্ক থাকে না, ইহা কর্ম-সঙ্গীতের অংশ।

১

সজনী, আরে এত রাইতে
চরকার ঘের ঘেরানি,
চরকা আমার নাতি-পুতি
চরকা আমার হিয়া,
চরকার দৌলতে আমার
সাড়ে সাত গণ্ডা বিয়া। —বাঁশপাহাড়ী

চর্যাগীতি

হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় রচিত এবং বহু পরবর্তী কালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপাল রাজদরবারের পুঁথিশালা হইতে সংগৃহীত যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সাধনভজন-মূলক সাতচল্লিশটি সঙ্গীত বাংলা ভাষার ইতিহাসে চর্যাগীতি নামে পরিচিত। ইহারা বাংলা ভাষার অন্যতম আদি নিদর্শন। ইহাদিগকে ধর্মীয় লোক-সঙ্গীত (religious folk song)-এর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করা যায়। সাধারণ লোক-সঙ্গীত হইবার পক্ষে ইহাদের একটি বাধা এই যে, ইহাদের মধ্যে এক একজন রচয়িতার নাম ভণিতায় শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর আদি সুর ধ্বনিত হইয়াছে, রচনার দিক দিয়াও বৈষ্ণব পদাবলীর পুর্বাভাষ ইহাদের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। যখন ইহারা রচিত হয়, তখন ইহারা মুখে মুখেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, পরবর্তী কালে ইহাদিগকে লিখিয়া লওয়া হইয়া থাকিবে। লিখিত হইবার পর ইহাদের মধ্যে নানা প্রকার রাগরাগিণীর নাম যুক্ত হইয়াছে ; এই সকল রাগরাগিণীর মধ্যে প্রাচীন কালে প্রচলিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণীর যেমন উল্লেখ আছে, তেমনই দেশীয় রাগরাগিণীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম ইহাদের মধ্যে দেশীয় রাগরাগিণী মাত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। একটির মাত্র এখানে নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে,

১

নিসিত আন্ধারী মুসার চারা।
অমিঅ ভখই মুসা করই আহারা॥
মাররে জোইআ মুসা পবনা।
জে ন তুটই অবনা গবনা॥
ভব বিন্দারই মুসা খণই গাতো।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাসক যাতো॥
কালা মুসা উহ ণ বাণ।
গঅণে উঠি চরই আমণ ধান।
তাব সে মুসা উঞ্চল পাঞ্চল।
সদ্‌গুরু বোহে করিহ সো নিচ্চল॥
জবে মুসাএর চারা তুটই।
ভুসুকু ভণই তবেঁ বান্ধন ফীটই॥

ইহার বাংলা অনুবাদ এই প্রকার:

আঁধার নিশায় মুষিকের চার (খাদ্য)।
অমিয় ভক্ষণ করে মুষিক করে আহার॥
মার রে যোগী মুষিক-পবন।
যাহাতে টুটে না আনাগোনা॥
ভব বিদারণ করে মুষিক, খোঁড়ে গর্ত।
চঞ্চল মুষিক জানিয়া নাশের জন্য থাক তুই॥
কাল মুষিক, জানি না বর্ণ।
গগনে উঠিয়া চরে আমন ধানে॥
তাবৎ সে মুষিক আঁচড় পাঁচড় করে।
(যাবৎ) সদ্‌গুরুর বোধে না করিও তারে নিশ্চল॥
যবে মুষিকের চার টুটে।
ভুসুকু ভণে তবে বাঁধন ছুটে॥

চাষের গান

বিভিন্ন বিষয় লইয়াই কৃষকের চাষের গান রচিত হইতে পারে, তবে কোন কোন গানে চাষ করা রূপক অর্থে ধরা হয়। ইহাও কর্ম-সঙ্গীতের অন্তর্গত।

১

জমিএ চাষ কর যতনে,
নইলে আবাদ হবে কেমনে।
উগাল সামাল তেউড় চাষ
জমিতে যেন না হয় ঘাস
ঘাস হলে আবাদ হবে কেমনে,
জমিএ চাষ কর যতনে॥
বাঁধটি বেঁধেছ বেশ,
জল যেন না হয় শেষ।
শেষ হলে আবাদ হবে কেমনে॥
লরে ছয়টি বলদ ঘরে
বাঁধ তাকে প্রেম ডোরে
ছয়টি বলদ চালাও সমানে॥
চোদ্দ ভুবনের জল
জল করে ছল ছল
লরে এমন জমি দিলে কি না কে জানে॥
বাঁধের উপর বাঁধ
তার উপরে দুটি চাঁদ
(মন রে) সার খোলে জল ছাড় জুকানে॥
(অরে) কোটিতে একজন চাষা,
(অ মন) লগনদাসের মিছে আশা
লাড়া কড়াই ধিকধিক পরাণে
জমিএ চাষ কর যতনে
নইলে পরাণ বাঁচে কেমনে॥ —বাঁশপাহাড়ী

২

ভাসাই নিল যত ক্ষেতি—'ক্ষেইন্যাবেতী, 'বীজমালী', 'বালাম'।
'চিন্নাল', 'গিরিং' আর কত কইব নাম॥
দেশের মাঝে হৈল কহর পরাণ রাখা ভার।
দারুণ তুফান, হায়, কৈল্ল রে উজাড়॥ —চট্টগ্রাম

৩

কাঁচা সোনার বরণ গৌর আমার, জনিক সন্ন্যাসীর সাথে।
ওগো তোমরা কি কেউ দেখেছ যাইতে ॥
হায়রে, চাঁচর কেশ তার নবীন বয়েস, হরির নামে বড় আবেশ,
বৈষ্ণবের বেশ।
ও নগরবাসী, দেখ গো তোরা আমার নিমাই নি কেউ দেখেছ যেতে।
শয়ন মন্দিরে ছিল, নিশা ভাগে কোথায় গেল, হায় কি হলো।
সে যে মা বলিয়ে, ডেকে গেল অভাগী শুন্‌লেম না কালনিদ্রা বশে।
হরির নামে মালা ঝুলছে গলে, একখানা নামাবলী শ্রীঅঙ্গেতে।
ওগো ঘরের বধ্ বিষ্ণুপ্রিয়া, সে যে ধূলায় পড়ে কাঁদতে আছে,
তোমরা নি কেউ দেখেছ যেতে ॥ —মৈমনসিংহ

৪

নন্দের ঘরের কানাই
যমুনা সেনানে চল যাই (ধুয়া)।
হইল দুইফর বেলা
তাতিব পন্থের ধূলা
কিমতে হাটিব লাঙ্গা পাই।
যাইব কিনা না যাইব ভাইয়া
কহ চিত্ত বুঝাইয়া
যমুনা কূলে শাম ভাই।
যমুনার জল কালা
সেনান করিতে ভালা
সর্ব অঙ্গ জলেতে মিশাই ॥ —ঢাকা

অনেক সময় সাধারণভাবে লোক-সঙ্গীতকেও চাষার গান বলা হয়।

৫

বাঁশী বাজাইওনা, কোন রসিকে বাজায় বাঁশী
নাম লইও না (ধুয়া)!
কদম তলে এড়ি বাঁশী সেনান করেছে,
পবনের বাতাসে বাঁশী রাধা বলেছে—

একেত কানাইর বাঁশী তাতে সপ্ত বেঁধা,
বাশী যে কেমনে জানে মোর নাম রাধা ?
কোন্ রসিকে বাজায় বাঁশী শুন্‌তে বিপরীত,
ঘরে কাম এড়ি ভইনে শুনে বাশীর গীত।

৬

পাকিলে দেখায় লাল —ঐ
ডালিমের ভুঁয়ে লোটায় ডাল।
পাকিলে ডালিম পাবে না।
পীরিতির ফল কাঁচা ভাইঙ্গনা॥ —বেলপাহাড়ী

৭

গুণ গুণ করে ভ্রমর মাঠেতে বেড়ায়।
মধুর লোভে ভ্রমর মাঠেতে বেড়ায়॥ —ঐ

৮

ঝাঁপ দিব যমুনার জলে, গলে ঝুরি লিব।
ও ললিতা, কোথায় হে নবীন বংশীধারী॥ —ঐ

৯

মরিলে গো আমরা পুঁটি মাছ জনব লিব।
শ্যামকে নদীর কিনারে হে বালতি দিব॥ —ঐ

১০

বলেছিলিম গো,
আমরা বারটার মটরে যাব।
ঘরের গৃহজ্বালা হে কারে দিয়ে যাব॥ —ঐ

১১

লোকে বলে ছিঃ—ছিঃ আমি
বা বারে ছি কি বিছানা
পুকুর দাঁড়ে আগালা মন মজেছে।
কত লোকের বড় ব্যথা শুনেছি॥
ননদিনী হল বিধি কথায় সাতালি। —ঐ

১২

চারি যুগে স্বর তবু দায় কেন না হয় তারি গো,
রাঙা চরণ পুজবো বলে ফিরি আশা ছিল গো। —ঐ

১৩

মালা আয়া বইলো কি কারণে বঁধুর—
আমার মন ভাঙ্গিল।
যার লাগি গৃহ ত্যজি থাকিলো নির্জনে বসিয়ে গো
সে বঁধু ছাড়িয়া মোরে কোথা রহিল গো।— —ঐ

১৪

শেফালি চামেলি বেলি জুঁই চাঁপা পারলে আধা
ফোটা ফুলে সাজিয়ে ভরিল গো,
ফুল তুলি নানা জাতি বিজনে বসি মালা গাঁথি
বঁধূ গলে দিব বলে আমার আশা ছিল গো,
বীণায় বাণী শুন বলি, ওগো ধনি,
পর-পীরিতে এমন ধারা যেমন হাতে চাঁদ পাইল। —ঐ

১৫

আমার কাঁদিতে ভাবিতে গো জনম গেল,
পলাশের পাতা যেন যুগল না হল।
সত্য যুগে লক্ষ্মী রূপে ছিলেম আমি বৈকুণ্ঠেতে গো,
হেনকালে প্রভুর আমার কি ভাষা হইল।
ত্রেতাতে বীর নাথে গিয়েছিলাম বনবাসে গো।
ভাগ্যদোষে রাক্ষস এসে আমায় হরিল। —ঐ

১৬

চলিতে তোর কাঁদ্না আসে ধুয়া ছলনা
ও তুই কাঁদলো বসে।
কাঁদলো ধনি লো কর্ম দিব না
মুখের হাসি মুখেই রাখবি
আড় নয়নে কথা বলবি
ধুয়ার ছলনায়, কাঁদলো ধনি লো, তুই ধর্ম জান না। —ঐ

চিঁড়াকুটার গান

ধান ভানার মত চিঁড়াকুটার গানও শুনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ধান ভানা এবং চিড়াকুটার প্রণালীতে কোন পার্থক্য নাই ; সেইজন্য গানের তাল কিংবা সুরেও কোন পার্থক্য থাকে না। কেবল ধানের বদলে চিঁড়া শব্দের উল্লেখ থাকে মাত্র।

১

চিঁড়া কুটি চিঁড়া বন পালার তলাতে
ছোট বহিন চিঁড়া কুটে মেজ বহিন ঝাড়ে,
বাড়ীতে কুটুম এসেছে। —বাঁশপাহাড়ী

চোর-চুন্নীর গান

জলপাইগুড়ি অঞ্চলে এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহাতে চোর এবং তাহার স্ত্রীর সঙ্গীত-সংলাপ শুনিতে পাওয়া যায় ; কোনও কোনও সময় ইহাতে ধৃত চোর-স্বামীর জন্য চোরের স্ত্রীর বেদনা প্রকাশ পায়, তাহাকে চোর-চুন্নীর গান বলা হয়।

১

বন্দনা। বন্দনা করি আমি চোর চকরপতি,
চোর চকর পতিরে তোর পদে ভকতি।
কি গুণ মন্তরের জোরে, চুরি কর দিন দুপুরে,
তোক ধরিতে কাঁহো নাহি পারে,
নাই কারোর শকতি।
খনেক ছোয়া খনেক চোরা, খনেক গাবুর
খনেক বুড়া, খনেক তুই নবীন চেঙ্গরা খনেক খুবরী,
বন্দনা করি, চোর চকরপতি॥

চুন্নী। মুই দ্যাখেছ তোর রে, চোরা, গল্প কথাই সার,
কি কহিম্ আর, যা ক্যানেতে ওরে, চোরা, চুরি করিবার।
যে জন, চোরা, করে চুরি,
তার মাইয়া পিন্ধেছে শাড়ী,
পাটাই না বোম্বোই দেখো মাদ্রাজী।

ফুল তোল বোট্টি পিন্‌ধেছে
হাওয়ার চাদর গায় দিছে
ঘরের ভিতর কন্যা আছে দেখিতে মজা কি বাহার,
যা ক্যানে তুই, ওরে চোরা, চুরি করিবার।

চোর। চুরনী, ক্যানে কর ভাবনা হপ্‌কতে করিনু বিয়ো,
নাই দেও গাহেনা, তাতে কিসের ভাবনা
দাঁও পালে মুই করিম চুরি কতো পিনদাম গাহেনা।
চুরনী, চুরি করিবা খাস সেই দিন,
সয়ের জিনিস কতোই আনিস
গাহেনা পাতি কাপড় চোপড় কতোই যে আনিস্।
চুরনী, দেখিস সে জিনিস সে কাথা তুই না ভাবিস্।

চুরনী। চোরা রে, আজি একখান চুরি করিস্ ধোকরা,
মোর নারীর একটা ফতোই সার।
গাও ধোলে নাই পিছিবার।
মোর বাদে তুই ফোতা আনিস এক জোড়া,
দিনে দিনে কতো বেড়াম এক কাপড়া হয়া। —জলপাইগুড়ি

চৈতপরবের গান

চৈত পরব বাংলা দেশে ছাতুপরব বলিয়া পরিচিত। চৈত্রমাসে এই উপলক্ষে কোন কোন সময় গান শুনিতে পাওয়া যায়।

১

কি জলে বান পড়িল সরগের তো জল নাই,
কি জলে বান পড়িল রসে রসো লো দিদি বান পড়িল॥

—সাহেবডিহি, পুরুলিয়া

২

ছোট কালে বিয়া হইল
বড় হইতে ছেলের মা হইল,
কোলে লইয়া কাঁদে লো বিকুলি,
পুরুষের ঘর করা লো বড় জ্বালা॥ —ঐ

ছ

ছাদপিটানোর গান

উচ্চ ভাবমূলক প্রেম-সঙ্গীতেরই একটি রূপ অধঃপতিত হইয়া ক্রমে ছাদ-পিটানোর গানে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহা কর্ম-সঙ্গীতের (work song)-এর অন্তর্গত এবং কর্ম-সঙ্গীতের মধ্যেও ইহা সর্বাধিক বিকৃত রুচির পরিচায়ক। রাধাকৃষ্ণের প্রেম এখানে লৌকিক মনোবিকারে পরিণত হইয়াছে; সেইজন্য ইহারা শ্লীলতার সকল মাত্রা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা তাল-প্রধান সঙ্গীত; তালই ইহার সকল স্বর ছাড়াইয়া গিয়াছে।

১

কদম তলায় চাঁড়ায় কালা বাঁশরী ধরি
হেই হেই বাঁশরী ধরি ॥
একলা পেলে আঁখি ঠারি আমরা লাজে মরি
মরি মরি আমরা লাজে মরি ॥ —বাঁকুড়া

২

তোমরা হরি বল না,
আসা যাওয়ার নৌকখানি লইয়া গেল চোরে।
কেমন তোমার মা-বাপ, কেমন তাগো হিয়া,
এত বড় ডাগর হইছ না হইছে বিয়া। —বরিশাল

৩

বেলা গেল সন্ধ্যা হল হাজরী কর বাবুজী
এখন ছুটী দেবার উপায় কি।
সারাদিন খেটে খেটে পেটের ভাত তো নাহি জোট
খিদের জ্বালায় জ্বলে মরি,
এখন ছুটী দেবেন বাবুজী।
আমার পেটের উপায় কি
বলে দেবেন বাবুজী।

দালান দিলে, মহাল দিলে
বাড়ীর নামু পুষ্করিণী।
আমার পেটের ভাতের উপায় কিবা,
তোমার কাছে জানাইছি॥ —মুর্শিদাবাদ

৪

চল সই জলকে যাবে লো, পড়িল বেলা
হেই হেই পড়িল বেলা।
রাত হলো ভয়ে মরি আমরা অবলা।
মরি মরি আমরা অবলা॥ —ঐ

৫

তুমি আমার কালসোনা হেই কালসোনা
তুমি ছাড়্যে গেলে আর আমি বাঁচব না।
মরি মরি বাঁচব না॥ —ঐ

৬

দালান দিলি মহল দিলি বাড়ীর নীচে পুষ্করিণী
একখানা পান্সী দিতে পারনি॥
বাঁধা জল কাঁচা পানি শুন হে মিস্ত্রী
একটু লবণ দিতে পারনি॥
চাল পেলাম ডাল পেলাম
না পেলাম জ্বালানী॥
তরকারীর মধ্যে সবই হল—
কেবল পায়নি স্থক্তানি॥
ভাত হল ডাল হল খেলাম না আমানী॥
দিঘির ধারে বাগান হল বড় বড় গাছ
না হল মালিনী॥
বড় বড় বাবু আছে দুনিয়া ভিতর
এমন মালিক চক্ষেতে দেখিনি॥ —বীরভূম

ছেঁচর গান

মুর্শিদাবাদ জিলার পল্লী অঞ্চলে ছেঁচর গান নামে এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে। কি ভাবে যে এই নামটির উদ্ভব হইল, তাহা জানা যায় না, তবে ছেঁচর গান লঘু-বিষয়ক লোক-সঙ্গীত নহে ; বরং ইহার ভিতর দিয়া সুগভীর ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণের বিষয়ই ইহারও অবলম্বন। পূর্বে যে আলকাপ গানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, বিষয় ও ভাবের দিক হইতে তাহার সঙ্গে ইহার ঐক্য আছে। নিম্নে কয়েকটি নিদর্শন উদ্ধৃত করা গেল—

১

আমায় কে ডাকলো গো, বিজন বনের ধারে গো,
বাঁশীর সুরে ও নাম ধরিয়া, বঁধু আসার আশে রহিলাম,
বসে পথ পানে শুধু চাহিয়া।
প্রেম করিয়ে এত জ্বালা, কালার সনে ও প্রেম করিয়া। —মুর্শিদাবাদ

২

যৌবন জ্বালা বড় জ্বালা, বঁধু, তুমি জান না।
তুমি যদি জান্‌তে, বঁধু, ছেড়ে যেতে না।
আমার এই প্রেমনদী, স্রোত বহে তার পাই না ঠিকানা। —ঐ

৩

অসময়ে রংয়ের ছিটা বঁধু গায়ে দিও না।
আমি জেগে থাকি সারা নিশি কৈতো বন্ধু এল না।
আমি কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকি কৈ তো তল্লাস নিলে না। —ঐ

৪

বিরহে প্রাণ বাঁচে না, প্রাণবন্ধু কুঞ্জে এল না।
আমি জেগে থাকি সারা নিশি গো পাতিয়ে ফুলের বিছানা।
আমি খুঁজে বেড়াই বনে বনে গো—
শ্যামের দেখা পেলাম না। —ঐ

৫

বন্ধু, তোমার লাগিয়া রে, এ নব যৌবন আমার
গিয়াছে চলিয়া বন্ধু রে।

তুমি চলে গেলে দূর দেশে, সময়ে এলে না কেন রে—
এ নব যৌবন আমার গিয়াছে চলিয়া বন্ধুরে।
এবার যদি আস, বন্ধু, তুমি আর পাবে না মধুরে—
এ নব যৌবন আমার গিয়াছে চলিয়া বন্ধুরে। —ঐ

৬

আমি কেন বা পিরিতি করিলাম।
আগে যদি জানতাম, বন্ধু, প্রেমের এত জ্বালা।
কদম তলায় ঘর করিতাম, থাকিতাম একলা রে—
আগে যদি জানতাম, বন্ধু, প্রেমের এত জ্বালা।
লহার প্রেমে সারে দিয়া রাখিতাম ভরিয়া রে। —ঐ

৭

বন্ধু জানিয়ে জান না, বল্লে শোন না,
জ্বালিয়ে গেলে মনের আগুন নিভিয়ে গেলে না।
ও যার কাঁচি কাটা চুল, চিকন কালো ছোকড়া,
বন্ধু, খেল কদমের ফুল।
বন্ধু নয়নের কাজল তিলক দণ্ড না দেখিলে,
মন হয় রে পাগল ॥ —ঐ

৮

কালবরণ ছোকড়া বন্ধু বড় ভালবাসিরে।
খাবার সময় মনে পড়লে গামছায় বেঁধে রাখি রে ॥
শুবার সময় মনে পড়লে বিছানায় বসে কাঁদি রে ॥ —ঐ

ছো-নাচের গান

পুরুলিয়ার মুখোস পরিহিত লোক-নৃত্যের নাম ছো-নৃত্য। ছো-নাচ পুরুলিয়ার আদিবাসী, বাঙ্গালী হিন্দু, অর্ধ-হিন্দু (semi-Hindu) অর্ধ-আদিবাসী (semi-aboriginal) ইহাদের প্রত্যেকের সমাজ-জীবনের উপকরণ দ্বারা গঠিত; এই দিক দিয়া ইহার সঙ্গে আসামের অন্তর্গত মণিপুরী নৃত্যের তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু মণিপুরী নৃত্য ও ছো-নৃত্যের বহিরঙ্গে পার্থক্য আছে; তথাপি ইহাদের উভয়ের মৌলিক ধর্ম অভিন্ন। মণিপুর অঞ্চলে

ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতিভুক্ত নাগাজাতিরই এক শাখা মণিপুরীর সঙ্গে বাঙ্গালী সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হইয়াছিল। পুরুলিয়াতেও বাঙ্গালী সংস্কৃতির সঙ্গেই আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) জাতির বিভিন্ন শাখার সাংস্কৃতিক জীবনের সংমিশ্রণ হইয়াছে। তাহার ফলে বাংলার এক প্রান্তে যেমন মণিপুরী রাসনৃত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনই আর এক প্রান্তে ছো-নৃত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মণিপুরবাসীর সুন্দর গৌরবর্ণ দেহাকৃতির জন্য তাহাদের নৃত্যকালীন রাধা-কৃষ্ণের মুখোস ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হয় নাই এ কথা সত্য; কিন্তু কৃষ্ণকায় এবং অপেক্ষাকৃত কুৎসিৎ দেহাকৃতির জন্য পৌরাণিক অভিজাত চরিত্রের নৃত্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিবার কালে পুরুলিয়ার সাধারণ জনসমাজে স্বভাবতই মুখোসের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। সেইজন্য ছো-নাচের মধ্যেও যাহাতে অনভিজাত কিংবা আঞ্চলিক কোন বিষয় প্রকাশ করা হইয়া থাকে, তাহাতে মুখোস ব্যবহৃত হয় না।

ছো-নাচে পৌরাণিক প্রসঙ্গের মধ্যে মধ্যে নানা আঞ্চলিক বিষয়ও প্রকাশ করা হইয়া থাকে, যেমন শিকার-নৃত্য। শিকার আদিবাসী কিংবা হিন্দু-ভাবাপন্ন আদিবাসী জীবনের একটি আচার; সুতরাং নৃত্যের মধ্য দিয়া যখন তাহা প্রকাশ করা হয়, তখন শিকারীর বেশ ধারণ করা হইলেও, কোনও মুখোস পরা হয় না। এক দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, ছো-নৃত্য যত উচ্চাঙ্গ লোক-শিল্প সম্মত অনুষ্ঠানই হোক না কেন, মুখোস ব্যবহারের জন্য তাহাতে কতকটা প্রাণহীনতা কিংবা কৃত্রিমতার ভাব দ্বারা আসিয়া যাইতে বাধ্য হয়। মুখোসের শিল্পোৎকর্ষ নৃত্যের নিষ্প্রাণতার ভাব কিছুতেই দূর করা যায় না। সেইজন্য দুই একটি মুখোসহীন ছো-নৃত্যও যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার আনন্দ এবং রস অধিকতর সহজস্ফূর্ত বলিয়া অনুভূত হয়।

মণিপুরী রাসনৃত্যে মুখোস ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু ইহা মণিপুরবাসীর সাধারণ জন-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন কেবলমাত্র রাজানুগ্রহ দ্বারা পুষ্ট হইতে লাগিল, তখন হইতেই ইহার মধ্যে পোষাক ও সাজসজ্জার যে আড়ম্বর দেখা দিল, তাহাতেই ইহা অনেকটা নিষ্প্রাণ (rigid) হইয়া উঠিল। এক দিক দিয়া মুখোসের ব্যবহারের ফলে নৃত্যের সহজ রূপটি যেমন অনেকটা আচ্ছন্ন হইয়া গেল, আর এক দিক দিয়া পোষাকের আড়ম্বরতা ও বিধিবদ্ধতা

(formality) ইহাকে কতকটা নিষ্প্রাণ করিয়া তুলিল। সুতরাং দেখা যায়, সমাজ-জীবনের ক্রমবিবর্তনের একই ধারা অনুসরণ করিয়া যেমন ছো-নৃত্য এবং রাস-নৃত্যের জন্ম হইয়াছে, তেমনই একই ধারা অনুসরণ করিবার ফলে উভয়েই একই অনিবার্য পরিণতির সম্মুখীন হইয়াছে। মণিপুরের সমাজে বিভিন্ন লোক-নৃত্য প্রচলিত থাকা সত্বেও তাহাতে রাস-নৃত্যই যেমন সর্বোত্তম (*par excellence*) বলিয়া গৃহীত হয়, পুরুলিয়ার জন-সমাজেও বিভিন্ন লোক-নৃত্য এবং আদিবাসী নৃত্য প্রচলিত থাকা সত্বেও, ছো-নৃত্যকেই সে দেশের সমাজে সর্বোত্তম (*par excellence*) বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

লোক-সমাজের সর্বোত্তম কোন সাংস্কৃতিক রূপ স্বতন্ত্র কিংবা বিচ্ছিন্ন ভাবে দেশান্তর হইতে অনুকরণের ফলে সৃষ্টি হইতে পারে না, তাহা সমাজের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক রূপ হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিকাশ লাভ করে। জাতির লোক-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া যাহা স্বীকৃতি লাভ করে,. জাতির রস-চেতনার নিভৃততম ক্ষেত্রেও তাহার শিকড় গিয়া প্রবেশ করে। পুরুলিয়ার জন-জীবনের সঙ্গে ছো-নাচের সম্পর্ক বিষয়ে যাঁহারা প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইহার সঙ্গে এই সমাজের সম্পর্ক প্রাণের (vital) সম্পর্ক। প্রাণ যেমন স্নায়ু ও শিরা উপশিরার সূত্রে সমগ্র দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযুক্ত, সাংস্কৃতিক জীবনেরও বিশিষ্ট একটি রূপ ইহার সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যান্য উপকরণের সঙ্গেও তেমনই ভাবে যুক্ত হইয়া থাকে। পুরুলিয়া অঞ্চলে এখনও যে সকল বিভিন্ন প্রকৃতির লোক-নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রকৃতি ও প্রসার অনুসরণ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনের পক্ষেই ছো-নাচের মত একটি বিশিষ্ট নৃত্যরূপ প্রচলিত থাকা সম্ভব। বাংলার অন্যান্য যে সকল অঞ্চলের নৃত্য-সংস্কার এত প্রবল নহে, সে অঞ্চলে এই শ্রেণীর পরিণত একটি নৃত্যরূপ প্রচলিত থাকিতে পারে, এমন আশা করা যায় না। সেই জন্য ছো-নাচের পটভূমিকায় পুরুলিয়ায় এখন পর্যন্ত আর কোন্ কোন্ লোক-নৃত্য বিশেষ প্রচলিত আছে, তাহার উল্লেখ করিতে পারা যায়।

পুরুলিয়ার সাধারণ জন-গোষ্ঠী প্রধানত মাহাতো বা কুর্মি সম্প্রদায় দ্বারা গঠিত হইয়াছে ; ইহার সঙ্গে ভূমিজ, আহিরা ইত্যাদির অস্তিত্ব থাকিলেও যে

সম্প্রদায় প্রধানত পুরুলিয়ার সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, তাহা প্রধানত কুর্মি বা মাহাতো সম্প্রদায়। এমন কি, এই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবন দ্বারা উচ্চতর হিন্দু সমাজও অনেক দিক দিয়া প্রভাবিত হইয়াছে। উচ্চতর হিন্দু সমাজ প্রভাবিত হইবার একটি প্রধান কারণ, বাংলার পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিভিন্ন কালে উচ্চতর হিন্দু বসতি ইহার মধ্যে বিস্তার লাভ করিবার ফলে ইহাতে তাহাদের সামাজিক জীবনের সুদৃঢ় সংহতি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই ; উচ্চতর হিন্দুর সামাজিক জীবনের শৈথিল্যের জন্যই ইহা অতি সহজেই আঞ্চলিক প্রবলতম যে সংস্কৃতি, তাহা দ্বারা কোন কোন বিষয়ে প্রভাবিত হইয়াছে। কিন্তু উচ্চতর হিন্দু সমাজ, বাংলা দেশের সমাজ-জীবনের সঙ্গে ক্রমাগত যোগ রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ইহার উপর আঞ্চলিক প্রভাব সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিতে পারে নাই, কেবল কোন কোন ক্ষেত্রে এবং পল্লী অঞ্চলে তাহা কতকটা সম্ভব হইয়াছে। সেইজন্য এমন কি, ছো-নাচের সঙ্গে কুর্মি, মাহাতো কিংবা ভূমিজ, আহিরারও যে সম্পর্ক, উচ্চতর হিন্দু সমাজের সেই সম্পর্ক নাই। তাহারা ইহার কৌতূহলী দ্রষ্টা মাত্র ; এমন কি, পৃষ্ঠপোষকও বলিতে পারা যায় না, সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা ত দূরের কথা। দেশের সাধারণ সম্প্রদায়, প্রধানতঃ কূর্মি-মাহাতোগণই ইহার উদ্ভাবক, ইহার প্রতিপালক এবং ইহার পৃষ্ঠপোষক। সেইজন্য ইহার লৌকিক চরিত্র (folk-character) অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মণিপুরী রাস-নৃত্য যেমন রাজানুগ্রহে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, পুরুলিয়ার ছো-নাচ সেই সুযোগ অল্পই লাভ করিয়াছে। কেবলমাত্র পুরুলিয়ার পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ইহা যখন সেরাইকেলার তদানীন্তন ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন সেখানে ইহা রাজানুগ্রহ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু পুরুলিয়ায় ইহার ধারা কেবলমাত্র জনসাধারণ এবং বিশেষতঃ মাহাতো সম্প্রদায়ই রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। এই মাহাতো এবং তাহাদেরই সমধর্মী অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল লোক-নৃত্যের এখনও কিছু কিছু পরিচয় অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাদের কথাই এখানে উল্লেখ করা যাইবে। কারণ, ইহাদের প্রত্যেকেরই রূপ, রস এবং আঙ্গিক দ্বারা এই অঞ্চলের ছো-নাচ পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

ছো-নাচ বাদ দিলে পুরুলিয়ায় যে লোক-নৃত্যের কথা প্রথমই উল্লেখ করিতে হয়, তাহার নাম নাটুয়া-নাচ। পুরুলিয়ার ছো-নাচ ব্যতীত আর

কোন লোক-নৃত্যেই মুখোস ব্যবহৃত হয় না। তাহার প্রধান কারণ, ছো নাচ ব্যতীত আর কোন নৃত্যেই পৌরাণিক প্রসঙ্গ কিংবা অভিজাত কোন বিষয় অবলম্বন করা হয় না। নাটুয়া-নাচের মধ্য দিয়াও কোন পৌরাণিক কিংবা অভিজাত কোন বিষয় পরিবেষণ করা হয় না। এই নৃত্য কর্মসঙ্গীতের সহচর, সুতরাং তাল-প্রধান। কর্মসঙ্গীতের সঙ্গে সংযুক্ত বলিয়াই ইহার সঙ্গে দৈহিক অঙ্গ সঞ্চালন প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। অঙ্গ সঞ্চালনের প্রাধান্য মুখোস নৃত্যেরও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ছো-নাচের অঙ্গ সঞ্চালনের দিকটি যে নাটুয়া-নাচ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। নাটুয়া-নৃত্য যেমন একক নৃত্য, তেমনই সারি (group) নৃত্যও হইতে পারে। কিন্তু সাধারণত বাংলার অন্যত্র প্রচলিত একক নৃত্যে অঙ্গ সঞ্চালন প্রাধান্য লাভ না করিলেও নাটুয়া নাচ ইহার ব্যতিক্রম। আদিবাসী পুরুষ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত নৃত্য মাত্রেরই অঙ্গ সঞ্চালনের প্রবলতা একটি বিশেষ লক্ষণ। সুতরাং পুরুলিয়ার লোক-নৃত্যে অঙ্গ সঞ্চালনের যে প্রাবল্য দেখা যায়, তাহা কেবলমাত্র ইহার মুখোসের জন্যই আসে নাই, কিংবা কেবলমাত্র নাটুয়া নাচ হইতেও আসে নাই, আদিবাসী নৃত্যের প্রভাবেরও যে কতকটা ফল ইহার উপর রহিয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়। নাটুয়া-নাচে মুখোসের ব্যবহার না থাকিলেও তাহাতে নানা রঙের কাপড়ের টুকরা গায় বাঁধিয়া গায়ে মুখে রঙ মাখিয়া সঙ্‌ সাজিয়া নৃত্য করা হয়, অথচ ইহা সঙের কিংবা ভাঁড়ের নৃত্য নহে। ইহার মধ্যে লঘু কৌতুক সৃষ্টি করিবার পরিবর্তে প্রধানতঃ বীররসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই নৃত্যের সঙ্গে বাংলার বিশিষ্ট আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র ঢোল (ঢোলক নহে) ও ধাম্‌সা বাজিয়া থাকে। ইহা যুদ্ধ-নৃত্যেরই অবশেষ (remnant) বলিয়া মনে হয় ; বর্তমানে ইহা ধনী লোকের বরানুগমন কালেই প্রধানত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রামের বিবাহোপলক্ষেও ইহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যুদ্ধ-নৃত্যগুলি অধঃপতিত (degenarted) হইয়া বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখন বিভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে ; ইহাও তাহাদের অন্যতম বলিয়া মনে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, এই নৃত্যের বলিষ্ঠ অঙ্গসঞ্চালনের রূপটি দ্বারা পুরুলিয়ার ছো-নৃত্য প্রভাবিত হইয়াছে। ছো-নাচের প্রথমেই গণেশের নৃত্য হয়, সঙ্গে সঙ্গে গণেশ বন্দনা সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়।

১

নম নারায়ণ, গণেশ, দিব্য হরগৌরীর নন্দন।
সিন্দুরের বিন্দু বিন্দু মূষিক বাহন,
নম নারায়ণ ॥
বম্ বম্ করেন ভোলা, বামে গিরিবালা,
কার্তিক গণেশের সঙ্গে নাচেন গৌরীবালা ॥
গণেশের জন্ম হইল মহাদেবের ঘরে
দেশে নেমন্তন যত দেবগণে
শনি দৃষ্টি মুণ্ড উড়ে কিসের কারণে ॥
ইন্দ্রেরো হস্তী চলেন ধীরে ধীরে,
সে হস্তীর মুণ্ড কেটে জিয়াও হে গণেশে ॥ —বাঁশপাহাড়ী

তারপর নানা বিষয়েই গান শুনিতে পাওয়া যায়—

২

শিমূল ফুলে নাইকো মধু গন্ধ মিলে না।
এমন প্রভু করেছেন লীলা ভ্রমর বসে না।
শিশুকালে খেলেছিলাম এক গলা জলে,
সে সব কথা মনে পড়ে, বন্ধু, তোমায় দেখিলে। —ঐ

৩

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে তেঁতুল পাতে জল,
শ্বশুর ঘরের লোক দেখিলে চোখে পড়ে জল। —ঐ

৪

নদীপারে নদীধারে সর ঢুধির বন,
আনবো ঢুধি বুনবো ক্ষুদী, আজ বইরবো কখন। —ঐ

৫

কদম তলায় বাজলো বাঁশী শুনতে পাইয়েছি,
তবে নাই নয়নের মুচকি হাসি নাই ভাল কাশি। —ঐ

৬

আম পাতা চিরি চিরি নোনা পাতা বহে
কাসাই নদী দামোদর লহকে পাইরাব হে ॥ —ঐ

৭

একটি ফুলের তরে বধূ হলে অপমান হে,
দুয়ারে লাগাই দিব ফুলের বাগান। —ঐ

৮

নদীধারে কাঁড়া বাগান সবাই বলে দাঁড়া দাঁড়া,
শিয়ালে আনিছে ধরে সাঁড়া ॥ —ঐ

৯

যখন ফুলটি কলি ছিল তখন ভ্রমর আইল গেল,
এবার ফুলটি শুকাই গেল
বঁধু কোন ফুলে সাজিল।
ভালে বঁধু ডালে শুকাইল ॥ —ঐ

১০

ছোট সময় খেলেছিলাম, বঁধু, এক গলা জলে।
সে সব খেলা মনে পড়ে বঁধু তোমায় দেখিলে ॥ —ঐ

১১

পরথমে বন্দিলাম প্রভু গাঁয়ে গেরাম
তার পরে বন্দিলাম প্রভু লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
গৌর রাই রাই-হে গৌর মিলয়ে আসনিয়া ॥ —ঐ

১২

নদী ধারে চাষে, বঁধু, মিছাই কর আশ,
ঝিরি ঝিরি বাঁকা নদী বইছে বার মাস। —ঐ

১৩

আম জাম খেঁজুর কাঁঠাল বাবুর বাগানে
ঐ বাবুকের মোকদ্দমায় জামিনে জানে ॥ —ঐ

১৪

জয় প্রভু নিত্যানন্দ হংস জনার ভক্তবৃন্দ
শত শত প্রণাম তোমায়,
গৌর আছে এই আসরে আয়।
গৌরসিংহে আছে গৌর আয় ॥ —ঐ

১৫

যমুনাতে ফুল ফুটেছে নীল কালো সাদা,
কোন ফুলেতে কৃষ্ণ আছেন, কোন ফুলে রাধা
যমুনার ধারে ধারে তমালের বন
তমালের ডালে কোকিল ডাকে ঘনে ঘন। —ঐ

১৬

সকালে ঘুমালে শিশু উঠ্‌লে বৈকালে ॥
ভাল করে লাচরে শিশু আসরের মাঝে ॥
আমবাগানে কে হ তুমি ফুলবাগানে কে।
গোরা গায়ে ঘাম পড়িছে রুমাল কিনে দাও ॥ —ঐ

১৭

আম পাকাটি হইত্যা বরণ।
জাম পাকা কালো ॥
বুড়া হলে কেউ ছুঁবে না।
আমার মরণই ভালো ॥ —ঐ

১৮

সরু কাপড় পরব না হে সায়া না হোলে।
সায়া কিনে দাও বাবুর বাপ্‌, বিজয়ার দিনে ॥
ছোটর বিয়া দিলি বার গায়ের ধারে
দূরের রাস্তা চলতে নারি ॥
দাও লা দেওর বলে।
আমাদের আজ কালোবাবু ॥
রাতেও ঘুমায় নাই।
ঘুমে আঁখি ঢুলু ঢুলু।
তাও তো বলি নাই ॥ —ঐ

১৯

যমুনায় জল্‌কে গিয়ে কলসী ভাঙ্গিল ॥
কত মারিলে কত পিটিলে
কত জোড়া পইনা ভাঙ্গিল ॥ —ঐ

২০

পুষ্পচয়নে গিয়েছিলাম, দাদা, হেরে এলাম শিশু দুইজনে,
দুইধারী দুই ধনুধারী মধ্যে ধনুক ঝিয়াড়ী। —বেলপাহাড়ী

২১

চল জাম ফুল বিড়ান যাব
আমরা ঘরেই কত রইব।
ছিড়া ছিড়ি কাপড় ফেলে দিয়ে আমরা
তসর কাপড় পরব।
চল জাম ফুল লিড়ান যাব
আমরা ঘরেই কত রইব। —ঐ

২২

শিশুকালে ফুল ফুটাছে করিয়াছে আলোরে।
জেনে শুনে বসবে ভ্রমর যেন না জানে চিকন কালারে॥ —ঐ

২৩

বেল পাকাটি হলুদ বরণ
জাম পাকা কালো
যৌবন গেলে ছুঁবে নাকো, মরণ ভালো। —ঐ

২৪

নদীর ধারে ঘর হে আমার নদীর ধারে বাস,
ঝিরি-ঝিরি বাঁকা নয়ন বইছে বারমাস। —ঐ

২৫

ওহে লালমোহন কচি কদম তুলোনা এখন,
পাকলে কদম সবাই খাবে কে করে বারণ। —ঐ

২৬

কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রা তিনরাণী
চরু নিবার লাইগ্যা রাজা ডাকে তো আপনি। —ঐ

২৭

আইরে গোপাল কোলে লিব জুড়ী করে জীবন,
চাঁদ মুখে চুমুক দিয়ে জুড়াই জীবন। —ঐ

২৮

তোমার লাগি দশভুজা, তোমার লাগি জগতে পূজা,
শিবের ধারণা, সীতাকে রাখিলেন গো হরণে।
দয়া কর দেব ঘনপতি। —ঐ

২৯

ফুল তুলিতে ফুল তুলিতে আলেন দেবকন্যা,
দুধারে ধেনুকধারী, মধ্যে বিনয়ারী। —ঐ

৩০

কি ভাবনা ভাবিছ, বন্ধু, দহে যাব না।
হাতে ধরা মোহন বাঁশি রাস্তায় ফুঁকো না। —ঐ

৩১

শুন, সুবদনি, থাকিতে পরাণি, সীতা না দিব রাঘবেরে,
সবিনয়ে কয় নিকষা-তনয় দেহ, প্রাণপ্রিয়ে, কভু স্থির নয়
নিশ্চয় মরিতে হবে রে।
মনের বাসনা শুনলো সজনি, রাঘবের বাণে লুটাবে ধরণী,
ভব জ্বালা দূরে যাবে রে। —ঐ

৩২

অর্জুন কৃষ্ণ দুইজন এক রথে আরোহণ
উপনীত বনের মাঝেতে।
শুনিয়া ফাল্গুনী কয় শুন কৃষ্ণ দয়াময়
তুমি প্রভু হরি হরি,
তুমি প্রভু মদন মোহন আজ না করিব রণ
পুন ফিরে যাবো বন।
শুন সখা শ্রীমধুসূদন,
ফিরাও হরি রথের ঘোড়া মুখে দিয়ে টান ধড়া,
আজ না করিব সম্ভাষণ হে।
সুখেতে গান্ধারী মাতা,
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ পিতা এখন কান্দিবে
শত বধূগণ হে শুন সখা শ্রীমধুসূদন। —ঐ

৩৩

বম্ বম্ বম্ ভোলা বামে গৌরী বালা,
মাথায় জটা তিরশূল ধরা নাচে গৌরী বালা। —বাঁশপাহাড়ী

৩৪

সিঁদুরের বিন্দু বিন্দু মূষিক বাহন,
সর্বদেবে বন্দি আগে গণেশ চরণ,
শীঘ্রি করে এস হনুমান পবন নন্দন,
শনির দৃষ্টে মুণ্ড উড়ে কিসের কারণ,
শুন শুন মুনি মূষিক-বাহন—
গণেশ দেবের মুণ্ড উড়ে কিসের কারণ,
আসিছেন বীর হনুমান পবন নন্দন,
গণেশ দেবের মুণ্ডু উড়ে কিসের কারণ।
আসিছেন হনুমান বীর পবন নন্দন,
হস্তীর মুণ্ডু কেটে হনুমান গণেশে জিয়ায়। —ঐ

৩৫

আষাঢ় মাসের ঘোলা জলে স্বামী মরেছে।
শাঁখা পরবো না শাখারী ঠাকুর
আমার কপাল ভেঙেছে॥
মাঠে মাঠে ঘুট্যা কুড়ায় সেও বরং ভালো।
শ্বশুর ঘরে হাঁড়ি মেজে গা' হলো কালো॥ —ঐ

৩৬

সব সখীরা যুক্তিকরে চল যাব যমুনার জলে।
বিন বসনে নাম্যাছিলাম জলে॥
চরা (চোরা) বলে গ্যাখ গো, চেয়ে তোদের বসন তুলা ডালে॥
কাতর ভাবে মরবো ডুবে হরি,
আর যাব না ফিরে আর যাব না ঘরে,
নিজ্ (নীচ) হতে কে আছ ভাই, বসন দিয়ে সরম রাখো
বিন বসনে এমনি আছি জলে,
চরার ভয়ে আর যাব না ঘরকে ফিরে॥ —ঐ

৩৭

পাশা খেলিব খেলাইব কি আছে মনে,
ওরে, পাশা খেলা নয়গো ভালো যা তে বনে ॥
বনে ফুটে বন তিলা ফুল বন করে আলো,
ওরে, বিটি ছায়ের (ছেলের) মিছা জনম পরের ঘর আলা ॥
বাঁকা সিঁতায় অলমা ধূতি রাস্তায় চলে যায়,
ওরে দেখি শ্যামের বিবেক না বঁধু কার ঘরে মানায় ॥

৩৮

আঁকা বাঁকা তেঁতুল বাঁকা ওরে বাঁকা শ্যাম,
(ওরে) মনের কথা হৃদে গাঁথা বঁধু ওরে বাঁকা শ্যাম,
অচম্বিতে সোনার মিরগ্ দিও দরশন।
ওরে মাইরো না মাইরনো মিরগ, রাম-লক্ষণ ॥
যমুনাকে জলকে যাএঁ কিসের কাঁদনা পায়।
ওগো তোরা বলনা গো সঙ্গিনী কে যায় ॥

ছো-নাচ পুরুলিয়ার কোন কোন অঞ্চলে যে-কোন সমাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে পালা পার্বণে অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করিয়া গাজনে। শিব পুজার চড়ক উৎসবে, দুর্গা পুজায় ও কালী পুজায় অনুষ্ঠিত হয়। ছো-নাচের দলে এক জন গায়ক থাকে। প্রায় ত্রিশ জন লইয়া দল গঠিত হয়। গায়েন গান আরম্ভ করিলে দলের অন্যান্য সকলে নৃত্যসহকারে গান করে। সাজ সজ্জা—পায়ে ঘুঁঘুর, পরনে ঘাঘ্রা ও বিচিত্র রঙিন পোষাক পরিচ্ছদ। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য মুখে মুখোস ও মাথায় মৌড় (মুকুট), পুরুষরাই প্রধানতঃ গান গায়। প্রয়োজন স্থলে পালা অনুযায়ী হর-পার্বতী রাধা-কৃষ্ণ পুরুষেরাই মেয়েদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বছরের যে কোন সময়ে ছো-নাচ হইতে পারে। তবে বিশেষ ভাবে চৈত্র (চড়ক) বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ (শিবপুজার গাজন) এবং আষাঢ় মাসে (রোহিণী) এই উৎসবের প্রশস্ত সময় বলিয়া পরিগণিত হয়। বাদ্যযন্ত্র—ঢোল, ধামসা, (ধম্‌সা) সানাই। ঝুমুর গান ছো-নাচের অঙ্গ। কিন্তু সমস্ত ঝুমুর গান ছো-নাচে গায় না। ছো-নাচের সময় রাত্রির বেলা চড়ক গাজন উৎসবে প্রথমে ছো-নাচ পরে পালা-গান অনুষ্ঠিত হয়। রামায়ণের কাহিনী ছো-নাচের প্রধান বিষয় হইলেও ধুয়া রূপে যে কোন বিষয়ে গান গাওয়া যাইতে পারে। উদ্ধৃত সঙ্গীতগুলি প্রায় অধিকাংশই ধুয়া।

৩৯

ওরে নিমাই কাঁদিলে কেনে
ভাইএর সনে কথা কহিতে কহিতে কাঁদিলে কেনে !
কিসের অভাব হয়েছে তোদের, ওরে নিমাই কাঁদিলে কেনে,
মাগো, কহিতে পারি না আর
তোমার নিমাই আর ঘরে রহিবে না মা
নিমাই আর ঘরে রহিবে না মা।
ওরে নিমাই কাঁদিলে কেনে ? —বাঁশপাহাড়ী

৪০

জমিনাতে ফুল ফুটেছে নীল কাল সাদা,
কোন ফুলেতে কৃষ্ণ আছেন কোন ফুলেতে রাধা।
শনি দৃষ্টি দিতে মুণ্ড উড়ে কিসের কারণ, গণেশদেব
হরগৌরীর নন্দন ॥ —ঐ

৪১

কুহু কুহু ডাক কোকিল কদমের স্বরে,
আর ডেকোনা কোকিল আমরা যাচ্ছি শ্বশুর ঘরে,
ফুল বাগানে ফুলের শোভা রাত্রির শোভা চাঁদনি,
মায়ের কোলে ছেলের শোভা, পুত্র শোভা জননী। —ঐ

৪২

বনে ফুটে বন তুইলা ফুল বন করে আলা,
ঝি ছাইলা মিছায় যেমন পরের ঘর আলা। —ঐ

৪৩

জনকের সতী আমি সীতা নাম ধরে
স্বামী আমার রাম রঘুমণি। —ঐ

৪৪

জনকপুরে জনক রাজা করে নিমন্ত্রণ।
যে ভাঙ্গিবে হরধনু তারে সীতা কন্যাদান। —ঐ

৪৫

জাঁতি কাটা সুপারী বায়েন কাঁইচি কাটা পান।
বাজাইতে জাপারি বায়েন তোর গুরুকে আন ॥ —ঐ

৪৬

উপর গালে পান সুপারী, আগদাঁতে 'মিশি'
তোর কিরা তোর ভায়ের কিরা আমি জানি কি?
ইঁচলি মাছের ফরা তায় ফেলেছি ঘি,
তোর কিরা তোর ভায়ের কিরা আমি জানি কি? —ঐ

৪৭

ব্যোম্ ব্যোম্ করেন ভোলা বামে গিরিবালা।
হাতেতে তিরশূল ধরা নাচিছে ভোলা॥ —ঐ

৪৮

ননদ, গাঁথ হে মালা পরকুল দহে তুলবো হে মিঠাইডালা,
যে গো আমার নিজ স্বামী সে করে গো গণ্ডগোল।
ধৈর্য ধরে রইবো কতদিন দেওর আমায় ভালবাসে,
নিজ স্বামী করে গণ্ডগোল ধৈর্য ধরে রইবো কতদিন।

—বাঁশপাহাড়ী

৪৯

লতা পাতা সব শুকাল, ডালের কোকিল বোবা হইল।
উঠ হে প্রাণের কানাই ও তোর গোষ্ঠে যাবার বেলা হল॥ —ঐ

৫০

কোকিল ডাকে কুহু কুহু বিচুরে অন্তরে—
অমর অমর পভাত (প্রভাত) হল বন্ধু এল কই॥ —ঐ

৫১

যমুনাকে জলকে যেয়ে (আমি) শ্যামকে দেখেছি।
ধুঁয়ার ছলনা করে আমি কত কেঁদেছি॥ (২)

৫২

সোনার আঁচির সোনার পাঁচির সোনার বাসর ঘর।
বাস ঘরে চাবি দিয়ে যাক্ বাপের ঘর॥ —ঐ

৫৩

আম জাম খেজুর কাঁঠাল বাবুর বাগানে।
ঐ বাবুদের মোকদ্দমা দামিনী জানে। —ঐ

খৃষ্টসঙ্গীত*

খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ এদেশে আসিয়া দেশীয় সঙ্গীতের সুরে খৃষ্টমাহাত্ম্য-সূচক যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়া ধর্মপ্রচারের কার্যে ব্যবহার করিতেন, তাহা খৃষ্টসঙ্গীত নামে পরিচিত।

১

এস ছুটে, ভাই।
যে পথে গেছেন যীশু সেই পথে যাই॥
গিয়ে সবে কাজ করি, হেরি তারে নেত্র ভরি,
করদ্বয় যোড় করি, চরণে শির লুটাই॥
হেরিলে তাহারি মুখ, দূরে যাবে সব দুখ
হইবে অতুল সুখ সে সুখের আর সীমা নাই।
বসিলে সে ক্রুশ তলে, পাষাণ হৃদি যায় গলে,
যিশু লন করি কোলে, আপনার পিতার ঠাঁই।

*ভ্রমক্রমে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।